শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ

রণজিৎ ঘোষ

এম.এ. (বাঙ্‌লা ও ইংরেজী) বি.টি

পরিবেশক—

জভাণ্ডার

প্রসাদ মুখার্জি রোড,

কোলকা-২৬

প্রকাশক—
এডুকেশনাল বুক কর্পোরেশনের পক্ষে
জে. চক্রবর্ত্তী বি. এ.
৪এ, কীর্ত্তিবাস লেন,
কলিকাতা-২৬

মুদ্রণ
প্রকাশ
কাত্যায়ণী ৫

উৎসর্গ

পিতৃদেবের

শ্রীচরণে

এই লেখকের শিক্ষা বিষয়ক বই :

ভারতের শিক্ষা ধারা প্রাচীন ও মধ্যযুগ

আধুনিক ভারতের শিক্ষা ধারা ও শিক্ষা সমস্যার ইতিহাস

শিক্ষাদর্শ পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস (যন্ত্রস্থ)

A Brief History of English Literature

ভূমিকা

বহু দিন পূর্বে শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশের উপর একখানা বই লিখবার সংকল্প করে কাজ সুরু করেছিলাম। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষণের পাঠক্রম পরিবর্তন করায় পূর্ব পরিকল্পনা বাতিল করে দিতে হয়। নতুন করে সুরু করব কিনা যখন এরূপ সংশয়ের মধ্যে ছিলাম তখন শ্রদ্ধেয় বনোয়ারীলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের উৎসাহে নতুন পাঠক্রম অনুসারে বই লেখায় হাত দেই। তাই বহু পূর্বে বিজ্ঞাপিত হলেও বই বের হতে দেরী হল।

আমি স্কুল শিক্ষক। শিক্ষা পদ্ধতি কি? শ্রেণী শিক্ষার সুবিধা অসুবিধা প্রভৃতি আমাকে শুধু বই পড়ে জানতে হয়নি। দৈনন্দিন জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান অর্জন করেছি। পাঠক্রমের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে নিজের কথা বলার অসুবিধা অনেক তবু একজন শিক্ষকের দৃষ্টি দিয়ে সমস্ত বিষয়টা বুঝে উপস্থাপনার চেষ্টা করেছি। আমাদের দেশের যারা পাঠক্রম রচনা করেন তারা অনেক সময় আমাদের শিক্ষার বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে চোখ বুজে থাকেন। শিক্ষক-শিক্ষণের পাঠক্রম যে ভাবে রচিত তা থেকে শিক্ষকরা প্রধানতঃ ব্যক্তিগত শিক্ষা পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্পর্কে জানবার বেশী সুযোগ পান। অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁদের শ্রেণীতে দলবদ্ধ ভাবে ৪০।৫০টি ছেলেকে শিক্ষা দিতে হয়। মাত্র কয়েক দিন আগে প্রাথমিক শিক্ষকদের এক "শিক্ষাশিবিরে" আদর্শ শিক্ষা পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত এ সম্পর্কে বলবার পর শিক্ষকরা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'স্যার ৪০।৫০টি ছেলেকে এক ক্লাসে কি এ ভাবে পড়ান সম্ভব। আমার মনে হয় এ প্রশ্ন আমাদের সমস্ত শিক্ষকের। শ্রেণীশিক্ষার সমস্ত দোষত্রুটি নিয়েই এ ব্যবস্থাকে আমাদের মেনে নিতে হয়েছে। পাঠক্রমের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে যথা সম্ভব চেষ্টা করেছি শ্রেণীশিক্ষার ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করতে হলে শিক্ষা পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত সে কথা বলতে।

বই লিখতে শিক্ষা নীতি, পদ্ধতি ও স্কুল সংগঠন সম্পর্কে ইংরেজী বাংলায় বহু বই আমাকে পড়তে হয়েছে। আমি প্রয়োজন মত বিভিন্ন বই থেকে সাহায্য নিয়েছি। কারো কারো লেখার প্রভাব আমার লেখায় থাকা অসম্ভব নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন পাঠক্রমকে অনুসরণ করে তৃতীয় পত্রের কোন বই লেখা হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। সম্পূর্ণ নতুন ভাবে

গ্রন্থ পরিকল্পনায় শ্রদ্ধেয় বনেষারীলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের পরামর্শে আমি যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি। শিক্ষা পদ্ধতি ও স্কুল সংগঠনের নতুন পাঠক্রম আরো ব্যাপক হয়েছে। আমি নিষ্ঠার সাথে পাঠক্রম অনুসরণ করেছি। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে যেখানে নতুন কিছু আলোচনার প্রয়োজন হয়েছে সেখানে পাঠ্যক্রমের সীমা ছাড়িয়ে যেতে কুন্ঠিত হইনি।

স্বাস্থ্যতত্ত্ব পর্বে পাঠক্রম বহির্ভূত দেহবিজ্ঞান প্রসঙ্গ লিখে পুস্তকের কলেবর স্ফীত করিনি।

শিক্ষানীতি ও পদ্ধতি বিজ্ঞানের আমার পূর্ববর্তী সমস্ত লেখকের নিকট আমি ঋণী তাঁদের ঋণ আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। প্রীতি ভাজনীয়। শ্রীমতী বিভা চৌধুরী এম.এ. বি.টি.। সন্ধ্যা মজুমদার এম.এ. বি.টি. জ্যোৎস্না দাস এম.এ. বি টি. তাঁদের পাঠপরিকল্পনা ব্যবহার করতে দিয়েছেন। তাঁদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

প্রুফ দেখতে পারি না বলে দায়িত্বটা অন্যত্র চাপিয়েছিলাম। যারা প্রুফ দেখেছেন তাদেব চেষ্টা সত্ত্বেও ভুল বহু বয়ে গেল এজন্য আমি লজ্জিত।

আমার শিক্ষক সহকর্মীরা যদি এ বই পড়ে সামান্য উপকৃত হন তাহলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে জানব। ইতি—

বিনীত—

৪।২৯ নেতাজী নগর
কলিকাতা-৪০

রণজিৎ ঘোষ

Paper III—General Methods : School Organisation & Health Education : 100 Marks

Significance of Methodology—Need for satisfactory Methods. Evolution of teaching methods—Logical and Psychological approaches, Progressive methods of teaching. Class teaching—individualised instruction—activity methods, Project, Workshop and other Group Methods.

Factors involved in Methods. Criteria of a good method Technique of instruction. Planning a lesson. Exposition and illustration. Art of questioning. Teaching aids and appliances. Audivisual aids. Correlations and integration of studies. Modern methods of evaluation : examinations and tests. Pupil progress and promotion. Cumulative record card. Measurement of teaching efficiency.

School plant—building and equipment. Laboratory - library ; Workshop-museum—subject-rooms. Gymnasium and Playground.

General organisation and administration. The Headmaster. Teacher's council. Time-table. Supervision.

Parent-teacher co-operation. Pupil-teacher relationship, School inspection.

Organisation of co-curricular activities. Physical education—Games and sports.

Health education—cardinal principles of community hygiene. Personal hygiene. Schoolhealth service—Medical inspection and treatment, follow up service. School meal. School sanitation.

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব

দ্বিতীয় পর্ব

বিদ্যালয় সংগঠন (School Organisation)

তৃতীয় পর্ব

স্বাস্থ্যতত্ত্ব

শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ

প্রথম অধ্যায়

শিক্ষায় পদ্ধতি-বিজ্ঞান ও পরিবেশের স্থান

শিক্ষা—বহুল পরিচিত এই ছোট কথাটি বোধ হয় সভ্যসমাজের সর্বাধিক ব্যবহৃত কথা। কিন্তু শিক্ষা শব্দটির সাথে আমরা যত পরিচিত ঠিক ততখানি অপরিচিত এর স্বরূপ ও তাৎপর্যের সাথে। অতি পরিচিতির ফলেই হয়ত আমরা বিরাট অর্থগর্ভ এই কথাটির তারপর্যকে বোঝাবার চেষ্টা করি না। শিক্ষা কি. কব কোন বিস্মৃত যুগে শিক্ষার ইতিহাস সুরু হয়েছিল, কি করে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে শিক্ষা বর্তমানরূপ পেয়েছে সে এক জটিল প্রশ্ন। শিক্ষার ইতিহাস মানব সভ্যতার ইতিহাসের সমকালীন। আদিম মানুষ যেদিন সভ্যতার পথে প্রথম পদক্ষেপ করে সেদিন থেকেই শিক্ষার ইতিহাস সুরু।

সেই আদিপর্বে মানুষ নিজের অজ্ঞাতেই শিক্ষার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। আদিম মানুষ হিংস্র-প্রকৃতির মাঝে ছিল একান্ত অসহায়। নিজের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে তাকে নিয়ত সংগ্রাম করতে হয়েছে। আদিম বন্য অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে গোষ্ঠীভুক্ত হয়েছে—সমাজবদ্ধ হয়েছে, পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে জীবন-যাত্রাকে সরল করে তোলবার চেষ্টা করেছে। এই প্রচেষ্টা, এই যে সামনের দিকে এগিয়ে চলার জন্য পদক্ষেপ এর মধ্যে মানুষ নিত্য নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে—এর মধ্য দিয়েই নিয়ত শিক্ষা লাভ করেছে। সে শিক্ষা হচ্ছে জীবন-যুদ্ধে বেঁচে থাকবার উপায় উদ্ভাবনের শিক্ষা। বন্য-প্রকৃতির মাঝে বাঁচবার প্রয়োজনে তাকে নিত্য নতুন উপায় উদ্ভাবন করতে হয়েছে। জীবন-যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মানুষ বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। ক্ষুধার্ত মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় বন্য ফল কুড়িয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছে—দেখেছে কোনটি ভাল কোনটি মন্দ। ভালকে

গ্রহণ করেছে মন্দকে বাতিল করে দিয়েছে। শিকারে গিয়ে লক্ষ্য করেছে তীক্ষ্ণাগ্র বিশিষ্ট প্রস্তরখণ্ডের উপযোগিতা সাধারণ প্রস্তর অপেক্ষা বেশী এমনি ভাবে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মেটাতে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে রেখে গিয়েছে গোষ্ঠীভুক্ত উত্তর-পুরুষের জন্য। যারা অভিজ্ঞ তাদের কাছ থেকে অনভিজ্ঞেরা নতুনের সন্ধান লাভ করেছে। কর্মে, চিন্তায়, অনুভূতিতে নব নব অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে অনাগত মানব-সমাজের জন্য! এই যুগ যুগ সঞ্চিত অভিজ্ঞতার আলোকে সভ্যতার জয়যাত্রায় মানুষের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে নতুন দিগন্তে। তাই দেখি আদিম মানুষ শিক্ষার স্বরূপকে না জেনেই শিক্ষার ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করেছে। মানুষের স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা নির্বাহের প্রয়োজনে গড়ে উঠেছিল সমাজ-ব্যবস্থা, আর তারই সাথে সুষ্ঠু সমাজ-জীবনের প্রয়োজনে বিকাশ লাভ করে শিক্ষা। বাইরের থেকে শিক্ষা নামক বস্তুটিকে সমাজের বুকে চাপিয়ে দেওয়া হয়নি, মানুষের প্রয়োজনে, সমাজের প্রয়োজনে, সমাজের মধ্য থেকেই শিক্ষা ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে একটা সুসংবদ্ধ রূপ নিয়েছে। প্রথম অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে বা নতুন কিছু উদ্ভাবনের পিছনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সজ্ঞান মনের স্বকৃত চেষ্টা ছিল না। কাজ করতে গিয়ে আকস্মিক ভাবে বা কোন কোন ক্ষেত্রে সজ্ঞান চেষ্টায় মানুষ যা লাভ করেছে তাই তার বুদ্ধিতে বিধৃত হয়েছে। একজনের অভিজ্ঞতা নতুন জ্ঞান সামগ্রিক ভাবে সামাজিক সম্পদে পরিণত হয়েছে।

মানব-শিশুর জীবনের দিকে তাকালেও দেখতে পাই শিক্ষা কি, না জেনেই তার কাজের মধ্য দিয়ে সে শিক্ষালাভ করছে। সমাজের ক্ষেত্রে কি মানুষের ক্ষেত্রে শিক্ষা কি, তার স্বরূপ কি ইত্যাদি জেনে শিক্ষা সুরু হয়নি। এ সম্পর্কে ডিউই বলেছেন, "The process begins unconsciously at birth, and is continually shaping the individual power, saturating his conscience, forming his habits, training his ideas and arousing his feeling and emotions. Through this unconscious education the individual gradually comes to share in the intellectual and moral resources which humanity has succeeded in getting together. He becomes an inheritor of the funded capital of civilisation.

মানুষ নিজের অজ্ঞাতসারেই প্রথম শিক্ষার গোড়াপত্তন করেছিল। তারপর সামাজিক চেতনা প্রবল হয়ে উঠবার সাথে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা-পর্বেই সূচনা হয়। জীবনের জটিলতা বেড়ে যাওয়ায় দেখা গেল মাত্র পূর্ব-সঞ্চিত অভিজ্ঞতাই সুষ্ঠু জীবনকে গড়ে তোলবার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। জীবন শুধু অতীত ও বর্তমানের মধ্যেই সীমায়িত নয়। তার দৃষ্টি প্রসারিত অনাগত ভবিষ্যতের দিকে। সামনের দিকে দৃষ্টি রেখে মানুষকে গড়ে তুলতে হবে শিক্ষায়। শিক্ষা শুধু পুরাতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় নয়, ভবিষ্যতের প্রস্তুতি। দৃষ্টিকে আরো প্রসারিত করে বলতে পারি শিক্ষাই জীবন—জীবনই শিক্ষা।

অতি প্রাচীন কালেই ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে মানুষকে কি ভাবে গড়ে তোলা যায় সমাজে সে চিন্তার উদ্ভব হয়েছিল। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা একদিনে গড়ে ওঠেনি। বহু যুগের ব্যর্থতা ও সাফল্যের মিশ্র ইতিহাস জড়িত রয়েছে এর পিছনে। প্রতিটি যুগের একটি নিজস্ব যুগ-বৈশিষ্ট্য আছে। পরিবর্তিত সমাজের প্রয়োজনে শিক্ষা নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে, বহু দার্শনিক, শিক্ষাবিদ ও সমাজ-কল্যাণীয় চিন্তায় ও কর্মে শিক্ষানীতি ও পদ্ধতি আজ বর্তমান রূপ নিয়েছে।

আমাদের দেশের বর্তমান প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষাদর্শকে জানতে হলে স্বাভাবিক ভাবেই পাশ্চত্য শিক্ষা-দার্শনিকদের শিক্ষাসম্পর্কীয় মতবাদ আমাদের আলোচনা করা দরকার। বর্তমানে যে শিক্ষাপদ্ধতির সাথে আমরা পরিচিত ও যে শিক্ষাদর্শ আমাদের সামনে রয়েছে তা পাশ্চাত্য শিক্ষাদার্শনিক ও শিক্ষাবিদদের চিন্তা ও সাধনায় গড়ে উঠেছে। মধ্যযুগের ধর্মান্ধ পুরোহিত-শাসিত সামাজে জীবনের সাথে সম্পর্ক বিরহিত গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থা কি করে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান রূপ নিয়েছে সেই ধারাবাহিক ইতিহাসকে অনুসরণ করলেই আমরা আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি-বিজ্ঞানের (Methodology) স্বরূপকে জানতে পারব।

শিক্ষাবিদরা শিক্ষার নীতি-আদর্শ-লক্ষ্য প্রভৃতি স্থির করবার পরেও একটা কথা থেকে যায়, তা হচ্ছে কি করে শিক্ষার নির্দেশিত লক্ষ্যে পৌছান যাবে। আদর্শকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে কোন পথ ধরে অগ্রসর হতে হবে—কোন পদ্ধতিকে অনুসরণ করতে হবে। রুশো তাঁর শিক্ষার আদর্শকে কিভাবে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চান তা বোঝাবার জন্য তাঁর মানসপুত্র 'এমিল'কে

সৃষ্টি করেছেন। পেস্টালৎসী তার শিক্ষাদান প্রণালী বোঝাবার জন্য লিখলেন How Gertrude teaches her son" ফ্রয়বেল শিশুউদ্যানের (Kinder garten) সৃষ্টি করলেন। এমনি ভাবে মন্টেসরী পদ্ধতি, প্রোজেক্ট পদ্ধতি, ডালটন পদ্ধতি প্রভৃতি বহু শিক্ষাপদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষাবিদদের মনোনীত শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ শেখাতে হলে কি করে শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে কিভাবে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ তাদের সামনে উপস্থাপন করতে হবে—শিশুর কোন কোন বিশেষ প্রবণতাকে কাজে লাগিয়ে তার কাছ থেকে ঈপ্সিত ফল পাওয়া যাবে—এসব নিয়েই পদ্ধতিবিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষাপদ্ধতি মূলতঃ শিক্ষাদানের কৌশল। শিক্ষা দেবার কাজ সফল করবার জন্য বহু প্রকার শিক্ষাপ্রণালী রয়েছে—যেমন আরোহী প্রণালী, অবরোহী প্রণালী, বক্তৃতা প্রণালী, কার্যাগার (laboratory) পদ্ধতী, প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি, আবিষ্ক্রিয়া পদ্ধতি, কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি, খেলা-ভিত্তিক পদ্ধতি ইত্যাদি। ব্যক্তিগত শিক্ষা ও শ্রেণীগত শিক্ষা উভয় ক্ষেত্রেই এর কোন একটি বা একই সাথে কয়েকটি পদ্ধতি অনুসৃত হয়। কোন্ পদ্ধতি কি ভাবে প্রয়োগ করলে সর্বাপেক্ষা ভাল ফল পাওয়া যাবার সম্ভাবনা আছে আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি-বিজ্ঞান সেই পথই নির্দেশ করে।

যাঁরা শিক্ষার সাথে জড়িত আছেন তাঁরা জানেন যাকে শিক্ষা দেওয়া হবে ঠিক মত তাকে শিক্ষা দিতে হলে সেই শিক্ষার্থীকে প্রথম জানতে হবে। শিশুর শক্তি, সামর্থ্য, আকাঙ্খা, অনুরাগ, বিরাগ, শিশুর শিশু-হয়। শিশুর শক্তি, সামর্থ্য, আকাঙ্খা, অনুরাগ, বিরাগ, শিশুর বিশেষ-প্রবণতা অর্থাৎ তার সব রকম বৈশিষ্ট্য জেনে বিশ্লেষণ করে শিশু-মনোবিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি সমূহ গড়ে উঠেছে। শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণে শিশু মনোবিজ্ঞানের গুরুত্বকে মেনে নিয়েও একথা স্বীকার করতে হবে—শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণে শিশু-মনোবিজ্ঞানই শেষ কথা নয়। শিক্ষার আদর্শ ও শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সার্থক ও বাস্তবে রূপায়ণের জন্য শিক্ষাপদ্ধতি-বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণের পিছনে দুটি প্রভাব সক্রিয়—একটি শিক্ষার মনস্তত্ত্বের দিক আরেকটি শিক্ষার যুক্তি-সিদ্ধ দিক (psychological and logical appoaches)। শিক্ষককে দু'টি দিক সম্পর্কে অবহিত হয়েই শিক্ষা পদ্ধতিকে বুঝতে হবে। শিক্ষক শিশুর প্রকৃতিকে

জানবে, আবার যা শিক্ষা দেওয়া হবে তার স্বরূপ ও তাৎপর্যকে জানবে। শিশু-মনের গতি-প্রকৃতি নির্ণয়ের পরও দেখা গিয়েছে শিশু-মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সর্বক্ষেত্রে একই পথ ধরে চলে না। বহুদিনের অভিজ্ঞতা সঞ্জাত যুক্তি-সিদ্ধ পথই শিক্ষক সেক্ষেত্রে অনুসরণ করেন। "The teacher then must regard on one hand the nature of the child to be taught, and on the othei hand the nature of knowledge in general and of the special piece of knoledge to be imparted in particular. This is what is meant when it is said that the theory of teaching rests both on psychology and on logic" (J. Welton, Principles and Methods of Teaching).

সাধারণ ভাবে শিক্ষা বলতে আমরা বুঝি জীবনের একটা নির্দিষ্ট সময়ে কোন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বিশেষ একটি বা কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। এ শিক্ষা আমরা সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের মাধ্যমেই অর্জন করি। ব্যাপক অর্থে শিক্ষাকাল বলে জীবনের কোন একটা সময়কে নির্দিষ্ট করে রাখা সম্ভব নয়। যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি। জীবনের প্রতিটি দিন আমরা নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছি—জন্ম থেকে মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত যে কোন অভিজ্ঞতা অর্জনই হচ্ছে শিক্ষা। Raymant বলেছেন, "In the wider and less definite sense, education means that process of development in which consists the passage of human being from infancy to maturity, the process whereby he gradually adapts himself in various ways to his physical, social and spiritual environment." (Principles of Education).

জন্মক্ষণ থেকেই সুরু হয় শিশুর শিক্ষাপর্ব। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন—"The real education begins from the conception as the mother begins to take up the responsibility of the child.'

যে শিশুটি জগতে এল তার দৈহিক ও মানসিক পরিপূর্ণ সুষ্ঠু বিকাশের উপযোগী করে শিক্ষা পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। সার্থক শিক্ষার জন্য প্রয়োজন আদর্শ শিক্ষা-পরিবেশ। শিক্ষার্থীর জীবনে পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই আর্যঋষিরা নাগরিক জীবনের কল-কোলাহলের

বাইরে তপোবনের আদর্শ-পরিবেশে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। যে পরিবেশে শিক্ষার্থীর জীবনের শ্রেষ্ঠ ক্ষণগুলি ব্যয়িত হয়, সেই পরিবেশ অপরিহার্যরূপেই শিক্ষার্থীর জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। তপোবনের পরিবেশ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "তপোবনের গুরুগৃহের শিক্ষা প্রকৃতির সাথে মানুষকে প্রীতির সম্বন্ধে—ঔৎসুক্যের সম্বন্ধে যুক্ত করে, আবার মানুষের সাথে মানুষকে শ্রদ্ধার বন্ধনে আবদ্ধ করে। এ সংযোগ শুধু স্বার্থের সংযোগ নয়—একাত্মবোধের সংযোগ।"

শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষাপরিবেশ দুই-ই শিক্ষার সাফল্যের দিক থেকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানে পদ্ধতি নির্ণয় ও পরিবেশ রচনা নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে ও হচ্ছে। শিক্ষার আদর্শ যত উন্নতই হোক না কেন তার সাফল্য নির্ভর করে সার্থক শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণ ও পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগের উপর। শিক্ষায় পদ্ধতি-বিজ্ঞানের গুরুত্ব সেখানেই নিহিত। শিক্ষাদর্শ যত উচ্চই হোক না কেন ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করলে কখনই সে উচ্চাদর্শে পৌছান সম্ভব হবে না। যাঁরা শিক্ষার সাথে জড়িত দেশের শিক্ষার গুরুদায়িত্ব যাঁরা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন, প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ ও জগতের বিভিন্ন প্রগতিশীল দেশে উদ্ভাবিত আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি-বিজ্ঞান ও তার প্রয়োগ-কৌশল ও শিক্ষাপরিবেশ সম্পর্কে তাঁদের জানা দরকার। সেই সাথে বিভিন্ন দেশের চিন্তাশীল শিক্ষাবিদদের চিন্তা-ধারার সহিত পরিচিতি অত্যাবশ্যক। যুগ পরিবর্তনের সাথে নতুন যুগের প্রয়োজনে বিভিন্ন দেশের শিক্ষাধারা নতুন রূপ পরিগ্রহ করছে। অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমান যুগের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হচ্ছে। এই পরিবর্তনের ধারাকে আমাদের সমগ্রভাবে জানাতে হবে। আমাদের দেশের গতানুগতিক যান্ত্রিক শিক্ষাপদ্ধতিকে পরিবর্তন করে আধুনিক যুগের উপযোগী করে তুলতে হলে বিভিন্ন দেশের প্রয়োগ-সিদ্ধ শিক্ষাপদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য। এ সম্পর্কে আধুনিক-অনাধুনিক ভেদ না করে খোলা মন নিয়ে প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষাদর্শন আলোচনা করে আমাদের দেশের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ রেখে এ দেশের প্রয়োজনের উপযোগী শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভাবন করতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিক্ষাদর্শ ও পদ্ধতি-বিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তন

শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষা

বর্তমান শতাব্দীকে আমরা বলি শিশুর যুগ। নবলব্ধ শিক্ষার নতুন আলোকে আমরা নিত্যকালের সেই চির পুরাতন শিশুকে নতুন করে আবিষ্কার করেছি। শিশুর মধ্যে লুকান রয়েছে অনন্ত সম্ভাবনা। তার দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক বিকাশ, তার আবেগ অনুভূতি প্রকাশের সুযোগ দানই হচ্ছে সার্থক শিক্ষার কাজ।

"The main object of education is not to teach but develop"—(Pestalzzi).

বিকাশ (Develop) অর্থাৎ যে সুপ্ত সম্ভাবনা নিয়ে শিশু জগতে এসেছে সেই অনন্ত সম্ভাবনা বা শক্তির বিকাশই হচ্ছে শিক্ষার কাজ। স্বামীজির কথার মধ্যেও সেই কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। মানুষ স্বরূপতঃ পূর্ণ (Perfect) এই পূর্ণতার বিকাশই হচ্ছে শিক্ষা।

"Education is the manifestation of the perfection already in man"—(স্বামী বিবেকানন্দ)। শিশুর এই সম্ভাবনা বিকাশের মধ্যেই আজকের সমস্ত শিক্ষাপ্রচেষ্টা নিবদ্ধ। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুই হচ্ছে সমগ্র শিক্ষাপ্রচেষ্টার কেন্দ্র-বিন্দু। শিক্ষার সব আয়োজনই শিশুকে নিয়ে। তাই আজকের শিক্ষাকে বলা হয় শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা (Child Centric Education)

শিশু সম্পর্কে মনোভাব চিরদিনই এরূপ ছিল না। মধ্য যুগে ভারতে ও ইউরোপে শিক্ষা ছিল জীবন নিরপেক্ষ। জীবনের পার্থিব প্রয়োজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী-সম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থা পুরোহিত-শাসিত সমাজে গড়ে উঠেছিল সেখানে শিক্ষার্থীর স্থান ছিল নিতান্তই গৌণ। নবীন শিক্ষার্থীর যে একটা স্বতন্ত্র স্বত্তা আছে, সে যুগের শিক্ষাব্যবস্থায় তার কোন স্বীকৃতি খুঁজে পাওয়া যায় না। শিশুকে মনে করা হত বয়স্কের

একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। শুধু মাত্র দেহের কাঠামো আর বয়সের দিক থেকেই শিশুকে পৃথক মনে করা হত। একজন শিক্ষাবিদ বলেছেন সে যুগে শিশুকে টেলিস্কোপের উল্টোদিক থেকে দেখা হত। বেশীদিনের কথা নয় ভিক্টোরীয় যুগের একখানি শিশুর চিত্র দেখলেই একথার সত্যতা প্রমাণিত হবে।

শিশু-মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রক্ষোভ বিক্ষোভ, আবেগ-সংস্কার, তার স্বভাব-আচরণ নিয়ে শিশুর যে স্বতন্ত্র জগত আছে একথা কেউ মনে করত না। শিশুর রুচি, আগ্রহ বা প্রবণতার সন্ধান করার প্রয়োজনীয়তা আছে একথা সে যুগের শিক্ষায় স্বীকৃতি পায়নি। শিশুর মনে আর বয়স্কের মন একই রকম, এই ছিল সেদিনের স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত। এই স্থির সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেই পূর্বনির্দিষ্ট একটি শিক্ষাক্রম শিশুর উপর চাপিয়ে দেওয়া হত। যে শিক্ষা-ক্রম তাকে অনুসরণ করতে হচ্ছে তা তার ভাল লাগছে কিনা, আয়ত্ত করবার মত শক্তি আছে কিনা এসব কথা বিচার বিবেচনা করার প্রশ্নই উঠত না। প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের কোন সুযোগই ছিল না। তার ভাল মন্দ অভিভাবক চিন্তা করবে। তার ইচ্ছা অনিচ্ছা ক্ষমতা অক্ষমতা তাও অভিভাবকই স্থির করবে। শিশু অর্থাৎ যার জন্য শিক্ষার সমস্ত আয়োজন, মধ্যযুগে সে ছিল নিতান্ত কৃপার পাত্র। বয়স্কের ইচ্ছাই শিশুর শিক্ষায় প্রতিফলিত হোক, তাদের কতকগুলি ধারণা শিশুর জীবনে রূপ গ্রহণ করুক এই ছিল শিশু সম্পর্কে সে যুগের মনোভাব।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধনের চেষ্টা বহুদিন থেকে চলে আসছে। প্রগতিশীল শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার আদর্শ একদিনে বা কোন একজন শিক্ষাবিদের চেষ্টায় গৃহীত হয়নি। শিক্ষায় শিশুর গুরুত্বের স্বীকৃতি কুইন্টিলিয়ান, ইরাসমাস, কমেনিয়াস প্রভৃতির শিক্ষাসম্পর্কীয় লেখার মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁরা প্রচলিত ব্যবস্থার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে শিশুকে প্রাচীন শিক্ষার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিতে পারেন নি। ধর্মনির্ভর চিরাচরিত শিক্ষাপদ্ধতির কিছুটার সংস্কার সাধনের জন্য তাঁরা চেষ্টা করে ছিলেন। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার দিকে প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ সুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিক্ষা সম্পর্কীয় রুশোর বৈপ্লবিক মতবাদ প্রচারের পর। এরপর থেকেই শিক্ষায় শিশুর বন্ধন-মুক্তির প্রচেষ্টা ইউরোপে ব্যাপক ভাবে সুরু হয়।

রুশোর দার্শনিক মতবাদ বাস্তবে রূপ দেবার জন্য এগিয়ে আসেন পেস্টালৎসী। এরপর হার্বার্ট শিশুশিক্ষার একটা মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিভূমি তৈরী করেন। ফ্রয়বেলের কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাব্যবস্থায় শিশু স্বাধীনভাবে আত্মবিকাশের সুযোগ পায়। পড়ার সাথে খেলা গান-হাতের কাজ সব মিলিয়ে তিনি এক অভূতপূর্ব শিশু-উদ্যান রচনা করলেন। বিংশ শতাব্দীতে মণ্টেসরী, ডিউই, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী শিক্ষায় এক বিরাট পরিবর্তন আনেন।

শিক্ষায় শিশুই কেন্দ্রবিন্দু এ আজ আর দার্শনিক তত্ত্ব নয়, শিশু-শিক্ষায় শিশু মধ্যমণি এ আজ বাস্তব সত্য। শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের পথকে মুক্ত করে দেওয়াই বর্তমান শিক্ষার লক্ষ্য। কঠোর নিয়ন্ত্রণ এখানে শিশুর স্বাভাবিক প্রকাশের পথকে রুদ্ধ করে না। শৃঙ্খলার নামে নিপীড়ন নেই। শিশু কাজ করে নিজের তাগিদে, অন্তরের প্রেরণায়। শৃঙ্খলা বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয় না; দায়িত্ব বোধ থেকে স্বাভাবিক ভাবেই শিশুর মনে শৃঙ্খলাবোধ জন্মায়। কাজের মধ্য দিয়ে শিশু বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, তার মনে আত্মপ্রত্যয় জন্মায়, ধীরে ধীরে তার ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। শিশুর স্বাভাবিক কর্মপ্রেরণা ও সৃজনী স্পৃহাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতির (প্রোজেক্ট ও বুনিয়াদি শিক্ষাপদ্ধতি) সৃষ্টি হয়েছে। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার এও এক বিশেষ রূপ। শিশুর দৈহিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক সব দিক থেকে সামগ্রিক বিকাশের পথকে মুক্ত করে দিয়ে সুসামঞ্জস্য-পূর্ণ ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলাই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার লক্ষ্য।

(কি করে ক্রম-বিবর্তনের মধ্য দিয়ে শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতি বর্তমান রূপ লাভ করেছে প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত শিক্ষাবিদদের মতবাদ ও প্রয়োগপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করলেই তা পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।)

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতি

আধুনিক শিক্ষানীতি ও শিক্ষাপদ্ধতি বলতে আমরা পাশ্চাত্য নীতি-পদ্ধতিকেই বুঝে থাকি। আধুনিক পদ্ধতি-বিজ্ঞানের ধারাকে অনুসরণ করতে হলে প্রাচীন ইউরোপের শিক্ষানীতি, পদ্ধতি ও আদর্শ কি ছিল সেখান থেকেই আলোচনার সূত্রপাত করতে হবে। আধুনিক শিক্ষাধারা প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও প্রাচীন ভারতের শিক্ষাদর্শ সম্পর্কে দু'একটি কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

প্রাচীন ভারতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে সিন্ধু উপত্যকায় এক অতি উন্নত সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছিল। সেই সভ্যতার বহু তথ্যই আজও আমাদের নিকট অজ্ঞাত, তবুও সিন্ধু-সভ্যতার যে সব নিদর্শন আমরা পেয়েছি তা থেকে মনে হয় মহেঞ্জদড়োতে লিপির ব্যবহার ছিল। যারা লিপির ব্যবহার জানত তাদের একটা শিক্ষাব্যবস্থা ছিল একথা স্বাভাবিক। এরপর ভারতে এল আর্যরা। প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা একান্ত ভাবে আর্য-সভ্যতারই দান। প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই আমরা খুঁজে পাই আমাদের জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য সমূহকে। যতই পুরাতন হোক না কেন আজও ভারতীয় হিন্দু-সমাজের রীতি-নীতিও সমাজ-জীবন অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের দ্বারা। প্রাচীন ভারতের তপোবনে যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তার মূল্য আজও আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

ভারতীয় জীবনের শেষ কথা মুক্তি বা মোক্ষ। অন্তরে যে প্রচ্ছন্ন অনন্ত সম্ভাবনা রয়েছে, সেই অনন্ত শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে নিজের অমর সত্বার সন্ধান পাওয়া বা পূর্ণতালাভ করাই হচ্ছে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য। পরিপূর্ণতা বা অমৃতত্ব লাভই জীবনের শেষ কথা হলেও আর্য-ঋষিরা জগতে বেঁচে থাকবার জন্য প্রয়োজনীয় লৌকিক-শিক্ষার উপযোগিতার কথাও স্বীকার করেছেন। উপনিষদে বিদ্যাকে পরা-বিদ্যা ও অপরা-বিদ্যা এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। লৌকিক-বিদ্যা অর্থাৎ কলা, বিজ্ঞান, শিল্প-বিদ্যা অনুশীলনের প্রয়োজন জগতে বেঁচে থাকবার জন্য, কিন্তু ঋষিরা সাথে সাথে সতর্ক করে দিয়েছেন, একেই যেন জীবনের শেষ কথা বলে গ্রহণ না করি। উপনিষদের ঋষি বলেছেন মানুষের সংসারিক সুখ-সমৃদ্ধির জন্য লৌকিক বা অপরা-বিদ্যার প্রয়োজন। কিন্তু জীবনের চরম সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্য তাকে আধ্যাত্মিক চিন্তা করতে হবে। আদর্শ-মানুষ গড়ে তুলতে লৌকিক-বিদ্যা ও শুদ্ধ-বিদ্যা দুয়ের সমন্বয় প্রয়োজন। ভারতের শিক্ষায় জড়-বিজ্ঞান ও ধর্ম-বিজ্ঞানের সমন্বয় হয়েছিল। উপনিষদে বলা হয়েছে বিদ্যা (পরা-বিদ্যা) ও অবিদ্যা (অপরা বিদ্যা) যারা যুক্ত করে দেখেন তাঁরাই সত্য দেখেন। নিজেকে জানা—আত্মানং বিদ্ধি—মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব রয়েছে সেই দেবত্বকে উদ্বোধিত করাই ছিল ভারতের শিক্ষার শেষ কথা।

ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতিতে দেখি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উভয় প্রকার শিক্ষা

ব্যবস্থাই ছিল। গুরু মৌলিক রীতিতে শিক্ষা দিতেন। বক্তৃতাধর্মী শিক্ষা বৌদ্ধযুগে প্রবর্তিত হয়েছিল বলে মনে হয়। তবে তার ব্যাপক প্রয়োগ ছিল না। ভারতীয় শিক্ষা প্রধানতঃ ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা (individualised instruction), আচার্যের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হত।

সে যুগের পাঠপদ্ধতিকে কয়েকটি স্তরে (stage) ভাগ করা যায়। উপক্রম বা প্রস্তুতি—শিক্ষার্থীর মনে গুরুর কাছ থেকে জানবার আগ্রহ থেকে পাঠ-প্রস্তুতি পর্বের সূচনা হত। শ্রবণ—গুরু যা বলতেন তা মনোযোগ দিয়ে শোনা। আবৃত্তি বা অভ্যাস করে আয়ত্ত করা। অর্থবাদ—যা শেখান হল তার অর্থ বোঝা। এরপর ফল ও উপপত্তি—অর্থাৎ আলোচনা করে যুক্তির সাহায্যে জ্ঞানের ভিত্তিকে দৃঢ় করে তার প্রয়োগ করা। মনন ও নিদিধ্যাসনের ফলে শিক্ষার্থী তার জীবনে সত্যকে উপলব্ধি করত। গভীর ভাবে চিন্তা করাকে বলা হত মনন। নিদিধ্যাসনের অর্থ হচ্ছে একাগ্রচিত্তে ধ্যান করে সত্যকে উপলব্ধি করা। প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিতে মেধা ও স্মৃতি-শক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হত। প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতেও শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। গল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দেবার পদ্ধতিও সে যুগে প্রচলিত ছিল।

ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতির যে পরিচয় আমরা পাই তাতে দেখা যায় বৈদিকযুগ থেকেই একটি সুচিন্তিত শিক্ষাব্যবস্থা এদেশে প্রবর্তিত হয়েছিল। দশম শতাব্দী থেকে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় জড়ত্ব দেখা দেয়। প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রাণশক্তি হারিয়ে পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে সামঞ্জস্য রাখতে না পেরে এক গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় পরিণত হয়।

ইউরোপীয় শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতি

গ্রীস –(সোফিষ্ট মতবাদ—সক্রেটিস, প্লেটো ও স্পার্টার শিক্ষাদর্শ)

ইউরোপের শিক্ষাক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা ও খৃষ্টান ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের একাধিপত্য স্থাপিত হবার পূর্বে ইউরোপীয় শিক্ষাদর্শ ও পদ্ধতি বলতে গ্রীসের শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষাদর্শকে বোঝান হত। দর্শন, রাজনীতি শিল্পশিক্ষা প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই গ্রীসের স্থান ছিল সর্বাগ্রে। গ্রীস ছিল ইউরোপীয় সভ্যতার আদি লীলাভূমি। সক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিষ্টটল প্রভৃতি মনীষীদের চিন্তাধারা ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজের চিন্তাধারাকে

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিয়ন্ত্রিত করেছে। গ্রীসের সভ্যতা ছিল নগরকেন্দ্রিক। শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী নাগরিকদের সন্তানের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষা ছিল বড়লোকের অবসর বিনোদনের উপায় মাত্র। সোফিষ্ট দার্শনিকেরা অর্থের বিনিময়ে শিক্ষা দিতেন। অপামর জনসাধারণ শিক্ষার অধিকার থেকে ছিল বঞ্চিত। এমন কি সক্রেটিস পর্যন্ত শিক্ষার সুযোগ পাননি কারণ সোফিষ্টদের দেবার মত অর্থ তাঁর ছিল না। অত্যন্ত দুঃখের সাথে তিনি বলেছেন—

"As for myself I am first to confess that I have never had a teacher, although I have always from my earliest youth desired to have one. But I am too poor to give money to the Sophists, who are the only professors of moral improvement—(As quoted by Robert R. Rusk in Doctrines of the Great Educators)"

সোফিষ্ট শিক্ষাদর্শে কোন সুদূর প্রসারী উদার দৃষ্টি ভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় না। তাদের শিক্ষাপদ্ধতিও কোন সুসংবদ্ধ প্রণালীকে অনুসরণ করত না। সোফিষ্টরা শিক্ষাকে প্রয়োজনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। জীবনের প্রত্যক্ষ প্রয়োজন মেটানোই ছিল শিক্ষার উদ্দেশ্য। তাঁরা মনে করতেন ব্যক্তির নিজের অভিজ্ঞতা হচ্ছে সবকিছু বিচারের মাপকাঠি। শিক্ষার সার্বজনীন সংজ্ঞা দ্বারা ব্যক্তিগত মতবাদকে নিয়ন্ত্রণ তাঁরা স্বীকার করতেন না। এঁরা ছিলেন শিক্ষায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা মতবাদের সমর্থক। ব্যক্তির নিজস্ব শক্তির চরম বিকাশই ছিল শিক্ষার লক্ষ্য। দেহের বিকাশের জন্য শরীর চর্চা (gymnastics) ও মনের বিকাশের জন্য সঙ্গীত চর্চাকে তাঁরা তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির মাধ্যম রূপে গ্রহণ করেছিলেন।

সক্রেটিস, প্লেটো এঁরা শিক্ষা সম্পর্কে যে দার্শনিক মতবাদ প্রচার করে গিয়েছেন তাতে দেখা যায় শিক্ষার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিসত্বার বিকাশের কথা বললেও সোফিষ্টদের উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র মতবাদের সমর্থন তাঁরা করেন নি। তাঁরা মনে করতেন শিক্ষা বাইরের থেকে চাপিয়ে দেবার মত বস্তু নয়। শিশুর ব্যক্তিসত্বার মধ্যে তা আপনি বিকশিত হয়ে উঠবে। সক্রেটিস শিক্ষার কাজের সাথে ধাত্রীর কাজের তুলনা করেছেন। তিনি নিজেকে বলেছেন

'মনের ধাত্রী' ("a man-midwife for mind")—নতুন মনের সৃষ্টিতে সাহায্য করাই তাঁর একমাত্র কাজ।

সক্রেটিস গ্রীসের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর মতবাদ প্রচার করেন। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর সার্বজনীন সংজ্ঞা ও আরোহী পদ্ধতি (Inductive discourse) সমাদর লাভ করে। কোন একটি বিষয়ের সূত্র নির্ধারণে তিনি আরোহী পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করতেন। সক্রেটিস অনুসৃত পদ্ধতিতে তিনটি স্তর দেখা যায়।

প্রথম স্তর চিন্তন বা অনুমান, প্লেটো বলেছেন opinion, এই স্তরে তিনি দেখিয়েছেন শিক্ষার্থী যা জানে বলে মনে করে তাকে প্রতিষ্ঠিত বা প্রমাণ করবার মত যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা তার নেই। দ্বিতীয় স্তরে বিশ্লেষক (analytic or destructive stage) পদ্ধতিতে তিনি দেখান, সে যা জানে বলে মনে করে প্রকৃত পক্ষে তা সে জানে না। সর্বশেষ স্তরে সংশ্লেষক (Synthatic stage) পদ্ধতি প্রয়োগ করে তার জানাকে যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। অনুশাসনের গণ্ডি ও সংস্কারের দাসত্ব থেকে মানুষের চিন্তাধারাকে সক্রেটিস যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, এখানেই তাঁর অনন্যতা।

একটি বিষয়ে ভারতীয় দার্শনিকদের সাথে তাঁর সাদৃশ্য খুঁজে পাই। আর্য ঋষিরা বলেছেন 'আত্মানং বিদ্ধি'। সক্রেটিস বলেছেন "Know Thyself" নিজেকে জান। এই যে আত্মজ্ঞান বা নিজেকে জানার সাধনাই ছিল আর্য ঋষির পরমকাম্য। সক্রেটিসও এই বাণীই প্রচার করেছিলেন।

শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্লেটো বিশেষ সচেতন ছিলেন। তিনি Republic ও Law গ্রন্থে তাঁর শিক্ষা সম্পর্কীয় সুচিন্তিত মতামত লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন, শিশুর মধ্যে যে সম্ভাবনা রয়েছে শিক্ষার কাজ হচ্ছে তাকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচালিত করা। (Education does not generate or infuse a new principle, it only guides and directs a principle already in existence") জোর করে শিশুর উপর শিক্ষাকে চাপিয়ে দেবার তিনি বিরোধিতা করেছেন। জোর করে চাপিয়ে দিলে তা মনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। প্রাথমিক শিক্ষা হবে আনন্দময়। শিক্ষা আনন্দময় হইলে শিশু মনের স্বাভাবিক

প্রবণতার খোঁজ মিলবে—"Then do not use compulsion, but let early education be a short of amusement, you will then be better able to find out the natural bent." (As quoted by Rusk in his Doctrines of the Great Educators).

Law গ্রন্থে তিনি শিক্ষায়-খেলার প্রভাব সম্পর্কে বিশেষ জোর দিয়েছেন। খেলার প্রতি শিশুর স্বাভাবিক অনুরাগকে আধুনিক শিক্ষায় বিশেষ ভাবে কাজে লাগান হয়। প্লেটোর শিক্ষানীতিব মধ্যে আমরা তার প্রথম সন্ধান পাই। তিনি ঐ গ্রন্থে সার্বজনীন শিক্ষার কথা বলেছেন। ছেলের বিদ্যালয়ে আসা পিতার ইচ্ছাব উপর নির্ভরশীল হবে—দরকার হলে তাকে ছেলে পাঠাতে বাধ্য করা হবে। শিক্ষাকে তিনি কি চোখে দেখতেন live গ্রন্থে তার আভাষ পাই—শিক্ষা হচ্ছে "The first and fairest thing that the best of men can ever have." প্লেটোর শিক্ষা ব্যবস্থায় সঙ্গীত ও দেহচর্চা দুইই স্থান লাভ করেছে। তিনি শিক্ষা সঙ্গীত দিয়ে সুরু করবার কথা বলেছেন তারপর দেহচর্চা। মানসিক-শিক্ষার প্রাধান্য তিনি মেনে নিয়েছেন, দেহচর্চা ও সঙ্গীত দুই আত্মার উন্নতি সাধন করবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।

সোফিষ্টদের শিক্ষাদর্শের বিপরীত আদর্শ দেখি স্পার্টায। এখানে শিক্ষা ব্যক্তির প্রয়োজনে নিযন্ত্রিত হত না—রাষ্ট্রেব তথা সমাজেব প্রয়োজনেই ব্যক্তিকে গড়ে তোলা হত। শিক্ষাও সেইভাবেই নিয়ন্ত্রিত হত। স্পার্টার শিক্ষায় পুঁথির কোন স্থান ছিল না। রাষ্ট্ররক্ষার প্রয়োজনে শক্ত দেহ গঠন করাই ছিল শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। দেহচর্চা আর সামরিক শিক্ষা ও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য অর্থাৎ রাষ্ট্রের স্বার্থে যতটুকু শিক্ষার প্রয়োজন ছিল তার বেশী শিক্ষা স্পার্টায় দেওয়া হত না।

মধ্যযুগীয় খৃষ্টীয় শিক্ষাদর্শ

খ্রীষ্ট ধর্ম ইউরোপে প্রধান্য লাভ করবার সাথে সাথে সেখানে শিক্ষাক্ষেত্রে যে যুগের সুরু হয় তাকে বলা হয় তিমিরাচ্ছন্ন যুগ। এ যুগে মানুষের স্বাধীন চিন্তার প্রাধান্য ধীরে ধীরে খর্ব হতে থাকে। খৃষ্টান যাজক সম্প্রদায় খৃষ্টীয় ধর্ম সংস্কারে আঘাত লাগতে পারে এমন কোন মতবাদকে প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাই যুক্তিবাদ বা চিন্তার স্বকীয়তাকে সন্দেহের

চোখে দেখা হত। মধ্যযুগের শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে চার্চের কুক্ষিগত হয়—ব্যক্তি-সত্তার পূর্ণ বিকাশের আদর্শ শিক্ষাক্ষেত্র থেকে লোপ পায়। খৃষ্টধর্মের প্রতি অন্ধ আনুগত্য, ধর্মীয় আচরণ ও রীতিনীতি শিক্ষাই ছিল সে যুগের শিক্ষার আদর্শ। মধ্যযুগীয় খৃষ্টান শিক্ষাদর্শ প্রধানতঃ টমাস এ্যাকুউনাসের দান। তিনি বলেন মানুষ আদিম পাপ (Original Sin) অঙ্গীকার করে জন্মেছে—তাই মানবশিশুর স্বাভাবিক প্রবণতা পাপের দিকে। এই আদিম পাপের প্রতি আগ্রহে দমন করাই হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য। এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীতে পর্যন্ত দেখি পিতাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে—Break your child's will in order that it may not perish,——Break its will as soon as it can speak plainly—or even before it can speak at all. It should be forced to do as it is told, even if you have to whip it ten times running,' (John Wesley)

নব জাগরণ

১৪৫৩ খৃঃ কনস্তান্তিনোপলের পতনের পর ইউরোপে এক যুগ-পরিবর্তনের সূচনা হয়। নবজাগরণে নতুন সাহিত্য, নতুন শিল্পকলা, নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নতুন চিন্তাধারার জন্ম হল। তিমিরাচ্ছন্ন যুগের অবসানে মানুষ জীবনকে নতুন ভাবে দেখতে শিখল, সব বিষয় অনুসন্ধান করে যুক্তির আলোকে সত্যকে জানবার আগ্রহ তার মধ্যে দেখা দিল। শিক্ষাকে আর চার্চের কুক্ষিগত রাখা সম্ভব হল না। ধর্মক্ষেত্রেও সংস্কার-আন্দোলন সুরু হল। সামগ্রিকভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার একটা উদ্দীপনা সর্বত্র দেখা দিল। নব জাগরণের যুগে প্রাচীন গ্রীক প্রভাবে শিক্ষাদর্শে যে নতুন মতবাদ জন্ম নিল তা মানবতাবাদ (Humanism).

শিক্ষাক্ষেত্রে খৃষ্টধর্মের প্রভাবমুক্ত গ্রীক ও রোমান সাহিত্য ও দর্শন, শিল্পকলা, চারু বিদ্যা প্রভৃতি মানবিক-বিদ্যা (Humanities) সমূহের চর্চা সুরু হয়। অন্ধ আনুগত্যের স্থানে যুক্তিবাদ ও স্বাধীন চিন্তা স্বীকৃতি লাভ করে। শিক্ষায় মানবতাবাদের অন্যতম প্রচারক ইরাস মাস। মানবতাবাদীরা ছিলেন আদর্শবাদী। তাঁরা গ্রীক ও রোমীয় আদর্শে শিক্ষায় মানবিকবিষয় সমূহ (liberal subjects) প্রবর্তন করতে চাইলেন আর সেই সাথে

যোগ করে দিলেন খৃষ্টান-মুক্তির আদর্শ। মানবতাবাদীরা শিক্ষাকে বাস্তব-জীবনের সাথে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু যুগ প্রভাব থেকে মুক্ত হতে না পারায় বাস্তব শিক্ষাপদ্ধতি তাঁরা সৃষ্টি করতে পারেন নি।

মানবতাবাদীদের আন্দোলনের ফলে খ্রীষ্টধর্মের গণ্ডিবদ্ধতা থেকে শিক্ষা মুক্তি লাভ করায় শিক্ষা সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সুরু হয়। কিন্তু মানবতাবাদীগণ পর্যবেক্ষণ-মূলক শিক্ষাধারা জ্ঞানের ক্ষেত্রের বিস্তার, ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথকে প্রশস্ত করা প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেন নি। দর্শন, সাহিত্য, ভাষা শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়েই তাঁদের দৃষ্টি প্রধানতঃ নিবদ্ধ ছিল এই ত্রুটি দূর করতে যাঁরা এগিয়ে এলেন তাঁদের শিক্ষায় বাস্তববাদী (realist) বলা হয়। স্পেনের লুই ভিভাসের সময় থেকে শিক্ষায় বাস্তব-বাদের (realism) গোড়া পত্তন হয়। সাহিত্য, দর্শনের সাথে সাথে তিনি তর্কবিদ্যা, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, পদার্থবিদ্যা, অর্থনীতি, ললিতকলা প্রভৃতি বিষয় শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ক্রমে শিক্ষা, সাহিত্য ও দর্শন থেকে প্রসারিত হয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু শাখায় প্রসারিত হয়। নতুন নতুন বিষয় শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় শিক্ষাদান পদ্ধতিতেও পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ঠিক এই সময়ে ১৫৯২ খ্রীঃ মোরাভিয়ার একটি ক্ষুদ্র গ্রামে বিশিষ্ট সংস্কারব্রতী শিক্ষাবিদ জন কোমেনিয়াস জন্ম গ্রহণ করেন।

———

জন কোমেনিয়াস (১৫৯২—১৬৭০)

জার্মানীর প্রখ্যাত শিক্ষা-সংস্কারক জন কোমেনিয়াস মোরাভিয়ার একটি ছোট গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যে প্রবল শিক্ষানুরাগ থাকা সত্বেও শিক্ষার সুযোগ পাননি। ষোল বছর বয়স কালে তিনি ল্যাটিন শেখার সুযোগ পান। বাল্যে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবার ফলে তিনি যে বেদনা পেয়েছিলেন তারই ফল-স্বরূপ হয়ত তিনি সার্বজনীন শিক্ষার একজন প্রধান প্রবক্তা হয়ে উঠেছিলেন। বেশী বয়সে ল্যাটিন শেখার ফলে ল্যাটিন শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটিগুলি তিনি বুঝতে পেরে পরবর্তীকালে এর সংস্কার সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ল্যাটিন শিক্ষা শেষ করে কলেজে ধর্মযাজকের প্রায়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করে যাজকের বৃত্তি গ্রহণ করেন। জীবনে তাঁকে বহু বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে। যাজক হয়েও তিনি ছিলেন আজীবন শিক্ষাব্রতী। তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত চিন্তাধারা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৬৩২ খৃঃ 'The Great Didactic' গ্রন্থে। এছাড়াও তিনি 'The Way of Light' এবং 'The School of Infancy' গ্রন্থদ্বয়ে শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন।

তিনি The Great Didactic গ্রন্থে শিক্ষাকে সার্বজনীন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। তিনি গ্রামে সহরে সর্বত্র ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বলেছেন। ছেলেমেয়ে সবাইকে স্কুলে পাঠাতে হবে। তিনি বলেছেন, ভগবান যাকে জড় বা নির্বোধ করেছেন সে বাদে কেউ যেন শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়, "Let none therefore be excluded unless God has denied him sense and intelligence."

শিক্ষার ব্যাপকতা মেনে নিয়ে তিনি বলেছেন, শিক্ষা ঐহিক-জীবনের সফলতা ও পারত্রিক-জীবনের প্রস্তুতি উভয়ের জন্যই প্রয়োজন। শিশুর

* বর্তমান বি, টি, সিলেবাস বহির্ভূত

শিক্ষায় বিদ্যালয়ের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। তিনি গৃহ-শিক্ষা অপেক্ষা বিদ্যালয়ের শিক্ষাকেই শ্রেয়ঃ মনে করতেন। বাড়ীতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিতামাতার শিক্ষা দেবার যোগ্যতা নেই বা সময়ের অভাব। যাদের যোগ্যতা ও সময় আছে তাদের ছেলেমেয়েদেরও ভাল ফল পেতে হলে বিদ্যালয়ে পাঠাতে হবে। সেখানে অন্যকে দেখে ও পরস্পর সহযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করবে। কোমেনিয়াস উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তের উপর বেশী জোর দিয়েছেন। শিশু দৃষ্টান্ত দেখেই সামাজিকতা শিখবে। ভদ্রতা, নম্রতা, সমাজিকতা গুণগুলিও অন্য শিশুর অনুকরণে আয়ত্ত করবে।

কোমেনিয়াস শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এজন্য তিনি শিশুর বয়স ভেদে শিক্ষাকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করেন। শিশু ছয় বছর বয়স পর্যন্ত নার্সারী স্কুলে শিক্ষা পাবে। দ্বিতীয় স্তরে ছয় থেকে বার বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়ের শিক্ষা হবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। প্রতি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হবে। তৃতীয় স্তরে বার বছর থেকে আঠার বছরের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতি সহরে মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হবে। সর্বশেষ স্তরে রাজধানী বা প্রাদেশিক সহরে আঠার থেকে চব্বিশ বছর পর্যন্ত যুবকদের বিভিন্ন বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হবে। প্রতি স্তরে যোগত্যাই হবে প্রমোশোণের একমাত্র মাপকাঠি।

প্রথম স্তরে গল্প, ছড়া, খেলা-ধূলা, হাতের কাজ, গান প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে। দ্বিতীয় স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে লেখা, পড়া, ব্যবহারিক-গণিত, সাধারণ ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, নীতিজ্ঞান, ধর্মজ্ঞান, সঙ্গীত প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হবে। এই সময়ে শিক্ষার্থীর ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মূর্ত-বিষয়ের জ্ঞানও ধীরে ধীরে কল্পনাশক্তি বিকাশের শিক্ষা দেওয়া হবে। তৃতীয় স্তরের শিক্ষায় ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা, ব্যাকরণ, গণিত, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বার একটু কঠোরতার সাথে নিয়ন্ত্রিত হবে। শুধু মেধাবী ছাত্ররাই এখানে শিক্ষার সুযোগ পাবে। অন্যেরা তাদের উপযোগী কৃষি, শিল্প প্রভৃতি বৃত্তি-শিক্ষা গ্রহণ করবে। ক্রমবর্দ্ধমান মানবদেহ ও মনের বিকাশের ধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কোমেনিয়াস শৈশব, বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের শিক্ষার কথা বলেছেন। মাতৃভাষায় শিক্ষার সম্পর্কেও তাঁর মতামত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ছয় বছর থেকে বার বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা মাতৃভাষায় হবে। এ সময়ে কোন বিদেশী ভাষা শেখান হবে না। মাতৃভাষা আয়ত্ত করবার পূর্বে বিদেশী ভাষা শেখার চেষ্টা আর হাঁটতে শেখবার আগে ঘোড়ায় চড়তে শেখা একই রকম অযৌক্তিক।

কোমেনিয়াস লক্ষ্য করেন সামঞ্জস্যপূর্ণ পদ্ধতি বা বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার অভাবে ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও লক্ষ্য না থাকায় শিক্ষা আশানুরূপ সাফল্য লাভ করছে না। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে একই বিদ্যালয়ে এক একজন শিক্ষক এক একরূপ শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করতেন। ছাত্ররা হতবুদ্ধি হয়ে ভাবত কোন পদ্ধতিকে অনুসরণ করব। শিক্ষা পদ্ধতির এই ত্রুটি দূর করবার জন্য কোমেনিয়াস বললেন যদি একজন শিক্ষককে দিয়ে একটি বিদ্যালয় পরিচালনা করা যায় তাহলে তাই হবে একই শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণের শ্রেষ্ঠ পন্থা। যে ক্ষেত্রে একাধিক শিক্ষকের প্রয়োজন হবে সেখানে এক একটি শ্রেণীর ভার এক একজন শিক্ষকের উপর ছেড়ে দিতে হবে।

শিশুর মনে শিক্ষার জন্য আগ্রহ ও অনুরাগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে আনন্দময় পরিবেশের সৃষ্টি করতে হবে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা শান্ত নির্জন পরিবেশে বিদ্যালয় নির্মিত হবে। প্রকৃতির সংস্পর্শে এসে সক্রিয় কর্ম-প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিশু জ্ঞান লাভ করবে। যতটা সম্ভব ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করতে হবে। শিশুর শিক্ষা শুধুমাত্র পুঁথি-নির্ভর হলে চলবে না। প্রত্যক্ষ উদাহরণের মাধ্যমে শিশু যে শিক্ষা লাভ করবে তাই তার মনে স্থায়ী হয়ে থাকবে। শিক্ষা প্রচেষ্টাকে সফল করে তুলতে হলে শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষার্থীদের উপযোগী পাঠ্যপুস্তকের অভাব সম্পর্কেও কোমেনিয়াস সচেতন ছিলেন। ল্যাটিন শিক্ষার জন্য তিনি যে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তাঁর Orbis Pictus গ্রন্থ শিক্ষায় 'Visual aid' পদ্ধতি প্রবর্তনের আদিগ্রন্থ সমূহের অন্যতম।

শিক্ষায় শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে তিনি অত্যাবশ্যক মনে করতেন। কিন্তু শৃঙ্খলা সম্পর্কে তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার। শৃঙ্খলার জন্য নিপীড়নের তিনি ছিলেন বিরোধী। সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারই শিশুর মনে শিক্ষা সম্পর্কে অনুরাগ সৃষ্টি করবে অন্যথায় শিক্ষার প্রতি বিরাগ বেড়েই যাবে।

কোমিনিয়াস তার সময়ের স্কুল সম্পর্কে লিখেছেন "They are the terror of boys and the slaughter houses of the minds." এই ভীতিকর অবস্থার পরিবর্তনের জন্যই তিনি শিক্ষা-সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন। শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষানীতিতে তিনি আধুনিক যুগের প্রথম পথ প্রদর্শক। তাঁর বিভিন্ন সিদ্ধান্ত মনোবিজ্ঞান সম্মত বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সার্বজনীন শিক্ষা, শিশুর প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ প্রভৃতি সে যুগে ছিল চিন্তাব বাইরে। শিক্ষার্থীর দেহ ও মনের বিকাশের সাথে শিক্ষার স্তর বিভাগ ও সেই অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন। উদাহরণের সাহায্যে ও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি সিদ্ধান্তের মধ্যে তাঁর দৃষ্টি ভঙ্গীর অভিনবত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। তার শিক্ষা-চিন্তা পরবর্তীকালে শিক্ষাবিদদের নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে।

*জন লক (১৬৩২-১৭০৪)

—নবজাগরণের ফলে ইউরোপের চিন্তাজগতে যে বিপ্লব দেখা যায়, তার ফলে যুক্তিবাদ প্রাধান্য লাভ করায় জার্মানীতে ধর্মবিপ্লব দেখা দেয়। মানুষ বহুদিনের অন্ধসংস্কার ও যাজক সম্প্রদায়ের আরোপিত বাধা নিষেধের বন্ধন থেকে মুক্তি প্রয়াসী হয়ে ওঠে ও সত্যের দিকে আকৃষ্ট হয়। কোমেনিয়াসের শিক্ষাসংস্কার-মূলক প্রয়াস এই সময় সামগ্রিকস সামাজিক ও ধর্মবিপ্লব প্রচেষ্টারই অংশস্বরূপ। কোমেনিয়াস শিক্ষাকে সার্বজনীন রূপ দিতে চেয়েছিলেন ও তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে আমরা মনোবিজ্ঞান সম্মত শিক্ষা-সংস্কার প্রচেষ্টার সন্ধান পাই। সেদিক থেকে তিনি নতুন যুগের অগ্রদূত। কোমেনিয়াসের পর ইংলণ্ডের দার্শনিক জন লকের শিক্ষা বিষয়ক চিন্তাধারা পরবর্তী শিক্ষাবিদদের প্রভাবিত করেছিল। তাঁর মতামত বহুল পরিমাণে কোমেনিয়াসের চিন্তাধারার সহিত সামাঞ্জস্যপূর্ণ।)

জন লক দার্শনিকরূপেই সমধিক খ্যাত। ১৬৮৮ খৃঃ ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লবের সমর্থনে তিনি সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের পক্ষে তাঁর দার্শনিক মতামত প্রচার করেন। শিক্ষা সম্পর্কে জন লকের অভিনব গ্রন্থ "An Essay Concerning Human Understanding" শিক্ষার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। তাঁর শিক্ষাসম্পর্কীয় অপর গ্রন্থ "Some Thoughts Concerning Education" হল্যাণ্ডে থাকাকালীন তিনি তাঁর বন্ধু এডওয়ার্ড ক্লার্কের পুত্রের শিক্ষার জন্য যে সব চিঠি লিখেছিলেন তার উপর ভিত্তি করেই দ্বিতীয় গ্রন্থখানি রচিত হয়। প্রথম যখন ছেলেটির বয়স আট, তখন তার দৈহিক সুস্থতা ও স্বভাব গঠন পরে ছেলেটি বড় হবার সাথে মানসিক শিক্ষার কথা চিঠিতে আলোচনা করেন। শিক্ষার একটা সুপরিকল্পিত রূপের সন্ধান এর মধ্যে পাওয়া না গেলেও তিনি বলেছেন যাঁরা

*বর্তমান বি, টি, সিলেবাস বহির্ভূত

প্রচলিত প্রথার উপর নির্ভর না করে ছেলেদের মানুষ করে তুলতে চান তাঁরা এই বই পড়লে উপকৃত হবেন।

লক ট্রেড-কমিশনার থাকাকালীন শিক্ষা সম্পর্কীয় একটি পরিকল্পনা রচনা করেন। এই পরিকল্পনায় প্রতিটি গ্রামে (Parish) কাজ শেখাবার স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব করেন। তিন বছর থেকে চৌদ্দ বছরের দরিদ্র ছেলে-মেয়েরা সুতাকাটা ও বোনার কাজ করবে—তার বিনিময়ে তাদের আহার্য্যের ব্যবস্থা করা হবে। এই পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেনি। লক বিশ্বাস করতেন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থায় ভিন্নরূপ হওয়া দরকার। অভিজাত ও ধনীর সন্তানের শিক্ষা ও সাধারণ মানুষের সন্তানের শিক্ষা একরূপ হবে না।

শিক্ষার ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে হবে কি গৃহে হবে সে সম্পর্কে লকের মনে সংশয় ছিল। উভয় দিকের অসুবিধার কথা তিনি বলেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি কোমেনিয়াসের বিরোধী সিদ্ধান্ত করেছেন। তিনি বলেন পিতার দৃষ্টির সামনে উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষাই সর্বোত্তম ও সর্বাপেক্ষা নিরাপদ। অবশ্য সবটাই নির্ভর করছে উপযুক্ত গৃহ-শিক্ষক নির্বাচনের উপর।

✓লক খেলা-ভিত্তিক শিক্ষার উপযোগিতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি বলেছেন একটা কঠিন বা গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিশুর উপর চাপিয়ে দিলে সেই বোঝা তার দেহ বা মন বহন করতে সক্ষম হবে না। এমন ভাবে তাদের শেখাতে হবে যাতে মনে হবে এ যেন খেলার মত অবসর বিনোদন "Learning anything they should be taught might be made as much a recreation to their play as their play is to their learning" (As quoted by R. R. Rusk in his The Doctrins of the Great Educators). যা তাদের ভাল লাগবে তা ছেলেরা আনন্দের সাথে করবে। একটি বিষয় একঘেয়ে হয়ে উঠবার আগেই তাদের অন্য কাজে লাগিয়ে দিতে হবে।* শিক্ষাকে কার্যকরী করে তুলতে হলে, শিশুর আগ্রহ, সৃষ্টি করতে হলে খেলার মাধ্যমেই সর্বাপেক্ষা উপযোগী। লককে খেলা-ভিত্তিক শিক্ষার পথিকৃৎ বলা যায়।

লক শিক্ষায় স্মৃতির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন শিক্ষায় স্মৃতির মূল্য অপরিসীম। তবে অভ্যাসের উপর স্মৃতির বিকাশ নির্ভর করে

একথা তিনি বিশ্বাস করতেন না। শুধু মুখস্ত করলেই স্মৃতি-শক্তি বেড়ে যাবে একথা বলা কঠিন। স্মৃতির মত অভ্যাসের ক্ষেত্রও সীমাবদ্ধ। বিশেষ-ক্ষেত্রই বিশেষ-ব্যক্তির অভ্যাস কার্যকরী হতে পারে অন্য বিষয় নয়। পিয়ানো বাদকের আঙ্গুল অভ্যাসবসে চোখ বুজেও সঠিক জায়গায় গিয়ে পড়ছে কিন্তু সেই অভ্যাস নাচের ক্ষেত্রে কার্যকরী হবে না। তিনি শিক্ষায় সঞ্চরণ বাদের মোটেই বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি একে অর্থহীন বলেই মনে করতেন। এক বিষয়ে যে দক্ষ তার কাছে আরেকটি বিষয় নিয়ে যুক্তি-তর্কের অবতারণা করলে হয়ত দেখা যায় সে অপর বিষয়টি সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচয়ই দিচ্ছে।

পাঠক্রম নির্দ্ধারণে লক কিছু পরিমাণে প্রয়োজনবাদী ছিলেন বলে মনে হয়। তিনি বলেন সবাই সব কিছু জানবে এ সম্ভব নয়। আমাদের জীবনের সাথে যে সব বিষয়ের সম্পর্ক আছে ও জীবনধারণের জন্য যা প্রয়োজন আমরা সে সব বিষয়ই শিখব। ব্যাকরণ শিক্ষায় সম্পর্কে তার বক্তব্য থেকে বুঝতে পারা যায় শিক্ষায় প্রয়োজনের দিকটায় তিনি অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন মানুষ ভাষা শিক্ষা করে কথা বলবার জন্য, ভাব বিনিময়ের জন্য। সাধারণ মানুষ কথাবার্তার মধ্য দিয়েই ভাষা শিখতে পারে। ভাষার যে সাধারণ প্রয়োজন—কথাবার্তা বলা, তার জন্য ব্যাকরণ প্রয়োজন নেই। বরং ব্যাকরণ শিখে তারা ভাষা শিখতে গেলে তাদের ভাষা শেখা বিলম্বিত হবে। তবে যাঁরা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে চান, প্রবন্ধ লিখতে চান তাঁদের ব্যাকরণ শেখা দরকার। এখানে প্রয়োজনে মেটানোই বড় কথা শিক্ষায় তিনি প্রয়োজনের দিকেই বেশী জোর দিয়েছেন।

নিপীড়ন আর আর চোখের জল ছিল সেই যুগের শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। লকের শৃঙ্খলা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী আধুনিক যুগের সাথে তুলনীয়। তিনি বলেছেন—I am very apt to think that great severity of punishment does but very little good, nay, great harm in education." লক বলেন, বেতের সাহায্যে শিক্ষক যা শেখাতে চান শিক্ষার্থীর মনে সে সম্পর্কে অনুরাগ না জন্মে বিরাগই জন্মে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানও লকের এই কথাই সমর্থন করে।

আধুনিক মনোবিজ্ঞান-সম্মত শিক্ষার ক্ষেত্র প্রস্তুতে সপ্তদশ শতাব্দীতে

শিশুর 'অন্তরের' আগ্রহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তিনি যে শিক্ষাদর্শের কথা বলেছেন তা তাঁর পরবর্তীকালের প্রগতিশীল শিক্ষাবিদদের চিন্তার খোরাক যুগিয়েছে। তাঁর বহু মতামতই আধুনিক যুগে গ্রহণযোগ্য না হলেও তিনি তাঁর যুগে যথেষ্ট আধুনিকতার পরিচয় দিয়েছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে লকের সর্ব-শ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে প্রতিটি শিশুকে পর্যবেক্ষণ করে তার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাব্যবস্থার নির্দেশ। তিনি বলেছেন, "There are a thousand other things that may need consideration, especially if one shoud take in various tempers, different inclinations and particular defaults that are found in children and prescribe proper remedies······there are possibly scarcely two children who can be conducted by exactly the same method."

জ্যঁ জ্যাঁক রুশো (১৭১২—১৭৭৮)

(প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের দাবী নিয়ে প্রথম এগিয়ে আসেন জ্যাঁ জ্যাঁকস রুশো। সাধারণ ভাবে রুশো ফরাসী বিপ্লবের অগ্রদূত রূপেই পরিচিত। তাঁর যুগান্তকারী চিন্তাধারা, রাষ্ট্রনীতি, সাহিত্য, শিক্ষা, ধর্ম সর্বক্ষেত্রেই এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করে। সমাজে যা কিছু গতানুগতিক, প্রাণহীন তাকে আঘাত করে নতুন চেতনা, নতুন প্রাণের সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন।) ফরাসী সামন্ততন্ত্রের অত্যাচারে নিপীড়িত জনগণকে তিনি যে মুক্তি ও সাম্যের বাণী শুনিয়েছিলেন তা শুধু ফরাসী-রাজতন্ত্রের অবসানই ঘটায়নি তা মুক্তিকামী প্রতিটি নরনারীকেই নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। (তাঁর The Social contral গ্রন্থে তিনি প্রথমেই বলেছেন "Man is born free; and everywhere he is in chains" রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি যে শৃঙ্খলমুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন শিক্ষায়ও তিনি সেই আদর্শেরই পরিপোষক। শিক্ষাসম্পর্কীয় তাঁর মতবাদ তাঁর রাজনৈতিক মতবাদেরই পরিপূরক।)

(রুশো শিক্ষাসম্পর্কীয় তাঁর মৌলিক চিন্তা ধারা Emil নামক গ্রন্থে অত্যন্ত নির্ভীক ও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। এর পূর্বে গতানুগতিক শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তনের দাবীকে এত বলিষ্ঠ ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে কেউ এগিয়ে আসেননি। রুশোর পূর্বে শিক্ষা ছিল প্রাণহীন। শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক, শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষার্থী এই তিন অঙ্গের শিক্ষার্থী বা শিশুই ছিল সর্বাপেক্ষা অবহেলিত। শিক্ষায় শিশুর আগ্রহ, রুচি, ক্ষমতা, তার মানসিক প্রবণতা কিছুরই মূল্য ছিল না। রুশোই প্রথম শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের পরিপন্থী কৃত্রিম-শিক্ষার পরিবর্তে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থার কথা বলেন। লর্ড মর্লি রুশোর 'এমিল'কে শিশুর মুক্তির সনদ ('It was the charater of youthful deliverance') বলে অভিনন্দিত করেছেন। শিশুকে শিক্ষার কেন্দ্রে স্থাপন করে তিনি আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার গোড়াপত্তন করেন।)

রুশোর শিক্ষাসম্পর্কীয় চিন্তাধারার প্রথম প্রভাব পাওয়া যায় তাঁর The New Heloise নামক উপন্যাসে। (তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কৃত্রিম পরিবেশ থেকে শিশুকে মুক্ত করতে না পারলে তার প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা সম্ভব হবে না। The New Heloise গ্রন্থে তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে মায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বর্ণনা করেছেন। এখানে রুশো বলেছেন শিশুকে আমরা শিক্ষা দেই না, শিশুর মধ্যে যে সম্ভবনা আছে তার বিকাশের জন্য পরিবেশ রচনাই আমাদের কাজ।) New Heloise গ্রন্থে, যা জলী বলেছে, 'ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া নয়, ছেলেদের শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করাই আমার কাজ।

(রুশো শিক্ষায় ছিলেন প্রকৃতিবাদী। তাঁর শিক্ষা স্বভাব অনুযায়ী শিক্ষা। তিনি যে কোনরূপ কৃত্রিমতায় বিরোধী। মানুষের তৈরী কৃত্রিম শিক্ষাব্যবস্থা শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের সম্ভবনাকে নষ্ট করে দেয়। তিনি 'এমিল' গ্রন্থের সুরুতেই বলেছেন "Every thing is good as it comes from the hands of the Author of Nature, but everything degenerates in the hands of man.")

(তাই রুশো তাঁর মানসপুত্র এমিল-কে কৃত্রিম সমাজের পরিবেশের বাইরে মুক্ত-প্রকৃতির ক্রোড়ে স্থাপন করে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি বলেছেন শিশু প্রচলিত শিক্ষাক্রমকে অনুসরণ করবে না। শিক্ষাব্যবস্থাই ক্রমবর্দ্ধমান শিশুকে অনুসরণ করবে। আমরা শৈশব সম্পর্কে কিছুই জানি না, আমাদে ভ্রান্ত কতকগুলি ধারণা নিয়ে যা করি তাতে শিশুর অধিকতর ক্ষতিই করা হয়। পণ্ডিতেরা শিশু কি শিখবে তার বিধান দিতে ব্যস্ত কিন্তু সে কতটুকু শিখতে পারে সে খোঁজ নেয় না। তারা শিশুর মধ্যে একজন বয়স্ক মানুষ খুঁজে বেড়ায়, কিন্তু একবার ভাবে না যে মানুষ হবার আগে তার অবস্থাটা কি।...তাই শিক্ষার্থীকে আগে ভাল ভাবে জানতে হবে, কারণ এটা নিশ্চিত আমরা কিছুই জানি না।) "We know nothing of childhood, and with our mistaken notions, the further we advance, the further we go astry. The wisest writers devote themselves to what a man ought to know, without asking what a child is capable of learning. They are always

looking for the man in child without considering what he is before he becomes a man....Being thus by making a more careful study of your scholars, for it is certain that you know nothing about them"—Preface to the Fmil as quoted in A Short History of Educational Ideas by S. G. Curtis and M.E.A. Boult wood).

(খৃষ্টান শিক্ষাদর্শ Original Sin নিয়ে মানুষ জন্মায় তাই মানবশিশুর স্বাভাবিক প্রবণতা পাপের দিকে এই ধারণার উপর গড়ে উঠেছে। রুশো ঠিক তার বিপরীত কথা দিয়ে সুরু করলেন, "that the first impulses of nature are always right, there is no original sin in human heart" (Emile).

স্বভাব-সুন্দর মানব-শিশু সমাজের কৃত্রিমতার মধ্য থেকেই পাপের পথে যায়, তাই রুশো প্রাকৃতিক পরিবেশে শিশুকে স্থাপন করে স্বাভাবিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বলেছেন।

রুশোর শিক্ষাকে বলা হয় নেতিবাচক শিক্ষা (Negative education). প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিনি বলেছেন অস্তিবাচক শিক্ষা (Positive education)। যে ক্ষয়িষ্ণু সমাজে শিশু বাস করে সে সমাজের দূষিত প্রভাব থেকে রক্ষা করবার প্রয়োজনেই তিনি প্রচলিত শিক্ষা থেকে শিশুকে দূরে সরিয়ে প্রকৃতির ক্রোড়ে স্থাপন করে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বলেছেন। প্রকৃতির কাছ থেকে শিশু যা শিখবে তাই হবে তার স্বাভাবিক শিক্ষা, এখানে শিশু নিজেই ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি সাহায্যে শিখতে পারবে। অপরিণত মনকে গঠিত করবার জন্য বয়স্কের উপযোগী কতগুলি কাজ আর উপদেশের বোঝাকে শিশুর উপর চাপিয়ে দেওয়াই হচ্ছে অস্তিবাচক শিক্ষার কাজ। শিশুকে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা দেবার পূর্বে যে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে শিশু শিক্ষা গ্রহণ করবে তাকে শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী করে তোলাই হচ্ছে নেতিবাচক শিক্ষার উদ্দেশ্য ("I call a positive education one that tends to form the mind prematurely and to instruct the child in the duties that belong to a man. I call negative education one that tends to perfect the organs that are the instruments

of knowledge before giving this knowledge directly. —Rousseau). তাই নেতিবাচক শিক্ষাকে যদি মনে করা হয় শিক্ষার অভাব তাহলে ভুল করা হবে। তিনি প্রাচীন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেম কিন্তু পুরান ভেঙেই তিনি তার কাজ শেষ করেননি শিশুকে গড়ে তোলবার জন্য তিনি নিজস্ব শিক্ষাপদ্ধতির যে কথা বলেছেন সেদিকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ গঠনশীল।

রুশোর বৈপ্লবিক শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষানীতির ব্যবহারিক রূপ কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে তিনি এমিল গ্রন্থে বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁর মানসপুত্র এমিলের শিক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন শৈশব থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত শিশুর শিক্ষা কিভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত। এমিল গ্রন্থের সুরুতেই তিনি বলেছেন শিশুর মধ্যে আমরা একটি পরিণত মানুষকে খুঁজি। মানুষ হবার আগে শিশুর স্বরূপকে, তার ব্যক্তিসত্তাকে জানতে চাই না—আমরা জানতে চাই না শিশুকে। পরিণত মানুষ হবার আগে শিশু কোন পথ ধরে ধীরে ধীরে পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে সেই রূপবিবর্তনের ইতিবৃত্তই রুশো এমিলের জীবনালেখ্যর মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। তিনি শিশুর জীবনের ক্রমবিকাশের স্তরকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এই চারটি স্তরে সে কি ভাবে শিক্ষা পাবে, তার দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি বৃত্তির কি ভাবে বিকাশলাভ ঘটবে সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এমিলের শিক্ষার মধ্যদিয়েই আমরা রুশোর শিক্ষাপদ্ধতি পাঠক্রম ইত্যাদি জানতে পারি। এমিলের জীবন কথার মধ্য দিয়ে রুশো তার শিক্ষানীতি ও শিক্ষাদর্শের বাস্তব দিকটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁর প্রকৃতির অনুসারী নেতিবাচক শিক্ষাদর্শই হচ্ছে এমিলের জীবন কথা।

শিশুর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তার দেহ ও মনের বিকাশ লাভ ঘটবে। এই বিকাশের পথ অনুসরণ করেই তার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। রুশো শিশু জীবনের পরিণত রূপ লাভ করবার পূর্ব পর্যন্ত সময়কে চারটি স্তরে ভাগ করেছেন। প্রথম পর্যায় এক থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা, দ্বিতীয় পর্যায় পাঁচ থেকে বার বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা, তৃতীয় পর্যায় বার থেকে পনর বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা, চতুর্থ পর্যায় পনর থেকে কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা।

প্রথম স্তরের পাঁচ বছর পর্যন্ত শিক্ষাকালকে দৈহিক বিকাশ ও ইন্দ্রিয়ানু-

জীবনের শিক্ষাকাল বলা চলে। এই সময় স্বপ্রধান চেষ্টাই হবে কি করে শিশুকে সুস্থ সবল ও কষ্টসহিষ্ণু করে তোলা যায়। এই সময়ে শিশু বাপ-মায়ের কাছেই থাকবে। তাই তার প্রথম শিক্ষা তাঁদের কাছে থেকেই আসবে। বিপরীত প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে তাকে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে এই স্তরে। এক রাশ পোষাকের বোঝা তার উপর চাপিয়ে দিয়ে ঘরের মধ্যে তাকে ননীর পুতুল করে রাখা চলবে না। যতটা সম্ভব ঢিলে-ঢালা পোষাক সে ব্যবহার করবে, পায়ে জুতো নাইবা রইল, অন্ধকারেই পথ চলতে শিখুক —এই করেই স্বাভাবিক পরিবেশে সে মানুষ হয়ে উঠবে। তার স্বাধীন চলা ফেরায় কোন বাধা সৃষ্টি করা চলবে না। গৃহের কারাগার থেকে তাকে মুক্তি দিতে হবে। খেলা-ধূলা সে করবে কিন্তু খেলা-ধুলার কোন ব্যয়-বহুল-উপকরণ তাকে দেওয়া হবে না। ফুল, পাতা, ডাল, মাটি এসব নিয়ে সে খেলবে। শাসন-বাহুল্য যেমন থাকবে না, আদর দিয়ে তাকে বিগড়ে দেওয়াও হবে না। কোন অন্যায় জেদ বা বায়নার প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। সে কোন অভ্যাসের দাস হবে না। একটি মাত্র অভ্যাসই সে আয়ত্ত করবে তাহচ্ছে কোন অভ্যাস না শেখা, 'The only habit, which the child slould be allowed to form is to contract no habit whatsoever.'

(প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাপরিকল্পনায় রুশো শিশুর মানসিক ও নৈতিক বিকাশের কথা চিন্তা করেননি। তাই দৈহিক পুষ্টি ভিন্ন বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য কোন শিক্ষা চর্চার ব্যবস্থা করেননি। এই সময়ে শুধু সুস্থ দেহ গড়ে তুলতে হবে। সুস্থ দেহ, সুস্থ মনের আধার এই কথাই তিনি বলতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন দেহ সুস্থ হলে মনের অনুগত হবে, দুর্বল হলে মনের উপর দেহের দাবীর মাত্রা বেড়ে যাবে "The weaker the body, the more it commands, the stronger it is, the better it obeys."

এই স্তরে ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থাও তিনি করেননি। তিনি এই সময় শিশুকে বেশী কথা বলতে বারণ করেছেন। এ বয়সে শিশু প্রথম চিন্তা করতে শিখবে। রুশো মনে করতেন বেশী কথা বললে চিন্তাশক্তি বিকাশের পথে সেটা অন্তরায় হবে। ভাষা যে চিন্তার বাহন, চিন্তাকে প্রকাশ করতে হলে তা ভাষার মাধ্যমে করতে হবে এবং উন্নত চিন্তার জন্যই যে ভাষার প্রয়োজন এ সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন না।

দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষা পাঁচ বছর বয়স থেকে সুরু হবে বার বছর পর্যন্ত চলবে। এ স্তরকে বলা চলে নেতিবাচক শিক্ষার যুগ। মানুষের সৃষ্ট কৃত্রিম-পরিবেশ থেকে শিশুকে সরিয়ে নিয়ে স্থাপন করতে হবে উদার প্রকৃতির মুক্ত প্রাঙ্গনে। তার জন্য গতানুগতিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা থাকবে না। খোলা চোখ আর খোলা মন নিয়ে সে প্রকৃতির কাছ থেকে বাস্তবশিক্ষা লাভ করবে। এ সময়ে তার শিক্ষা হবে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। স্বাস্থ্যকর স্বাভাবিক পরিবেশে শিশুর দেহের পুষ্টি সাধিত হবে। রোদ, বৃষ্টি, শীত, গ্রীষ্ম সব কিছুতেই সে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। খেলা ধুলা ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদের সাথে উপযুক্ত বিশ্রামের ব্যবস্থা থাকবে। বাধা-নিষেধের নিগড়ে তার স্বাভাবিক বিকাশের পথকে রুদ্ধ করা চলবে না। স্বচ্ছন্দ বিহার আর স্বাধীনতার মধ্য দিয়েই শিশু এই স্তরে শিক্ষা লাভ করবে।

এই পর্যায়ে বইয়ের বোঝা চাপিয়ে শিশুর মনকে পিষ্ট করা হবে না। রুশো বলেন, পড়াটা দরকার আমি জানি, কিন্তু পড়া থেকে যখন শিশু উপকার লাভ করবে তখনই তার পড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ শিশুর মন পড়ার উপযুক্ত না হওয়ার পূর্বে তার পড়ার ব্যবস্থা করে জীবনকে বিড়ম্বিত করতে তিনি চাননি। তবে এই স্তরে কিছুই শেখান হবেনা তা নয়। দেহচর্চার উপযোগী দৌড়-ঝাঁপ, সাঁতার, গাছে চড়া, নানা রকম খেলা এসব থাকবে। মাটি, জল, গাছ, ডালপালা এসব দিয়ে ঘর, দুর্গ এসব তৈরী করতে শিখবে, ছবি আঁকবে। এছাড়া বাইরের প্রকৃতি সম্পর্কে শিশুর মনে কৌতুহল জাগবে, কৌতুহল মেটাবার জন্য সে নানারূপ প্রশ্ন করবে, এসব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে, তাকে গল্প বলে তার জানার স্বাভাবিক স্পৃহা মেটাতে, হবে।

শিশুকে এ সময় তিরস্কার বা পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে কিছুই করান হবে না। নিজের কৃতকর্মের ফলাফলের মধ্য দিয়েই সে শিক্ষা লাভ করবে। এই ঠেকে শেখার নীতিকে বলা হয় স্বাভাবিক ফলাফল-তত্ত্ব (Natural consequence). প্রকৃতিই শিশুর শিক্ষক, প্রকৃতিই তার বিচারক। পুরস্কার কি শাস্তি যাই সে লাভ করুক সে প্রকৃতির হাত থেকেই লাভ করবে। এমিল যদি জানলার কাচ ভাঙে তাহলে এজন্য তাকে শাস্তি দেওয়া হবে না। জানলা দিয়ে ঠাণ্ডা আসবে সেই হবে তার শাস্তি। জলে ভিজলে ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হবে—তাকে ঘরে আটক থাকতে হবে কৃতকর্মের ফল-

ভোগের মধ্য দিয়েই সে শিক্ষা লাভ করবে। স্বাভাবিক ফল লাভের উপর ভিত্তি করে শিশুকে ছেড়ে দেওয়া সব সময় নিরাপদের নয়। ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হবে তাই থেকে শিক্ষা হবে একথা মনে করে শিশুকে সারাদিন জলে ভিজতে দিলে স্বাভাবিক ফলাফলটা অনেক সময় বিপজ্জনক হতে পারে।

তৃতীয় স্তরের শিক্ষা বার বছর থেকে পনের বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই পর্যায় থেকেই শিশুর প্রকৃত শিক্ষা সুরু হবে। শিশু-জীবনের এই পর্যায়ের শিক্ষাকে ইতিবাচক শিক্ষার যুগ বলা যেতে পারে। পূর্ব দুইটি স্তরে শিশুর দেহের পুষ্টি ও ইন্দ্রিয় অনুশীলনের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা হয়েছে। দৈহিক অনুশীলনের স্তর উত্তীর্ণ হয়ে এবার মনসিক বা বৌদ্ধিক অনুশীলনের আয়োজন করা হবে। এই স্তরে শিশুর স্বাধীন চিন্তাশক্তির উন্মেষ হয়। এই সময়ে জীবন ও পারিপার্শ্বিক জগত সম্পর্কে তার মনে অজস্র কৌতুহলী প্রশ্নের উদয় হবে। শিশুর এই কৌতুহলকেই শিক্ষার কাজে লাগাতে হবে গতানুগতিক পুঁথিনির্ভর শিক্ষার ব্যবস্থা তার জন্য করা হবে না। শ্রেণী কক্ষের বন্ধন থেকে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে প্রকৃতির মুক্তঅঙ্গন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে। শিক্ষক তার কৌতূহল মেটাবার জন্য সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেবেন। এজন্য প্রয়োজন তাকে বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, সহিত্য সব কিছুই শেখাতে হবে। সে শুধু শিক্ষকের মুখ থেকেই শুনে শিখবে না। প্রকৃতিবিজ্ঞান সে বাস্তব পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে শিখবে। নিজে পরীক্ষা করে নানা প্রশ্নের উত্তর সে নিজেই খুঁজে বের করবার চেষ্টা করবে। তার জ্ঞান যতটা সম্ভব বাস্তব ভিত্তিক হবে।

বই সম্পর্কে রুশোর একটা বীতরাগ ছিল। শিক্ষার এই স্তরেও তিনি এমিলের জন্য কোন বইয়ের ব্যবস্থা করেন নি। তিনি মনে করতেন নিজের চোখে দেখে যা শিখবে তাই হবে সার্থক শিক্ষা। তিনি বলেন, 'আমি বইকে ঘৃণা করি, বই থেকে আমরা এমন কিছু বলতে শিখি যে সম্পর্কে আমাদের নিজের কোন ধারণা নেই।' বই পছন্দ না করলেও একখানা বই তিনি এমিলের অবশ্য পাঠ্য বলে নির্দেশ করেছেন তা হচ্ছে ডিফোর রবিনসন ক্রুশো। জাহাজ ডুবিতে এক নির্জন জনমানবহীন দ্বীপে আশ্রয় নিয়ে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ক্রুশো কি করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল ও দেশে ফিরে আসতে পেরেছিল সে কাহিনী যেমন কৌতূহল উদ্দীপক তেমনি শিক্ষাপ্রদ।

এমিল যাতে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়ে সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয় সে শিক্ষা দেবার জন্যই হয়ত তাকে রবিনসন ক্রুশোর কাহিনী পড়তে বলা হয়েছে।

এই স্তরের শিক্ষায় এমিলকে একটা শিল্প শিখতে হবে। জীবিকা অর্জনের জন্য এই শিল্পকে সে বৃত্তি রূপে গ্রহণ করবে না। শ্রমের মূল্য সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হলে এই শিল্পশিক্ষার প্রয়োজন। কায়িক পরিশ্রম সম্পর্কে যাতে তার মনে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি না হয়, যাতে এমিল শ্রমের মর্যাদা দিতে শেখে এজন্যই তিনি তাকে শিল্পশিক্ষা দিতে বলেছেন।

চতুর্থ স্তরের শিক্ষা হবে পনের থেকে কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত স্থায়ী। বাল্য ও কৈশোরের স্তর অতিক্রম করে এমিল এবার ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পণ করবে। এতদিন পর্যন্ত তার শিক্ষা ছিল আত্মকেন্দ্রিক। তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশের জন্যই শিক্ষার সমস্ত আয়োজন করা হয়েছে। প্রথম তিনটী স্তরের শিক্ষার মধ্য দিয়ে এমিলের দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধির বিকাশ হয়েছে—এবার এর সাথে হৃদয়ের যোগ স্থাপন করতে হবে—"We have formed his body, his senses and his intelligence, it remains to give him a heart" পরিপূর্ণ আত্মবিকাশই শিক্ষার শেষ কথা নয়—এবার শিক্ষার মধ্য দিয়ে তার সামাজিক চেতনাকে জাগ্রত করতে হবে। মানুষের সাথে মিশে, তাদের সুখ দুঃখের সাথে পরিচিত হয়ে মানুষকে ভালবাসবে, মানুষকে সম্মান করবে। রুশো শিক্ষায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী কিন্তু তার শিক্ষা সমাজবিরোধী নয়। তিনি এমিলকে শিক্ষার মধ্য দিয়ে সমাজসচেতন করে তুলতে চেয়েছেন। তবে এমিলের শিক্ষায় তিনি সমাজের নিয়ন্ত্রণকে স্বীকার করেন নি।

এই পর্যায়ে এমিল ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে। সৌন্দর্যবোধ বিকাশের জন্য সৌন্দর্যতত্ত্ব আলোচনা করবে। যৌবনাগমে তার মনে যৌনচেতনা জাগবে, সেজন্য যৌনশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সামাজিক জীবনে পরিচ্ছন্ন যৌনসম্পর্কে ও বিবাহিত জীবনের পবিত্রতার সম্পর্কে তাকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে হবে। তার ভবিষ্যত জীবন-সঙ্গিনী সোফীর সাথে তাকে এই সময় পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। এরপর নানাদেশ, নানা জাতি, তাদের রীতিনীতি সম্পর্কে জ্ঞানঅর্জনের জন্য দেশ ভ্রমণে বের

হবে। এই ভাবে পরিণত যৌবনে শিক্ষা শেষ করে এমিল সোফীকে বিয়ে করে সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করবে।

নারীশিক্ষা সম্পর্কে রুশোর মতবাদকে প্রগতিশীল বলা যায় না। এমিলের ভবিষ্যৎ জীবনসঙ্গিনী সোফিয়ার শিক্ষা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, নারীশিক্ষার প্রয়োজন পুরুষের জন্য, নারীসম্পর্কে তিনি কোন উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন বলে মনে হয় না। পুরুষের সহচরী বা সহায়িকা ছাড়া নারীজীবনের কোন ভূমিকা আছে বলে তিনি মনে করতেন না।

রুশো ছিলেন আবেগ-প্রবণ, কিছু পরিমাণ বাস্তব-বিমুখ। তাঁর বাস্তব-বিমুখীনতার জন্য তাঁর মধ্যে পরস্পর বিরোধী অসামঞ্জস্যপূর্ণ উক্তির সন্ধান মেলে। তাঁর মানসপুত্র এমিলের জন্য তিনি যে কাল্পনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন তার সাথে তিনি বাস্তবের সামঞ্জস্য বিধান করতে পারেননি। তিনি যে স্বভাব-অনুসারী শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন, সেখানে পিতামাতার সান্নিধ্য থেকে শিশুকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছেন, তিনি তাকে মানুষের সমাজের বাইরে রাখতে চেয়েছেন। তাঁর এই পরিকল্পনা বাস্তবের সাথে সম্পর্ক বিরহিত। তারপর একজন শিক্ষক সর্বক্ষণ শিশুর সাথে থেকে তাকে পরিচালনা করবে এও বাস্তব নয়। তারপর নেতিবাচক শিক্ষায় সমাজের সমস্ত প্রভাব থেকে শিশুকে মুক্ত রাখতে হবে কারণ যা কিছু সামাজিক তাই কৃত্রিম। একটি শিশুকে পনর বছর পর্যন্ত কি সমাজের সবকিছু থেকে দূরে সরিয়ে সমাজের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা যায়? যদি তা সম্ভবও হয় তাহলে কি করে তাঁকে আবার সমাজের উপযোগী করে তোলা সম্ভব হবে।

রুশোর দোষত্রুটি ও অসঙ্গতি সত্ত্বেও তিনিই আধুনিক শিক্ষার পথ-প্রদর্শক। শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্রে তিনিই প্রথম শিশুকে স্থাপন করেন। শিশুর স্বভাব-প্রবণতা, রুচি, শক্তি প্রভৃতির মূল্য শিক্ষাক্ষেত্রে অপরিসীম একথার স্বীকৃতি আমরা প্রথম রুশোর মধ্যেই পাই। প্রকৃতির উদার মুক্ত-প্রাঙ্গন শিক্ষার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত পরিবেশ একথা পাশ্চাত্য শিক্ষায় তিনিই প্রথম জোরের সাথে বলেন। ইন্দ্রিয় পরিচালনার মাধ্যমে বিভিন্ন জিনিষের সাথে পরিচয় ঘটিয়ে শিশুর আগ্রহকে বাড়িয়ে তোলার পদ্ধতিকে রুশোর কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি। শিক্ষাপদ্ধতি ও নীতি সম্পর্কে তিনি যে আভাষ দিয়েছেন—তাঁর কাছ থেকে সেই ইংগিতগুলিকে নিয়েই পরবর্তীকালে নতুন নতুন শিক্ষাপ্রণালী সমূহ প্রবর্তিত হয়। রুশো শিশুর নিজস্ব সত্তা ও

মানসিক বিকাশের পথকে প্রস্তুত করবার নির্দেশ দিয়ে শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানের ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর পথ প্রস্তুত করেছেন। তাঁর চিন্তায় যা ছিল অস্পষ্ট তাকেই সুসংবদ্ধ রূপ দিতে চেয়েছিলেন পেস্টালৎসি। শিক্ষানীতি ও শিক্ষাপদ্ধতিকে মনোবিজ্ঞান সম্মত করবার প্রাথমিক প্রচেষ্টা পেস্টালৎসির শিক্ষা-প্রয়াসের মধ্যে পাই।

জোয়ান হেনরিখ পেষ্টালৎসী (১৭৪৬-১৮২৭)

সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখ সহরে ১৭৪৬ খৃঃ পেষ্টালৎসীর জন্ম হয়। শৈশবেই পিতৃবিয়োগ হওয়ায় স্নেহময়ী জননীর তত্ত্বাবধানে তাঁর বাল্যের শিক্ষা সুরু হয়। কল্যাণময়ী জননীর শুভ প্রভাব তাঁর জীবনকে আনন্দময় করে তুলেছিল। মায়ের প্রভাব তাঁর জীবন জুড়ে ছিল বলেই তাঁর শিক্ষাচিন্তায় মায়ের প্রভাব এত বেশী পরিলক্ষিত হয়। পেষ্টালৎসীর জীবন ব্যাপী সাধনায় বহু বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়। তিনি ছিলেন আদর্শবাদী। বহু ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর নতুন শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নীরিক্ষা চালিয়ে সাফল্যের পথে এগিয়ে চলেন। রুশোর এমিল শিক্ষা জগতে যে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল পেষ্টালৎসী তাঁর জীবনব্যাপী সাধনায় তাকেই বাস্তবরূপ দিতে চেয়েছিলেন। রুশোর নেতিবাচক শিক্ষাকে তিনি একটি গঠনমূলক রূপ দিয়েছিলেন। রুশোর শিক্ষাদর্শে সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে একটা বিরোধ দেখা যায়, পেষ্টালৎসী মানুষ ও সমাজের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। গৃহশিক্ষাকেই তিনি শিক্ষার স্বাভাবিক ভিত্তিস্থাপনের ক্ষেত্র বলে মনে করতেন।

১৭৬৯ খৃঃ তিনি 'বির' গ্রামে একটি খামার স্থাপন করে তার নাম দেন 'নিউহফ'। এখানে তিনি একটি অনাথ আশ্রম খোলেন। কয়েকটী দুস্থ শিশুকে নিয়ে তিনি বাস্তব জীবনের উপযোগী হাতের কাজের সাথে সাথে তাদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন।

ছেলেদের চাষ আর মেয়েদের ঘরের কাজ সেলাই প্রভৃতি শেখালেন। প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে বাস্তবজীবনের প্রয়োজনীয় শিক্ষাকেই তিনি এখানে প্রধান স্থান দেন। হাতের কাজের সাথে মুখে মুখে সাধারণজ্ঞান, বাইবেল প্রভৃতি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু স্কুলটি বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। ১৭৮০ খ্রীঃ বিদ্যালয়টি আর্থিক বিপর্যয়ে বন্ধ হয়ে যায়।

এই সময়ে তিনি তাঁর শিক্ষানীতির মূল সূত্রগুলিকে আলোচনা করে তাঁর প্রথম গ্রন্থ The Evening Hour of Hermit প্রকাশ করেন। এর পর তিনি Leonard and Gertrude (১৭৮১ খ্রীঃ) গ্রন্থে একটি কাহিনীর মাধ্যমে তার শিক্ষানীতি প্রচার করেন। ১৭৯৮ খ্রীঃ সুইজারল্যাণ্ডের ষ্ট্যান্জ গ্রামে অনাথ শিশুদের ভার নিয়ে তাদের জন্য একটি স্কুল খোলেন। এই

বিদ্যালয় স্থাপনে তিনি সরকারী সাহায্য পেয়েছিলেন। এই বিদ্যালয়েই তিনি পাঁচটি স্বরবর্ণের সহিত ব্যঞ্জনবর্ণ মিশিয়ে বর্ণসংযোগ ও স্বরবর্ণের উচ্চারণ ভেদ বোঝাবার সহজতম পদ্ধতি "সিলেবারীজ" (Syllabaries) আবিষ্কার করেন। পাঁচটি স্বরবর্ণের সাথে প্রত্যেকটি ব্যঞ্জন বর্ণ মিশিয়ে (যেমন ba, be, bi, bo, bu, আবার ab, eb, ib, ob, ub) উচ্চারন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ায় সাধারণ শিক্ষিত মায়েরাও তাদের সন্তানের শিক্ষাদায়িত্ব গ্রহন করতে সক্ষম হয়েছিল। ষ্ট্যান্‌জে তিনি লেখা-পড়ার সাথে হাতের কাজকে আরো বেশী করে যুক্ত করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে শিক্ষার সাথে হাতের কাজ যুক্ত হলে গতানুগতিক শিক্ষার চেয়ে আরো অনেক বেশী ফল পাওয়া যাবে।

ষ্ট্যান্‌জের বিদ্যালয় বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। এর পর কয়েক জন বন্ধুর চেষ্টায় বার্গ ডোর্ফ-এ একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাজ সুরু করেন। এখানে তিনি ভাষা শেখানোর জন্য রঙীণ কাঠের অক্ষর ব্যবহার সুরু করেন। অঙ্ক শেখানোর জন্য ছোট ছোট পাথরখণ্ড ও ছোট ছোট কাঠের টুকরো ব্যবহারের রীতি প্রবর্তন করেন। এরপর তাঁর কার্যক্ষেত্র ইভারডুনে স্থানান্তরিত হয়। এখানে এসে তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির আরো অনেক পরিবর্তন হয়। পূর্বে তিনি Table of Unit উদ্ভাবন করেছিলেন, এখানে ভগ্নাংশ শেখানোর জন্য Table of Fraction প্রবর্তন করেন। শিশুর নিকট বিমূর্ত অপেক্ষা মূর্তবিষয়ের অবদান অধিক এটা বুঝতে পেরে তিনি শিক্ষায় ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য উপকরণের ব্যবহার সুরু করেন। ফ্রয়েবেল ও মন্টেসরীর শিক্ষা-পদ্ধতিতে বহুবিধ উপকরণের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। তাঁরা এ সব উপকরণকে এক একটি ভাবের প্রতীক রূপে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু পেষ্টালৎসী এসব ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য উপকরণের পশ্চাতে কোন বিশেষ অর্থের সন্ধান করেন নি। শিশুর শিক্ষাকে সহজ করে তোলার ব্যবহারিক মূল্যের দিক থেকেই এসব উপকরণের সাহায্য তিনি গ্রহণ করেছেন।

জীবনের শেষ সময়ে তিনি "How Gertrude Teaches Her Children" প্রকাশ করেন। এতে পেষ্টালৎসীর শিক্ষা-চিন্তার বিষদ বিবরণ পাওয়া যায়। এ ছাড়া তিনি The A. B. C. of Observation এবং The Book for Mothers প্রভৃতি বই লেখেন।

পেষ্টালৎসী শিক্ষা বলতে শিশুর সর্বাঙ্গীণ উন্নতিই বুঝতেন। শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে তিনি বলেন "Education is the natural, progessive and

harmonious development of all the powers and capacities of human being" স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে রেখেই তিনি শিশুর বিকাশের সুযোগ করে দিতে চেয়েছেন। শিক্ষা শুধু স্বাভাবিক পরিবেশেই হবে না, শিক্ষা হবে শিশুর স্বভাব-অনুসারী। রুশোর স্বভাব-অনুসারী শিক্ষাতত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই পেষ্টালৎসী শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞান সম্মত করতে চেয়েছিলেন। শিশুর স্বভাব বা প্রকৃতি জেনেই স্বভাব-অনুসারী শিক্ষার আয়োজন সম্ভব। সেই দিক থেকে পেষ্টালৎসীই শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের প্রথম পথ প্রদর্শক।

নিজের জীবনে মায়ের প্রভাবের কথা স্মরণ করে তিনি বলতেন, শিশুর শিক্ষায় মায়ের ভালবাসার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। তাই প্রাথমিক শিক্ষার ভার তিনি মায়ের হাতে ছেড়ে দিতে চেয়েছেন।

পেষ্টালৎসীর শিক্ষায় ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে শিশুর বাস্তববোধ বিকাশের একটা বিশেষ স্থান আছে। শিশুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হবে শিক্ষাদানের প্রাথমিক ভিত্তি। তাঁর মতে Sense Training is the first and foremost training, লেখাপড়ার সাথে হাতে কলমে কাজ যুক্ত করতে হবে।

পেষ্টালৎসী শিক্ষায় শিশুর মানসিক বিকাশে স্তর বা ধারাকে অনুসরণ করতে বলেছেন। শিশুকে সহজ থেকে ক্রমে কঠিনের দিকে নিয়ে যেতে হবে। এই ক্রমবর্দ্ধমান জটিলতা মানসিক বিকাশের স্তরকে অনুসরণ করবে। তিনিও রুশোর মত বলেছেন "শিশু শিক্ষাক্রম অনুসরণ করবে না, শিক্ষাক্রমই শিশুকে অনুসরণ করবে।" তিনি কোন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান দান করতে চাননি তার মধ্যে যা আছে যে সম্ভবনা আছে তাকেই তিনি শিক্ষা বলেছেন "The Main object of education is not to teach but to develop."

বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি বহুভাবে পেষ্টালৎসীর নিকট ঋণী। তাঁর দোষ-ত্রুটি ছিল, তিনি ছিলেন আদর্শবাদী, তাই দেখা গিয়েছে শিক্ষার সূত্রটি ঠিক-ভাবে বুঝেও তিনি বাস্তব ক্ষেত্রে সঠিকভাবে তার প্রয়োগ করতে পারেন নি। তবুও সহজ সরল শিক্ষাদরদী মানুষটি শিক্ষাক্ষেত্রে যে সব পরীক্ষা চালিয়ে গিয়েছেন তার ফলে তাঁর উত্তর সাধকেরা শিক্ষাক্ষেত্রে বহু যুগান্তকারী পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। একথা সত্য, তিনি বিশেষ শিক্ষা পাননি মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না তবুও তিনিই বাস্তবধর্মী মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষাপদ্ধতির পথ প্রদর্শক। তিনি যা শুরু করেছিলেন তাঁরই ভাবশিষ্যদের দ্বারা তা সার্থক রূপ পেয়েছে। তিনি নিজেই বলেছিলেন

"I am the initiator and depend it upon others to carry out my views" শুধু মনস্তত্ত্বই নয় শিক্ষাকে সার্বজনীন করে তোলবার জন্যও তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। রুশোর শিক্ষাব্যবস্থায় সমাজের দাবীকে উপেক্ষা করা হয়েছে। পেষ্টালৎসী শিক্ষায় ব্যক্তি ও সমাজের সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে শিক্ষাকে ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণের পথে পরিচালনার কথা বলেন। সবদিক থেকে বিচার করে বলা চলে গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুশোর কণ্ঠে যে বিদ্রোহের বাণী ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল, যে বৈপ্লবিক শিক্ষাদর্শ তিনি প্রচার করেছিলেন তাকে বাস্তবে রূপ দেবার মধ্য দিয়ে পেষ্টালৎসী আধুনিক শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

জন ফ্রেডারিক হারবার্ট (১৭৭৬-১৮৪১ খৃঃ)

পেষ্টালৎসী শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানের ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর নীতির মধ্যে এমন কতকগুলি অসঙ্গতি ছিল যার জন্য তিনি আদর্শের সাথে বাস্তবের সুষ্ঠু সমন্বয় করতে পারেননি। মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হলেও তাঁর পক্ষে শিক্ষানীতিকে দৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দাঁড় করানো সম্ভব হয় নি। তাঁর আরব্ধ কাজকে বৈজ্ঞানিক-রূপ দিতে এগিয়ে আসেন ফ্রেডারিক হারবার্ট। রুশো ও পেষ্টালৎসী শিশুশিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের গুরুত্বকে অনুভব করে যে কাজ সুরু করেন হারবার্ট তাকে বাস্তবে রূপায়িত করেন।

১৭৭৬ খৃঃ জার্মাণীর এক কৃষ্টিসম্পন্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে হার্বার্ট জন্ম গ্রহণ করেন। মায়ের কাছে তাঁর শিক্ষার সুরু। জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠকালীন তিনি সে যুগের খ্যাতনামা দার্শনিক ফিক্টে ও শিলিং-এর সংস্পর্শে এসে ভাববাদী-দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হন। কিন্তু হারবার্ট ছিলেন যুক্তিবাদী তাই ভাববাদী-দর্শন তিনি পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেননি। এখানে তিনি সুইজারল্যাণ্ডের ইণ্টার লেকেনয়ের শাসনকর্তার তিনটি ছেলের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। এই তাঁর শিক্ষকতার হাতেখড়ি—আর তিনি যে মনোবিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন করেছিলেন সেও এখান থেকেই সুরু। এদের শিক্ষকতার মধ্য দিয়েই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রের রুচি, আগ্রহ, শক্তি ও ব্যক্তিত্ব বিচারের প্রয়োজন আছে। এখানে দু'বছরের শিক্ষকতাকালে তিনি পেষ্টালৎসীর শিক্ষা-প্রণালীর প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৭৯৯ খৃঃ তিনি বার্গডর্ফে পেষ্টালৎসীর স্কুলটি দেখে আসেন। এর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে পেষ্টালৎসীর শিক্ষানীতি ও প্রণালীর মধ্যে যে অসংলগ্নতা ছিল তা সংস্কারে ব্রতী হন। তাঁর কর্মক্ষেত্র গোটিনজেন ও কোনিগসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষরূপে সীমাবদ্ধ। তাঁর শিক্ষানীতি সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য তিনি কোনিগসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি শিক্ষক শিক্ষণ-শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন।

হারবার্ট ছিলেন দার্শনিক। শিক্ষাকে তিনি দর্শনের পটভূমিকায় উপস্থাপন করেন। তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতিকে তিনি দার্শনিক ভিত্তির উপর দাঁড় করান। গোটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাসম্বন্ধীয় বিষয়ের অধ্যাপক রূপে

যে সব বক্তৃতা করেন ও এই বিষয়ে প্রকাশিত দু'টি বইয়ে তাঁর শিক্ষানীতি সম্পর্কে যে আলোচনা আছে তাতে দেখা যায় শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে তিনি নীতি-ধর্মের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে একটি মাত্র কথায় প্রকাশ করা যায় তা হচ্ছে নীতিজ্ঞান (morality)। তিনি বার বার শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নীতিধর্ম বা নীতিজ্ঞান এই কথাটি প্রচার করেছেন। শিক্ষা ও নীতিধর্ম এ দু'টি কথা তাঁর কাছে প্রায় সমার্থবোধক ছিল। নৈতিক চরিত্র গঠন ও সৎগুণের বিকাশই হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য। এই নীতিজ্ঞান বা নীতিবোধকে শিক্ষার সাহায্যে একটি জীবন্ত অভ্যাসে পরিণত করার যে কৌশল তাই হচ্ছে শিক্ষা। তিনি শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিশুর সুরুচিবোধ ও সৌন্দর্যজ্ঞানকে বিকশিত করতে চেয়েছেন। শিক্ষার ফলে শিশু যা কিছু অ-সুন্দর যা কিছু অসত্য তাকে ঘৃণা করতে শিখবে। শিশুকে এমন ভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে সে স্বভাবতঃই সত্য-সুন্দরের দিকে আকৃষ্ট হয়।

হারবার্ট শিক্ষায় শিশুকে জানার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিক্ষা যদি হয় শিশুর প্রকৃতি-অনুসারী তাহলে শিশুর মন বা প্রকৃতিকে আগে জানতে হবে। তিনি অ্যারিষ্টটলের 'মন কতগুলি ভিন্ন ভিন্ন শক্তি (faculty) নিয়ে গঠিত' এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি মনে করতেন মন একটি অখণ্ড শক্তি। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষ কোন সহজাত শক্তি নিয়ে জন্মায় না। রুশোর 'শিশু' স্বভাবতঃই সৎ—এ তত্ত্বেও তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। শিশুর জন্ম সময়ে তার মন থাকে শূন্য। অভিজ্ঞতার দ্বারাই সে সৎ কি অসৎ হয়। এই অভিজ্ঞতাই হচ্ছে জ্ঞানের ভিত্তি। জন্মের পর থেকেই আমরা বহু অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই। এই অভিজ্ঞতা দুইটি সূত্র থেকে আমরা লাভ করি—প্রকৃতির কাছ থেকে, আর মানুষের কাছ থেকে। আমাদের সামনে নতুন কোন অভিজ্ঞতা এলে পরস্পরের মধ্যে সংযোগ ও বিয়োগের মধ্য দিয়ে পুরাতন অভিজ্ঞতার সাথে নতুনের সমন্বয় সাধিত হয়। পুরাতনের সাথে নতুনের সংযোজন প্রক্রিয়াকে শিক্ষার অন্বয়ীকরণ (apperception) বলা হয়। নতুন নতুন অভিজ্ঞতা পুরাতনের সাথে অন্বিত হয়ে একটি পরিমণ্ডলের সৃষ্টি করে। পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতার পরিমণ্ডল (circle) নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে বিস্তৃতি লাভ করে। এমনি ভাবে চিন্তা-বৃত্ত (Circle of thought) সম্প্রসারিত হয়। পুরাতন অভিজ্ঞতার সাথে অন্বিত হয়ে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়—পুরাতন জ্ঞানের সাহায্যেই আমরা নতুন

জ্ঞান অর্জন করি এই তত্ত্ব আধুনিক অনেক মনোবিজ্ঞানীও সমর্থন করেছেন। পুরাতন ও নতুনের সংযোগ সাধনের এই যে নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া চলছে এতে মনকে বহু পরস্পর বিরোধী অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়। মন যখন কোন বিরোধী অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় তখন পুরাতন অভিজ্ঞতা একে বাধা দেয়। এই বাধার ফলে কোন কোন অভিজ্ঞতা চেতনার মধ্যে স্থান পায় না। কিন্তু এগুলি চিরতরে মন থেকেও মিলিয়েও যায় না। মনের অবচেতন কোণে এরা স্থান নেয়। চেতন মনের অনভিপ্রেত অভিজ্ঞতা অবচেতন মনের কোণে লুকিয়ে থাকে এই মতবাদ ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণ তত্ত্বে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

হারবার্ট তাঁর শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের একটি বিশিষ্ট স্থান নির্দেশ করেছেন। আধুনিক কোন কোন শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষকের জন্য একটি গৌন স্থা‚ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। শিক্ষক সেখানে পরিচালক নন তিনি মাত্র পর্যবেক্ষক। হারবার্টের শিক্ষায় শিক্ষক শিক্ষাকর্মের একটি প্রাণবান-অঙ্গ স্বরূপ। শিক্ষার্থী যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তাকে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সুশৃঙ্খল রূপ দেওয়া শিক্ষকের কাজ। শিক্ষকই শিশুর মনে আগ্রহ সৃষ্টি করবেন ও তাকে সুপরিচালিত করে নতুন জ্ঞানার্জনে সহায়তা করবেন। তিনি বাইবের শাসনের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার কবলেও তিনি বাইরের থেকে চাপিয়ে দেওয়া শৃঙ্খলায় শিশুর নৈতিক বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে বলে মনে করতেন। শিক্ষার প্রতি আগ্রহ থেকে শিক্ষার্থীর মনে যে শৃঙ্খলাবোধ আসবে সেই স্বতঃউৎসারিত শৃঙ্খলার কথাই তিনি বলেছেন। শিক্ষার লক্ষ্য যে নীতিবিজ্ঞান তাকে হারবার্ট পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমতঃ আত্মার স্বাধীনতা, দ্বিতীয় হচ্ছে তার সুমঞ্জস্য বিকাশ, তৃতীয় সদিচ্ছা, চতুর্থ ন্যায়পরায়ণতা, পঞ্চম, স্বাভাবিক সততা। শিক্ষক শিক্ষা-প্রণালীর মধ্য দিয়ে শিশুর চিন্তা, ধারণা, অনুভূতি ও ইচ্ছাকে এই আদর্শ-অনুসারী করবেন হারবার্ট তাই চেয়েছেন।

হারবার্টের শিক্ষাতত্ত্বে আগ্রহের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। শিক্ষায় শিশুর আগ্রহের যে কোন মূল্য বা প্রয়োজনীয়তা আছে গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় তার কোন স্বীকৃতি ছিল না। হারবার্ট বুঝতে পেরেছিলেন শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর মনে আগ্রহ সৃষ্টি বিশেষ প্রয়োজনীয়। আগ্রহ সৃষ্টি হলেই শিশুর মন নতুন বিষয় শিক্ষার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠবে। শিশুর ইচ্ছাশক্তি উদ্দীপ্ত হলেই শিক্ষার কাজ এগিয়ে চলবে। বর্তমানকালের

শিক্ষাবিদগণও বিশ্বাস করেন বহুমুখী-আগ্রহের (many sided interest) সাথে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানকে যুক্ত করাই শিক্ষার লক্ষ্য। শিক্ষার্থীর বহুমুখী-আগ্রহের উপর নির্ভর করেই শিক্ষায় অনুবন্ধ-প্রণালীর (correlation) প্রবর্তন হয়েছে। একটি মূল বিষয়কে (core-subject) কেন্দ্র করে এই প্রণালীতে অপর বিষয় সমূহ শিক্ষা দেওয়া হয়। অন্যান্য বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় বিষয়টির সাথে যুক্ত হয়ে স্বাভাবিক ভাবেই উপস্থাপিত হয়।

এই যে আগ্রহ সৃষ্টি ও শিখবার ইচ্ছাকে জাগিয়ে তোলা এর মধ্যে কতকগুলি স্তর রয়েছে। একটি একটি করে স্তরগুলি অতিক্রম করে আমরা অগ্রসর হই। হারবার্ট শিশুর মানসিক গঠন ও আগ্রহের ধারাকে অনুসরণ করে চারটি স্তর বা সোপান রচনা করেছেন। এই ধাপগুলি হচ্ছে পর্যবেক্ষণ (observation), ধারণা (expectation), চাহিদা (demand) ও কার্য (action)। এই স্তর বিভাগ অনুসারে তিনি শিক্ষাপদ্ধতিরও চারটি স্তর নির্দেশ করেছেন—(১) স্পষ্টতা (clearness), (২) পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপন (association), (৩) সূত্র নির্দ্ধারণ (Generalisation) (৪) প্রয়োগ পদ্ধতি (Method of application)। হারবার্টের শিক্ষাপদ্ধতিতে প্রথম স্তরটির মূল্য অত্যন্ত বেশী তাই তাঁর ছাত্র জিলার এই স্তরটিকে ভেঙ্গে দু'টি ভাগে ভাগ করেন। প্রথমটি প্রস্তুতি (Perparation), দ্বিতীয়টি উপস্থাপন (presentation)। হারবার্টের অপর শিষ্য রেইন প্রস্তুতিপর্বে উদ্দেশ্য (aim) বলে আরেকটি নতুন স্তর যোগ করেন।

প্রস্তুতিপর্বে শিশুর পূর্বজ্ঞানকে আশ্রয় করে নতুন জ্ঞান আহরণের জন্য তার মনে আগ্রহ সৃষ্টি করা হয়। প্রস্তুতিপর্বে শিক্ষার্থীর আগ্রহ উদ্দীপ্ত করে তার মনকে পাঠাভিমুখী করাই শিক্ষকের কাজ। নতুন-পাঠ সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারলেই পরবর্তী কাজ অর্থাৎ উপস্থাপনা সুষ্ঠু ভাবে করা সম্ভব হয়।

উপস্থাপন পর্বে শিক্ষার্থীর নিকট নতুন বিষয়টি ধীরে ধীরে তুলে ধরতে হবে। প্রয়োজন হলে সমগ্র বিষয়টি কয়েকটি পর্বে ভাগ করে উপস্থাপন করতে হবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সহযোগিতায় শিক্ষাকার্য এগিয়ে চলবে। শিক্ষার্থী শুধু নীরব-শ্রোতার ভূমিকা গ্রহণ করবে না—পাঠে সে-ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে। শিক্ষক প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীর মনকে পাঠে আকৃষ্ট রাখবেন।

সম্বন্ধস্থাপন বা তুলনাপর্বে শিক্ষার্থীর পূর্বলব্ধ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার সাথে নতুন আহরিত জ্ঞানের সম্বন্ধ স্থাপন করতে-হবে। তুলনা বা সম্বন্ধ স্থাপনের কাজ শুধু মাত্র শিক্ষকই করবেন না—শিক্ষার্থীও এতে অংশ গ্রহণ করবে।

সূত্র নির্দ্ধারণ—যা শেখান হল সেই জ্ঞানমূলক বিষয় থেকে শিক্ষার্থীদের একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে, শিক্ষক শুধু মাত্র পথ নির্দেশ করবেন। সূত্রনির্দ্ধারণ সাধারণতঃ জ্ঞানমূলক পাঠের (knowledge lesson) ক্ষেত্রে সম্ভব।

প্রয়োগ—এই স্তরে শিক্ষার্থী যা শিখল তা সে সম্পুর্ণ আয়ত্ত করতে পেরেছে কি না তার পরীক্ষা হয়। অর্জিত জ্ঞানের বাস্তবপ্রয়োগ করতে না পারলে শিক্ষার্থী শিক্ষনীয় বিষয়কে সম্পুর্ণরূপে আয়ত্ত করতে পারেনি বলেই ধরে নেওয়া হবে। বিষয়ানুসারী বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে বা লিখতে দিয়ে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পারমাপ ও সে অর্জিত জ্ঞানকে প্রয়োগ করতে সক্ষম কিনা জানা যায়।

আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির বহু পরিবর্তন হয়েছে, অনেক নতুন শিক্ষা-পদ্ধতিও উদ্ভাবিত হয়েছে কিন্তু সব কিছুর মূলেই রয়েছে, শিশুকে জানা ও তার মনে শিক্ষার আগ্রহ সৃষ্টি করা। শিশুমনের আগ্রহকে-কেন্দ্র করেই কর্মকেন্দ্রিক-শিক্ষা (Activity centred education) পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। হারবার্টের পঞ্চ-সোপান শিক্ষাপদ্ধতি কিছু পরিমানে যান্ত্রিক হলেও শ্রেণী-শিক্ষায় এর উপযোগিতাকে আজও অস্বীকার করা যায় না। পাঁচটি স্তরকে সংক্ষিপ্ত করে তিনটি স্তর সৃষ্টি করে (প্রস্তুতি—উপস্থাপন—প্রয়োগ বা অভিযোজন) যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে শ্রেণীশিক্ষার ক্ষেত্রে আজও আমরা তা ব্যবহার করি। হারবার্ট শিক্ষকদের দর্শকের ভূমিকায় স্থাপন করেন নি। শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠন ও ব্যক্তিত্ব বিকাশে শিক্ষকের যে একটা প্রত্যক্ষ দায়িত্ব আছে তার স্বীকৃতি হারবার্টের মধ্যে পাই। শিক্ষায় অনুবন্ধ-প্রণালীর কার্যকারিতাকেও অস্বীকার করা যায় না। শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতে দাঁড় করাবার যে প্রচেষ্টা পেষ্টা-লৎসী সুরু করেছিলেন হারবার্ট শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন করে পেষ্টালৎসীর আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করেন।

ফ্রয়েবেল (১৭৮২-১৮৫২ খৃঃ)

শিক্ষায় নবযুগের সূচনা করেন রুশো। রুশোর শিক্ষাদর্শকে বাস্তবে রূপ দিতে এগিয়ে আসেন পেষ্টালৎসী। রুশোর নেতিবাচক শিক্ষাদর্শকে গঠনাত্মক রূপ দিতে গিয়ে তিনিই প্রথম অনুভব করেন শিশুর শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে সর্বপ্রথম শিশুকে জানতে হবে, শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানসম্মত করে তুলতে হবে। শিক্ষাবিদদের মধ্যে তিনিই প্রথম সচেতন ভাবে শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতে দাঁড় করাবার জন্য সচেষ্ট হন। মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকায় তাঁর সদিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি এ কাজে খুব অগ্রসর হতে পারেন নি। তাঁর আরব্ধ কাজ শেষ করবার দায়িত্ব তাঁরই উত্তর-সাধক হারবার্ট গ্রহণ করেন। তাঁরই পথ অনুসরণ করে তিনি শিক্ষাপদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিকভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। ঠিক একই সময় পেষ্টালৎসীর শিক্ষা-চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন উইলহেলম ফ্রয়েবেল।

দক্ষিণ জার্মাণীর এক মনোরম পার্বত্য পরিবেশে উইসব্যাক গ্রামে ফ্রয়েবেল (১৭৮২ খৃঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবে মাতৃবিয়োগ হওয়ায় ও পিতা দ্বিতীয়বার বিয়ে করায় বালক ফ্রয়েবেল বিমাতার সংসারে পিতা-মাতার স্নেহময় সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হন। সঙ্গীহীন জীবনে পল্লী-প্রকৃতিই হয় তাঁর বাল্যজীবনের সাথী। বাল্যে প্রকৃতির এই নিবিড় সাহচর্যের ফলে তাঁর কল্পনাপ্রবণ মন প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করে একটি প্রাণবান সত্তার। জীবন্ত-প্রকৃতি, এই ধারণা তাঁর পরবর্তী জীবনে শিক্ষা-দর্শে বিশেষ স্থান অধিকার করে। পল্লী-প্রকৃতির স্নেহময় আবেষ্টনীর মধ্যে বালক ফ্রয়েবেল রচনা করেছিলেন আপন ক্রীড়াক্ষেত্র। দশ বছর বয়সে তাঁর ধর্মযাজক মামা তাকে নিয়ে যান নিজের কাছে। এখানে এসে তিনি প্রথম শিক্ষার সুযোগ পান। কিন্তু শিক্ষা বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেনি। পনর বছর বয়সে তিনি বন-বিভাগে কাজ পান। এখানে কাজ করবার সময় প্রকৃতির সাথে পরিচয় আরো নিবিড় হয়। প্রকৃতির মধ্যে তিনি দেখতে পান এক অলৌকিক শক্তি—যে শক্তি প্রকৃতির মধ্যে তারই প্রকাশ দেখতে পান পৃথিবীর সর্বত্র। সমগ্র বিশ্বব্যাপী একটি ঐক্যের সূত্রের সন্ধান পান, প্রকৃতির সাথে এই ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের ফলে।

বনবিভাগে দু'বছর কাজ করবার পর তিনি আবার লেখাপড়ায় মন দেন। জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য, কিন্তু অর্থাভাবে পড়া ছাড়তে বাধ্য হন।

১৮০৫ খৃঃ ফ্রয়েবেল ফ্রাঙ্কফুর্টের একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। এখানে পেষ্টালৎসীর পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হত। এখানেই প্রথম ফ্রয়েবেল নিজেকে প্রথম আবিষ্কার করেন—তাঁর মধ্যে যে সুপ্ত-শিক্ষক ছিল তা নিজ ক্ষেত্রের সন্ধান পেয়ে জাগ্রত হয়ে ওঠে। এখানে দু'বছর শিক্ষকতার পর তিনি ইভারডুনে দু'বছর পেষ্টালৎসীর কাছে থেকে তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। পেষ্টালৎসীর শিক্ষাপদ্ধতি তাঁকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করলেও তিনি পেষ্টালৎসীর শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে কতকগুলি অসঙ্গতি আবিষ্কার করেন। তিনি লক্ষ্য করেন পেষ্টালৎসীর শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষাদর্শ সামঞ্জস্যহীন। তিনি যা বলেন কার্যক্ষেত্রে তাকে ঠিক ভাবে রূপায়িত করতে পারছেন না। মনে হয় তিনি নিজেও সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ফ্রয়েবেল পেষ্টালৎসীর শিক্ষানীতিকে সম্পূর্ণতা দেবার কাজে এগিয়ে আসেন।

১৮১১ খৃঃ তিনি প্রকৃতি-বিজ্ঞান পাঠের জন্য প্রথমে গোটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৮১৩ খৃঃ তিনি প্রুশিয়ার সৈন্যদলে যোগ দেন। সৈন্যদলের নিয়মানুবর্তিতা, কষ্ট সহিষ্ণুতা, দলবদ্ধ হয়ে কাজ করা প্রভৃতি থেকে তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ১৮১৬ খৃঃ তিনি কলীহাউ গ্রামে The Universal German Institute of Education নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ভবিষ্যৎ kinder-garten শিক্ষাপদ্ধতির প্রস্তুতিপর্ব এখান থেকেই সুরু হয়। এখানে তাঁর শিক্ষার লক্ষ্য হয় শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তির সামঞ্জস্য পূর্ণ বিকাশ। এই আত্মবিকাশ (Self Development) হবে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। শিক্ষার্থীরা এখানে বাগানে কাজ করত, নানা রকম জিনিষ তৈরী করত—কাজের মধ্য দিয়েই স্বাধীন ভাবে তাদের অন্তর্নিহিত শক্তি প্রকাশ পেত। বাস্তব জগতকে চেনা আর সেই সাথে কল্পনা শক্তিকে উদ্দীপ্ত করবার জন্য নানা কাজ ও কাহিনীর অবতারণা করা হত। দশ বছর এখানে কাজ করবার পর তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, যে সব নতুন পদ্ধতির এখানে প্রয়োগ করেন তা লিপিবদ্ধ করে তিনি The Education of Man নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

এরপর তাঁর কয়েকজন বন্ধু তাঁর উদ্ভাবিত নতুন শিক্ষাপদ্ধতিকে প্রচারের জন্ত তাঁকে সুইজারল্যাণ্ড নিয়ে যান। এখানে যাজকসম্প্রদায় তাঁর বিরোধিতা করলেও সুইস-সরকার তাঁর শিক্ষানীতি প্রবর্তনে আগ্রহ দেখান। ফ্রয়েবেল বার্গডর্ফে একটি অনাথ আশ্রম ও একটি শিক্ষকশিক্ষণ-কেন্দ্রের ভার গ্রহণ করেন। দীর্ঘ দশ বছর কাল তিনি এখানে গবেষণা করেন। এই দীর্ঘ সাধনার ফলে তাঁর শিক্ষানীতি একটি পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করে। এখানে কাজ করতে করতে তিনি শিক্ষার্থী জীবনের ক্রমবিকাশের বিভিন্নস্তর ও স্তরভেদে আত্মবিকাশের উপযোগী কতকগুলি খেলা ও কাজ আবিষ্কার করেন। তিনি উপলব্ধি করেন শিশুকে উপযুক্ত রূপে গড়ে তুলতে হলে তার শিক্ষা আরম্ভ হওয়া উচিত তিন বছর বয়স থেকে। শিশুর জন্ত সার্থক শিক্ষা-ব্যবস্থা করতে হলে মাতার সাহায্য অপরিহার্য। মায়ের কাছ থেকে যে শিক্ষা সে পাবে তা শিশুর জীবনে অক্ষয় সম্পদ হয়ে থাকবে।

ফ্রয়েবেল তাঁর পরিণত জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে ১৮৩৭ খৃঃ ব্ল্যাকেন বুর্গ গ্রামে তিন থেকে সাত বছরের ছেলেদের জন্য একটি শিশুবিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৩৯ খৃঃ তাঁর রচিত এই শিশু-উদ্যানটির নাম দেন কিণ্ডার-গার্টেন। এই সার্থক নামটি বিশ্বের শিশুশিক্ষার ইতিহাসে এক নতুন যুগের সৃষ্টি করেছে। বাগানের ছোট ছোট চারাগাছগুলি যেমন মালীর সযত্ন তত্ত্বাবধানে ধীরে ধীরে বড় হয়ে একদিন ফুলে ফলে বিকশিত হয়ে ওঠে তেমনি শিশু-উদ্যানের শিশুরা সযত্ন-পালিত ও বর্দ্ধিত হয়ে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করতে থাকে। খেলা, মনের মত কাজ ও গানের মধ্য দিয়ে এক আনন্দময় পরিবেশ রচিত হয় শিশু-উদ্যানের শিশুদের জন্ত। সুইজারল্যাণ্ড থাকাকালীন ফ্রয়েবেল যে সব গান ও খেলা সৃষ্টি করেছিলেন তার সাথে শিশুর বিকাশের স্তর অনুসারে আরও গান ও খেলার সৃষ্টি করেন। উপযুক্ত শিক্ষক গড়ে তোলবার জন্য তিনি ব্ল্যাকেন বুর্গে একটি শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতি ধীরে ধীরে জার্মাণীর বাইরেও জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ফ্রয়েবেলের শিক্ষাদর্শ ও নীতি ছিল গণতান্ত্রিক, জার্মাণীর শাসক ও যাজক সম্প্রদায় এই শিক্ষাপদ্ধতিকে সুনজরে দেখত না। ১৮৫১ খৃঃ প্রুশিয়ার সরকার এক হুকুম নামায় প্রুশিয়ার সমস্ত কিণ্ডারগার্টেন বন্ধ করে দেন। শেষ বয়সে এই মর্মান্তিক আঘাত সহ্যকরতে না পেরে ১৮৫২ খৃঃ তিনি মারা যান।

ফ্রয়েবেল যখন তাঁর শিক্ষাদর্শ নিয়ে সাধনায় রত তখন ইউরোপে ভাববাদী-

দর্শন বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিল। ফ্রয়েবেল এই ভাববাদী-দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। শিশু-উদ্যানের রচনাকারী বলে ফ্রয়েবেল খ্যাত হলেও তার কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতির পশ্চাতে একটা দার্শনিক তত্ত্ব আছে। ছেলেবেলায় প্রকৃতির উদার ক্রীড়াক্ষেত্রে একটি শিশু যে অনুভূতি লাভ করেছিল সেই অনুভূতিই পরিণত বয়সে তার শিক্ষাদর্শকে প্রভাবিত করে। সমগ্র সৃষ্টির মাঝেই তিনি এক ঐশী-শক্তির অনন্ত প্রকাশকে প্রত্যক্ষ করেছেন। যে শক্তি প্রকৃতির মধ্যে এক রূপে প্রকাশিত সেই শক্তিই মানুষের মধ্যে অন্যভাবে প্রকাশিত। বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি এক অদৃশ্য ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ। শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই ঐক্যের সন্ধান। জগৎ ও জীব সম্পর্কে এই যে সমগ্র দৃষ্টি তা তাঁর শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যেও অনুসৃত হয়েছে। তিনি মনে করতেন সৃষ্টির মধ্যে কতকগুলি বিকাশের স্তর আছে, প্রত্যেক স্তরই অপরটির সাথে অবিচ্ছেদ্যরূপে যুক্ত। মানুষের মনের বিকাশের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। তাই শিক্ষাদান কাজে শিক্ষার্থীর মনের বিকাশের ধারাকে লক্ষ্য রেখে বিষয়গুলি স্থির করতে হবে। এই বিকাশের ধারা স্বাভাবিক, বাইরের থেকে কোন বাধার আরোপ করলে, বা কিছু চাপিয়ে দিলে স্বাধীন বিকাশের পথ রুদ্ধ হবে। মানুষের জীবন বিকাশের ধারায় শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন—একটির পর একটি স্তর পার হয়ে যায়, এগুলি পৃথক করে দেখলে একটিকে অপরটি থেকে স্বতন্ত্র মনে করলে ভুল করা হবে। আত্মবিকাশের ক্ষেত্রে একটি স্তব পূর্ববর্তী স্তরের ্ ার নির্ভর-শীল। পরিপূর্ণতা লাভের পথে একটি স্তর থেকে অপর স্তরে উত্তরণই হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য। এই চলার পথে কোন ফাঁক নেই—সমগ্র পথটিই একটি ঐক্যের সূত্রে গাঁথা। সামগ্রীক-দৃষ্টি ও ঐক্যের উপর ফ্রয়েবেল বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

প্রতীকের ব্যবহার ফ্রয়েবেলের শিক্ষাপদ্ধতির আর একটি বৈশিষ্ট্য। বিশ্বব্যাপী যে ঐশী-শক্তির প্রকাশ প্রতীকের মধ্য দিয়ে তার স্বরূপ বা মর্মার্থ তুলে ধরেছেন শিশুর কাছে। শিশু তার সহজাত বুদ্ধি আর কল্পনার মধ্যদিয়ে প্রতীকের মর্মার্থ উপলব্ধি করে। শিশু যখন বারান্দার রেলিং গুলিকে ছাত্র কল্পনা করে পাঠশালা খুলে বসে তখন সে যে কল্পনার জগত সৃষ্টি করে সে প্রতীকেরই জগৎ। শিশুর বিকাশের স্তর অনুযায়ী প্রতীক স্বরূপ তিনি ছয়টি উপহার (Gift) ও অনেকগুলি হাতের কাজ আবিষ্কার করেছেন। প্রথম উপহার হচ্ছে নানা রঙের ছ'টি উলের বল বা গোলক। গোলক হচ্ছে ঐক্য

ও স্বাতন্ত্র্যের প্রতীক তাই একে ঈশ্বরের প্রতীকরূপে গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয় উপহার হচ্ছে, কাঠের গোলক, ঘনক (cube) ও সিলিণ্ডার। গোলক গতি শীল, কিউব স্থিতিশীল, গোলকের একটি তল, কিউবের ছয়টি কিন্তু দুইটি সমন্ব গুণ সম্পন্ন। সিলিণ্ডারটি গোলক ও ঘনকের সমন্বয়। দ্বিতীয় উপহারে একই সাথে ঐক্য ও বৈচিত্র্যের ধারণা সুস্পষ্ট হবে। তৃতীয় উপহারের একটি ঘনক আটটি ভাগে ভাগ করা—এদিয়ে চেয়ার, সিঁড়ি, দরজা প্রভৃতি তৈরী করা হয়। চতুর্থ উপহারও আটটি লম্বা প্রিসম (prism), পঞ্চম উপহার একসাথে ঘনক ও প্রিসম, ষষ্ঠ উপহার, এক থেকে পঞ্চম উপহার এক সাথে মিলিয়ে, এ সব জিনিষ দিয়ে নানা রকম জিনিষ তৈরী করা যায়, বিভিন্ন আকৃতি ও সংখ্যা গণনা শেখান হয়। সপ্তম থেকে নবম উপহার কাঠি, কাঠের টুকরা, দড়ি, আংটি ইত্যাদি, এ দিয়ে পরিধি, পরিমান ও আয়তন সম্পর্কে ধারণা জন্মায়। প্রতিটি উপহারের পিছনেই তিনি এক একটা দার্শনিক ব্যাখ্যা যুক্ত করেছেন। সেই রহস্যময় ব্যঞ্জনার দিকে না গিয়েও প্রত্যেকটি উপহারের শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে বাস্তব উপযোগিতাকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। ফ্রয়েবেলের শিক্ষাপদ্ধতিতে কাদা, বালি, কাঠের গুড়া প্রভৃতি দিয়ে নানা জিনিষ তৈরী করতে শেখান হয়। এতে সৃজনী শক্তির বিকাশ, আত্ম-বিশ্বাস, হস্ত সঞ্চালনের দক্ষতা প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়। নানা জিনিষ সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি হয়। পেষ্টালৎসীই প্রথম হাতের কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার প্রবর্তন করেন—ফ্রয়েবেল কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে ছবি আঁকা ও হাতের কাজ দুইয়ের উপরই বিশেষ জোর দেন।

কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে প্রকৃতিপাঠের ব্যবস্থা আছে। শিশুরা বাগানে কাজ করে ছোট ছোট ফুলের গাছ পর্যবেক্ষনের মধ্য দিয়ে নানা জ্ঞান লাভ করে। পশুপাখীর জীবন যাত্রা লক্ষ্য করেও শিক্ষা দেওয়া হয়।

কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষপদ্ধতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে শিশুদের মন মাতানো ছড়া ও গান। খেলা আর গানকে তিনি তাঁর শিক্ষায় অত্যন্ত উচ্চ স্থান দিয়েছেন। খেলার আনন্দের মধ্য দিয়ে শিশু ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে—খেলার আনন্দের মধ্য দিয়েই শিশু কর্মের প্রেরণা পায়। ফ্রয়েবেল বলেছেন—"Play is the highest achievement of child development at this stage, since it is spontaneous expression according to the necessity of its own natute of the childs inner being."

ছেলেদের গানের মধ্যে ৭টি মায়ের গান ও ৫০টি খেলার গান। গানগুলির সাথে রয়েছে নানা বর্ণের ছবি আর নাচ। গানের সাথে নানা রকম নাচের মধ্য দিয়ে শিশুদের অঙ্গসঞ্চালন হয়। এ ছাড়া গানের সাথে মার্চের শিক্ষা দেওয়া হয়, কাজের সাথে সাথে গানের ব্যবস্থাও আছে। গান ও খেলাগুলি শিশুর বিকাশের স্তর অনুযায়ী করা হয়েছে।

ফ্রয়েবেলের শিক্ষাপদ্ধতিতে গল্পের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে। শিশুরা গল্প শুনতে ভালবাসে তাই গল্পের মধ্য দিয়ে যা শেখান হয় তা তারা আনন্দের সাথেই শেখে। এতে ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি পায়—। শিশুর কল্পনা শক্তিকে উদ্দীপ্ত করা হয়। দেহের জন্য যেমন খেলা, মনের খোরাক তেমনি গল্প। একটায় দেহের অপরটায় মনের তৃপ্তি।

ফ্রয়েবেলের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে কয়েকটি কথা বলা হয়। তাঁর উদ্ভাবিত প্রতীকের রহস্যময় ব্যাখ্যা ও ভাববাদী আধ্যাত্মিক দর্শনের সাথে শিক্ষা-নীতিকে জড়িয়ে ফেলায় অনেক সময় তাঁর শিক্ষাদর্শ দুর্বোধ্য বলে মনে হয়। তাঁর শিক্ষাপদ্ধতিতে লেখা ও পড়া একেবারে শেষ স্তরে স্থান পেয়েছে। লেখা ও পড়াকে যথোচিত গুরুত্ব তিনি শিশুর শিক্ষায় দেন নি। তাঁর বিরুদ্ধসমালোচনা সত্ত্বেও শিশু-উদ্যানের অভিনবত্ব শিক্ষায় এক নতুন যুগের সৃষ্টি করেছে। শিশু-শিক্ষা ব্যবস্থায় ফ্রয়েবেল প্রবর্তিত কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতির প্রভাব অনস্বীকার্য্য।

———

হারবার্ট স্পেন্সার (১৮২০—১৯০৩ খৃঃ)

উনবিংশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডে স্পেন্সার একজন বিশিষ্ট দার্শনিক। অসাধারণ প্রতিভার বলে তিনি সমসাময়িক কালে চিন্তাজগতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন; কিন্তু উনবিংশ শতকে তিনি দার্শনিক রূপে যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন বিংশ শতকে আজ তা অনেকটা ম্লান হয়ে গিয়েছে। তাঁর নিজের যুগ তাঁর প্রতিভার যে সম্মান দিয়েছিল তাঁর কতকগুলি ত্রুটীর জন্ম পরবর্তী যুগ তাঁকে আর সে সম্মান দেয়নি। স্পেন্সার দার্শনিকরূপে প্রধানতঃ পরিচিত হলেও শিক্ষাক্ষেত্রও তাঁর চিন্তায় সমৃদ্ধ হয়েছে। চিন্তাজগতে তিনি ছিলেন একান্তই নিঃসঙ্গ। চিন্তার ক্ষেত্রে এই নিঃসঙ্গতাই তাঁর শক্তি ও দুর্বলতার উৎস। অন্যান্য চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সাথে যেখানেই মতের অমিল হয়েছে সেখানেই তিনি তাঁদের প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়েছেন। এই পরমত অসহিষ্ণুতা তাঁর অন্যতম দুর্বলতা। তিনি ছিলেন স্বভাব-বিদ্রোহী, স্বাধীনচেতা, আত্মবিশ্বাসী ও নিজের মতামত সম্পর্কে অত্যন্ত গোঁড়া। স্পেন্সারের চেষ্টায়ই ইংল্যাণ্ডের শিক্ষানীতি বৈজ্ঞানিক প্রভাবে প্রভাবিত হয় ও সেখানে শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক ভাবে বিজ্ঞানচর্চা সুরু হয়। আধুনিক যুগে জীবনের সর্বক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার বিশ্লেষণের যে দাবী তা স্পেন্সারের চিন্তায়ই প্রথমই মুখর হয়ে উঠেছিল।

১৮২০ খৃঃ ডার্বি সহরে স্পেন্সার জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন শিক্ষক ও বিজ্ঞান বিষয়ে ছিল তাঁর বিশেষ অনুরাগ। বাল্যে পিতার কাছ থেকে স্পেন্সার জড়বিদ্যা ও রসায়নের মূল তত্ত্বগুলি সম্পর্কে শিক্ষালাভ করেন। তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্ম প্রেরিত হয়েছিলেন কিন্তু সেখানে প্রাচীন রীতিতে ল্যাটিন ও গ্রীক শিক্ষাকেই প্রাধান্য দেওয়া হত, বিজ্ঞান বিষয়ক চর্চা ও গবেষণার সুবিধা না থাকায় তিনি সেখানে শিক্ষাগ্রহণে অস্বীকার করেন ও নিজ অভিরুচিমত বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণায় রত থাকেন। এই সময় তিনি লক্ষ্য করেন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি পরস্পরের সাথে নিবিড় সম্বন্ধে যুক্ত। এই ধারণাকেই তিনি পরবর্তীকালে একটি সুসংহত রূপ দিয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করে সুসমন্বিত দর্শন (synthetic philosophy) রূপে দাঁড় করাতে যত্নবান হন।

১৮৩৭ খৃঃ তিনি তাঁর পিতার সহকারীরূপে শিক্ষকতায় যোগ দেন। একাজে তিনি বেশী দিন ছিলেন না। এর পর তিনি দশ বছর রেলের ইঞ্জিনীয়ারের কাজ করেন। একাজেও তিনি স্থির থাকতে পারেননি। এর পর তিনি লেখকের বৃত্তি গ্রহণ করেন ও বিখ্যাত 'ইকনমিষ্ট' পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৫৩ খৃঃ পর্যন্ত এখানে কাজ করবার পর তিনি স্বাধীনভাবে লেখায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর চিন্তারক্ষেত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন একটি দিক কমই আছে যেদিকে প্রসারিত হয়নি। এদিক থেকে তিনি ইংরেজ দার্শনিকদের মধ্যে অনন্যসাধারণ। তিনি নির্ভীক ভাবে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। তিনি ছিলেন শক্তিশালী সমালোচক কিন্তু তাঁর সমালোচনায় গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর অত্যন্ত অভাব দেখা যায়। তিনি এই শক্তিকে প্রধানতঃ পরের ছিদ্রানুসন্ধানেই নিয়োগ করেছেন। তাঁর বুদ্ধিবৃত্তির সাথে হৃদয়-বৃত্তি ও সহানুভূতির যোগ স্থাপন করতে পারেন নি বলেই তাঁর প্রতিভার একটা বিরাট অংশ অপচয়িত হয়েছে। S. J. Curtis ও M. E. A. Boultwood তাঁর সম্পর্কে বলেছেন—"Rarely in history of human-thought has such a high degree of intellectual power been exercised to so little lasting purpose (A short History of Educational Ideas)

শিক্ষাক্ষেত্রে স্পেন্সারের দান ১৮৫১ খৃঃ থেকে ১৮৫৯খৃঃ পর্যন্ত লেখা চারটি প্রবন্ধের মধ্যেই মূলতঃ সীমাবদ্ধ। ১৮৬০ খৃঃ এই প্রবন্ধ চতুষ্টয় Education Intellectual, Moral, Physical, নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। স্পেন্সার ছিলেন পূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। ব্যক্তির জীবনবিকাশে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ তিনি সর্বদা সন্দেহের চক্ষে দেখতেন। গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার অসারতার আলোচনার মধ্যদিয়েই তিনি তার শিক্ষা সম্পর্কীয় প্রবন্ধ সুরু করেন। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি আলোচনা করে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেন, শিক্ষা হচ্ছে পরিপূর্ণ জীবন যাপনের প্রস্তুতি (Preparation for complete livinig)। শিক্ষার সাধারণ সংজ্ঞা থেকে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণায় পৌছান যায় না। তাই তিনি জীবনের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ আত্মরক্ষণ (Self Preservation) মূলক কাজের বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে তার বক্তব্যকে পরিস্ফুট করতে চেষ্টা করেছেন। স্পেন্সার বলেন বিজ্ঞানের যে সব বিষয় আত্মরক্ষণ ও জীবনের সুষ্ঠু সংরক্ষণের সাথে সম্পর্কিত, পাঠ্যবিষয়ে তাকেই প্রাধান্য দিতে হবে।

তিনিজীবনের প্রয়োজন সাধনকেই শিক্ষার উদ্দেশ্য বলে নির্দেশ করেছেন। কোন বিষয় শিক্ষণীয় কোন বিষয়ের কি মূল্য তা প্রয়োজনের মাপকাঠিতে স্থির হবে। যা ব্যক্তির জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করতে পারে তাই শিক্ষা হিসাবে মূল্যবান। এদিক থেকে প্রয়োগবাদী-দর্শনের সাথে তাঁর মিল আছে। জীবনে কোন বিদ্যা কতটুকু প্রয়োজনে আসতে পারে তাই বিচার করে তিনি বিভিন্ন বিষয়ের আপেক্ষীকমূল্য স্থির করেছেন ও জীবনে তাদের মূল্যানুসারে কয়েকটি স্তরে ভাগ করেছেন। যে সমস্ত কাজ জীবন-রক্ষার (Self Preservation) প্রত্যক্ষভাবে সহায়ক তার মূল্য সর্বাধিক। তারপর তিনি স্থান দিয়েছেন যে সব কাজ জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহে গৌনভাবে সাহায্য করে। তৃতীয় হচ্ছে, সন্তান পালনের জন্য অত্যাবশ্যক কাজ সমূহ। চতুর্থ, ব্যক্তির সামাজিক সম্বন্ধ নির্ণয় ও রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় কাজ। অবসর বিনোদন ও আনন্দ বিধানের উপায় স্বরূপ সাহিত্য বিষয়ক পাঠকে তিনি পাঠক্রমের সর্বনিম্নে স্থান দিয়েছেন। শিক্ষার এই গুরুত্ব নির্ণয়ক স্তর-বিভাগ থেকে বিষয়-গুলিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে ভুল হবে—এগুলি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হয়েই শিক্ষাকে সার্থক-ফল-প্রদ করে তুলবে।

স্পেন্সার ছিলেন ইতিহাসের কঠোর সমালোচক। সে যুগের ইতিহাস ছিল রাজা-রাণীর কাহিনী আর রাজদরবারে ও রাজঅন্তঃপুরের ষড়যন্ত্রের বিবরণে পূর্ণ। এই জাতীয় ইতিহাস পাঠে সমাজের বিকাশ, সমাজের রীতিনীতি, দেশের অবস্থা সম্পর্কে কোন কিছু জানবার বা কোন নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে ধারণা জন্মাবার পক্ষে সহায়ক ছিল না। তাই এই জাতীয় ইতিহাস স্কুলের ছেলেদের পড়ানোর কোন সার্থকতাই নেই—স্পেন্সারের এই মত অনেকেই সমর্থন করেন। ইতিহাসের স্থলে এই জন্য তিনি বিবরণমূলক সমাজ-বিজ্ঞান (Descriptive sociology) পড়ানোর কথা বলেছেন। স্পেন্সারের পর থেকে দেশের সামাজিক ও শিল্পোন্নতির কাহিনী আধুনিক ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। স্পেন্সার মিলের মত চিন্তার-শৃঙ্খলা নির্দ্ধারণে বিষয়ের প্রভাবকে স্বীকার করতেন। এজন্য তিনি পাঠক্রম নির্দ্ধারণে বিজ্ঞান-বিষয় সমূহকে সাহিত্য ও কলা বিষয়ক বিষয় সমূহ অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

স্পেন্সার তার বৌদ্ধিক-শিক্ষা (Intellectual learning) প্রবন্ধে মুখস্থবৃত্তি ও বস্তুগত শিক্ষার অপব্যবহারের নিন্দা করেছেন। এই প্রবন্ধে

তিনি শিক্ষাপদ্ধতির সুপরিচিত নীতি (Maxims of Education) সমূহ গঠন করে শিক্ষাপদ্ধতিতে তার ব্যবহারের কথা বলেন। বহু আলোচিত তাঁর শিক্ষানীতি গুলিতে শিক্ষার্থীর শিক্ষাপদ্ধতিতে কি রীতি অনুসৃত হবে সে সম্পর্কে কতগুলি নিয়মকে মেনে চলতে বলেছেন—(১) সহজ থেকে জটিলের দিকে যাওয়া (Proceed from simple to comlplex) (২) অনির্দিষ্ট থেকে নির্দিষ্টের দিকে যাওয়া (from indefinite to definite) (৩) মূর্ত হতে বিমূর্তের দিকে যাওয়া (from concrete to abstract) (৪) শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা ও ধারা মানুষের জীবনধারার ঐতিহাসিক বিকাশের ধারা অনুসারী হওয়া (Racial Recapitulation)। (৫) অভিজ্ঞতার দিক থেকে যুক্তির দিকে যাওয়া (from empirical to rational) (৬) শিক্ষায় শিক্ষার্থীর আত্মবিকাশের প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করা। শিক্ষাসম্পর্কীয় এই নীতি সমূহ শিক্ষাপদ্ধতিবিজ্ঞানকে যথেষ্ট প্রগতিশীল করেছে, আবার ঠিক আক্ষরিক ভাবে এই নীতি সমূহের প্রয়োগ প্রচেষ্টা বিভ্রান্তির সৃষ্টিও করতে পারে। যদি সহজ থেকে জটিলের দিকে যাবার সাধারণ নীতিটি সম্পর্কে বিচার করা যায় তাহলে দেখি 'সহজ' কথাটি যে ভাবে আমরা বুঝি ঠিক সেই ভাবে শিক্ষার্থীর উপর প্রয়োগ করলে সর্বক্ষেত্রেই ঈপ্সিত ফল পাওয়া যাবে না। 'সহজ' কথাটি আপেক্ষিক (relative), একে শিক্ষার্থীর বয়স ও মানসিক বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। যা যুক্তির দিক থেকে সহজ বলে আমাদের মনে হয় মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে বিচার করে দেখা গিয়েছে তা সব সময় সহজ নয়। আমরা জানি একটি সম্পূর্ণ বাক্য শেখানোর আগে একটি একটি করে শব্দ শেখান যুক্তির দিক থেকে সঙ্গত। কিন্তু কার্যত দেখা গেছে একটি একটি করে শব্দ না শিখিয়ে ছোট ছোট বাক্য দিয়ে সুরু করলে ভাষাশেখান সহজ হয়। অর্থাৎ যুক্তি-নির্ভর হয়ে শিশু-মনোবিজ্ঞানের দিকে চোখ বুজে থাকলে সহজ-কঠিন বুঝতে ভুল হবে।

স্পেন্সার মনে করতেন জ্ঞান সঞ্চয় করলেই বিশেষ শক্তির অধিকারী হওয়া যায়। একথা তিনি বিচার করেননি যে জ্ঞানের ভাণ্ডার বৃদ্ধি হলেই হয় না—তার প্রয়োগ ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্জনের প্রয়োজন আরো বেশী। স্পেন্সার পূর্ণ বয়স্কের প্রয়োজনের দিক থেকে বিচার করে পাঠক্রমের বিভিন্ন বিষয়ের মূল্য নির্দ্ধারণ করেছেন—কিন্তু একথা বিচার করেননি, যা পরবর্তী জীবনে বয়স্কের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয় হতে পারে শিশুর কাছে তা অর্থহীন। কারণ যে স্তরে পৌঁছালে শিশু সেই জ্ঞানকে

আয়ত্ত করবে বা বুঝতে পারবে শিশু সে স্তরে পৌঁছাবার পূর্বেই তাকে তা শেখাবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র।

শিক্ষার বিজ্ঞানের দাবীকে মেনে নিয়ে তিনি ইংল্যাণ্ডের শিক্ষায় এক সুদূর প্রসারী পরিবর্তনের সূচনা করেন। দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানের যেটুকু সাধারণ জ্ঞান থাকা দরকার শিক্ষাক্রমে তার কোন ব্যবস্থা ছিল না। আর যেখানে উচ্চশিক্ষায় বিজ্ঞানের সূত্রগুলি শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল সেখানে তার কার্যকরী প্রয়োগ-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। যে যুগে বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, বিভিন্ন শিল্পে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগ হচ্ছে সেই সময় শিক্ষায় বিজ্ঞানের প্রতি অবহেলাকে তিনি দূর করতে চেয়েছিলেন। তাঁর লেখায় হিউরিসটিক (Heuristic) শিক্ষাপদ্ধতির সমর্থন পাওয়া যায়। শিশু নিজেই পর্যবেক্ষণ করবে, নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, তাকে খুব কম বলা হবে, যত বেশী সে নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার করতে পারে সে চেষ্টা করতে হবে—স্পেন্সার বিজ্ঞান শিক্ষার মধ্য দিয়ে তাই চেয়েছেন।

স্পেন্সার নৈতিক-শিক্ষা প্রবন্ধে শিক্ষায় প্রকৃতিবাদ মতাবলম্বীদের সমর্থন করেছেন। উপযোগবাদীদের (Utilitarian) মত তিনি বলেন, যে আচরণের সামগ্রিক ফলাফল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হিতকর সে আচরণই ভাল আচরণ। আর যে আচরণের ফলাফল অহিতকর সেই আচরণই মন্দ আচরণ। মানুষের আচরণে সুখ বা দুঃখ কি ফল লাভ হল তারই মাপ কাঠিতে সেই আচরণ ভাল কি মন্দ বিচার হবে।

স্পেন্সার নৈতিক-শিক্ষা বিষয়ে স্বাভাবিক শৃঙ্খলাকে শ্রেয়ঃ মনে করতেন। তিনি বলেন "Nature illustrates to us in simplest way the true theory and practice of moral discipline."

শাস্তি সম্পর্কেও তিনি প্রকৃতিবাদীদের মত বলছেন, অন্যায় কর্মের ফল শিশু স্বাভাবিকভাবেই লাভ করবে। যে ছেলে সবার সাথে যেতে চাইবে না সে সঙ্গীহীন হয়ে একা পড়ে থেকে তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে। যে ছেলে রোজ খেলনা ভাঙে তা থেকে সে বঞ্চিত হবে—এজন্য তাকে অন্য শাস্তি দিতে হবে না। অবশ্য এই স্বাভাবিক শাস্তির জন্য শিশুকে ছেড়ে দেওয়ার একটা সীমা আছে। তিন বছরের একটি শিশু যদি ধারাল ক্ষুর নিয়ে খেলতে থাকে তাহলে নিজের কৃতকর্মের ফল সে নিজে ভোগ করবে বলে ছেড়ে দেওয়া চলে না—এক্ষেত্রে শাসনের প্রয়োজন আছে। স্পেন্সার শাস্তির

প্রয়োজনীয়তাকে ব্যক্তির দিক থেকে বিচার করেছেন, সামাজিক প্রয়োজনের দিক থেকে বিচার করেন নি।

স্পেন্সারের শেষ দৈহিক-শিক্ষা প্রবন্ধটি বিশেষ মূল্যবান। সে সময় শিক্ষার্থীর পুষ্টির জন্য খাদ্য, খেলা, নিয়ন্ত্রিত ব্যায়াম ও বিশ্রাম এসব দিকে দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করা হত না। এ সম্পর্কে তাঁর লেখা পরবর্তী যুগে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। মুক্ত বায়ু, পুষ্টিকর খাদ্য, দৈহিক ব্যায়াম, যথাযোগ্য বস্ত্র এ সব যে শিক্ষার সাথে দরকার একথা তিনি জোরের সাথে বলেন। আর আজ এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সন্দেহ করবার কোন স্থান নেই।

স্পেন্সারের পর আমরা অনেকদূর এগিয়ে এসেছি তবু উনবিংশ শতকের ইংলণ্ডের প্রাচীনপন্থী শিক্ষাধারা ও শিক্ষাচিন্তায় তিনি এক বিরাট পরিবর্তনের দ্বার মুক্ত করেন। শিক্ষায় আধুনিক বিজ্ঞানের চর্চার প্রয়োজনীয়তাকে তিনিই ইংলণ্ডের জনসমক্ষে তুলে ধরেন ও তাঁরই চেষ্টায় সেখানে বিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত হয়। বিষয় নির্বাচনে গতানুগতিক প্রথার অনুবর্তন করা হত। তার প্রয়োজন বা মূল্যের বিচার করা হত না। শিক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ের আপেক্ষিক মূল্য স্থির করে তিনিই প্রথম জীবনে কোন বিদ্যার (বিষয়ের) কতটুকু গুরুত্ব দেওয়া সঙ্গত তা স্থির করে পাঠক্রম নির্ধারণ করেন। শিক্ষার সর্বক্ষেত্রেই এই পরিমাপ সম্ভব কি সঙ্গত নয় তবুও তাঁর শিক্ষাদর্শের এই দিকটি জীবনের প্রকৃত সমস্যা সমাধানে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নিয়েছে। তাঁর শিক্ষার লক্ষ্য "পরিপূর্ণ জীবনযাপনের প্রস্তুতি"র এই মতবাদকে আশ্রয় করেই তিনি প্রয়োজনের মাপকাঠিতে শিক্ষার মূল্যায়ণ করেছেন। তাঁর এই প্রয়োজনধর্মী শিক্ষার প্রতিধ্বনি আমরা Pragmatic দর্শনের মধ্যে শুনতে পাই। স্পেন্সারের এই আদর্শটিকে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী প্রসূত বলে সমালোচনা করা হয়, কারণ তিনি ব্যবহারিক জীবনের উপকরণগুলির উপর ও ব্যক্তির কল্যাণের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু আত্মরক্ষণমূলক (Self Preservation) বিষয়ের গুরুত্বকে কি আমরা বাস্তবক্ষেত্রে অস্বীকার করতে পারি—ব্যক্তির সংরক্ষণ কি সমাজ-সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় নয়। তাঁর আরেকটি ত্রুটি জ্ঞানার্জনের উপর অত্যধিক গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা উল্লেখ করেছি। তাঁর স্তরবিভাগ সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয় কিন্তু তিনিই শিক্ষায় জ্ঞানের যথাযথ মূল্য নির্ধারণ করে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তার স্থান নির্ধারণ করেছেন।

মেরিয়া মন্টেসরী (১৮৭০—১৯৫২ খৃঃ)

ফ্রয়েবেলের পর যে মহীয়সী মহিলা নব নব উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রকে আরো বিস্তৃত করেছেন তার নাম মন্টেসরী। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে যে পরিবর্তনের সূচনা হয় বিংশ শতাব্দীতে সে প্রচেষ্টা সার্থক রূপ লাভ করে। বহু শিক্ষাবিদ আধুনিক শিশু-শিক্ষার বুনিয়াদ গড়ে তোলবার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন। তাঁদের সবার দানেই আজকের শিক্ষা "শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা" রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই রূপায়নে মন্টেসরীর দান অবিস্মরণীয়। তিনি শিক্ষা-দার্শনিক ছিলেন না। চিকিৎসার ক্ষেত্র থেকে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে আসেন। ১৮৭০ খৃঃ ইতালীর চিরাভেলীতে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। রোম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, ডি, উপাধি লাভ করে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান-সম্মত মানসিক চিকিৎসালয়ের সহকারী চিকিৎসক নিযুক্ত হন। এখানে কিছুদিন অভিজ্ঞতা লাভের পর তাঁকে Orthoprenic স্কুলের পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এখানে পরিচালিকা রূপে তিনি স্বল্পবুদ্ধি ও বিকলাঙ্গ শিশুদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। তাদের শিক্ষার জন্য ফরাসী চিকিৎসক এডওয়ার্ড সেগুঁইন আবিষ্কৃত ও অনুসৃত পশ্চাৎপদদের জন্য শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করে ডাঃ মন্টেসরী বিশেষ ফল লাভ করেন। এখানে পশ্চাতপদ শিশুদের নিয়ে পরীক্ষা-নীরীক্ষা করতে করতে কয়েকটি নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন ও রোমের কয়েকটি বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করে আশাতীত ফল লাভ করেন। তখন তার মনে হয় স্বল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন পশ্চাতপদ শিশুদের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি আশাতীত সাফল্য লাভ করেছে, সুস্থ স্বাভাবিক শিশুদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারলে তা অধিকতর সাফল্য-মণ্ডিত হবে। এই সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর নবউদ্ভাবিত শিক্ষাপদ্ধতি এক নতুন ক্ষেত্রে প্রয়োগের সুযোগ এসে যায়। The Roman Association for Good Building নামক একটি প্রতিষ্ঠান বস্তির তিন থেকে সাত বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য ১৯০৪ খৃঃ Casadei Bambini বা Childrens House নামে শিশুনিবাস স্থাপন করে। বস্তি-সমাজ এই শিশুনিবাস পরিচালনার জন্য মন্টেসরীকে আহ্বান জানায়। এখানে তিনি চার বছর কাজ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর উদ্ভাবিত শিক্ষা প্রণালী "শিশু নিবাসের" শিক্ষার্থীদের উপর প্রয়োগ করে তিনি সাফল্য লাভ

করেন। এর পর তিনি তাঁর শিক্ষাপ্রণালী প্রচারের জন্য বই লেখেন। ধীরে ধীরে তাঁর অনুসৃত শিক্ষাপদ্ধতি বহু বিদ্যালয়ে অনুসৃত হতে থাকে। বর্তমান বিশ্বে শিশুশিক্ষার পদ্ধতিরূপে মণ্টেসরী-পদ্ধতি সর্বত্রই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। যে সব শিক্ষাপদ্ধতি শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে মণ্টেসরী প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতি তার মধ্যে অন্যতম।

রুশো পরবর্তী অন্যান্য বহু শিক্ষাবিদের মত মণ্টেসরী ও রুশোর আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। মণ্টেসরীর শিক্ষানীতিতে শিশুর ব্যক্তিত্ব, তার সাহসিক প্রবণতা, তার বিশেষ আগ্রহ, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞান আহরণের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নিয়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন শিক্ষা হবে শিশু-কেন্দ্রিক, প্রতিটি শিশুর একটি নিজস্ব সত্তা আছে, শিশুর শিক্ষা অগ্রসর হবে তার বিকাশের স্তর অনুসরণ করে। শ্রেণীগত শিক্ষায় শিশুকে আলাদা আলাদা করে দেখা সম্ভব নয়। তাই তিনি শ্রেণীশিক্ষা (Class teaching) অবৈজ্ঞানিক বলেছেন। তাঁর শিক্ষায় প্রতিটি শিশু একটি unit, শ্রেণীবদ্ধ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এখানে নেই। বিভিন্ন শিশুর বিকাশের গতি বিভিন্ন তাই পরিচালিকার কাজ হবে সেই বিকাশের গতি-প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করে তার শিক্ষা ব্যবস্থা করা। এজন্য শিক্ষাবিদ এডামস্ বলেছেন, "...that the knell of class-teaching has been rung. The question, who tolled the bell ?....the evidence seems to point to Dr. Montessori" (Modern Development in Educational Practice—Sir John Adams)

মণ্টেসরী-শিক্ষানীতির প্রথম কথাই হচ্ছে স্বাধীনতা, প্রতিটি শিশু নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী এককভাবে শিক্ষা গ্রহণ করবে। পুরস্কারের লোভ বা তিরস্কারের ভয় দেখিয়ে শিশুকে দিয়ে জোর করে কিছু করান অস্বাভাবিক। শিশুরা স্বাভাবিক ভাবেই সক্রিয়, শ্রেণী-শিক্ষার বন্ধনে বেঁধে রাখলে তাদের স্বাভাবিক বিকাশের পথই রুদ্ধ হবে। প্রাণচঞ্চল শিশুদের ক্লাসে আটকে রাখার অবস্থাকে তিনি "পিনে বদ্ধ সারি সারি প্রজাপতির" সাথে তুলনা করেছেন। স্বাধীনতা অর্থে তিনি উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দিতে বলেননি, ছেলেদের শৃঙ্খলমুক্তির কথাই বলেছেন। স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হবে স্বতঃস্ফূর্ত অন্তর্জাত শৃঙ্খলার (Internal or Free discipline) মধ্য দিয়ে।

মণ্টেসরী শিক্ষার মধ্য দিয়ে সমগ্র সত্তার সুসামঞ্জস্য পরিপূর্ণ বিকাশের কথাই ভেবেছেন। তাঁর শিক্ষাপদ্ধতিতে শিশুকে নিজের চেষ্টায় শিক্ষা

করবার সুযোগ দেওয়া হয়। শিখবার সাজ সরঞ্জাম তাকে দিলে শিশু নিজেই শিখবার চেষ্টা করবে। এজন্য তিনি কতকগুলি খেলনার উদ্ভাবন করেন। খেলনাগুলি এমন ভাবে তৈরী যদি শিশু কোন ভুল করে তাহলে নিজেই ভুল শুধরে নিতে পারবে। একে বলা হয় স্বয়ং-শিক্ষা (Auto eduction;)। শিশুর কাজে পরিচালিকা যতদূর সম্ভব কম হস্তক্ষেপ করবেন।

মণ্টেসরী-শিক্ষানিকেতনে শিক্ষিকা নেই আছে পরিচালিকা (Directress)। তিনি শাসন করবেন না সাহায্য করবেন। জননীর স্নেহ নিয়ে পরিচালিকা সর্বদা পাশে থাকবেন। পরিচালিকাকে শিশুর মনস্তত্ত্ব জানতে হবে। শিশুরা সেখানে নিজের আগ্রহে খেলবে, শিখবে, কোথাও কাজ করবে। পরিচালিকা তাদের সবার দিকে লক্ষ্য রাখবেন, উৎসাহ দেবেন প্রয়োজন হলে তাদের সাথে খেলায় মাতবেন, কোথাও ওদের কাজের সঙ্গী হবেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা শিশুরা মগ্ন থাকবে যার যার কাজে। এখানে কোন জোর নেই বা জবরদস্তি নেই, কোন নিপীড়ন নেই। ভয় দেখিয়ে বা লোভ দেখিয়ে কাজ করাবার চেষ্টা তিনি করবেন না। একক বা দলবদ্ধ ভাবে 'শিশু নিবাসের' শিশু-শিক্ষার্থীরা যে শৃঙ্খলা ও সুরুচির পরিচয় দেয় তা স্বাধীনতারই ফল। কোন শিশুর কাজে যদি অপরের স্বাধীনতার ব্যাঘাত জন্মায় তাহলে সেখানে পরিচালিকা হস্তক্ষেপ করেন।

মণ্টেসরী শিক্ষাপদ্ধতিতে শিশুর ইন্দ্রিয়-নিচয়ের শিক্ষার জন্য বিভিন্ন Didactic Apparatus পরিকল্পনা করেছেন। এতে আছে নানা আকারের নানা মাপের কাঠের ফলক ও কাঠের লাঠি, কাঠের সিলিণ্ডার, রঙীন পুতুল, ধাতুর ঘণ্টা, মঞ্চ, কাঠের সিঁড়ি, বিভিন্ন শব্দ উৎপাদনের জন্য বন্ধ কাঠের বাক্স, বড় বড় হরফে লেখা কাঠের রঙীন বর্ণমালা, কার্ডবোর্ডের বাক্সে কার্ডের উপর লেখা বিভিন্ন অঙ্ক ইত্যাদি। এসব উপকরণ দিয়ে ছেলেদের রঙ চেনা, স্পর্শ-শক্তি ও স্মরণ-শক্তির বিকাশ, বিভিন্ন আকৃতি ও আকার সম্পর্কে ধারণা, অক্ষর সম্পর্কে ধারণা, সংখ্যার প্রতীক দণ্ডের সাহায্যে ১ থেকে ১০ পর্যন্ত গণনা করতে শিক্ষা দেওয়া হয়।

শিশুরা বিদ্যালয়ে এসে প্রথমে তাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়। হাতমুখ ধোয়া, স্নান করা, পোষাক পরিচ্ছদ পরা তারপর ধীরে ধীরে ঘর পরিষ্কার, বাসনপত্র পরিষ্কার, খাবারের টেবিল সাজান সবই যাতে

তারা নিজেরা করতে পারে সেভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। শরীরচর্চার জন্ত বিভিন্ন প্রকার খেলা, গানের সাথের নাচ প্রভৃতি ব্যবস্থা করা হয়।

শিক্ষানিবাসের সাথে বাগানের ব্যবস্থা রাখা হয়। এখানে প্রকৃতি-পাঠের মাধ্যমে উদ্ভিদ সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান লাভ করে। এছাড়া পশু পালনের ব্যবস্থা করে পশুজীবনের প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের ব্যবস্থা করা হয়।

শিশুরা ছবি আঁকতে ভালবাসে। তাদের নানারকম রঙীন পেন্সিলে প্রথমে আঁকতে শেখান হয় পরে তুলি দিয়ে আঁকতে দেওয়া হয়।

মন্টেসরী পদ্ধতিতে লেখা ও পড়া একসাথে শেখান হয়। মোটা কাগজের অক্ষর কেটে শিরিষ কাগজ এঁটে দিয়ে তার উপর আঙ্গুল চালনা শিক্ষা দেওয়া হয়। আঙ্গুল চালনা করবার সময় শিক্ষকের সাথে সাথে শব্দটির বারবার উচ্চারণ করে, অক্ষরটির সাথে পরিচয় ঘটে। গণনা শিক্ষায় প্রথম টাকা-আনা-পয়সার সাহায্য গ্রহণ করা হয়। ১ থেকে ১০ ইঞ্চি দাগ দেওয়া কাঠির সাহায্যে গণনা লিখতে ও পড়তে শেখান হয়। শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে কিণ্ডারগার্টেন ও মন্টেসরী পদ্ধতি দুই যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। মন্টেসরী-শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে বহু ক্ষেত্রে ফ্রয়েবেলের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশে কিণ্ডারগার্টেন নামে পরিচিত শিশুবিদ্যালয়ে বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় মিশ্রপদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে। দুইটি শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে ঐক্য রয়েছে কিন্তু বৈষম্যও কম নয়।

মন্টেসরী পদ্ধতিতে শিশুদের ব্যক্তিগতভাবেও খেলার কাজের সুযোগ দেওয়া হয়। কিণ্ডারগার্টেন (কে, জি) ব্যবস্থায় দলগতভাবে কাজ করা হয়। কে, জি পদ্ধতিতে শিক্ষিকা শিক্ষা পরিচালনা করেন। মন্টেসরী ব্যবস্থায় পরিচালিকা শিশুর কাজের দিকে শুধু দৃষ্টি রাখেন। শিশু কোন উপহার (Gift) নিয়ে খেলবে কে, জি-তে তা শিক্ষিকা ঠিক করে দেন, খেলা ও কাজ নির্দিষ্ট সময় ধরে চলে। মন্টেসরী পদ্ধতিতে শিশু নিজের ইচ্ছামত খেলনা নিয়ে খেলা করে—খেলার বা কাজের কোন নির্দিষ্ট সময় নেই—শিশু যতক্ষণ খুশী খেলতে পারে। মন্টেসরী শিশুদের কাছে অধিক গল্প বা রূপকথা বলার বিরোধী। ফ্রয়েবেল মনে করতেন গল্পের মধ্য দিয়ে শিশুদের কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি পায়। ফ্রয়েবেলের Gift এর পিছনে একটা বিশেষ অর্থ রয়েছে কিন্তু মন্টেসরীর Didactic Apparatus এর পিছনে কোন দুর্জ্ঞেয় রহস্ত বা গূঢ় অর্থের কল্পনা করা হয় না। ফ্রয়েবেলের শিক্ষাব্যবস্থায় লেখা-পড়া ও বইয়ের ব্যবহারের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়নি। মন্টেসরী পদ্ধতিতে বইয়ের ব্যবহার ও লেখাপড়া শেখায় যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে শিশুকে স্থাপনের যে প্রচেষ্টা রুশোর সময় থেকে শুরু হয়েছিল বিংশ শতাব্দীতে সেই আন্দোলন সার্থকতা লাভ করে। শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা-আন্দোলনের সার্থকতায় মণ্টেসরীর দান অপরিসীম। শ্রেণী-শিক্ষার বিলোপ সাধন করে তিনি যে শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন করেন তা শিক্ষাক্ষেত্রে এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা করে। শিশুর বিকাশের জন্য সর্বপ্রকার স্বাধীনতা দেওয়া হলেও কয়েকটি ত্রুটি তার শিক্ষাপ্রণালীতে দেখা যায়। তিনি ইন্দ্রিয়-শিক্ষার উপর জোর দিয়েছেন কিন্তু কল্পনাশক্তির বিকাশ ও গঠনমূলক কাজের দিকে ততটা জোর দেননি। কয়েকটা নির্দিষ্ট শিক্ষা-উপকরণ নিয়ে শিক্ষাব্যবস্থা করায় শিশুর আত্মবিকাশ কিছুটা ব্যাহত হয়। ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্বেও মণ্টেসরী-পদ্ধতি শিক্ষার এক নতুন ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছে।

জন ডিউই (১৮৫৯—১৯৫২ খৃঃ)

বিংশ শতাব্দীর শিক্ষাধারা যে দু'জন শিক্ষাবিদ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে জন ডিউই তাঁদের অন্যতম। ডাঃ মন্টেসরী ও ডিউই দুজনেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করলেও শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রধানতঃ বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেই সীমাবদ্ধ। মন্টেসরী ছিলেন চিকিৎসা-বিজ্ঞানী তিনি মনস্তাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যে সব সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর প্রচেষ্টা শিক্ষাক্ষেত্রে তার প্রয়োগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ডিউই ছিলেন একাধারে দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ। আধুনিক শিক্ষার বিবর্তনে তাঁর অবদানকে বুঝতে হলে তাঁর দর্শনকে বুঝতে হবে। ডিউইর শিক্ষা সম্পর্কীয় অভিমত ও দর্শন ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। ১৮৫৯ খৃঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বার্লিনটন গ্রামে এক সাধারণ পিউরিটান পরিবারে জন ডিউই জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম বয়সে বিদ্যালয়ে তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় না। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে ভারমণ্ট বিদ্যালয়ে প্রবেশ করবার পর তাঁর বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। মাত্র উনিশ বছর বয়সে স্নাতক শ্রেণীর পাঠ শেষ করে পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বোচ্চ নম্বর পান। কিছুকাল বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পর তিনি গবেষণামূলক বিশ্ববিদ্যালয় হপকিন্সের দিকে আকৃষ্ট হন। এখানে তিনি খ্যাতনামা মনোবিজ্ঞানী ষ্টানলীহল ও প্রয়োগবাদী (Pragmatist) দার্শনিক চার্লস পিয়ার্সে'র সাথে পরিচিত হন। হপকিন্সের Ph. D ডিগ্রী নিয়ে সেখান থেকে তিনি মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক হয়ে যান। এখান থেকে মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয় যান। এর পর আবার ফিরে মিচিগান ও পরে চিকাগো, বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন।

চিকাগো থাকাকালীন ১৯০১ খৃঃ তিনি তাঁর স্ত্রীর সহায়তায় একটি স্কুল খোলেন। এই বিদ্যালয়ে স্বাধীনভাবে তিনি তাঁর শিক্ষানীতি নিয়ে পরীক্ষা সুরু করেন। তিনি স্কুলটির নাম দেন Laboratory School. বর্ত্তমানে এই বিদ্যালয় ডিউই স্কুল নামে খ্যাত। এই বিদ্যালয়টিই হচ্ছে আধুনিক যুগের প্রথম গবেষণামূলক বিদ্যালয়। ডিউই হলেন এই বিদ্যালয়ের পরিচালক (Director)। শিক্ষা সম্পর্কে ডিউই যে সব গবেষণা করেছিলেন ও নীতি-নির্দ্ধারণ করেছিলেন এখানে স্বাধীনভাবে তার পরীক্ষা সুরু করেন। নানা

বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে কাজ এগিয়ে যেতে থাকে। মাত্র ১৬ জন ছাত্র নিয়ে বিদ্যালয় সুরু হয়, সুপরিচালনার গুণে অল্পদিনের মধ্যে ছাত্র সংখ্যা হয় ১৫০ জন। এই সময়ে এলাফ্লাগ নামে এক মহিলা ডিউইর সাথে যোগ দেন। তিনি ছিলেন দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্না এক শিক্ষিকা। ডিউইর শিক্ষা-পদ্ধতির অভিনবত্বে আকৃষ্ট হয়ে তিনি এখানে আসেন ও দীর্ঘদিন অধ্যক্ষার কাজ করেন। এই বিদ্যালয়ের সাফল্যের জন্য ডিউইর স্ত্রীও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন এই বিদ্যালয়ের ভাষাশিক্ষা বিভাগের প্রধানা।

এই Laboratory School-এ ডিউই সমস্যামূলক শিক্ষাপদ্ধতির (Problem Method) প্রথম প্রয়োগ করেন। এই শিক্ষা-পদ্ধতিই তাঁর শিষ্যরা বিশেষ করে কিলপ্যাট্রিক পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জিত করে Project Method বা কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা-পদ্ধতিতে রূপ দেন। ডিউইর স্কুলে চার থেকে চৌদ্দ বছরের ছেলেরা নানারূপ কাজ ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষালাভ করে। পূর্বনির্দিষ্ট ধরা বাঁধা কোন শিক্ষাপদ্ধতি এখানে অনুসরণ করা হয় না, স্বতন্ত্রভাবে কোন বিষয় এখানে শিক্ষা দেওয়া হয় না। শিক্ষার্থীরা নানারূপ গঠনমূলক কাজ-কর্মের মধ্য দিয়ে শিক্ষালাভ করতে করতে তারা বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন করে। চিরাচরিত শিক্ষাপদ্ধতির দোষত্রুটিগুলি দূর করবার জন্য বৃহত্তর সমাজজীবনে প্রবেশ করে শিশুকে যে সব কাজ জানতে হবে—যেমন রান্না, ছুতারের কাজ, কাঠের কাজ প্রভৃতি কেন্দ্র করেই তিনি তাঁর নতুন শিক্ষা-পদ্ধতি গড়ে তোলেন। বিদ্যালয় এখানে বৃহৎ মানবসমাজেরই অংগ—সমাজের প্রতিচ্ছবি। শিক্ষক ও ছাত্রের পরস্পরের সহযোগিতায় শিক্ষা এখানে এগিয়ে চলে। শিক্ষা এখানে অনাগত জীবনের প্রস্তুতি। শুধু প্রস্তুতি নয়—শিক্ষাই জীবন। বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্ক আছে বলেই ছেলেরা এ শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহ বোধ করে। শিশুর জীবনে যে শিক্ষা কার্যকরী হবে সুস্থ সামাজিক জীবনের উপযোগী সুনাগরিক হয়ে উঠতে পারবে সেভাবেই এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। ব্যক্তির প্রয়োজন ও গোষ্ঠির প্রয়োজন ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উভয় দিকথেকেই মানুষকে গড়ে তোলাই হচ্ছে এ শিক্ষার আদর্শ।

এ প্রসঙ্গে ডিউইর শিক্ষাদর্শনের স্বরূপ ও তাৎপর্যকে জানবার প্রয়োজন আছে। তাঁর শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষানীতি অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। ডিউই বলে গেছেন শিক্ষা ও দর্শনকে আলাদা করে দেখা ভুল। বাল্যজীবন থেকে

পরিণত দার্শনিক মতবাদ গড়ে ওঠা পর্যন্ত ডিউই বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের সাথে পরিচিত হন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সে সব মতবাদ দ্বারা সাময়িক ভাবে প্রভাবিত হন। নিষ্ঠাবান পিউরিটান পরিবারে জন্মগ্রহণ ও সেই পরিবেশে বর্দ্ধিত হবার ফলে তিনি বাল্যে বাইবেলের সৃষ্টি-তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাকালে তিনি টি হাক্সলী ও ডারুইনের মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব ও ডারুইনের বিবর্তনবাদ পরস্পর বিরোধী। তারপর হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে মনোবিজ্ঞানী ষ্টানলীহল ও প্রয়োগবাদী দার্শনিক চার্লস পিয়ার্সের দ্বারা প্রভাবিত হন। এঁরা দু'জনেই ছিলেন বস্তুবাদী। এদের মতবাদ ডিউইর মনে গভীর রেখাপাত করে। এরপর ডিউইর পরিচয় হয় হেগেলীয় দার্শনিক মতবাদে বিশ্বাসী মরিসনের সাথে। হেগেল ছিলেন ভাববাদী দার্শনিক। ভাববাদীরা বলেন এ সৃষ্টির সব কিছু স্রষ্টার চিন্তার মধ্যে সম্পূর্ণ—এ জগতের সব কিছুই ঐশী শক্তির প্রকাশ। ভাববাদীরা সৃষ্টির পশ্চাতে দৈবীসত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। সেই একই বহুরূপে প্রকাশিত। জগতে নতুন কিছু ঘটতে পারে না—যা কিছু ঘটে তা সব কিছুই স্রষ্টার কল্পনায় বিধৃত।

হেগেলের প্রভাব বেশীদিন ডিউইর জীবনে স্থায়ী হয়নি। এই সময়ে তিনি উইলিয়াম জেমসের সাথে পরিচিত হন এবং তাঁরই প্রভাবে তিনি ভাববাদী দর্শনের বিরোধী প্রয়োগবাদী মতবাদ (Pragmatism) গ্রহণ করেন। ভাববাদীরা বলেন, সত্য চিরন্তন—অপরিবর্তনীয়—ধ্রুব। প্রয়োগবাদীরা বলেন পরিবর্তনশীল জগতে সত্য কখনও ধ্রুব বা সনাতন হতে পারে না। সত্য মানেই যুগ-সত্য। যুগে যুগে মানুষের সমাজের পরিবর্তন হয়েছে, এই পরিবর্তনের সাথে তার প্রয়োজনেরও রূপ বদলেছে। পুরান প্রয়োজনের পরিবর্তে নতুন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। দু'শ বছর আগে যে আদর্শের যে মূল্য ছিল, বর্তমানে পরিবর্তিত জগতে আজ তা মূলহীন—এক সময়ে তার মূল্য ছিল বলে কি তাকে আঁকড়ে থাকতে হবে। সত্যাসত্যের বিচার হবে প্রয়োজনের মাপকাঠিতে। যা সাফল্য আনবে তাই সত্য। প্রয়োজনের পরিবর্তনের সাথে সাথে সত্যেরও রূপান্তর হবে। প্রাচীন দার্শনিক মতবাদের ততদিনই মূল্য থাকবে যতদিন তা মানুষের জীবনের সমস্যা সমাধানের সহায়ক থাকবে। জেমসের এই দার্শনিক মতবাদ ডিউই গ্রহণ করেন। তার এই প্রয়োজন-সিদ্ধি ও কার্যসিদ্ধির মতবাদকে Instrumentalism বলা হয়—"Everything is provisional, nothing ultimate. Knowledge

is always a means, never an end in itself it is purely instrumental, hence the title of Deweys Philosophy Instrumentalism" (R. R. Rusk)

এই দর্শনের পটভূমিকায় ডিউই তার শিক্ষানীতি ও পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করেছেন। পরিবর্ত্তনশীল জগতে সত্য যেমন পরিবর্ত্তনশীল—গতিশীল জগতে শিক্ষাও তেমনি গতিশীল (Dynamic)। তিনি মনে করতেন সমাজের উন্নতি করতে হলে—মানব সমাজের কল্যাণ সাধন করতে হলে সর্ব প্রথম প্রয়োজন সুশিক্ষা। শিক্ষাকে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করে একদেশদর্শী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তিনি জীবনকে শিক্ষা থেকে পৃথক করে দেখেন নি। শিক্ষা হচ্ছে জীবনের প্রস্তুতি, না, আরো বেশী—শিক্ষাই জীবন। শিক্ষা ও জীবন তাঁর কাছে সমার্থবোধক শিক্ষাই জীবন, জীবনই শিক্ষা। তিনি বলেন "there is nothing to which education is subordinate save more education. The educational Process has no end beyond itself—it is its own end."

ডিউই স্বাভাবিক ভাবেই বিদ্যালয়কে সমাজ-জীবনের অঙ্গ বলে গ্রহণ করেছিলেন। ডিউই ব্যক্তির প্রয়োজনকে অস্বীকার করেন নি। মানুষে মানুষে গুণগত পার্থক্য থাকবেই, কিন্তু ব্যক্তিগত বিভিন্নতার (individual diffrence) জন্য শিক্ষায় প্রতিটি ব্যক্তির জন্য বিকাশের সুযোগ করে দিতে হবে, তেমনি শিক্ষার্থীর জীবনে সামাজিক দিকটাও দেখতে হবে। সমাজকে বাদদিয়ে ব্যক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে কোথায়? সমাজে জন্ম গ্রহণ করে সমাজের মধ্যেই ব্যক্তির জীবন পরিপূর্ণতা লাভ করবার সুযোগ পায়। শিশু সমাজ থেকে গ্রহণ করবে আবার সমাজকে তার যা দেবার আছে তাই দেবে। এই দেওয়া আর নেওয়ার মধ্যেই সমাজ ও ব্যক্তি এগিয়ে চলবে। যেহেতু শিক্ষা সমাজ-জীবনের অঙ্গ তাই শিক্ষার সাথে সমাজ-জীবনের অতীত অভিজ্ঞতা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এদিক থেকে হারবার্টের মত তিনিও অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন অভিজ্ঞতা লাভের কথা বলেছেন। তার মতে শিক্ষা হচ্ছে অভিজ্ঞতার দ্বারা অভিজ্ঞতার পুনর্গঠণ "Education is the procoss of remaking experience"

ডিউই শিক্ষাকে ভবিষ্যত জীবনের প্রস্তুতি বলে মনে করতেন না। শিশুর শিক্ষা তার বর্তমানের সাথেই জড়িত এ শুধু বাঁচবার ভবিষ্যত প্রস্তুতি নয়—বেঁচে থাকবার ক্রিয়াই হচ্ছে শিক্ষা "Education therefore is a process of living, not a prearpation for future living (Dewey)

যেহেতু শিক্ষা বর্তমানে জীবন ও সমাজের সাথে জড়িত তাই শিশুর শিক্ষার পরিবেশকে, তার বিত্তালয়কে আদর্শ সমাজের অনুরূপ করে সম্পূর্ণ ত্রুটি মুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। বিত্তালয় যদিও সমাজজীবনের অঙ্গ তবুও সমাজজীবনের যে জটিলতা ও কলুষতা শিশুকে বিভ্রান্ত করে তুলতে পারে বিত্তালয় যেন সমাজের সেরূপ প্রতিচ্ছবি না হয়। বিত্তালয়সমাজে শান্ত পরিচ্ছন্ন পরিবেশের সৃষ্টি করতে হবে, যেখানে শিশু যুথবদ্ধ জীবনের মধ্যদিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই ভালমন্দ বুঝতে শিখবে। তার নীতিবোধ জাগরণের জন্য অন্য কোন উপাদানের প্রয়োজন হবে না। বিত্তালয়-জীবনের বিচিত্র বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়েই তার নীতিবোধ জাগ্রত হবে।

শিক্ষায় শিক্ষকের স্থান সম্পর্কে ডিউই প্রাচীন ও আধুনিক কোন মতবাদই গ্রহণ করেন নি। প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতিতে দেখি শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যমনি হচ্ছেন শিক্ষক—শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষক-কেন্দ্রিক। তিনি যা শেখাবেন শিশু তাই শিখবে—এখানে তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। এ ব্যবস্থায় শিশুর প্রয়োজন, ক্ষমতা, আগ্রহ, রুচি প্রবণতা কিছুই বিচারের প্রয়োজনীয়তা নেই। পূর্ব-নির্ধারিত একটা শিক্ষাক্রম শিশুর উপর চাপিয়ে দেওয়া হত। শিক্ষক তার খুশীমত পদ্ধতি অনুসরণ করতেন এই ছিল প্রাচীন শিক্ষারীতি ও শিক্ষক।

আধুনিক কোন কোন শিক্ষাপদ্ধতিতে আবার শিক্ষককে নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক যদি দর্শকই থাকবে তাহলে অতীত অভিজ্ঞতার সাথে নতুন অভিজ্ঞতাকে যুক্ত করে নতুন জ্ঞানের ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করবে কে? শিক্ষকের কাজ হচ্ছে এই দু'ইকে অন্বিত করা। শিক্ষক বিত্তালয়ের গণতান্ত্রিক সমাজের বাইরে নয়—তিনিও সমাজের একজন সভ্য। গণতান্ত্রিক সমাজের সভ্যরূপে তিনিও বিত্তালয়ের কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবেন। শিশুর বিকাশকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার জন্য যে অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছেন, তা তিনি প্রয়োগ করবেন। তিনি তাঁর সমৃদ্ধতর অভিজ্ঞতা নিয়ে শিশুকে পথের সন্ধানে দেবেন। শিশুর কল্যাণে তাকে জীবনে প্রবেশ লাভ করবার পথ সুগম করে দিতে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতাকে নিয়োগ করবেন। এ জন্য যদি প্রয়োজন হয়ে তাকে শাসন করতে হবে। সমাজের কল্যাণ-বোধ দ্বারাই তিনি শিশুকে গড়ে তোলবার চেষ্টা করবেন। তাই শিক্ষা ব্যাপারে শিক্ষকের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ডিউই বলেছেন:—

"What concerns him, as teacher, is the way in which that subject matter may become a part of experience;

what there is in the child's present that is useable with reference to it, how such demands are to be used ; how his own knowledge of the subject matter may assist in interpreting the child's needs and doings, and determine the medium in which the child should be placed in order that his growth may be properly directed" (Dewey's 'The child and the curiculum,' as quoted in A Short History of Educational Ideas By S. J. Curtis and M.E.A Boult Wood)

ডিউই প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষা কোন পূর্বনির্দিষ্ট শিক্ষাক্রমকে অনুসরণ করে না। শিশুর মানসিক বিকাশের ধারা অনুসারে তার শিক্ষা এগিয়ে চলবে। শিক্ষার স্তর বিভাগ ডিউই গ্রহণ করেছেন। শিশুর জীবনের স্তর অনুসরণ করে ধাপে ধাপে শিক্ষা এগিয়ে চলবে। তিনি শিক্ষাকালকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন। প্রথম স্তরে পরিবেশ পরিচিতি। আট বছর পর্যন্ত এই স্তর চলবে। খেলাধুলা ও পরিবেশ পরিচিতির মধ্য দিয়ে সে শিক্ষা লাভ করবে। এই স্তরে কোন পাঠক্রম নেই—ঘর সাজানো, ঘর পরিষ্কার, রান্নার কাজ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সে সমাজচেতনা লাভ করবে।

দ্বিতীয় স্তর আট বছর থেকে বার বছর কাল পর্যন্ত স্থায়ী হবে। এই স্তরকে বলা হয়েছে মনোযোগের কাল। এই সময়ে তার কৌতূহল আর মনোযোগকে শিক্ষার কাজে লাগাতে হবে। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় নানা বিষয় তাকে শেখাতে হবে। কৌতূহল বশে নানারূপ সমস্যা সমাধান করতে সে শিখবে। এই সময়ে প্রাসঙ্গিক ভাবে সে কিছুটা ভূগোল অঙ্ক প্রভৃতি শিখবে।

তৃতীয় স্তরে শিক্ষার্থী যখন পৌছবে তখন তার মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটতে সুরু করেছে। তাই এই সময় তাকে সব কিছু শেখান হবে। তবে শিক্ষা পুঁথি-কেন্দ্রিক হবে না। শিশুর কাছে সমস্যার সৃষ্টি করা হবে, শিশু তার সমাধান খুঁজে বের করবে।

ডিউইর শিক্ষাপদ্ধতিকে জানতে হলে তার আগ্রহ-তত্ত্ব (Theory of Interest) ও সক্রিয়তা-তত্ত্ব (Theory of Activity) জানা দরকার। আমরা দেখেছি হারবার্ট শিক্ষায় শিক্ষার্থীর আগ্রহের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিক্ষনীয় বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ সৃষ্টি করতে না পারলে শিক্ষাপ্রচেষ্টা সার্থক হবার কোন সম্ভাবনা নেই। হারবার্ট

বলেন, শিশু যখন কোন নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় তখন সে তাকে পূর্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতার সাথে যুক্ত করে আয়ত্ত করতে চায়। শিশু নতুন জ্ঞান আহরণ করে পুরাতন জ্ঞানের সাথে সম্বন্ধ যুক্ত করে। পুরাতনের সাথে অন্বিত করে নতুনকে জানার আগ্রহের ফলেই সার্থক-শিক্ষা সম্ভব। এই যে নতুনকে জানার আগ্রহ এর পিছনে রয়েছে একটা প্রচেষ্টা বা উদ্যম (effort), এই প্রচেষ্টা স্বতঃউৎসারিত নয় এই প্রচেষ্টা চেষ্টাকৃত বা আরোপিত। যেমন শিক্ষক শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ সৃষ্টি করেন—এই আগ্রহ আরোপিত।

ডিউই শিক্ষায় আগ্রহ-তত্ত্বে বিশ্বাসী। তিনি হারবার্টের সমালোচনা করে বলেছেন, শিক্ষার্থীর আগ্রহ একটা যান্ত্রিক প্রক্রিয়া (mechanical process) নয়। শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ সৃষ্টি হয় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। আগ্রহ ও উদ্যমের মধ্যে কোন পার্থক্য তিনি খুঁজে পান নি। এর মধ্যে কোন বিরোধ নেই, আগ্রহ ও প্রচেষ্টাকে আলাদা করে পৃথক পৃথক দু'টি প্রক্রিয়া ভাবলে চলবে না। আগ্রহ যেখানে স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যম সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই আসবে। এর জন্য কোন পৃথক চেষ্টার প্রয়োজন নেই। কোনরূপ তাড়না বা বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্রচেষ্টা-সৃষ্টি সম্ভব নয়। আগ্রহ ও প্রচেষ্টা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

শিক্ষায় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্যকে স্বীকার করে নিয়েই শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিটি শিশুর বিকাশের পথ একই নির্দিষ্ট রূপ ধরে আসবে না। শিশুর আত্মবিকাশের প্রচেষ্টায় তার আগ্রহ অনুসারে শিক্ষা হবে বিভিন্নমুখী।

শিক্ষায় শিশুর কর্মপ্রবণতাকে কাজে লাগাবার প্রচেষ্টা ডিউইর বহু পূর্ব থেকেই আমরা দেখেছি। শিশুর মধ্যে যে স্বাভাবিক সৃজনী প্রতিভা রয়েছে তাই তার সক্রিয়তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। ফ্রয়েবেলের শিক্ষাপদ্ধতিতে এই সক্রিয়তা (Theory of Self Activity) একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। ডিউই তার শিক্ষাপদ্ধতিতে সক্রিয়তা-তত্ত্বকে যে ভাবে গ্রহণ করেছেন তার সাথে পূর্ববর্তী শিক্ষাবিদদের সক্রিয়তা-তত্ত্বের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ডিউইর পূর্বে সক্রিয়তা সম্পর্কে মনে করা হত, কর্মের মধ্য দিয়ে শিশুর দৈহিক পরিপুষ্টি সাধিত হয় ও মানসিক সম্ভাবনাগুলি বিকাশের সুযোগ পায়। ডিউই কর্মপ্রবণতাকে বা সক্রিয়তাকে আরো ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। মানুষের সমস্ত অভিজ্ঞতা ও নতুনজ্ঞান আহরণের পশ্চাতে এই সক্রিয়তাকে সক্রিয় রূপে দেখি। কোন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাই বিনা আয়াসে বিনা চেষ্টায় লাভ করি না। দৈনন্দিন কর্ম জীবনে আমরা

বহু সমস্যার সম্মুখীন হই। আমাদের স্বাভাবিক কর্মপ্রবণতাবশে কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। প্রতিকূল অবস্থা থেকে যে সমস্যার সৃষ্টি হয় তা দেখে মানুষ কর্ম-বিরত হয় না। সে সমস্যা সমাধানে তৎপর হয়ে ওঠে। নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট ও সমস্যা সমাধানের উপযোগী নানা তথ্যের সন্ধান করে। সম্ভাব্য সমাধানের পথ খুঁজে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায় এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই সে সত্যের সন্ধান লাভ করে। অর্থাৎ সত্যকে লাভ করতে হলে সক্রিয়তার মধ্য দিয়েই তা করতে হবে। সক্রিয়তা থেকে যে সমস্যার উদ্ভব হয় সক্রিয়তার মধ্য দিয়েই তার সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়।

ডিউইর শিক্ষাপদ্ধতি প্রধানতঃ তার সক্রিয়তা-তত্ত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই সক্রিয়তা থেকে যে সমস্যার উদ্ভব ও সমস্যা সমাধানের জন্য যে কর্ম-তৎপরতা তাকে যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে পাঁচটি স্তর খুঁজে পাই। এই স্তরগুলি হচ্ছে :—

১। সক্রিয়তা (Activity)—মানুষ তার স্বাভাবিক কর্মপ্রবণতাবশে সক্রিয় হয়ে উঠবে।

২। সমস্যা (Problem)—কর্মে নিযুক্ত হয়ে মানুষ প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হবে। নতুন সমস্যা এসে তার কর্ম প্রচেষ্টাকে বাধা দেবে।

৩। তথ্য (Data)—সমস্যা সমাধানের জন্য সে কর্ম তৎপর হয়ে সমাধানের উপযোগী বহুবিধ তথ্য সংগ্রহ করবে।

৪। প্রকল্প (Hypothesis)—সমস্যা সমাধানের উপযোগী সংগৃহীত তথ্য থেকে যে ধারণা হবে তার মধ্য থেকে একটি ধারণাকে সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায়রূপে গ্রহণ করবে।

৫। অভিক্রিয়া (Experiment)—সমস্যা সমাধানের গৃহীত সম্ভাব্য উপায়কে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে তার উপযোগিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

ডিউইর এই শিক্ষাপদ্ধতিকে বলা হয় Problem Method. ডিউইর শিক্ষায় গতানুগতিক শ্রেণী-শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। বাস্তব পরিবেশে প্রতিকূল সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে এই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ও নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে।

বিদ্যালয়ের পরীক্ষাকে ডিউই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করেছেন। পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়ে কতটা পারদর্শিতা অর্জন করেছে তার

পরিমাপ হবে না। পরীক্ষার মধ্যদিয়ে পরিমাপ করা হবে শিশু সমাজ-জীবনের কতকটা উপযোগী হয়েছে ও সমাজ থেকে তার কি সাহায্যের প্রয়োজন।

ডিউইর শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষাপদ্ধতির বহু সমালোচনা হয়েছে তবু বিংশ শতাব্দীতে আমরা শিক্ষার যে নব রূপায়ণ প্রত্যক্ষ করছি তাতে ডিউইর দান সর্বাধিক। গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষার কি রূপ হওয়া উচিত এ সম্পর্কে তিনি তাঁর সমস্ত লেখার মধ্য দিয়ে নতুন আলোক সম্পাত করেছেন। আদর্শশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও রূপ সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে তিনি গণতান্ত্রিক শিক্ষার আদর্শকে প্রচার করেছেন। শিক্ষায় ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য এই দুই পরস্পর বিরোধী মতবাদের সমন্বয় যে সম্ভব এবং আদর্শ গণ-তান্ত্রিক শিক্ষার অর্থই হচ্ছে এই দুইয়েব মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ডিউই একথা অত্যন্ত জোরের সাথে বলেছেন। আদর্শ গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তির চাহিদা ও সমাজের চাহিদার মধ্যে কোন বিরোধ নেই—এখানে একে অপরের পরিপূরক। আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাঠামোকে টিকিয়ে রাখতে হলে শিক্ষাব্যবস্থায়ও গণতান্ত্রিক আদর্শের অনুসরণ করে চলতে হবে ডিউইর এই মতবাদ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করেছে।

শিক্ষার সর্বব্যাপক রূপটিকে ডিউই যে ভাবে তুলে ধরেছেন এর পূর্বে শিক্ষাকে সে দৃষ্টি ভঙ্গী থেকে আর বিচার করা হয়নি। শিক্ষাই জীবন ও শিক্ষা জীবনের সমব্যাপী। শিক্ষা সম্পর্কে এ দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ নতুন।

বাস্তব দৃষ্টি ভঙ্গী থেকে তিনি তার শিক্ষাপদ্ধতিকে উপস্থাপন করেছেন। তার Problem Method থেকেই তার শিষ্য কিলপ্যাট্রিক Project Method প্রবর্তন করেন।

বিদ্যালয় যে সমাজের একটি অঙ্গ, সমাজেরই প্রতিচ্ছবি এই মতবাদ তিনিই প্রচার করেন। বিদ্যালয়কে সমাজধর্মী করে তোলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত হয়েই তিনি এই ভাবধারা প্রচার করেন। বিদ্যালয়কে সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখলে যে কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি হবে সেখানে শিক্ষার্থীরা নিশ্চয়ই বাস্তব শিক্ষা লাভ করতে পারবে না। বিদ্যালয় পরিবেশ যতটা স্বাভাবিক সমাজধর্মী ও স্বাভাবিক হবে।

আধুনিক শিক্ষায় ডিউইর প্রভাব ও দান সম্পর্কে Jerome Nathonson-এর ভাষায় বলা যায় "The Deweyan revolution in education, we see has already carried us a long Way."

শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ

আধুনিক শিক্ষা বলতে আমরা বুঝি ইউরোপীয় শিক্ষাধারা। আধুনিক শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষাকে আমরা ইউরোপ ও আমেরিকার শিক্ষাবিদদের দান বলেই জানি। ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতের দু'ই মহান পুরুষের অবিনশ্বর দানের সম্বন্ধে আমরা প্রায় অজ্ঞ। রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মাগান্ধী ভারতের শিক্ষায় যে নব যুগের সৃষ্টি করেছেন তা যে কোন যুগের যে কোন শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদের অমরকীর্তির সাথে তুলনীয়। কাব্য-সাহিত্যের এমন একটি দিক নেই যা রবীন্দ্র-প্রতিভার যাদু স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠেনি। রবীন্দ্র-প্রতিভা শুধু কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রেই সীমিত নয়। রবীন্দ্রনাথ ভাবুক-কবি-দার্শনিক, কিন্তু তিনি শুধু কল্পলোক বিহারী নন। কাব্য-সাহিত্যর ক্ষেত্র তাঁর স্বচ্ছন্দ বিহারের ভূমি—তবুও কর্মক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ আপন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে তিনি যে কর্মযজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন সেখানে আমরা পরিচয় পাই অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথের জীবনের অপর একটি দিকের। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সম্পর্কীয় চিন্তাধারা ও তার বাস্তব রূপায়ণের প্রচেষ্টা তাঁকে বর্তমানযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর শিক্ষাসংস্কার প্রচেষ্টা শুধু ভারতের নয় ভারতের বাইরের মনীষীদের চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাজগতে যে বাণী প্রচার করেছেন ও কর্মক্ষেত্রে তাকে যে ভাবে রূপায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তা শুধু ভারতের নয় সমগ্র বিশ্বমানবের কাছে নতুনবার্তা বহন করে এনেছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী তাই আজ মহামানবের মিলন ক্ষেত্র।

বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাব্যবস্থার সাথে এদেশের নাড়ীর কোন যোগ নেই। দেশের অধিকাংশ লোককে নিরক্ষর রেখে দেশের সামান্য অংশের জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সে ছিল, "একটা প্রকাণ্ড ছাঁচে ঢালা ব্যাপার। দেশের সমস্ত শিক্ষাবিধিকে সে এক ছাঁচে শক্ত করিয়া জমাইয়া দিবে ইহাই তাহার এক মাত্র চেষ্টা। পাছে দেশ আপনার স্বতন্ত্র প্রণালী আপনি উদ্ভাবিত করিতে চায় ইহাই তাহার সবচেয়ে ভয়ের বিষয়। দেশের মনঃপ্রকৃতিতে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া, সে আপনার আইন খাটাইবে, ইহাই তাহার মৎলব। সুতরাং

এই বৃহৎ বিভার-কল, কেরানীগিরির-কল হইয়া উঠিতেছে। মানুষ এখানে নোটের হুড়ি কুড়াইয়া ডিগ্রীর বস্তা বোঝাই করিয়া তুলিতেছে, কিন্তু তাহা জীবনের খাদ্য নহে। তাহার গৌরব কেবল বোঝাইয়ের গৌরব, তাহা প্রাণের গৌরব নহে।" যে শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর দেহ-মন-আত্মাকে নিয়মের নিগড়ে বেঁধে প্রয়োজন মত ছাঁচে ঢালাই করে নিতে চায় তিনি শিশুকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন সেই বিদ্যালয়ের কারাগার থেকে। এই মুক্তির পথ সন্ধান করতে তিনি দেশ-বিদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে পর্য্যবেক্ষণ করেছেন। গভীর ভাবে চিন্তা করেছেন প্রাচীন ভারতের তপোবনের শিক্ষাদর্শ সম্পর্কে। প্রচলিত গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতাকে সম্যক উপলব্ধি করেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষা-চিন্তাকে রূপ দিতে এগিয়ে এসেছিলেন। একথা সত্য, তিনি বিভিন্ন শিক্ষা-বিষয়ক প্রবন্ধে তাঁর শিক্ষা-চিন্তাকে যে ভাবে প্রকাশ করেছেন সে সমগ্র চিন্তাকে তিনি রূপ দিতে পারেননি তবু তাঁর আদর্শের সার্থক রূপায়ণ হয়েছে বিশ্বভারতীর মধ্যে। অত্যন্ত দুঃখের সাথে স্বীকার করতে হচ্ছে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নৃত্য-নাট্য নিয়ে আমরা যে পরিমাণ হৈ চৈ করি ঠিক সেই পরিমাণ অজ্ঞতা আমাদের তাঁর গভীর চিন্তামূলক শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধ সমূহ সম্পর্কে। তাঁর গভীর চিন্তামূলক শিক্ষা-প্রবন্ধগুলি নিয়ে যদি গবেষণা করা হত ও তার সার্থক রূপায়ণের ব্যবস্থা করা হত তাহলে শিশু-কেন্দ্রিক জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা আমরা বহু পূর্বেই গড়ে তুলতে পারতাম।

দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোরের অভিজ্ঞতা মোটেই মধুর নয়। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমী সর্বত্রই তিনি স্কুলের যে রূপ দেখেছেন, যে অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছেন তা অত্যন্ত বেদনার। তাই তিনি লিখেছেন, "ছেলেদের ভাললাগা-মন্দলাগা বলিয়া একটা খুব মস্ত জিনিষ আছে, বিদ্যালয় হইতে সে চিন্তা একেবারে নিঃশেষে নির্বাসিত।" যে শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের দেশে গড়ে উঠেছিল সেখানে শিক্ষার্থীর ভাল লাগা না লাগার প্রশ্ন কোনদিনই বিচার করে দেখা হয়নি। কোন রকমে ডিগ্রীলাভ করিয়ে দেবার ব্যবস্থাই ছিল বিদ্যায়তনগুলিতে। বাল্যজীবনে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন এই বিদ্যালয়গুলিতে সেই অভিজ্ঞতা থেকে একদিন তিনি লিখেছিলেন, "অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে আমার মনে এই কথাটি জেগে উঠেছিল, ছেলেদের মানুষ করে তোলবার জন্যে যে একটা যন্ত্র তৈরী হয়েছে, যার নাম ইস্কুল, সেটার ভিতর দিয়ে মানব-শক্তির শিক্ষার সম্পূর্ণতা হতেই পারে না।" যান্ত্রিক শিক্ষা-

ব্যবস্থা থেকে কি করে শিশুদের মুক্তি দেওয়া যায় এ নিয়ে তিনি প্রথম পরীক্ষা সুরু করেন শিলাইদহ থাকতে। পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও গ্রামের কয়েকটি ছেলেকে নিয়ে তিনি প্রথম শিক্ষকতা সুরু করেন। পুত্রকে তিনি প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার কাছে সঁপে দেননি। পল্লী প্রকৃতির উদার প্রাঙ্গনে প্রথম যে শিশুশিক্ষার আয়োজন করেছিলেন তাই পরিণত রূপ নেয় শান্তিনিকেতনে। ১৩০৮ সনের ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনে তিনি 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' নামে বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনে উপনিষদের বাণী গভীর ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। রবীন্দ্রনাথ আবাল্য উপনিষদের আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছেন। উপনিষদের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার প্রভাবেই তিনি প্রাচীন তপোবনের শিক্ষাদর্শের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সেই সাথে শৈশবের তিক্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি শিশুর ভাললাগা মন্দলাগা, তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। প্রচলিত প্রাণহীন কৃত্রিম শিক্ষার স্থানে তিনি শিশুর শিক্ষায় এক আনন্দময় স্বচ্ছন্দ জীবন-প্রবাহ বইয়ে দিতে চেয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে তিনি যে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন তা সম্পূর্ণরূপেই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা। তপোবনের সভ্যতায় বিশ্বাসী হয়েও তিনি পাশ্চাত্যের জড়-সভ্যতাকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখেন নি। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের চিন্তাধারার সমন্বয় তাঁর শিক্ষাদর্শের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তা একটা বিশেষ দেশ বা কালের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতার যে কথা বলেছেন তা জীবনের খণ্ডিত রূপ নয়। জীবনকে তিনি সমগ্রভাবে উপলব্ধির কথা বলেছেন—"বিশ্বকে বিশ্বাত্মা দ্বারা সহজে পরিপূর্ণ করিয়া দেখিতে শেখাই যথার্থ শেখা।" ভারত পরিপূর্ণতাকে চেয়েছিল, এই পরিপূর্ণতার সাথেই নিখিলের যোগ।

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষায় কৃত্রিমতাকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন। তাই শান্তিনিকেতনের শিক্ষার্থীদের সাথে তিনি বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরের নিবিড় যোগ-সাধন করতে চেয়েছিলেন—"প্রকৃতির ক্রোড়ে জন্মে যদি প্রকৃতির শিক্ষা থেকে দূরে সরে থাকি তাহলে শিক্ষা কখনও সার্থক হতে পারে না।" মুক্ত প্রকৃতির প্রাঙ্গনই যে শিশুদের নিজস্ব ক্রীড়াভূমি একথা তিনি বার বার বলেছেন। "বন আমাদের সজীব বাসস্থান........অতএব বিদ্যালয় যদি স্থাপন করতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জন মুক্ত-আকাশ ও উদার-প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই।"

মুক্ত প্রকৃতির সাথে শুধু নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করলেই চলবে না, কাজের মধ্য দিয়ে পড়ার পরিবেশকে আনন্দমধুর করে তুলতে হবে। বিদ্যালয়ের জমিতে ফসল ফলবে, গোশালায় গরু থাকবে। "গোপালনে ছাত্রদের যোগ দিতে হইবে। পাঠের বিশ্রামকালে তাহারা স্বহস্তে বাগান করিবে, গাছের গোড়া খুঁড়িবে, গাছে জল দিবে, বেড়া বাঁধিবে, এইভাবে তাহারা প্রকৃতির সাথে শুধু ভাবের সম্পর্ক নহে, কাজের সম্বন্ধও পাতাইতে থাকিবে।" তাই তিনি প্রাচীন তপোবনের আদর্শে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করেছিলেন। যেখানে বিলাস-ব্যসনহীন সরল আড়ম্বর জীবনে অভ্যস্ত তরুণ শিক্ষার্থীরা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে গড়ে তুলবে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ। পরস্পর মেলামেশার মধ্য দিয়েই জ্ঞানকে অনুভূতির সাহায্যে আত্মস্থ করা সম্ভব। তিনি আদর্শ-গুরুর কল্পনায়ও তপোবনের গুরুকেই দেখেছেন। "দেখেছি মনে মনে তপোবনের কেন্দ্রস্থলে গুরুকে। তিনি যন্ত্র নন, তিনি মানুষ, নিষ্ক্রিয়ভাবে মানুষ নন, সক্রিয়ভাবে ; কেননা মনুষ্যত্বের লক্ষ্য সাধনেই তিনি প্রবৃত্ত।....শিষ্যের জীবনে প্রেরণা পায় তাঁর অব্যবহিত-সঙ্গ থেকে।" গুরু শিষ্যের মধ্যে সহজ সম্পর্ককেই তিনি বিদ্যাদানের প্রধান মধ্যস্থ বলে জেনেছেন। শিষ্যেরা সন্তানের মত সেবা করে তার কাছ থেকে বিদ্যাগ্রহণ করতেন। "উভয়ের মধ্যে শুধু সামীপ্য নয়, আন্তরিক সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই নইলে দেনা-পাওনায় নাড়ীর যোগ থাকে না।"

শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষার উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নিজেকে প্রকাশ করবার ভাষা হিসেবে মাতৃভাষাই শ্রেষ্ঠ। বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিখতে শক্তির যে অপচয় হয় সে সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন বলেই তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রতি জোর দিয়েছেন। বার বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর নিজের শিক্ষাও ইংরেজী বর্জিত ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রকে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য তিনি নিজে বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয় নিয়ে বাংলা ভাষায় পুস্তকরচনায় ব্রতী হন। বহু প্রবন্ধে তিনি শিক্ষার মাধ্যমরূপে বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করবার কথা বলেছেন। তাঁরই চেষ্টার ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা অধিকতর মর্যাদা লাভ করে।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে সকল রকম কষ্ট স্বীকার করে, সকল প্রকার বড়োমানুষিকে তুচ্ছ করে দিয়ে এখানে গুরুগৃহে বাস করতে হবে একথা যেমন তিনি

বলেছেন, আবার শিক্ষা যাতে নীরস একঘেয়ে হয়ে না ওঠে সে জন্য সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। শিক্ষাকে আনন্দময় করে তোলবার জন্য, "ছেলেদের জন্য নানা রকম খেলা মনে মনে আবিষ্কার করেছি, একত্র হয়ে তাদের সাথে অভিনয় করেছি, তাদের জন্য নাটক রচনা করেছি।···কোন নিয়ম দ্বারা পিষ্ট না হয়, এই আমার অভিপ্রায় ছিল।···তারপর ক্রমশঃ নানা ঋতু-উৎসবের প্রচলন হয়েছে, আপনার অজ্ঞাতসারে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের আনন্দের যোগ এই উৎসবের সহযোগে গড়ে উঠবে এই আমার লক্ষ্য ছিল।"

সুকুমার-কলার চর্চার মধ্য দিয়ে মানুষের আনন্দময় স্বরূপের বিকাশ-লাভ ঘটে। মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন, এজন্য তিনি সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি সুচারু শিল্পের চর্চার ব্যবস্থা শান্তি-নিকেতনে করেছিলেন। সঙ্গীতভবন ও কলাভবন শান্তিনিকেতনের দু'টিপ্রধান শাখা। ভারতের চিত্রকলার পুনরুজ্জীবনে শান্তিনিকেতনের দান অপরিসীম।

বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসনের উপর আমরা আজকাল জোর দিচ্ছি। আজকের শিক্ষার্থীই ভবিষ্যত-ভারতে নাগরিক। নাগরিক জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের উপযুক্ত করে তুলতে তার শিক্ষা বিদ্যালয়-জীবনের মধ্য দিয়েই সুরু হওয়ার দরকার। যখন স্কুল-স্বায়ত্তশাসনের (School Self-Government) চিন্তা এদেশে কোথাও দেখা দেয়নি সেই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্যালয়ে ১৯০৫ খৃঃ স্কুল-স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করেন। সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীরূপে (Co-curricular activities) ভারতের বিদ্যালয়ে তিনিই স্কুল-স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থার প্রথম প্রবর্তক। এ-ছাড়া গান, নাচ, অভিনয়, নানা উৎসব প্রভৃতি যে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক এ-তত্ত্বে তিনি শুধু বিশ্বাসী ছিলেন না, তাঁর শিক্ষাব্যবস্থায় এগুলি বিশেষ স্থান জুড়ে আছে। প্রকৃতির সাথে নিবিড় যোগাযোগের কথা তিনি শুধু প্রচারই করেন নি, তিনি ছেলেদের পাঠ-কক্ষের বাইরে এনে আলো-বাতাসে ভরা মুক্ত প্রাঙ্গণে বৃক্ষের ছায়ায় শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন।

শান্তিনিকেতন শুধুমাত্র বিদ্যা চর্চারই ক্ষেত্র নয়, তিনি এখানে শিক্ষাকে কেবল জ্ঞানমুখী না রেখে বৃত্তিমুখীনও করেছেন। বিশ্বভারতীতে তিনি জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় সাধন করেছেন। বোলপুরের সন্নিকটে সুরুলে শ্রীনিকেতনে তিনি ব্যবহারিক শিক্ষার নানাবিধ ব্যবস্থা করেন। এখানে চাষবাস, গো-পালন, তাঁত বোনা, কাপড় ছাপানো, ট্যানিং, চামড়া ও মাটির নানারকম জিনিষ তৈরী হাতে কলমে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তার মধ্যে আমরা যে উচ্চাদর্শের সাক্ষাৎ পাই তার সম্পূর্ণ বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব হয়নি। তবু বিশ্বভারতীর মধ্যে যে শিক্ষাদর্শ রূপায়িত হতে চলেছে তা শুধু ভারতের নয় সমগ্র জগতের শিক্ষাবিদদের আকর্ষণের স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যে শিক্ষার কথা বলেছেন, সে শিক্ষা "ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়" তিনি বলেছেন, "বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ কেবল কারখানার দক্ষতা শিক্ষা নয়, স্কুল কলেজের পরীক্ষা পাশ করা নয়, আমাদের যথার্থ শিক্ষা পেতে হবে প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে" ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ও ব্যক্তি-সত্তার সাথে বিশ্ব-সত্তার মিলনকেই তিনি শিক্ষা বলে মনে করতেন। শুধু মাত্র জ্ঞান অর্জন বা জাতীয়তা বোধের বিকাশের কথা চিন্তা করেই তিনি শিক্ষা-সংস্কারে ব্রতী হন নি। মানবতা বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি শিক্ষা-পরিকল্পনা করেছিলেন। তাই দেশ বা জাতির সঙ্কীর্ণ গণ্ডি পার হয়ে বিশ্বভারতী আজ বিশ্ব-মানবের তীর্থ ভূমি।

মহাত্মা গান্ধীর বুনিয়াদী শিক্ষাদর্শ

ভারতীয় জাতীয়-আন্দোলনের নেতারা জাতীয় আন্দোলনের প্রথম যুগ থেকেই ইংরেজের শিক্ষানীতি ও ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার স্বরূপ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনে একদল ইংরেজী-শিক্ষিত কর্মচারী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়েছিল সে শিক্ষার সম্পর্কে জাতীয় নেতারা কোনদিন উচ্চ ধারণা পোষণ করেন নি। বিভিন্ন শিক্ষা-কমিশনের সুপারিশে শিক্ষাব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন সাধিত হলেও বিংশ শতাব্দীতে সরকারী শিক্ষাব্যবস্থা যে রূপ নেয় তা ছিল জাতীয় আদর্শ ও আশা আকাঙ্ক্ষার সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্ক বিরহিত। ১৯০৫ খৃঃ প্রথম যখন বাংলায় জাতীয়-আন্দোলন সুরু হয় সেই সাথে জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনও সুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ ও জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলবার জন্য দাবী উঠতে থাকে। বাংলায় ১৯০৬ খৃঃ জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ (National Council of Education) স্থাপিত হয়। এর পর যখন মহাত্মাজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন সুরু হয় তখন ছাত্রদের তিনি ইংরেজের তৈরী গোলামখানা ছেড়ে আসবার আহ্বান জানান। হাজার হাজার ছাত্র স্কুল কলেজ থেকে বেরিয়ে আসে। দেশের বিভিন্ন স্থানে National School স্থাপিত হয়। তারপর আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসার সাথে সাথে ছেলেরা আবার স্কুলে ফিরে যায়। কিন্তু প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা দেশের উপযোগী নয়, এ ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন, এ দাবী জাতীয় নেতারা বার বার করতে থাকেন। কিন্তু সর্বভারতীয় কোন জাতীয় শিক্ষাপরিকল্পনা নিয়ে তখনও কোন আন্দোলন সুরু করা হয় নি।

১৯৩৭ খৃঃ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা চালু হবার পর কংগ্রেস মন্ত্রী-মণ্ডলী বিভিন্ন প্রদেশের শাসন ভার গ্রহণ করেন। কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশ-সমূহে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনার প্রয়োজন দেখা দিল। কংগ্রেস প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল—দেশের শাসনভার গ্রহণ করলে মাদক বর্জন নীতি গ্রহণ করবে ও দেশে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। মাদক বর্জন কার্যে পরিণত করতে হলে রাজস্বের ক্ষতি, এদিকে প্রাথমিক শিক্ষা চালু করবার পরিকল্পনা গ্রহণ

করতে হলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলী যখন উভয় সংকটের সম্মুখীন তখন জাতীয় শিক্ষার বুনিয়াদ গড়ে তোলবার জন্য এগিয়ে এলেন জাতির-জনক মহাত্মা গান্ধী। গান্ধীজী শুধু দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির কথাই চিন্তা করেন নি, দেশের সামগ্রিক উন্নতি ছিল তাঁর চিন্তায়। তাই দরিদ্র দেশের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার কথা চিন্তা করে যখন কংগ্রেস নেতারা দিশাহারা সেই সময়ে প্রকাশিত হল 'হরিজন' পত্রিকায় গান্ধীজীর বৈপ্লবিক শিক্ষাপরিকল্পনা। তিনি প্রচলিত শিক্ষা সম্পর্কে বললেন, "বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ও পদ্ধতি কোন দিক থেকেই দেশের প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে উপযোগী নয়। ইংরেজীকে উচ্চ শিক্ষার বাহন করবার ফলে স্বল্প সংখ্যক উচ্চ শিক্ষিতের সাথে বিরাট সংখ্যক অশিক্ষিতের চিরদিনের জন্য একটা বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ছড়িয়ে পড়বার পথে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। ইংরেজীর উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করবার ফলে উচ্চ শিক্ষিত সম্প্রদায় মানসিক দিক থেকে নিজের দেশের সাথে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছে।...প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে অর্থব্যয় হচ্ছে তাকে অপব্যয় বলা চলে কারণ শিশুরা যা কিছু শিখল তা কিছুদিন বাদেই ভুলে যায়। এ শিক্ষা তাদের জীবনে কোন কাজেই আসে না।" জীবনের সাথে প্রয়োজনহীন শিক্ষার স্থানে তিনি এমন একটা শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন যা জীবনের বুনিয়াদকে দৃঢ় ভিত্তির উপর গড়ে তোলে। তিনি বললেন "প্রাথমিক শিক্ষা সাত বছরকাল ব্যাপী হবে। এই স্তরে ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীর উপযুক্ত সাধারণ শিক্ষা ও জীবনের উপযোগী বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এ শিক্ষায় ইংরেজীর কোন স্থান থাকবে না।"

"ছেলেমেয়েদের সামগ্রিক উন্নতির জন্য যে সব শিক্ষা দেওয়া হবে তা যতটা সম্ভব কোন একটা লাভজনক বৃত্তির মাধ্যমে দেওয়া হবে। বৃত্তি শিক্ষায় দুটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, শিক্ষার্থীর শিক্ষাকালীন বৃত্তির মধ্য দিয়ে ছাত্ররা নিজেদের বেতন দিতে পারবে, সাথে সাথে শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে বৃত্তিশিক্ষার মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পাবে।"

গান্ধীজীর পরিকল্পনা পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই প্রচলিত গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতি থেকে নতুনতর ভাবে তিনি শিক্ষা-পুনর্গঠন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—এ শিক্ষা শিল্পকেন্দ্রিক, এ ব্যবস্থায় একটি শিল্পকে কেন্দ্র করে অন্যান্য বিষয় শেখানোর ব্যবস্থা হবে। শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা, শিক্ষা হবে স্বনির্ভর (Self Supporting)। শিল্প থেকে যে

আয় হবে তাই দিয়ে শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ হবে। শিক্ষাকে গ্রামীণ অর্থ-নীতির সাথে যুক্ত করে গ্রাম্যজীবনের উপযোগী করে তুলতে হবে।

গ্রামীণ ভারতের উপযোগী করে গান্ধীজী যে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করেন তাকে বলা হয় 'বুনিয়াদী শিক্ষা' (Basic Education)। এই শিক্ষাই হবে ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের ভিত্তিভূমি, যার বুনিয়াদের উপর গড়ে উঠবে পূর্ণ বিকশিত সার্থক জীবনের ইমারত। গান্ধীজী বলেছেন, "Basic education is not a technique, it is a way of life. It aims at integrated all round development of personality of the individual and also building up of a Society on truth, justice and non-violence."

বুনিয়াদী শিক্ষা-দর্শনের গোড়ার কথা হচ্ছে, জীবনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবর্তে সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজের পুনর্গঠন। গান্ধীজীর পরিকল্পিত এই শিক্ষাসংগঠন একদিন শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হবে সেই আশা ও আশ্বাসের কথাই রয়েছে এই শিক্ষাব্যবস্থার মর্মমূলে। তাই গান্ধীজী বলেছেন,—

"My plan...... is thus conceived as the spear head of a social revolution. It will provide a healthy and normal basis of relationship between the city and the village, and lay the foundation of a juster social order in which there is no unnatural division between the haves and have not."

বুনিয়াদী শিক্ষাপরিকল্পনা সম্পর্কে জাকির হোসেন কমিটি বলেছেন,—

"The scheme envisages the idea of co-operative community, in which the motives of social service will dominate all the activities of children."

গান্ধীজী ভারতের সনাতন আদর্শে বিশ্বাসী। সত্য ও অহিংসার পথ তাঁর জীবনের পথ। তিনি যে সমাজ-বিপ্লব আনতে চেয়েছিলেন তা হিংসার পথ ধরে আসবে না। ভারতের গ্রামের পুনর্গঠন করতে চেয়েছিলেন গঠন-মূলক কাজের মধ্য দিয়ে। বুনিয়াদী শিক্ষাকেও তিনি সামগ্রিক জীবন গঠনের দিক থেকেই দেখেছেন। শান্তিপূর্ণ সামাজিক বিপ্লবের পরিকল্পনা তিনি বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্য দিয়েই করতে চেয়েছেন। কর্মের সাথে জ্ঞানের বন্ধন করে পুঁথিগত শিক্ষার সাথে বাস্তব জীবনের যে ব্যবধান তা তিনি বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ঘুচিয়েছেন।

গান্ধীজীর শিক্ষাপরিকল্পনা ভারতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে রচিত। বুনিয়াদী শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের দিকটাও উপেক্ষণীয় নয়। শিশুরা সর্বদাই কর্মচঞ্চল, নীরস পুঁথির মাধ্যমে যে শিক্ষা তা শিশুমন গ্রহণ করতে সংকোচিত হয়। এই নিষ্প্রাণ শিক্ষার মধ্যে শিশু তার স্বাভাবিক বিকাশের পথটি খুঁজে পায় না। এ শিক্ষা শিক্ষার্থীর সহজ কর্ম-প্রবণতাকে পঙ্গু করে দেয়। শিশুর মনে নতুন সৃষ্টির প্রেরণা যোগাতে পারে না। শিশুর মধ্যে যে স্বাভাবিক কর্মপ্রবণতা রয়েছে তার বিকাশের পথ যদি সুগম করতে হয় তাহলে তাকে কাজ দিতে হবে। শিশু চায় খেলা আর কাজ। বুনিয়াদী শিক্ষায় দশজনে মিলে কাজের মধ্য দিয়ে যে শিক্ষার আয়োজন করা হয়েছে তাতে শিশুর ইচ্ছা অনিচ্ছা ও ঔৎসুক্যের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাকর্মের যে স্বাধীনতা তার মধ্য দিয়ে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কাজের মধ্য দিয়ে শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশের সাথে ইন্দ্রিয়গুলি সুনিয়ন্ত্রিত হবে, বুদ্ধি মার্জিত হবে, স্বাধীনভাবে কাজ করবার সুযোগ পেয়ে শিশু আত্মশক্তিতে আস্থাবান হবে।

গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষায় লেখাপড়া শেখার সাথে ব্যক্তিগত-স্বাস্থ্য ও সামাজিক-স্বাস্থ্য এ দুই দিক সম্পর্কেই শিশু যাতে সচেতন হয় সে ব্যবস্থা করেছেন। বুনিয়াদী শিক্ষায় সাফাই ও স্বাস্থ্যরক্ষা মূল কাজের অন্যতম।

বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতিতে গতানুগতিক পুঁথিকেন্দ্রিক শিক্ষার পথকে ত্যাগ করে কর্মের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থাকে গ্রহণ করা হয়েছে। কোন একটি শিল্পকে কেন্দ্র করে শিল্পকাজের মাধ্যমে পাঠক্রম নির্দ্ধারিত বিষয় এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে অন্যান্য পাঠ্যবিষয়গুলিকে শিক্ষাদানের প্রণালী অনুবন্ধ-প্রণালী (correlation) নামে পরিচিত। শিল্প-শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিশুকে কারিগর বানানোই বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য নয়। এ শিক্ষায় শিশু যান্ত্রিকভাবে শিল্পটিকে আয়ত্ত করবে না, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষালাভ করে শিশু শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করবে। গান্ধীজী বলেছেন,—"Every handicraft has to be tought not merely mechanically as is done to-day but scientifically, that is to say, the child should learn the why and wherefore of every process." কোন একটি নির্দিষ্ট বৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষায় অন্য বিষয়গুলি সম্পর্কে জ্ঞান লাভের সাথে শিক্ষার্থী পরবর্তী জীবনের প্রয়োজনীয় বৃত্তিকেও এখানে

থেকেই শিখে নিতে পারে। বুনিয়াদী শিক্ষায় জাকির হোসেন কমিটির সুপারিশ অনুসারে নিম্ন তিনটি শিল্পকেই মূলশিল্প বলে গ্রহণ করা হয় :—

১। সূতা কাটা ও বয়নশিল্প।

২। কৃষি।

৩। চামড়ার কাজ, কাঠের কাজ, কার্ড-বোর্ডের কাজ বা স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী যে কোন একটি শিল্প।

সাধারণতঃ সূতা কাটা ও বয়ন বা কৃষিকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে বুনিয়াদী শিক্ষায় গ্রহণ করা হয়। দেখা গিয়েছে এই দু'টি শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষার ক্ষেত্রকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করা যায়। বয়নশিল্পের জন্য প্রয়োজন সূতা, সূতার জন্য দরকার তুলা, তুলা পেতে হলে চাষ করবার পূর্বে জানতে হবে মাটির গুণ, কোন মাটিতে কি জন্মায় সে সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার। চাষের পর গাছটি হলে গাছ, ফুল ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা জন্মায়, তার পর তুলা থেকে সূতা, তাকে রঙ করে নক্সা কেটে বস্ত্র বয়ন, তারপর উৎপাদিত মাল বিক্রি, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে জ্ঞান এমনি ভাবে একটি বিষয় থেকে অনুবন্ধ-প্রণালীর মাধ্যমে বিষয়ান্তরে নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিল্পের সাথে যুক্ত হয়ে একটির পর একটি বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থী বাস্তব ভাবে শিক্ষা লাভ করে। অনুবন্ধ-প্রণালীতে শিক্ষার ফলে বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়। জ্ঞানের একটি বিষয়ের সাথে অপরটি যুক্ত, জীবনের অখণ্ডতার সাথে জ্ঞানের এই যে অখণ্ডতা তা বুনিয়াদী শিক্ষায় বজায় রাখা হয়েছে।

অনুবন্ধ-প্রণালীতে শিক্ষা দেবার পথে একটি প্রধান অসুবিধা হচ্ছে যথাসম্ভব বৃত্তিকে কেন্দ্র করে শিক্ষাদেবার ফলে সাহিত্য, ইতিহাস ভূগোল, অঙ্ক ইত্যাদি অতি সামান্যভাবেই এই পদ্ধতিতে শেখান যায়। এগুলি বৃত্তির প্রয়োজনে অতি সামান্যভাবেই তার সাথে সংযুক্ত তাই এ-সম্পর্কে জ্ঞান সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই অসুবিধা সম্পর্কে সচেতন হয়ে বুনিয়াদী শিক্ষায় এইসব বিষয় সম্পর্কে ভিন্ন পাঠ্যসূচী রচিত হয়েছে। অনুবন্ধ-প্রণালীর মধ্য দিয়ে যেটুকু শেখান যায় তা থেকে অনেক বেশী তথ্যরাজি স্বতন্ত্র পাঠ্যসূচীতে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

বুনিয়াদী শিক্ষায় মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। অতিরিক্ত সর্বভারতীয় ভাষারূপে হিন্দীকে দেবনাগরী হরফে হিন্দুস্থানে গ্রহণ করা হয়েছে। মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণকরবার যৌক্তিকতায়

সন্দেহের অবকাশ নেই, কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষা থেকে ইংরাজীর নির্বাসনের যৌক্তিকতায় অনেকেই সংশয় প্রকাশ করেছেন। গান্ধীজী হয়ত ভবিষ্যত স্বাধীন-ভারতের কথাই চিন্তা করেছিলেন তাই বুনিয়াদী শিক্ষাক্রমে ইংরাজীর স্থান নেই।

গান্ধীজী যখন বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা করেন তখন তিনি ৭ থেকে ১৪ বছরের শিক্ষার্থীদের জন্য সাত বছরের শিক্ষার ব্যবস্থার কথা বলেন। তাঁর ধারণা ছিল সাত বছর পর্যন্ত ছেলে মেয়েরা বাপ-মায়ের কাছে লেখাপড়া শিখবে। চৌদ্দ বছরের পর শিক্ষা সম্পর্কে তখন কিছু বলা হয়নি। গান্ধীজী তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনার এই ত্রুটি দূর করবার জন্য ১৯৪৫ খৃঃ 'নঈ তালিম' পরিকল্পনা পেশ করেন। তিনি বলেন বুনিয়াদী শিক্ষা হবে জীবনের সর্ব-স্তরের শিক্ষা। নয়া তালিম বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণ মাত্র। এতে চারটি স্তরের শিক্ষার কথা বলা হয়েছে ;—

১। প্রাক-বুনিয়াদী শিক্ষা—৭ বছরের কমবয়সী ছেলেমেয়েদের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা।

২। বুনিয়াদী শিক্ষা—৭ থেকে ১৪ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা।

৩। উত্তর-বুনিয়াদী শিক্ষা—১৫ বছরের ঊর্ধ্ব বয়স্কদের শিক্ষা।

৪। প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা।

'নঈ তালিমের' প্রতি স্তরেই কর্মকেন্দ্রীক শিক্ষার ব্যবস্থা করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রাক্ বুনিয়াদী শিক্ষায় খেলাকে কাজের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ শিশুর কাছে খেলা আর কাজে কোন পার্থক্য নেই। হিন্দুস্থানী তালিম সঙ্ঘ বিভিন্ন স্তরের জন্য বিস্তৃত পরিকল্পনা র' না করেন। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ শ্রীমশরুওয়ালা মন্তব্য করেছেন, এই নয়া তালিমের মধ্য দিয়েই সমাজ-বিপ্লব সাধিত হবে।

গান্ধীজী পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষার বহু পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন হয়েছে। গান্ধীজীর প্রথম পরিকল্পনা প্রকাশ হবার পর পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক্রম রচনার জন্য ডাঃ জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। সেই কমিটি বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে দু'টি রিপোর্ট পেশ করেন। গান্ধীজী নিজে ১৯৪৫ খৃঃ "নঈ-তালিম" পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। সার্জেন্ট কমিশন যুদ্ধোত্তর ভারতের জন্য যে শিক্ষা পরিকল্পনা করেন সেখানে বুনিয়াদী শিক্ষাকে পরিমার্জিত করে গ্রহণ করবার সুপারিশ করা হয়েছে। তারপর মুদালিয়র

মিশন মাধ্যমিক শিক্ষাসংস্কার পরিকল্পনা পেশ করবার পর বুনিয়াদী শিক্ষাকে তার সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ করবার প্রয়াস চলেছে।

প্রাথমিক স্তরে বুনিয়াদী শিক্ষাকেই আমরা জাতীয়শিক্ষা-ব্যবস্থা বলে গ্রহণ করেছি। গান্ধীজী পরিকল্পিত শিক্ষাই আজ গ্রামীন-ভারতের শিক্ষার আদর্শ-ব্যবস্থা রূপে গৃহীত হয়েছে।

গান্ধীজী তাঁর শিক্ষাপরিকল্পনা পেশ করবার পর তাঁর শিক্ষাকে কার্যকরী-রূপ দেবার জন্য জাকির হোসেন কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করেন তার বহু সমালোচনা হয়েছে। সবচেয়ে বেশী সমালোচনা হয় শিক্ষাকে আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর (Self supporting) করে তোলবার প্রস্তাব সম্পর্কে। প্রথম থেকেই একে অবাস্তব বলা হয়। শিল্পের উৎপাদন থেকে স্কুলের ব্যয় বা শিক্ষকের বেতন সংগ্রহ করতে হলে স্কুল কারখানায় পরিণত হবে। সাধারণ-শিক্ষাকে বাদ দিয়ে শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধিই হবে বিদ্যালয়গুলির একমাত্র লক্ষ্য।

শিল্পের জন্য অত্যন্ত বেশী সময় নির্দ্ধারিত হয়। দিনের সাড়ে পাঁচঘণ্টার মধ্যে তিনঘণ্টা কুড়ি মিনিট শিল্পের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়। বাকী যে সময়টুকু পাওয়া যাবে তাতে অন্য বিষয়গুলি ভাল ভাবে পড়ানো সম্ভব নয়।

অনুবন্ধ প্রণালী বুনিয়াদীশিক্ষার প্রধান ভিত্তি। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে অনুবন্ধ প্রণালীকে প্রসারিত করা সম্ভব নয়। যে ক্ষেত্রে এই প্রণালীকে অনুসরণ করা সম্ভব নয় সেখানেও এই পদ্ধতি মাধ্যমে বিষয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করতে চেষ্টা করলে তা অবাস্তব ও কৃত্রিমতা দোষে দুষ্ট হবে।

বুনিয়াদী শিক্ষাপরিকল্পনায় শুধু মাত্র পল্লী অঞ্চলের কথাই বলা হয়েছে। সহরের পরিবেশ অনুযায়ী শিল্প নির্দ্ধারণের কথা বলা হয়নি।

বুনিয়াদী শিক্ষায় সাত বছরের পূর্বে শিক্ষার কি ব্যবস্থা হবে সে সম্পর্কে কোন কথা বলা হয়নি ও বুনিয়াদী শিক্ষাস্তর অতিক্রম করে শিক্ষার্থী কি করবে সে সম্পর্কেও পরিকল্পনায় কিছু বলা হয়নি।

প্রাক-স্বাধীনতা যুগের শিক্ষার ৭ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় ইংরেজীকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া যুক্তি সঙ্গত হয়নি।

বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি সফল রূপায়নের জন্য যে ধরণের উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রয়োজন সেইরূপ উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া অত্যন্ত কষ্ট সাধ্য। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে শিক্ষাপরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবার সম্ভবনা আছে বলে অনেক আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

পুঁথিগত শিক্ষার অভিশাপ থেকে শিশু শিক্ষার্থীকে মুক্তি দিয়ে জাতীয়-ভাবধারা-পুষ্ট ভারতীয় পরিবেশের উপযোগী যে শিক্ষাদর্শ গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষাপরিকল্পনার মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করেন তার উপযোগিতা আজ প্রশ্নাতীত রূপে প্রমাণিত হয়েছে। একটা অবাস্তব শিক্ষাব্যবস্থা যা বিদেশী শাসক-সম্প্রদায়ের স্বার্থে এদেশে প্রবর্তিত হয়েছিল সেই ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রয়োজনেই গরীব দেশের উপযোগী করে গান্ধীজী একটি বাস্তব শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করেন।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য সমূহকে স্বীকার করে নিয়ে শিল্প-কেন্দ্রিক বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছে। কর্মের মধ্য দিয়ে শিক্ষার ফলে শিশু-শিক্ষার্থী একদিকে পাঠের নীরস একঘেয়েমি থেকে রক্ষা পেয়েছে, অপরদিকে তার স্বাভাবিক সৃজনী প্রতিভা বিকাশের পথ খুঁজে পেয়েছে। পুঁথিকেন্দ্রিক পাঠে কায়িক শ্রমবিমুখতা ও শ্রম সম্পর্কে একটা অশ্রদ্ধার ভাব সৃষ্টি হয়। বাস্তবধর্মী শ্রমের মাধ্যমে শিক্ষায় শিক্ষার্থীর মনে শ্রমের মূল্যবোধ জন্মায় ও শ্রমের মর্যাদা দিতে শেখে। শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিল্পের উপস্থিতিতে শিক্ষার্থীরা ব্যবহারিক ভাবে শিক্ষা লাভ করবে। এতে তার বুদ্ধি ও কর্ম কুশলতায় দেহ ও মনের সমান বিকাশ লাভ ঘটবে। একটি শিল্পে কুশলী হয়ে উঠলে সেই শিল্পকেই বৃত্তিরূপে গ্রহণ করতে পারবে। সামাজিক পরিবেশে শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়ায় শিক্ষার্থী সমাজ-সচেতন হবে। শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে হওয়ায় বিদেশী ভাষার নিষ্পেষণে শিশু-মন পিষ্ট হবে না। বুনিয়াদীশিক্ষা পরিকল্পনা সম্পর্কে গান্ধীজি বলেছিলেন—The scheme is a revolution in the education of the village-children. সমগ্র ভারতের শিক্ষায় গান্ধীজি প্রদর্শিত পথ সত্যিই এক নব যুগের সূচনা করে।

(বর্তমান আলোচনা গান্ধীজির বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বুনিয়াদী শিক্ষার বিবর্তনের ইতিহাসের জন্য আমার 'আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা সমস্যার ইতিহাস' দেখুন)

তৃতীয় অধ্যায়

কয়েকটি আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি

বর্তমান শতাব্দীতে ইউরোপ ও আমেরিকায় শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে বহু পরীক্ষা-নীরিক্ষা চলছে। আধুনিক সমস্ত শিক্ষাপদ্ধতিই শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বৈষম্যকে স্বীকার করে প্রতিটি শিশুকে কি করে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ দেওয়া যায় সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পরিকল্পিত। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় প্রতি শিশুকে মনস্তাত্বিক দিক থেকে বিচার করে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ঔৎসুক্য, প্রবণতা, শক্তি প্রভৃতি সবদিক দেখে তার শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর কর্ম প্রচেষ্টাকে মর্যাদা দিয়ে তার মধ্য দিয়ে তার দৈহিক ও মানসিক বিকাশের পথকে প্রশস্ত করবার সুযোগ দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় প্রধানতঃ শিশুর ব্যক্তিত্বের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হলেও শিক্ষার সামাজিক দিককেও অস্বীকার করা হয় না। সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে সুসমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টাই আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য। বিভিন্ন শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রণালী অনুসৃত হলেও সমস্ত পদ্ধতির লক্ষ্যই সামাজিক চাহিদার দিকে দৃষ্টি রেখে ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ দান।

কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি ঃ—শিশুশিক্ষা সম্পর্কে রুশোর বৈপ্লবিক শিক্ষাদর্শ প্রচার হবার পর থেকেই ইউরোপে প্রাচীন গতানুগতিক শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তে মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলনের চেষ্টা চলতে থাকে। বিভিন্ন শিক্ষাবিদের সাধনার মধ্য দিয়ে কি করে শিক্ষায় শিক্ষার্থীর প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে সেই ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস আমরা পূর্ব অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

আমাদের পূর্ব-আলোচিত শিক্ষাপদ্ধতি সমূহে (কিণ্ডারগার্টেন, মণ্টেসরী, বুনিয়াদী, সমস্যা পদ্ধতি) আমরা দেখেছি বিভিন্ন নামে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি সমূহে বিভিন্ন প্রণালী অনুসৃত হলেও এসব মনোবিজ্ঞানসম্মত আধুনিক শিক্ষা-পরিকল্পনা ও পদ্ধতির মধ্যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ তারতম্য খুঁজে পাওয়া যায় না। আজকের শিক্ষার গোড়ার কথাই হচ্ছে, শিক্ষাকর্মে শিশুই হচ্ছে প্রধান অঙ্গ। শিক্ষায় শিশু আজ নীরব শ্রোতা বা নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্র নয়। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুর সক্রিয়তা ও সৃজনী শক্তিকেই ভিত্তি

করে নানারূপ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। পূর্ব নির্দিষ্ট একটা পাঠক্রম আর শিশুর উপর চাপিয়ে তার সমস্ত স্বাধীন কর্মপ্রচেষ্টাকে বিনিষ্ট করে, মন ও দেহের দিক থেকে তার সম্ভাবনার পথকে রুদ্ধ করে দেওয়া হয় না। শিশুর রুচি, চাহিদা, সামর্থ সব কিছু বিচার করেই শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। শিশুর শিক্ষা আজ আর পুঁথির বোঝায় ভারাক্রান্ত নয়। আজকের শিক্ষাবিদরা বুঝতে পেরেছেন গতানুগতিক পুঁথিকেন্দ্রিক নীরস শিক্ষাকে সরস করে তুলতে হলে এমন আয়োজন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থী মনে করবে শিক্ষার প্রতিটি কাজে তার একটি বিশিষ্ট অংশ রয়েছে। শিশু নিজের মূল্য সম্পর্কে সচেতন হলেই প্রতিটি কাজে অত্যন্ত আনন্দের সাথে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করবে। শিশুদের কাজের মূল্য যত বেশী দেওয়া যাবে ততই তাদের কাজের আগ্রহ বেড়ে যাবে। কাজের মধ্য দিয়ে শিশু তার আত্মউন্মেষণের (Self Expression) পথ খুঁজে পাবে। কাজের মধ্য দিয়েই শিশুর সৃজনাত্মক কর্মশক্তি পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ পাবে। শিশু কাজের মধ্য দিয়ে যা আয়ত্ত করবে তাই হবে তার সত্যিকারের শিক্ষা। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করলেই শিশুর জ্ঞানের ভিত্তি দৃঢ় হবে। মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষায় শিশুর ইন্দ্রিয়গুলির পরিচালনে যথাযথ শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মণ্টেসরী-পদ্ধতিতে ইন্দ্রিয়-শিক্ষার (Sense Training) বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। শারীরিক ও মানসিক দুই রকম কাজই শিক্ষায় ব্যবস্থা করতে হবে। দৈহিক কাজের মধ্য দিয়ে শিশু যাতে মনের দিক থেকে সমান ভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে শিক্ষায় সে আয়োজন রাখতে হবে। শিক্ষায় শিশুর আগ্রহ সৃষ্টি করতে তার স্বাভাবিক সক্রিয়তাকে ভিত্তি করে নানারূপ কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার আয়োজন করা হয়েছে। পূর্ব আলোচিত শিক্ষাপদ্ধতি ছাড়াও আমরা এ অধ্যায়ে যে সব শিক্ষাপদ্ধতির আলোচনা করব যার ভিত্তি কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা।

যুক্তিসিদ্ধ ও মনস্তত্ত্বনির্ভর শিক্ষাপদ্ধতি :—(Logical & Psychological Method)—শিক্ষায় আমাদের সামনে থাকে শিক্ষার্থী ও বিষয় বস্তু। শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিতে হলে জানতে হয় তার স্বরূপ—তার মনের গঠন। কি ভাবে কি উপায় অবলম্বন করলে কোন রীতিতে বিষয় বস্তুকে উপস্থাপন করলে শিক্ষার্থীর মন তাকে গ্রহণ করবে এসব জেনে আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি নির্দ্ধারণ করতে হয়। আবার উপস্থাপনের ক্ষেত্রে যে রীতি বা পদ্ধতিকে অনুসরণ করা হবে, যে ভাবে বিষয় বস্তুকে ভাগ করে

শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরা হবে তা যুক্তি-নির্ভর কিনা তা দেখতে হবে। শিক্ষাপদ্ধতি নির্দ্ধারণের পিছনে দু'টি প্রভাব সক্রিয়—একটি মনস্তত্ত্বের দিক অপরটি যুক্তির দিক। শিক্ষাদান একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। শিক্ষা দিতে গিয়ে খেয়াল খুশীমত চললে শিক্ষা সার্থক হবার কোন সম্ভবনা নেই। আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রণালীতে কতগুলি শিক্ষাসম্পর্কীয় মূলনীতি (Maxims of Education) মেনে নিয়ে আমাদের চলতে হয়। এই মূল-নীতিগুলি হয় যুক্তিসিদ্ধ (Logical) না হয় মনস্তত্ত্ব (Psychological) নির্ভর। শিক্ষাদানে আমরা যে কোন একটি পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকি।

যুক্তিনির্ভর শিক্ষার ক্ষেত্রে অবরোহ পদ্ধতি (Deductive), আরোহ পদ্ধতি (Inductive), বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ (Analytical and Synthetical Method) প্রভৃতি অনুসরণ করা হয়।

অবরোহী পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর সাধারণ সূত্র বা সত্য উপস্থাপন করে তারপর উদাহরণ দিয়ে বিশেষ ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করা হয় (from General to Particular)। মানুষ মরণশীল এই সাধারণ সত্য থেকে—রাম, শ্যাম মানুষ তাই মরণশীল এই বিশেষ সিদ্ধান্তে আসি।

আরোহী পদ্ধতিতে স্বতন্ত্র ভাবে কতগুলি উদাহরণ বিচার করে তার মধ্য থেকে সাধারণ গুণটি যার মাধ্যমে উদাহরণগুলি একই সূত্রে আবদ্ধ হয় সেই গুণটিকে বেছে নিয়ে সাধারণ সত্যে এসে (from Particular to General) পৌঁছান হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আগুনের সাথে ধোঁয়ার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক দেখেই সিদ্ধান্ত করি ধোঁয়ার অস্তিত্ব আগুনের উপর নির্ভরশীল।

বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে একটি বস্তুকে নিয়ে সেই বস্তুটি যে সব উপদানে গঠিত হয়েছে তা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভাগ করে তার প্রতিটি দিকের সাথে পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া হয়। যেমন দেহ-বিজ্ঞান পড়তে গিয়ে মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এক একটি দিক নিয়ে আলোচনা করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে একটি বস্তুর সমগ্র রূপটিকে একসাথে নিয়ে তারপর তার ভিন্ন ভিন্ন দিকগুলি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়। বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে অংশ থেকে পূর্ণের দিকে (from parts to whole) যাই আর সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে আমরা পূর্ণ থেকে অংশের (whole to parts) দিকে যাই।

শিক্ষা ব্যবস্থায় যুক্তিনির্ভর শিক্ষাপদ্ধতির গুরুত্বকে স্বীকার করেও আমাদের মনে রাখা দরকার যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্তই যে শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বদা সহজতম পথ এ ধারণা ঠিক নয়। যুক্তির বিচারে আমরা মনে করি

শিক্ষায় আমরা অংশ থেকে সমগ্রের দিক যাই সে পদ্ধতিটাই ঠিক। একটু একটু করে বিষয় বস্তুকে শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরলে তার পক্ষে বোঝবার সুবিধা হবে। কিন্তু সাহিত্য পাঠে দেখা গিয়েছে সমগ্র বিষয়টি শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থিত করে তারপর তার আলোচনা করলে সে যে ভাবে বিষয় বস্তুর রস গ্রহণ করতে পারে, খণ্ড খণ্ড করে বিষয়টি পরিবেশন করলে সে ভাবে উপভোগ করতে পারে না।

মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি শিশু মনের গঠন, শিশুর গ্রহণের ক্ষমতা, শিশু মনের গতি প্রকৃতি সব কিছু বিচার করে নির্দ্ধারিত হয়। মনের স্বাভাবিক গতিকে অনুসরণ না করে যদি শুধু মাত্র যুক্তি-নির্ভর করে শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে তোলা যায় তাহলে সেই শিক্ষাপদ্ধতির সার্থক হবার সম্ভবনা কম। কারণ দেখা গিয়েছে যুক্তির বিচারে আমাদের কাছে যা সহজ বলে মনে হয় শিশুর কাছে তা সহজ নাও হতে পারে। যেমন শিক্ষায় সহজ থেকে জটিলের দিকে যাওয়ার মূলনীতিকে আমরা মেনে চলি—এটা যুক্তির দিক থেকেও গ্রহণ যোগ্য। কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে ব্যাপারটা ঠিক তত সোজা নয়। সহজ (Simple) কথাটা আপেক্ষিক (relative), একে শিক্ষার্থীর মানসিক গঠনের পটভূমিকায় দেখতে হবে। যুক্তির বিচারে সম্পূর্ণ বাক্য শেখানোর আগে একটি একটি শব্দ শেখানো সঙ্গত। কিন্তু কার্যত দেখা গিয়েছে ছোট ছোট বাক্য দিয়ে সুরু করলে ভাষা শিক্ষা সুষ্ঠু ও সহজ হয়। সহজ বিচারটা সব সময় যুক্তি দিয়ে হবে না, হবে শিশুর গ্রহণ করবার ক্ষমতা দিয়ে।

মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষায় শিশুর মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলতে পারে বা তার মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে বা অপরিণত মস্তিষ্ক যা গ্রহণ করতে পারবে না এমন কিছু শিক্ষা দেওয়া হয় না। আমরা জানি মূর্ত (concrete) বস্তু শিশুর কাছে যত সহজবোধ্য ও মূর্ত বস্তুর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া যত সহজ, বিমূর্ত বস্তুর (abstraet) মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া ততটা সহজ নয় ও মানসিক গঠনের একটা বিশেষ স্তরে না পৌছান পর্যন্ত বিমূর্ত জিনিষকে শিশু তার কল্পনার মধ্যে আনতে পারে না। তাই মনস্তাত্বিক পদ্ধতিতে মূর্ত থেকে বিমূর্তের দিকে যাওয়ার কথা বলা হয়। তেমনি শিশু যখন নতুন জ্ঞান আহরণ করে তখন তার পুরাতন অভিজ্ঞতার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করেই শেখে। এ জন্য মনস্তাত্বিকশিক্ষায় জানা থেকে অজানার দিকে যাওয়ার পদ্ধতিকে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে

শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ

আধুনিক শিক্ষায় যুক্তিসিদ্ধ ও মনস্তত্ত্বসম্মত উভয় পদ্ধতির পিছনে শিক্ষার যে সব মূলনীতি (Maxims) আছে তার গুরুত্বকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। উভয় পদ্ধতিতেই শিশু-শিক্ষার উপযোগী যে রীতি ও প্রণালী রয়েছে স্থান কাল ও পাত্রকে বিচার করে যদি তার সুষ্ঠু প্রয়োগ হয় তাহলে শিক্ষা সার্থক হয়ে উঠবে।

(পরবর্তী অধ্যায়ে শিক্ষার মূলনীতি Maxims of Education অংশে এ সম্পর্কে আরো বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে)।

ডাল্টন-পরিকল্পনা (Dalton Plan)

গতানুগতিক শ্রেণীশিক্ষার বন্ধন থেকে শিশুকে মুক্তি দেবার যে আধুনিক প্রচেষ্টা শিক্ষার ক্ষেত্রে চলছে সেই প্রচেষ্টার ফল স্বরূপ ডাল্টন-শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। শ্রেণীশিক্ষায় শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তা লোপ পেয়ে যায়। শ্রেণী গত শিক্ষায় শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা, স্বয়ংক্রিয়তা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা বহু পরিমাণে ব্যাহত হয়। পড়ার ইচ্ছা না থাকলেও তাকে পড়তে হয়, নির্দিষ্ট সময়টুকু অতিক্রান্ত হলে পাঠের বিষয় বদলে তাকে অন্য বিষয়ে মন দিতে হয়। ডাল্টন-শিক্ষাপদ্ধতিতে শ্রেণীশিক্ষার অসুবিধা দূর করে শিশুকে শিক্ষার ব্যাপারে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট প্রদেশের ডাল্টন সহরের টাউন হলে মিস হেলেন পার্কহার্ষ্ট এই নতুন শিক্ষা-পদ্ধতি নিয়ে প্রথম পরীক্ষা সুরু করেন বলে এই পদ্ধতি ডাল্টন-পরিকল্পনা নামে খ্যাত। তিনি ১৯১৯ খৃঃ এই শিক্ষাপরিকল্পনা রচনা করেন। একে Laboratory School ও বলা হয়ে থাকে। ১৯২২ খৃঃ মিস এভিলিন ডিউই এই পদ্ধতিকে Dalton Laboratory Plan নাম দেন। এই পদ্ধতিকে 'ল্যাবোরেটরী প্ল্যান' বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই পদ্ধতিতে শ্রেণীকক্ষ গুলিকে এক একটি পরীক্ষাগারে বা কর্মশালায় পরিণত করা হয় ও সেই ভাবেই ব্যবহার করা হয়। পরীক্ষাগারে শিক্ষার বিভিন্ন উপকরণ, বই, ম্যাপ, চার্ট প্রভৃতি থাকবে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেরা সেই উপকরণের সাহায্যে নিজেদের পাঠ বা গবেষণা স্বাধীন ভাবে চালিয়ে যাবে।

ডাল্টন-পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর উপর নিজনিজ পাঠ আয়ত্ত করবার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। শ্রেণীশিক্ষার ব্যবস্থা এখানে নেই। শ্রেণীকক্ষের বদলে এখানে

রয়েছে বিভিন্ন বিষয়-কক্ষ। প্রতিটি বিষয়-কক্ষে বিষয় উপযোগী শিক্ষার উপকরণ রয়েছে—শিক্ষার্থী নিজনিজ পাঠ আয়ত্ত করতে এর সাহায্য গ্রহণ করে। শ্রেণী-শিক্ষক এই পদ্ধতিতে নেই, আছে বিষয়-শিক্ষক। শ্রেণী-শিক্ষার মত শ্রেণী-কক্ষে আবদ্ধ শিক্ষার্থীদের সামনে এঁরা বক্তৃতা করেন না—এঁরা প্রয়োজন মত ছাত্রদের সাহায্য করেন মাত্র। শ্রেণীশিক্ষার মত শিক্ষার্থী এখানে নিষ্ক্রিয় শ্রোতা নয় বা এখানে শিক্ষকের বক্তৃতা শোনাই তার একমাত্র কাজ নয়। শিক্ষার্থী নিজের ইচ্ছা মত উপস্থাপিত সমস্যাগুলি নিয়ে কাজ করবে ও সমাধানের চেষ্টা করবে। শিক্ষার্থী এখানে স্বাধীন ও সক্রিয়।

ডাল্টন পদ্ধতিতে শ্রেণীশিক্ষা না থাকলেও শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা অনুসারে শ্রেণীবিন্যাস রয়েছে। শিক্ষক কোন বিষয়ের সুরুতে একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের ছাত্রদের সামনে সে বিষয় কি ভাবে আয়ত্ত করতে হবে সে সম্পর্কে সাধারণ ভাবে আলোচনা করেন। তারপর একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাজ নির্দিষ্ট করে দেন। সেই পূর্ব নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট কাজ শেষ করতে হয়। ডাল্টন-পদ্ধতিতে বছরের পাঠ বিভিন্ন বিষয়-শিক্ষক কয়েকটি ভাগে ভাগ করে দেন। এক-একটি ভাগ বা unit নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (সাধারণতঃ একমাস) শেষ করতে হয়। নির্দিষ্ট কাজকে বলা হয় Assignment. শিক্ষার্থী নিজেব ইচ্ছামত সময়-তালিকা তৈবী করে পাঠ প্রস্তুত বরে। তবে কাজ (assignment) নেবার সময় তাকে অঙ্গীকাব করতে হয়, যে কাজ তাকে দেওয়া হল সেই কাজ সে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করবে। কাজ নেবার পর সে স্বাধীন ভাবে কাজ সুরু করবে। পরীক্ষা না থাকলেও চার সপ্তাহ শেষে তার পাঠ্য সে সম্পূর্ণ ভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছে কিনা তা প্রমাণ করবার জন্য তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। শিক্ষার্থী যে কোন বিষয় নিয়ে সুরু করতে পারে ও যতক্ষণ খুশী একটি বিষয় নিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে পারে। ইচ্ছা করলে একাধিক বিষয়ে মন সংযোগ করতে পারে বা একটি বিষয়ের উপরেই পর পর কয়েক দিন মন নিবদ্ধ রাখতে পারে। শিক্ষক পড়ান না কিন্তু নির্দিষ্ট সময় শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত থাকেন। যে কোন শিক্ষার্থী সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করতে পারে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রবণতা ও খুশী মত কাজ করবার সুযোগ পায়। শিক্ষকের সাহায্য যে কোন সময় গ্রহণ করতে পারে কিন্তু এজন্য কোন বাধ্য বাধকতা নেই। শিক্ষকের সাহায্য গ্রহণ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক।

বিষয়-কক্ষে শিক্ষক উপস্থিত থেকে নিম্ন কর্তব্য সমূহ পালন করেন :—

১। বিষয়-কক্ষে পাঠের উপযোগী পরিবেশ বজায় রাখা।

২। যে নির্দিষ্ট কাজ দেওয়া হল সে সম্পর্কে বিশদ ভাবে আলোচনা করা।

৩। বিষয় উপযোগী শিক্ষা-উপকরণ ও তার ব্যবহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সংবাদ দেওয়া।

৪। বিভিন্ন সমস্যা কি ভাবে সমাধান করতে হবে সে সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া।

৫। যখন সত্যিকারের প্রয়োজন উপস্থিত হয় তখন কোন একটি সমস্যাকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া।

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুকে তার কাজে স্বাধীনতা দেবার নীতিকে ডাল্টন-পরিকল্পনায় সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে Dalton Association-এর একখানা Leaflet-য়ে যা বলা হয়েছে তা বিশেষ ভাবে প্রণিধান যোগ্য। সেখানে আছে "The Dalton Plan is a scheme of educational reorganisation applicable to the school-work of pupils from eight to eighteen years of age. It aims at giving the child freedom, making the school a community where the mutual interaction of groups is possible, and it approaches the whole problem of work from the pupils point of view, giving him more responsibility for, and interest in, his education.

"The form rooms become subject laboratories, where-in are collected all the books and apparatus relative to the particular subjects.

"The pupils are still grouped in forms for convenience sake." (As quoted by Sir John Adams in "Modern Development in Educational Practice")

দেখা যাচ্ছে স্বাধীনতাই হচ্ছে এই পদ্ধতির মূলকথা। মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষায় শিক্ষার্থীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শিক্ষার্থী তার নিজের খুশীমত যে কোন বিষয় নিয়ে কাজ করবে; কোন বিষয়ে সে মনোনিবেশ করলে তার কাজে হস্তক্ষেপ করা চলবে না, বা বাঞ্ছনীয় নয়। সময়-পত্রিকা (Time Table) থাকলে শিক্ষার্থী তার ইচ্ছা-

মত সময় কোন বিষয়ে নিবদ্ধ থাকতে পারত না। তাই ডাল্টন-পদ্ধতিতে সময়-পত্রিকা বাদ দেওয়া হয়েছে। এই পদ্ধতিতে যে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে সেই স্বাধীনতাই শিক্ষার্থীকে দায়িত্বের বন্ধনে বেঁধে ফেলে। বাইরের জোর জবরদস্তি তার উপরে একটুও নেই, কিন্তু নিজের সংকল্প রক্ষার জন্য, আত্মসম্মান রক্ষায় সে নিজেই পড়ায় মনোযোগী হয়। স্বাভাবিক দায়িত্ব-বোধ থেকে নির্দিষ্ট কাজ সে নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করে দেয়।

ডাল্টন-পদ্ধতিতে যেমন ইচ্ছামত কাজের সুবিধা রয়েছে তেমনি ইচ্ছা করলে পরস্পরের সহযোগিতায় দলবদ্ধ হয়ে কাজ করবার সুযোগও রয়েছে (Where mutual interaction of groups is possible)। দলবদ্ধ হয়ে সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে কাজ করবার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক চেতনা সৃষ্টির সহায়ক হয়। তবে দলবদ্ধ হয়ে কাজ করা সম্পূর্ণ ভাবে শিক্ষার্থীর স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

ডাল্টন-পদ্ধতিতে পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই কিন্তু শিক্ষার্থীর পাঠ কতটা অগ্রসর হচ্ছে সে সম্পর্কে খোঁজ রাখা হয়। শিক্ষার্থী কোন বিষয় কতটা আয়ত্ত করল তা জানার ব্যবস্থা না থাকলে পাঠ প্রগতি সম্পর্কে কোন ধারণা করা যায় না। তাই শিক্ষক শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বিষয়ে অগ্রগতির রেকর্ড রাখেন। ছাত্ররা কোন একটি বিষয় আয়ত্ত করবার পর তাব সারমর্ম দেখে অগ্রগতির লেখচিত্র (graph) অঙ্কন করা হয়। এই লেখচিত্র দেখে শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়েই উন্নতি সম্পর্কে ধারণা করতে পারে। শিক্ষার্থী বুঝতে পারে কোন বিষয়ে সে কয়েকটি unit পিছিয়ে আছে। শিক্ষক লেখচিত্র দেখে অগ্রগতি ঠিক ভাবে হচ্ছে কিনা বুঝতে পারেন ও দরকার হলে পাঠ-পরিকল্পনার পরিবর্তন করতে পারেন। চুক্তি অনুযায়ী একটি কাজ শেষ হলেই তাকে নতুন কাজ দেওয়া হয়। এ পদ্ধতিতে একজনের জন্য আরেকজনকে বসে থাকতে হয় না। আপন আপন যোগ্যতা অনুসারে বিদ্যার্থীরা এগিয়ে চলে।

ডাল্টন-পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিক্ষার্থীকে কাজ করবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। এর ফলে তার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। স্বাধীন ভাবে কাজ করায় তার দায়িত্ব বোধ জন্মায় যা তার ব্যক্তিত্ব বিকাশে ও নিজের যুক্তি ও বুদ্ধি বলে কাজ করবার ক্ষমতা ও সমস্যা সমাধানের পক্ষে সহায়ক হয়। দলগত ভাবে কাজ করবার ফলে সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি পায় ও অপরের মতামতকে মূল্যদিতে ও শ্রদ্ধা করতে শেখে। বুদ্ধিমান ও

মেধাবী ছাত্রকে অনগ্রসর ছাত্রের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। নির্দিষ্ট কাজ শেষ করতে পারলেই সে নতুন কাজ নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে। আবার অনগ্রসর ছাত্রকে শ্রেণীর অন্যসবার সাথে এগিয়ে যাবার জন্য তাল সামলাতে গিয়ে ব্যতিব্যস্ত হতে হয় না। বিষয় অনুসারে শ্রেণী-কক্ষ থাকায় বিভিন্ন বিষয়-কক্ষে সেই বিষয়ের উপযোগী পাঠ-পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় শিক্ষার্থীদের পক্ষে সেই আবহাওয়ায় কাজ করবার সুবিধা হয়।

ডাল্টন-পদ্ধতির প্রধান অসুবিধা হচ্ছে মেধাবী ও বুদ্ধিমান ছেলেদের পক্ষে এ পদ্ধতি সুবিধাজনক হলেও সাধারণবুদ্ধি বিশেষ করে অনগ্রসর ছেলেদের পক্ষে এ পদ্ধতি উপযোগী নয়। ছোট ছেলেদের ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতির প্রয়োগ খুব সুবিধাজনক নয়। নীচু শ্রেণীর অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়েদের পক্ষে শিক্ষকের সাহায্য ছাড়া নিজেদের ক্ষমতায় কাজ করা সম্ভব নয়।

ডাল্টন-পদ্ধতিতে 'শ্রেণী পঠন' একেবারে নির্বাসিত করা হয়েছে। কিন্তু দেখা গিয়েছে রসগ্রাহিতা-মূলক ও প্রেরণা-মূলক পাঠে শ্রেণী-শিক্ষা অধিকতর উপযোগী। এই পদ্ধতিতে শিক্ষককে প্রায় নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। অথচ তাঁকে সর্বদাই বিষয়-কক্ষে উপস্থিত থাকতে হচ্ছে। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে একই সমস্যা নিয়ে ছাত্ররা আসছে, কখন কে আসবে তার স্থিরতা নেই, এর ফলে তাঁর উপর চাপ অনেক বেশী হওয়ায় তিনি বিশ্রামের সুযোগ পান না।

অগ্রগতির পরিমাপ শুধুমাত্র অধীত বিষয়-বস্তুর সারমর্ম লেখা দেখেই ঠিকমত বিচার করা যায় না। সাধারণ শিক্ষার মত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ এ পদ্ধতিতে নেই। শ্রেণী-পঠনে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক ধারণা জন্মাবার ও কোন সমস্যা থাকলে তা সমাধানের পক্ষে সুবিধা হয়।

ডাল্টন-পদ্ধতিকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হলে প্রচুর বিষয়-কক্ষ, শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত আসন সংখ্যা, অভিজ্ঞ বিষয়-শিক্ষক সংগ্রহ, প্রচুর পরিমান শিক্ষার উপকরণ সংগ্রহ করা দরকার। ভারতে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ভাবে এই পদ্ধতির প্রয়োগের চেষ্টা হয়েছে। ১৯২৪খৃঃ পাঞ্জাব এডুকেশন জার্ণালের ফেব্রুয়ারী সংখ্যা থেকে জানা যায় যে একবার Chief's College-এ ডাল্টন-পদ্ধতি প্রয়োগের চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু সে প্রচেষ্টা কার্যকরী না হওয়ায় পরিত্যক্ত হয়। লাহোর Central Training College-এ এই পদ্ধতির প্রয়োগ প্রচেষ্টা কিছুটা সার্থক হয় কিন্তু সেখানে কাজ বেশীদূর অগ্রসর হয়নি। বাংলা দেশে বহরমপুরের কোন একটি হাইস্কুলের প্রধান

শিক্ষক উৎসাহী হয়ে ডাল্টন-পদ্ধতি তাঁর স্কুলে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছিলেন। দু'টি শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট কাজ (assignment) ঠিক করে বিষয়-কক্ষ ঠিক করে কাজে অগ্রসর হন। দু'মাসের মত কাজ চালিয়ে কতকগুলি অসুবিধার জন্য পরিকল্পনা ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

প্রজেক্ট পদ্ধতি (Project Method)

ডিউই শিকাগো সহরে Laboratory School-এ তাঁর শিক্ষানীতিকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু করেন। তিনি গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতিকে ত্যাগ করে নানারূপ কাজের মধ্যদিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। দৈনন্দিন কর্মজীবনে আমরা বহু সমস্যার সম্মুখীন হই, সমস্যার সম্মুখীন হয়ে সমস্যা এড়িয়ে চলবার চেষ্টা না করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করি। সমস্যা সমাধানে তৎপর হয়ে নানা উপায় উদ্ভাবন করি। গঠনমূলক কাজের মধ্যদিয়ে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টায় আমরা বাস্তব জীবনে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি। সমস্যা সমাধানে কর্ম তৎপর হয়ে আমরা যে ভাবে শিক্ষালাভ করি ডিউই তাঁর শিক্ষাপদ্ধতিতে সেই নীতিরই প্রয়োগ করেছেন। এই পদ্ধতিকে বলা হয় Problem Method. ডিউইর শিক্ষাপদ্ধতিতে শিশুকে শ্রেণী কক্ষের শৃঙ্খলা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিক পরিবেশে শিক্ষক-নির্ভর না হয়ে যতটা সম্ভব শিক্ষার্থীরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান করবে। এই সমস্যা সমাধানমূলক কাজের মধ্যদিয়েই তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটবে। সে বাস্তব জীবনের সম্মুখীন হবার যোগ্যতা অর্জন করবে। সহযোগিতামূলক কাজের মধ্য দিয়ে সামাজিক জীবনের উপযুক্ত হয়ে উঠবার যোগ্যতা লাভ করবে। ডিউই চেয়েছিলেন শিক্ষার্থী শিক্ষার মধ্য দিয়ে সার্থক সামাজিক জীবরূপে গড়ে উঠবে। তাঁর Problem Method এর মধ্য দিয়ে তিনি সেই সার্থকতায় পৌঁছতে চেয়েছেন।

বিগত প্রথম মহাসমরের পর ডিউইর শিষ্য ডাঃ কিলপ্যাট্রিক ডিউইর শিক্ষাপদ্ধতিকে কিছুটা পরিবর্তিত করে বাস্তব-সমাজের পরিবেশে বাস্তব-জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জনের ভিত্তিতে প্রজেক্ট

পদ্ধতির পরিকল্পনা করেন। ষ্টিভেনসন বলেছেন, প্রজেক্ট হচ্ছে একটি সমস্তামূলক কাজ যা স্বাভাবিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে—"The Project is a problematic act carried to completion in its natural setting."

এই পদ্ধতিতে যে কাজটি শিক্ষার্থীকে দেওয়া হবে তা হবে সমস্তামূলক এবং শিক্ষার্থীরা সেই সমস্তার সমাধান করবে শ্রেণীকক্ষের বাইরে স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে। কিলপ্যাট্রিক প্রজেক্ট সম্পর্কে বলেছেন "Project is a wholehearted purposeful activity executed in a social environment."* প্রজেক্ট হচ্ছে একটি উদ্দেশ্যমূলক কাজ যা সামাজিক পরিবেশে সর্বান্তঃকরণে সম্পাদিত হবে।

প্রজেক্ট পদ্ধতিতে প্রতিটি কাজের পিছনে থাকবে একটি সমস্যা এবং সেই সমস্যার পিছনে থাকবে একটা উদ্দেশ্য। সমস্যা শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থিত করা হলে তারা সেই সমস্যাটির সমাধান করবে ও এই সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়ে কাজটির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

সমস্যামূলক কাজটির উপস্থাপনা থেকে সার্থক সম্পাদন ও তার বিচার-বিবেচনা পর্যন্ত আমরা চারটি স্তর লক্ষ্য করি। সেই স্তরগুলি হচ্ছে—

১। শিক্ষার্থীর সামনে যখন একটি কাজ বা সমস্যা (Project) উপস্থাপন করা হবে তখন তারা স্থির করবে এই কাজটি তারা কেন করবে। সেই বিশেষ সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়ে কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে—তাই প্রথম স্তরের লক্ষ্য হচ্ছে উদ্দেশ্য স্থির করা—(Purposing)

২। উদ্দেশ্য স্থির করবার পর ঠিক করতে হবে কি করে কাজটি করা যায়—অর্থাৎ সমস্যার সমাধান হয়। একে বলা যায় পরিকল্পনার স্তর (Planning)। এই স্তরে কাজটি কয়টি ভাগে (unit) ভাগ করা হবে। কে কতটা কাজ করবে, unit-গুলি সম্পাদনের জন্য কিভাবে দল গঠন করা হবে তা ঠিক করে নেওয়া হবে।

৩। এর পর পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। পূর্বনির্দ্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে উদ্দেশ্যমূলক কাজটি বাস্তবে রূপ দেবার জন্য সবাই কাজ করবে। এই স্তরকে বলা যায় কর্মসম্পাদন স্তর (executing)।

৪। কাজটি সম্পাদনের পর আসবে বিচারের স্তর (judging)। যে কাজটি বা সমস্যাটি সমাধান করা হল তা কতটা সফল হয়েছে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে কাজটি সুরু হয়েছিল তা সিদ্ধ হয়েছে কিনা, ত্রুটি-বিচ্যুতি কি রইল, কি শিক্ষা হল সে সম্পর্কে সবাই মিলে আলোচনা করবে, বিচার করবে।

বিদ্যালয়ের প্রাথমিক দিক থেকেই শিক্ষার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেওয়া যায়। সময় দেখতে শেখান, দিগ্‌নির্ণয়, স্কুল বাড়ীর নক্সা করা, স্কুলের প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরী করা, বাগান তৈরী করা, পশু-পক্ষী পালন করা প্রভৃতি বহু জিনিষ ছেলেদের প্রজেক্ট পদ্ধতির মধ্য দিয়ে শেখান যায়। প্রজেক্ট পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে অনুবন্ধ প্রণালীর (Correlation) মধ্য দিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। মূল বিষয়ের সাথে যুক্ত হয়ে অন্য যে সব বিষয় আসবে তার আলোচনা করা হবে ও শিক্ষার্থীরা সেই বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে। যেমন স্থির করা হল ছেলেরা স্কুলের জমিতে একটি বাগান করবে। প্রথমে কাজের উদ্দেশ্য স্থির করে নিতে হবে—কেন বাগান করা হচ্ছে, এর সার্থকতা কি, এর কোন প্রয়োজন বা উপকারিতা আছে কি না সে সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনা হবে। তারপর বাগানটি কি করে করা হবে সে সম্পর্কে সবাই মিলে পরামর্শ করে একটি পরিকল্পনা রচনা করা হবে। কাজটি কয়েকটি ভাগে ভাগ করে ভিন্ন ভিন্ন দলের উপর এক একটি অংশ সম্পাদনের দায়িত্ব দেওয়া হবে। পরিকল্পনা হয়ে যাবার পর বাগানটি তৈরীর কাজ শুরু হবে। প্রতিটি দল নিজেদের অংশের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে কাজটিকে বাস্তবে সার্থক করে তুলবে। এর পর সম্পাদিত কাজটির বিচার বিশ্লেষণ হবে—ত্রুটি-বিচ্যুতি কোথায় রইল তা যেমন খুঁজে বের করা হবে, তেমনি কাজটা কতটা সার্থক হল তাও দেখতে হবে।

এখন দেখা যাক এই বাগান তৈরী কাজটির মধ্য দিয়ে আমরা অনুবন্ধ প্রণালীতে কি কি কাজ শিখতে পারি এবং কোন কোন বিষয় সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান হয়। বাগান তৈরী করতে প্রথমেই একটি নক্সা করতে হবে—স্কুলের কোন জায়গায় বাগান হবে—কতটুকু জমিতে বাগান হবে সব মেপে স্থির করে নিয়ে নক্সাতে দেখান হবে। তারপর যে মাটিতে চাষ হবে তার গুণাগুণ, কোন মাটিতে কোন ফসল জন্মায় সে সম্পর্কে আলোচনা হবে। কোন ঋতুতে কোন ফসল ফলবে, কোন ফুল কোন ঋতুতে হয় প্রাসঙ্গিকভাবে উদ্ভিদ-বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা হবে। জমিতে সার দেওয়া হলে কি সার দেওয়া দরকার, বীজ সংগ্রহ করতে হলে নার্শারীতে চিঠি দিয়ে বীজ আনিয়ে নিতে হবে। বাগান তৈরীর একটা খরচ আছে, সেই খরচের হিসাব রাখা। কাজটি সুরু হবার পর ধারাবাহিকভাবে কাজের অগ্রগতির বিবরণ লিখে রাখা হবে। বাগান শেষ হলে কাজের বিচার করা হবে—আলোচনা সভায়

বিশ্লেষণ করা হবে কাজে কোথায় ত্রুটি রয়েছে, কতটুকু সার্থক হয়েছে। তাই দেখা যাচ্ছে একটি বাগান করবার মধ্য দিয়ে ছেলেরা নক্সা তৈরী, উদ্ভিদতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, চিঠিলেখা, হিসাব রাখা, ভাষাশেখা প্রভৃতি সব কিছুই শিখতে পারবে। কাজের মধ্য দিয়ে তাদের দেহচর্চাও হবে। প্রজেক্ট সম্পাদনে সৃজনীশক্তির বিকাশ, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস, সহযোগিতার মধ্য দিয়ে পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠা প্রভৃতি বহু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। অনুবন্ধ প্রণালীর একটা বিপদ হচ্ছে অতি উৎসাহীরা অনেক সময় কষ্ট-কল্পনা ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করতে গিয়ে শিক্ষা-বিভ্রাটের সৃষ্টি করেন। এ সম্পর্কে Sir John Adams সতর্ক করে বলেছেন, "....but there was a tendency to go to extremes, and sometimes curriculum got into a state of inextricable confusion. All the subjects got mixed up in a general jumple."

প্রজেক্ট পদ্ধতি ডিউইর সক্রিয়তা-তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষার্থীরা নিজেরা সক্রিয়ভাবে সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং কাজটি করবে তারা স্বাভাবিক সামাজিক পরিবেশের মধ্যে। তাই প্রজেক্ট পদ্ধতিতে কাজের মধ্য দিয়ে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও সামাজিক চেতনার বিকাশলাভ এই দুই ঘটবে। ডিউই শিক্ষায় ব্যক্তিসত্ত্বা ও সমাজসত্তার মধ্যে কোন বিরোধ খুঁজে পাননি তাই তিনি এই দুইয়ের সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন। প্রজেক্ট পদ্ধতিতে ডিউইর সেই শিক্ষাদর্শের রূপই কিলপ্যাট্রিক দিয়েছেন।

প্রজেক্ট পদ্ধতি আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত। শিশুর মধ্যে যে স্বাভাবিক সৃজনপ্রতিভা ও কর্মপ্রবণতা রয়েছে তার বশে কাজ করতে চায়। যেহেতু শিশু কাজ করতে ভালবাসে তাই তারা নিজেদের আগ্রহেই কাজ করবে। আগ্রহ ও সমস্যা সমাধানের কৌতূহলের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সে কাজে স্বাভাবিক অনুপ্রেরণা লাভ করবে। প্রজেক্ট পদ্ধতিতে শিশুকে কাজ করবার পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। সমস্যাটি যা শিশুর সামনে উপস্থাপিত হল তা সে নিজেই সমাধান করবে। কাজের আনন্দের মধ্য দিয়ে সে যে শিক্ষালাভ করবে তার মধ্য দিয়ে সে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে।

সাধারণ শিক্ষায় একটি কাজ করতে গিয়ে বা একটি বিষয় শিক্ষার ক্ষেত্রে তার পিছনে কি নীতি (Principles) রয়েছে সেটাই আগে শেখান হয়। প্রজেক্ট পদ্ধতিতে একটি কাজের পিছনে কি নীতি আছে শিক্ষার্থীরা তা নিজেরাই কাজ করতে গিয়ে প্রয়োজনমত জেনে নেবে।

"In the topical organisations the principles are learned first, while in the project the problems are proposed which demand in the solution the development of principles by the learner as needs"—(W. W. Charters as quoted by Adams in Modern Development in Educational Practice.)

প্রজেক্ট পদ্ধতির অসুবিধা হচ্ছে একটি প্রজেক্ট শেষ করে আরেকটি প্রজেক্ট সুরু করবার মধ্যে যে ফাঁক (gap) থেকে যায় তার মধ্য দিয়ে শিক্ষার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব নয়। এর ফলে অনেক বিষয়ে জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যায়। নিম্নশ্রেণীর অল্প বয়স্ক ছাত্রদের জন্য প্রজেক্ট উপযোগী হলেও উচ্চশ্রেণীতে যেখানে জটিল বিষয় রয়েছে সেখানে শিক্ষণীয় বিষয়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা না পেলে শিক্ষালাভ সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে প্রজেক্টের কার্যকরীতা সীমাবদ্ধ।

অনুবন্ধ প্রণালীর মধ্য দিয়ে শিক্ষার একটা সীমা আছে—সীমা ছাড়িয়ে একে বিষয়ান্তরে সম্প্রসারিত করলে কষ্টকল্পনার আশ্রয় নিতে হয় এবং এমন সব বিষয়ের আমদানী করা হয় যার সাথে প্রজেক্টের কোন সম্পর্ক নেই। প্রজেক্টের মধ্য দিয়ে সব বিষয় শেখানো সম্ভবও নয়। অনেক সময় কাজের চাপে প্রজেক্টের শিক্ষামূলক দিকটি চাপা পড়ে যায়।

অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দিতে হলে শিক্ষকের যে পরিমাণ অভিজ্ঞতা থাকা দরকার ও বহু বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন সেরূপ শিক্ষক পাওয়া কঠিন।

দলবদ্ধ হয়ে কাজ করার ফলে সহযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি হয়—সামাজিক বোধ জন্মায় আবার দলের মধ্যে মিশে কাজে ফাঁকি দেবার ইচ্ছা থাকলে তাও খুব কঠিন নয় এবং সর্বকালে সর্বদেশে দু'চারটি ফাঁকিবাজ ছেলে থাকবেই তারা এ সুযোগ গ্রহণ করবে।

প্রজেক্ট পদ্ধতির সাথে আমাদের দেশের বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতির অনেক দিক থেকে মিল রয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষা, প্রজেক্টের ন্যায় কর্মকেন্দ্রিক। এখানে একটি শিল্পকর্মকে কেন্দ্র করে শিক্ষাপরিকল্পিত হয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষায় শিশুর পরিবেশ অনুযায়ী কয়েকটি শিল্প থেকে একটি শিল্প বেছে নিতে হয় যার সম্পর্কে শিশু স্বাভাবিক আগ্রহ বোধ করবে। এই পদ্ধতিতেও মূল শিল্পটি থেকে অনুবন্ধ প্রণালীতে নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভের সুযোগ আছে। উভয় পদ্ধতিতেই মানসিক ও দৈহিক উভয় দিকের চর্চাই হয়। দুইটি

পদ্ধতিতেই বাস্তব পরিবেশের মধ্যে কর্মের পরিকল্পনা করা হয়। শিক্ষাকে বাস্তব জীবনের সাথে সংযুক্ত করা দুই শিক্ষাপদ্ধতিরই বৈশিষ্ট্য।

প্রজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরাই প্রজেক্ট স্থির করে। বুনিয়াদী পদ্ধতিতে সীমাবদ্ধ কয়েকটি পূর্বনির্দিষ্ট প্রজেক্ট থেকে একটি প্রজেক্ট বেছে নিতে হয়। প্রজেক্ট পদ্ধতির জ্ঞানলাভের মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব নয়। একটির পর একটি প্রজেক্ট নিয়ে ছেলেরা কাজ করে যায় ফলে তাদের জানার মধ্যে ফাঁক থেকে যায়। বুনিয়াদী পদ্ধতিতে একটি মূল শিল্পকর্ম নির্দিষ্ট থাকে বলে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে ধারাবাহিকতা রাখা সম্ভব হয়।

প্রজেক্ট পদ্ধতিতে কর্মটি গৌণ, শিক্ষালাভই মুখ্য কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতিতে বিষয় শিক্ষার সাথে শিল্পকর্মে দক্ষতালাভ করতে হয়। শিল্পটি এখানে গৌণ নহে। বুনিয়াদী পদ্ধতি কর্মকেন্দ্রিক হলেও মূলতঃ তা শিল্প-কেন্দ্রিক। বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে গান্ধীজি বলেছেন—"...not activity centred, but craft centred." তবে একথা মনে রাখতে হবে গান্ধীজি পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষায় শিল্পের যে গুরুত্ব ছিল বর্তমানে তার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। দুইটি পদ্ধতিতেই শিক্ষার্থীর সক্রিয়তাকে কেন্দ্র করে অনুবদ্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দেবার নীতিকে গ্রহণ করায় প্রজেক্ট ও বুনিয়াদী শিক্ষা উভয় পদ্ধতিকেই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার শ্রেণীভুক্ত করা যায়।

উইনেটকা পদ্ধতি (Winnetka Plan)

চিকাগো সহরের নিকটে মিচিগান হ্রদের তীরে উইনেটকা নামক স্থানে ওয়াসবার্ণ (Washburne) ১৯১৯ খৃঃ একটি নতুন ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন করেন। উইনেটকার প্রাথমিক ও জুনিয়ার হাইস্কুলে এই পদ্ধতির প্রথম প্রয়োগ করা হয় বলে এই শিক্ষাপ্রণালী উইনেটকা পদ্ধতি নামে খ্যাত।

ব্যক্তিগত শিক্ষার যে নীতির উপর ডাল্টন শিক্ষাপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত উইনেটকা শিক্ষা-পরিকল্পনার ভিত্তিও সেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা। উদ্দেশ্য এক হলেও প্রয়োগের ক্ষেত্রে দুই পদ্ধতিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী অনুসৃত হয়। উইনেটকা পদ্ধতিতে পাঠক্রমকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—(ক) সাধারণ অত্যাবশ্যক বিষয়সমূহ (Common essentials) (খ) সামাজিক ও সৃজনী-মূলক দলগত কাজসমূহ (Social and creative group activities)।

অত্যাবশ্যক সাধারণ বিষয়সমূহ প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় আয়ত্ত করতে হয়। ডাল্টন পদ্ধতির মত এখানেও শিক্ষার্থীকে কাজ (assignment) দেওয়া হয়। বিষয়সমূহ কতকগুলি unit-য়ে ভাগ করে শিক্ষার্থী নিজের সাধ্যানুসারে কাজ করে কাজটি বা সমস্যাটি সমাধানের চেষ্টা করে। একটি ইউনিটের কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থী শিক্ষকের কাছ থেকে ইউনিটের উত্তর সম্বলিত একখানি কাগজ পায়। উত্তরপত্রের সাথে মিলিয়ে যদি দেখে নিজের উত্তর হয়নি তখন সে আবার নিজের ভুল সংশোধন করতে লেগে যায়। যদি তার নিজের সমস্ত উত্তর পূর্বপ্রস্তুত উত্তর-পত্রের সাথে মিলিয়ে দেখা যায় উত্তর নির্ভুল হয়েছে তাহলে সে শিক্ষককে পরীক্ষা নেবার জন্য অনুরোধ করে। প্রতিটি ইউনিটে যদি পুরো মার্ক পায় তাহলেই শিক্ষক তাকে পরের unit নিয়ে এগিয়ে যাবার অনুমতি দেন। পরীক্ষায় পাশ করতে না পারলে আবার তাকে পুরোন unit নিয়ে কাজ করে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে হয়।

উইনেটকা শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য-নীতির (individual difference) স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রতিটি শিশুর পক্ষে অত্যাবশ্যক বিষয়সমূহে একই হারে উন্নতি করা সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীরা নিজক্ষমতা অনুসারে নিজেদের চেষ্টায় প্রধান বিষয় সমূহ আয়ত্ত করে। গতানুগতিক শ্রেণীশিক্ষার ব্যবস্থা এই পদ্ধতিতে নেই। কিন্তু উইনেটকা পদ্ধতিতে শ্রেণীশিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে বিলোপ করা হয়নি। এখানে একই সাথে একজন শিক্ষার্থী তিনটী বিভিন্ন শ্রেণীতে পড়তে পারে। কোন একটি ছাত্র হয়ত সাহিত্যে বেশ কিছুটা এগিয়ে আছে, বিজ্ঞানে নির্দিষ্ট মান রক্ষা করে চলছে, অঙ্কে পিছিয়ে আছে, শিক্ষার্থী যে বিষয়ে যে কয়মাস এগিয়ে বা পিছিয়ে আছে সেই অনুসারে সে বিভিন্ন শ্রেণীতে গিয়ে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। বিভিন্ন বিষয়ের প্রগতি যদি একই হারে না হয় তাহলে বিভিন্ন বিষয়ে Promotion ও বিভিন্নভাবে হবে। কোন এক বিষয়ের অগ্রগতি ও প্রমোশন অন্য কোন এক বিষয়ে এগিয়ে যাওয়া কি পিছিয়ে থাকার উপর নির্ভরশীল নয়। এই শিক্ষাপদ্ধতিতে বাৎসরিক পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রমোশনের ব্যবস্থা নেই। শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ নির্দিষ্ট কাজ শেষ করে যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারলেই তাদের পরবর্তী শ্রেণীতে প্রমোশন দেওয়া হয়।

সৃষ্টিধর্মী দলগত সামাজিক কাজগুলিতে সবাইকে অংশ গ্রহণ করতে হয়। নাচ, গান, অভিনয়, চিত্রাঙ্কন, বিভিন্ন সৃজনধর্মী কাজে তারা অংশ গ্রহণ

করে। ছাত্রদের জন্য অত্যাবশ্যক শিক্ষণীয় বিষয়গুলির জন্য যেরূপ পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে—দলগত কাজের জন্য কোন পরীক্ষা বা মার্কের ব্যবস্থা নেই—এসব কাজে শিক্ষার্থীরা অংশ গ্রহণ করে আনন্দলাভ করে—এটাই তাদের পরম লাভ। ছাত্রদের প্রথম থেকেই গঠনমূলক কাজে শিক্ষা দেওয়া হয়। তারা সমবায় বিপণি, স্কুল ম্যাগাজিন পরিচালনা, ক্লাব গঠন প্রভৃতি কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। স্কুলের বিভিন্ন দলগত কাজ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কমিটি আছে, প্রতিটি ছাত্রকেই কোন না কোন সমিতির সভ্য হতে হবে। সাধারণ পাঠক্রম বহির্ভূত এসব সৃজনধর্মী গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে তাদের স্বাভাবিক শৃঙ্খলাবোধ জন্মায়, দলগত কাজের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতায় সামাজিকবোধ জাগ্রত হয়। পড়ার পরিবেশ নানাবিধ কাজের মধ্য দিয়ে আনন্দময় হওয়ায় শিশুরা পড়ায় আগ্রহ বোধ করে।

বিদ্যালয় সংগঠন একজন করে মনোবিজ্ঞানী, মনোরোগ বিশারদ; চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও একজন সর্বক্ষণের জন্য নিযুক্ত সম্পাদক যুক্ত থাকেন। বিভিন্ন স্তরের ছাত্রদের উপযোগী করে মনোবিজ্ঞান-সম্মত পুস্তক রচনা করা হয়। ছাত্রদের আচরণ সম্পর্কীয় সমস্যা মনোরোগ-বিশারদ সমাধান করেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানী সাধারণ স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখেন। বিভিন্ন বিভাগের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন সম্পাদক।

ওয়াসবার্ণ পরিকল্পিত এই শিক্ষাপদ্ধতিতে ডাল্টন শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটিগুলিকে যতদূর সম্ভব পরিহার করবার চেষ্টা করা হয়েছে। ব্যক্তিমুখীন-শিক্ষাপ্রচেষ্টায় শ্রেণীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নিয়ে শিক্ষা-পরিকল্পনা করায় উভয় পদ্ধতির মধ্যে একটা সমন্বয় সাধিত হয়েছে—সেই সাথে শ্রেণীশিক্ষার দোষ-ত্রুটি থেকেও শিক্ষাকে মুক্ত রাখা সম্ভব হয়েছে। ব্যক্তি-মুখীন শিক্ষাপরিকল্পনা সমূহের মধ্যে উইনেটকা শিক্ষাপদ্ধতির ভবিষ্যৎ খুবই সম্ভাবনাপূর্ণ।

ডেক্রলি পদ্ধতি (The Decroly Method)

ওভাইড ডেক্রলী (Ovide Decroly) ছিলেন বেলজিয়ামের একজন চিকিৎসক। ব্রুসেলস সহরের কয়েকটি স্কুল তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষাপদ্ধতি অনুসারে পরিচালিত হয়। ডেক্রলী-পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত ও দলগত উভয়

শিক্ষাপদ্ধতির সমন্বয় হয়েছে। তাঁর শিক্ষানীতির মূলকথা হচ্ছে জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ। তিনি বলেন বিদ্যালয় এমন প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে স্থাপিত হবে যেখানে শিশুরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে বহু বাস্তব জ্ঞান লাভ করবে। শিক্ষা হবে বাস্তব জীবনের অঙ্গ এবং অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই শিক্ষার্থীরা শিক্ষা লাভ করবে। এজন্য ডেক্রলী-স্কুল সম্বন্ধে বলা হয়েছে—School for learning through living. বিদ্যালয়ে স্বাভাবিক সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করবার জন্য পরিবার ও বিদ্যালয়ের যোগাযোগ রক্ষা ও স্কুলের নানা কাজে অভিভাবকদের অংশ গ্রহণ করবার কথা তিনি বলেছেন।

ডেক্রলী-স্কুলে শ্রেণীকক্ষগুলি গবেষণাগারের মত বহু উপকরণে সজ্জিত রাখা হয়। এক এক শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের দশ কি পনের জনের এক একটি unit-এ ভাগ করা হয় তারপর তাদের একটি বিষয় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় যে সম্পর্কে তারা পড়াশুনা করবে ও কাজ করবে। দলবদ্ধ ভাবে তারা নির্দিষ্ট বিষয়টি নিয়ে কাজ করে। কাজ করবার সময় বিষয়টির নানা দিক নিয়ে আলোচনা হয় ও বিষয়টির সমস্ত দিক নিয়ে তারা পড়াশুনা করে। এই জন্য প্রাসঙ্গিক ম্যাপ, চার্ট ও প্রয়োজনীয় বইয়ের ব্যবহার ও উল্লেখ করতে পারে। তারপর তাদের পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানে যে ফল লাভ হল সে সম্পর্কে তাদের রিপোর্ট পড়া হয়। যদি তাদের বিবরণীতে কাজটি সম্পর্কীয় কোন উল্লেখযোগ্য দিক আলোচিত না হয় তাহলে তাদের আবার ফিরে সেই কাজটি করতে দেওয়া হয়। ছাত্ররা নিজেদের কাজের সমালোচনা করে এবং প্রত্যেক ছাত্র কাজটি সম্পর্কে তার বক্তব্য বলবার সুযোগ পায়। কাজের জন্য কোন নম্বর দেওয়া হয় না ও ছাত্রদের কাজের তুলনা-মূলক বিচার করা হয় না।

ডেক্রলী প্রথায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহের উপর নির্ভর করে শিক্ষা দেওয়া হয়। যে বিষয়ে শিক্ষার্থীর আগ্রহ আছে সে বিষয়কে কেন্দ্র করে অন্যান্য বিষয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ডেক্রলী প্রথা যেহেতু জীবন-মূলক শিক্ষা তাই শিক্ষার্থীকে সমাজ-জীবনের উপযুক্ত করে তোলবার শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের ক্ষমতা, রুচি ও আগ্রহের মধ্যে বৈষম্য দেখা যায়, তাই দলবদ্ধভাবে কাজ করার সাথে স্বাধীন ভাবে কাজ করবার যথেষ্ট সুযোগ এখানে দেওয়া হয়। শিশু-জীবনকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করা যায়, দেখা গিয়েছে স্তরানুযায়ী শিশুর

আগ্রহ বিভিন্ন রূপ হয়, এবং এই আগ্রহই শিশুর মানসিক গঠনকে নিয়ন্ত্রিত করে। তাই এই পদ্ধতিতে আগ্রহের কেন্দ্র স্থির করে সে বিষয়ের সাথে জড়িত অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। ডেক্রলী পদ্ধতিতে শিক্ষায় দলবদ্ধ ভাবে কাজ করবার প্রেরণা জাগে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে দায়িত্ব বোধ জন্মায়। নিজেরা নিজেদের কাজ পরিচালিত করায় তাদের মধ্যে বিচার বোধ ও পরিচালনার ক্ষমতা সৃষ্টি হয়।

বাটাভিয়া পদ্ধতি (Batavia System)

বাটাভিয়ার (নিউইয়র্ক) স্কুল-সুপারইনটেনডেণ্ট জন কেনেডি এই শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্তক। প্রধানতঃ পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের জন্যই এই পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। যারা পিছিয়ে আছে এখানে তাদের বাদ দেওয়া হয় না —যাতে তারা মেধাবী ছাত্রদের সাথে এগিয়ে যেতে পারে সে চেষ্টাই করা হয়। এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত শিক্ষা ও শ্রেণীশিক্ষা প্রণালীর যোগ সাধন করা হয়েছে। এখানে পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের জন্য অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। এখানে রোজকার শিক্ষায় ছাত্রদের ব্যক্তিগত কাজের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। ছাত্রদের কাজের উৎসাহ দেবার জন্য যে কাজ তাদের করতে দেওয়া হয় শিক্ষকও সেই কাজ করেন। বাটাভিয়া পদ্ধতিতে প্রতিটি স্তরে পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। এই পদ্ধতির সাফল্যের জন্য প্রয়োজন অতি অভিজ্ঞ ও সুযোগ্য শিক্ষকের।

সঙ্ঘবদ্ধ পদ্ধতি (Group Method)

গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা যে শিক্ষাপদ্ধতির সাথে পরিচিত তা হচ্ছে শ্রেণীশিক্ষা পদ্ধতি। শ্রেণীশিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষক বক্তা আর শিক্ষার্থী নিষ্ক্রিয় শ্রোতা। শ্রেণীশিক্ষায় ধরে নেওয়া হয় একই শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা প্রায় একই প্রকার যোগ্যতার অধিকারী। আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপদ্ধতির সৃষ্টি হবার পর শ্রেণীশিক্ষা পদ্ধতির ত্রুটিগুলি সম্পর্কে শিক্ষাবিদদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত সামর্থ্য, গ্রহণ

করবার ক্ষমতা, বুদ্ধি, রুচি, আগ্রহ এক রকম হয় না, তাই শিশুকেন্দ্রীক শিক্ষায় শ্রেণীশিক্ষার পরিবর্তে ব্যক্তিগত শিক্ষার প্রবর্তন হয়। ব্যক্তিগত শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের উপর অত্যন্ত জোর দেওয়া হয়, এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমাজ চেতনা কি পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব দেখা যায়। ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত উভয় শিক্ষানীতির সমন্বয় করবার চেষ্টা হয়েছে সঙ্ঘবদ্ধ শিক্ষাপদ্ধতিতে।

সঙ্ঘবদ্ধ শিক্ষাপদ্ধতিতে কোন একটি কাজ শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে সম্পন্ন করে। কোন একটি নির্দিষ্ট কাজ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে করতে দেওয়া হলে শিক্ষার্থীরা দলবদ্ধ ভাবে তার বিভিন্ন দিক ও বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। যদি শুধুমাত্র বুদ্ধি-মূলক সমস্যা হয় তাহলে সমস্যাটির সবদিক নিয়ে আলোচনা করে সমাধানের পথ নির্দেশ করে দিতে পারলেই কাজটি শেষ হয়। সমস্যা সমাধান মূলক আলোচনায় সবাই অংশ গ্রহণ করে। বিভিন্ন গ্রন্থ, চার্ট, পরিসংখ্যান প্রভৃতির সাহায্যে সবাই যার যার বক্তব্য উপস্থিত করে। এখানে দলের সবাই আলোচনার মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্তে আসে। সব দলই তাদের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করে রাখে। সবশেষে সমস্ত দলগুলি নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা হয়, বিষয়টি সম্পর্কে বিভিন্ন দল তাদের অভিমত পেশ করে। সেখানে আবার সমস্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আলোচনা করে একটা সাধারণ সিদ্ধান্ত করা হয়। সঙ্ঘবদ্ধ এই যে কাজ বা সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি একে সমস্যা পদ্ধতি (Problem Method) বলা যায়। বহু শিক্ষা-পদ্ধতিতেই সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করার নীতি অনুসৃত হয়, যেমন সেমিনার বা আলোচনা চক্র, প্রজেক্ট, কর্মশালা পদ্ধতি (Work shop) দলীয় আলোচনা।

সঙ্ঘবদ্ধ কার্যপদ্ধতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমগ্র শ্রেণীকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করা হয়। শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে ন্যস্ত কাজটি সমাধানের চেষ্টা করে। সঙ্ঘবদ্ধ কার্যপ্রণালীতে দল পরিচালনার জন্য একজন দলনেতা নির্বাচিত করা হয়। দলনেতার পরিচালনায় নির্দিষ্ট বিষয়টি বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করা হয়। দলগঠনের সময় ভাল মন্দ সব মিশিয়ে দল গঠন করতে হয়। প্রত্যেক দলের যোগ্যতার মান যাতে মোটামুটি একই রকম হয় সেদিকে নজর রাখতে হয়। যদিও দলনেতার নেতৃত্বে আলোচনা কি কার্য পরিচালিত হয় তবুও প্রতি দলের কার্যপ্রণালী ও কাজের অগ্রগতির প্রতি শিক্ষক সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। দলের প্রতিটি ছেলে কাজ করছে কিনা—

আলোচনা ঠিক পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছে কিনা এসব দিকে তাঁকে নজর রাখতে হবে। প্রয়োজনমত তিনি ঠিক পথের নির্দেশ দেবেন ও দলের থেকে কাজ আদায় করে নেবেন।

সঙ্ঘবদ্ধ পদ্ধতিতে আলোচনা কি কাজ ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরিচালিত হয়। সেমিনার বা আলোচনাচক্রে কোন একটি বিষয় সাধারণভাবে আলোচিত হবার পর আলোচনাচক্রে কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে মূল-বিষয়টির বিভিন্ন দিক নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আলোচনা করা হয়। নির্দ্ধারিত সময়ের পর বিভিন্ন দলগুলি একত্রিত হয়—এখানে বিভিন্ন দলের দলপতি তাদের দলের সিদ্ধান্ত-সম্বলিত পূর্ণ বিবরণী পেশ করে। সেই সম্মিলিত আলোচনা থেকে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

প্রজেক্ট পদ্ধতিতে একটি কাজ বাস্তবে রূপ দেবার জন্য সে কাজটিকে কতকগুলি unit-য়ে ভাগ করে এক একটি দলের উপর সেই unit-গুলি সম্পাদনের ভার দেওয়া হয়। সবাই মিলে কাজ করে পরিকল্পিত লক্ষ্যে পৌছান হয়। কাজটির সুরুতে নির্দিষ্ট প্রজেক্টের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করে কার্য সম্পাদনের পরিকল্পনা করা হয়। কাজটি হয়ে যাবার পর আবার আলোচনার মাধ্যমে সম্পাদিত কাজের গুণাগুণ বিচার করা হয়।

সঙ্ঘবদ্ধ পদ্ধতির বিভিন্নরূপ দলীয় কাজে দলীয় নেতার একটা বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। দলনেতার সুপরিচালনার উপর দলের কাজের অগ্রগতি ও সাফল্য নির্ভর করে। দলনেতাকে গণতান্ত্রিক মনোভাব সম্পন্ন হতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় দলনেতা স্বেচ্ছাচারী হয়ে দলের অন্য কোন সভ্যকে মতামত প্রকাশের সুযোগ দেয় না—তার মতামত অন্যের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দলনেতার নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বের অভাবে দলের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। গণতান্ত্রিক দলনেতা দলের প্রতিটি সভ্যকে আলোচনাকালে মতামত প্রকাশের সমান সুযোগ দেবে। দলনেতাকে দেখতে হবে কোন অংশ গ্রহণকারী যেন আলোচনাকালে চুপ করে থেকে কাজকে এড়িয়ে না যায়। আলোচনায় বিভিন্ন অংশগ্রহণকারীর বক্তব্যকে সংহত করে দলকে সিদ্ধান্তে আসতে সাহায্য করবে। অংশগ্রহণকারীরা তাদের উপর ন্যস্তকাজটি সুষ্ঠু সমাধানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে।

চতুর্থ অধ্যায়

শিক্ষাদানের নীতি নির্দ্ধারণ ও শিক্ষাপ্রণালী

প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতির ক্রম-বিবর্তনের ধারাকে অনুসরণ করে আমরা দেখেছি বিভিন্ন যুগে শিক্ষা সমস্যার রূপ ছিল বিভিন্ন। যুগের পরিবর্তনের সাথে শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে তোলবার প্রয়োজনে শিক্ষার আদর্শ ও পদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে আধুনিক শিক্ষার যে রূপের সাথে আমরা পরিচিত অষ্টাদশ শতাব্দীতে রুশোর বৈপ্লবিক শিক্ষাচিন্তার মধ্যে আমরা প্রথম তার সন্ধান পাই। তারপর বহু মণীষীর সাধনায় বহু ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর অতিক্রম করে নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে বিংশ শতাব্দীতে কয়েকটি অভিনব শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে। শিশুর শিক্ষায় যে সব নীতি অনুসৃত হচ্ছে তা আমরা আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতিগুলিকে বিশ্লেষণ করলেই জানতে পারি। আধুনিক যে সব শিক্ষাপদ্ধতির সাথে আমরা পরিচিত প্রয়োগের ক্ষেত্রে এদের দৃষ্টিভঙ্গীর অদ্ভুত ঐক্য লক্ষ্য করা যায়—তা হচ্ছে শিশু সম্পর্কে এদের মনোভাব। সমস্ত আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতিতেই দেখা যায় শিক্ষায় শিশুর প্রাধান্য স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। আধুনিক শিক্ষাকে এই জন্যই বলা হয় শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা (Child Centric education). শিশুকে জেনে তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সাথে পরিচিত হয়ে শিশুকে গড়ে তুলতে হলে শিশুশিক্ষার যে রূপ হওয়া দরকার সেইভাবেই আধুনিক শিক্ষার নীতি-পদ্ধতি নির্দ্ধারিত হয়েছে।

শিক্ষাকার্যে তিনটী অঙ্গ—শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও বিষয়বস্তু। এদের প্রাধান্য সব সময়েই এক রকম ছিল না। মধ্যযুগীয় শিক্ষাব্যবস্থায় দেখা গিয়েছে শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষার্থী অপ্রধান অঙ্গ। সে সময় শিক্ষকই ছিলেন শিক্ষাজগতের মধ্যমণি বা কেন্দ্রবিন্দু। তিনিই মুখ্য, তিনিই সক্রিয়। তার পরেই বিষয়। যার জন্য শিক্ষার সমস্ত আয়োজন সেই শিক্ষার্থীই গৌণ। শিক্ষক যা শেখাবেন, যেভাবে শেখাবেন, যতটুকু শেখাবেন তাই শিক্ষার্থীকে শিখতে হবে। এই ব্যাপারে ছাত্রের গ্রহণ করবার ক্ষমতা, তার ভাল লাগা, তার ইচ্ছা এসব বিষয় বিবেচনার মধ্যেই আনা হত না। যা বিবেচনার মধ্যে আসত তা হচ্ছে শিক্ষকের হাতের যষ্ঠি। যষ্ঠির মাধ্যমেই শিক্ষক-শিক্ষার্থীর

সম্পর্ক গড়ে উঠত। কারণ সে যুগে বিশ্বাস ছিল যষ্টির ব্যবহার না হলে নাকি শিক্ষার্থীর উচ্ছন্নে যাবার পথ পরিষ্কার হত—Spare the rod spoil the child এই ছিল সে যুগের আপ্ত-বাক্য।

ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় যার জন্য শিক্ষার আয়োজন সেই শিক্ষার্থী আর গৌণ নয়। শিক্ষক শিক্ষার্থী, ও বিষয় শিক্ষার এই তিনটী অঙ্গের মধ্যে কি সম্পর্ক তা প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ স্যার জন এডামস অত্যন্ত সুন্দর ভাবে একটি বাক্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। "শিক্ষক জনকে ল্যাটিন শিক্ষা দেয়।" শিক্ষক, জন ও ল্যাটিন এরা যুক্ত হয়েছে একটি কাজের মধ্য দিয়ে সেই কাজটি (ক্রিয়াপদটি) হচ্ছে শিক্ষা দেওয়া। শিক্ষার তিনটি অঙ্গের মধ্যেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। শিক্ষা যখন দেওয়া হচ্ছে শিক্ষার্থীকে তখন তাকে আর পিছনে ফেলে রাখা যায় না বিষয় আর শিক্ষক দুইয়ের প্রয়োজন শিশুর শিক্ষার জন্য তাই আজকের শিক্ষায় শিশুই প্রধান—বিংশশতাব্দীর শিক্ষা শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা। এই প্রসঙ্গে একটু দীর্ঘ হলেও স্যার জন এডামসের কথা তুলে দেওয়া হল।

"Verbs of teaching govern two accusatives, one of the person, another of the thing : as Majister Latinam Johannem Docuit—the master taught John Latin. The essential difference between the old and the new teaching lies in the incidence of effort on these two accusatives. The old teachers laid most of the stress on Latin, the new lay it on John. In both cases it is probable that the teacher still drives his team tandem, though of old Latin came first, while John was kept in the backword region where, incidentally, he was more accessible to the whip. In these days John is brought into the position of prominence, and certainly gets his full share of the teacher's attention." (Modern Developments in Educational Practice)

শিক্ষার আয়োজন শিশুকে নিয়ে—শিশুর শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে শিশুর মধ্যে যে শক্তি বা সম্ভাবনা আছে তার পরিপূর্ণ বিকাশ করতে হলে আমাদের কয়েকটি বিষয়কে বিশেষ ভাবে জানতে হবে। সাধারণ ভাবে শিশুমন ও যে শিশুকে শিক্ষা দিচ্ছি বিশেষভাবে তার ব্যক্তিগত

বৈশিষ্ট্য সমূহ জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। শিশুর প্রকৃতিকে যদি জেনে নিতে পারি তাহলে শিক্ষার কাজও অনেক সহজ হয়ে যাবে। তার প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। শিশুদের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য সর্বক্ষেত্রেই দেখা যায়। তবু আমাদের মনে রাখতে হবে প্রতিটি শিশুর কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্যের মধ্যে পাওয়া যাবে না। এ পার্থক্য শুধু দেহগত নয়, মনোগত পার্থক্যও রয়েছে। শিশুদের মানসিক গঠন এক রকম নয়। তারপর বৌদ্ধিক দিক থেকেও দেখা যায় এক একটি শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ভিন্ন ভিন্ন রূপ। আবার সাধারণ ভাবে যে সব শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ প্রায় একই রকম তাদের মধ্যেও দেখা যাবে এক একটি শিশু এক এক বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করছে। শিশুদের আবেগ ও সর্বক্ষেত্রে সমান নয়। সব দিক থেকে বিচার করে দেখলে দেখা যায় শিশুর সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে বাদ দিয়ে প্রতিটি শিশুকে স্বতন্ত্র ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখব এক একটি শিশুর মধ্যে লুকানো রয়েছে অনন্ত রহস্য। শিশুর শিক্ষায় তাই বিশেষ প্রয়োজন হচ্ছে শিশু-প্রকৃতিকে জানা। আগে শিশুকে জানবো তারপর স্থির করবো শিশুর শিক্ষায় কোন নীতিকে আশ্রয় করা হবে। শিশুর প্রকৃতি কি, তার বৈশিষ্ট্য কি—এ প্রশ্নটা শিশুর শিক্ষানীতি নির্দ্ধারণে সব সময় সামনে রাখতে হবে। শিশুকে যেখানে ব্যক্তিগত ভাবে তার শক্তি অনুসারে শিক্ষা দিতে হবে (individualised instruction) সেখানে তার বৈশিষ্ট্যগুলিকে জানার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় এজন্যই শিশুপর্যবেক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

শিশুশিক্ষার একটি প্রধান কথা হচ্ছে শিশু যাতে নিজেই শিখতে পারে, জানতে পারে, নিজেই নিজের কাজ করতে পারে সে ভাবে তাকে সাহায্য করতে হবে। শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ শিশুর উপরই নির্ভরশীল। শিক্ষক কি অভিভাবক অনেক সময় ইচ্ছামত শিশুর ভবিষ্যত জীবন সম্পর্কে পরিকল্পনা করেন ও শিশুর জীবনকে নিজেদের পরিকল্পনা অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করতে চান। এ ঠিক পথ নয়। "The growth of the self depends ultimately, however on the child himself and the ideals that govern his life. Some teachers and parents have mistakenly tried to plan their children's lives for them and to mould them to their will. This is not right, the child must

work out his own ideal and teachers and parents should help not dictate. (Instruction in Indian Secondary Schools Ed. E. A. Macnee p. 13). বিষয়ের সাথে শিশুর যোগাযোগ স্থাপন শিক্ষক হবে উপলক্ষ্য (instrumental) মাত্র। শিশু তার পরিবেশের সাথে নিজেকে যাতে মানিয়ে নিতে পারে পরোক্ষ ভাবে তাকে সেই সাহায্য করতে হবে। পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে চলার সাথেই তার দৈহিক ও মানসিক বিকাশ নির্ভরশীল। আমাদের একটি লক্ষ্য হচ্ছে শিশুকে সামাজিক করে তোলা। সামাজিক জীবন ও পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে চলার শিক্ষাও শিশুকে দিতে হবে। সে শুধু সমাজের যোগ্য সন্তানই হবে না, তার প্রভাবও সমাজ-জীবনে প্রতিফলিত হবে। শিশুর ব্যক্তিত্বের সুসামঞ্জস্য পূর্ণ বিকাশের সহায় তাই হচ্ছে শিক্ষার কাজ। ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশ যেমন শিশুর নিজের জন্য প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সমাজের জন্য। সমাজ ও ব্যক্তি এর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের দিকে দৃষ্টি রেখেই "শিশুশিক্ষা নীতি" স্থির করা হবে। সমাজবোধ জাগ্রত করা শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ। বিদ্যালয়ে শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর জীবনে যে সমাজবোধ জাগ্রত হয় তা উপদেশ শুনে নয় বিদ্যালয়-সমাজের (School Society) রীতিনীতিগুলি পালনের মধ্য দিয়েই সে সামাজিক হয়ে ওঠে। শুধু সমাজবোধে নয় জাতীয়তাবোধও বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে।

শিশু-প্রকৃতি ও শিক্ষা প্রণালী :—শিক্ষার রূপ কি হবে সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হলে আমরা "শিশু প্রকৃতি" অনুসারী শিক্ষার পরের ধাপের জন্য প্রস্তুত হতে পারি। শিশুর ব্যক্তিত্বের সুসামঞ্জস্য-পূর্ণ বিকাশ ও তাকে ভবিষ্যতের জন্য গড়ে তোলার কাজ সুরু হবে তার শিক্ষারম্ভের সাথে সাথে। শিশুচরিত্রের কতগুলি অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য আছে। চরিত্রের সেই বৈশিষ্ট্যগুলিই হচ্ছে শিশুপ্রকৃতির নিয়ামক। শিশুপ্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের যে জ্ঞান শিক্ষায় তাকে কাজে লাগাতে হবে। শিশুপ্রকৃতির একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিশু কাজ করতে ভালবাসে। আমরা বলি শিশু সদা চঞ্চল। সব সময়েই সে একটা না একটা কিছু করছে। হয় ভাঙছে, না হয় গড়ছে। তাকে খেলা দিয়ে চুপ করিয়ে রাখা যায়। শিশু ইঁট দিয়া ঘর বানাচ্ছে এটা তার কাছে খেলা আর কাজ দুই'ই। খেলার মধ্য দিয়েই তার কর্মপ্রবণতা

চরিতার্থ হয়। খেলাই হচ্ছে শিশুর কাছে একটা কাজ। চুপ করে বসে থাকা শিশুর স্বাভাবিক ধর্ম নয়। একটি সুস্থ শিশুর পক্ষে দৈহিক ও মানসিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকাই স্বাভাবিক। শিশুর কর্মপ্রবণতা তার দৈহিক ও মানসিক উভয় দিকের উন্নতির জন্যই প্রয়োজন। কাজের মধ্য দিয়ে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি সঞ্চালিত হয়, শিশুর দৈহিক পুষ্টির জন্য তার কাজের দরকার অত্যন্ত বেশী। শিশুকে কাজ করতে না দিলে তার মধ্যে যে শক্তি রয়েছে তার অপচয় হয়, তার স্বাভাবিক পুষ্টি ব্যাহত হয়।

শিশুর মধ্যে যে স্বাভাবিক সৃজনী শক্তি রয়েছে কাজের মধ্য দিয়েই তার বিকাশ ঘটে। কাজ করতে গিয়ে সে ভাঙবে আর গড়বে। এই ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়েই তার আত্মপ্রত্যয় বেড়ে যাবে সে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে। কাজের মধ্য দিয়া যে শিক্ষা লাভ করবে সেই হবে তার প্রকৃত শিক্ষা। শিশুর উপর বইয়ের বোঝা চাপানোর আগে তার যে স্বাভাবিক কর্মপ্রবণতা আছে তাকে শিক্ষার কাজে লাগাতে হবে। আধুনিক বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতির সাফল্যের পশ্চাতে রয়েছে শিশুর কর্মপ্রবণতার সদ্ব্যবহার। ডাল্টন প্ল্যান, প্রজেক্ট মেথড, হিউরিষ্টিক পদ্ধতি, Play way প্রভৃতি পদ্ধতিতে খেলা ও কাজ করবার প্রতি শিশুর যে স্বাভাবিক আগ্রহ রয়েছে তাকে কাজে লাগানো হয়েছে। মানুষ সামাজিক জীব—যূথবদ্ধ প্রবৃত্তি বশে সমাজে আমরা সঙ্ঘ-বদ্ধ হয়ে বাস করি। এই যে মিলে মিশে বাস করা এটা দশজনে মিশে কাজ করবার মধ্য দিয়ে শেখান যায়।

অনেকে বলেন শিক্ষা হচ্ছে অভিজ্ঞতার সমষ্টি। অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই আমরা নতুন জ্ঞান আহরণ করি। শিশু স্কুলে আসার বহু পূর্ব থেকেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে সুরু করে, মৃত্যুর দিন পর্যন্ত চলে এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি—এই যে শেখা তা বই পড়ে শেখা নয়। নতুন নতুন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শেখা। অভিজ্ঞতা অর্জনের সাথে শিশুর কাজের একটা নিকট সম্পর্ক রয়েছে। একটার পর একটা কাজ যখন শিশু করে তখন তার নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা লাভ হয়। নতুন কাজের মধ্য দিয়ে তথ্য সে সংগ্রহ করে তার মধ্য দিয়েই তার জ্ঞানের সীমা প্রসারিত হয়ে থাকে। নতুন কিছু শিখতে হলে যতটুকু শিখেছি আমরা সেখান থেকেই সুরু করি। অর্থাৎ পুরাতনের জের টেনে নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করি। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষায় বাস্তবের সাথে একটা নিবিড় যোগসূত্র আছে। শিশু তার বাস্তব পরিবেশে ইন্দ্রিয়ের

সাহায্যে প্রত্যক্ষভাবে যে শিক্ষা লাভ করে তা তার মনে গভীর রেখা পাত করে। বাস্তব জ্ঞান অর্জন করতে হলে তা কাজের মধ্য দিয়েই সম্ভব। অবশ্য সব সময়েই আমরা যা শেখাতে চাই তার সাথে বাস্তবের যোগসূত্র স্থাপন সম্ভব নয়। বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ কোন কোন ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। সমুদ্র সম্পর্কে কিছু পড়াতে গিয়ে ছেলেদের সমুদ্রের পাড়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, বা বাঘ সম্পর্কে পড়াতে বসে চিড়িয়াখানায় গিয়ে বাঘ দেখিয়ে আনা সম্ভব নাও হতে পারে—এসব ক্ষেত্রে তার বিকল্প ব্যবস্থা করা সম্ভব কিনা দেখতে হবে।

কাজ করা বা অভিজ্ঞতা অর্জন দুইয়ের জন্য প্রয়োজন আগ্রহের। শিশু স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রেরণায় (Instinctive Tendency) নানা কাজে লিপ্ত হয়। প্রবৃত্তিমূলক সব কাজই শিক্ষার পরিপোষকতা নয়। প্রবৃত্তির আদিম রূপ ও তার নগ্ন প্রকাশ সমাজ সম্মত নয়। শিক্ষা আমাদের প্রবৃত্তিকে পরিমার্জিত করে। প্রবৃত্তিমূলক প্রেরণায় শিশু যে কাজ করে সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য নিয়ে যদি তা পরিচালিত করা যায় তাহলে সে কাজ শিশু আনন্দের সাথে করবে। কৌতূহল শিশুর একটি সহজাত প্রবৃত্তি। শিশু নতুনকে জানতে চায়। এই কৌতূহল প্রবৃত্তিকে শিক্ষার প্রশ্ন করার কাজে লাগান যায়। শিশু যদি নতুন নতুন বিষয় জানবার জন্য কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করতে থাকে, সে নতুন জ্ঞান সম্পর্কে উৎসাহী হয় তাহলে তার শেখার কাজটি দ্রুত এগিয়ে চলে। যে কাজ শিক্ষাসহায়ক নয় সে কাজ থেকে তার কর্ম-প্রবণতাকে অন্যদিকে পরিচালিত করতে হলে শিক্ষাসহায়ক যে কাজ সে দিকে তার আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। অর্থাৎ যে কাজে শিক্ষার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, শিশুকে সেই সম্পর্কেই উৎসাহী করে তুলতে হবে। শিক্ষায় আগ্রহ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। যে বিষয়ে শিশুর আগ্রহ নেই, তার মনে আগ্রহ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি সে বিষয় যত প্রয়োজনীয়ই হোক না কেন তা শিশু সহজ ভাবে গ্রহণ করবে না। জোর করে চাপিয়ে দিলে তার ফল শুভ হবে না। সমস্ত শিক্ষাপদ্ধতিতেই যে বিষয় শিক্ষা দেওয়া হবে সে সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। অনিচ্ছুক শ্রোতাকে কিছু শোনাতে চেষ্টা করলে তা কানে যাবে বটে কিন্তু তা "মরমে পশিবে না।" শিক্ষার পরিবেশকে আনন্দময় করে তুলে শিক্ষার বিষয়কে সরস করে তোলবার সবরকম চেষ্টার পরও একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে শিক্ষা ব্যাপারটা সর্বক্ষেত্রেই মধুর নয়। পথ যতই মসৃন করা হোক না

কেন—চড়াই উৎরাই কিছু থাকবেই। কঠিন নীরস বিষয় আয়ত্ত করতেও শিক্ষার্থী নিরুৎসাহ হবে না যদি বিষয় সম্পর্কে শিশুর মনে উৎসাহ সৃষ্টি করা যায়। উৎসাহ বা ঔৎসুক্য বোধ করলেই শিক্ষায় শিশুর আগ্রহ জন্মাবে।

শিশুদের যখন কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হবে তখন সেই নির্দিষ্ট বিষয়টি শেখাবার উদ্দেশ্য কি, সেই বিষয়টির মধ্য দিয়ে আমরা কোন লক্ষ্যে পৌছাব সে সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর মনে একটা সুস্পষ্ট ধারণা জন্মান দরকার। কোন একটি বিষয় নির্বাচন করে তা শিক্ষা দেবার সময় সেই বিশেষ পাঠের লক্ষ্য স্থির করে যদি অগ্রসর হওয়া যায় তাহলে পাঠ (Lesson) সুশৃঙ্খল ভাবে সম্পন্ন হয়। শিক্ষার্থীর দৃষ্টি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিবদ্ধ থাকে। সেই নির্দিষ্ট পাঠ আয়ত্তের সহায়ক যে সব তথ্য উপস্থাপন করা হয় সে সব তথ্যের উপযোগিতা কি তা তারা বুঝতে পারে। বিক্ষিপ্ত তথ্য রাজি একটি সুসংবদ্ধ রূপ নেবার ফলে পাঠ সার্থক হয়। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য না নিয়ে কোন পাঠ সুরু হলে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে না তাদের সামনে প্রতিপাদ্য বিষয় কি? কি করতে চাই সেটা ঠিক করে নিলে কাজের অনেক সুবিধা। কাজ করতে গিয়ে সে বিচার করে দেখতে পারে যা করতে চাইছে তা হচ্ছে কিনা। পাঠের ক্ষেত্রেও তাই শিক্ষার্থী জানতে চায় তার নির্দিষ্ট পাঠ তাকে লক্ষ্যে নিয়ে যাচ্ছে।

পাঠের লক্ষ্য যদি ঠিক থাকে তাহলে লক্ষ্যের উপযোগী তথ্য নির্বাচনে বেগ পেতে হয় না। কোন একটি বিষয় যখন শিক্ষক শিক্ষা দেন তখন সে বিষয়টি বোঝাতে যে সকল তথ্যের প্রয়োজন তা শিক্ষককে সংগ্রহ করতে হবে। একই বিষয় শিক্ষার্থীদের বয়স ও গ্রহণের ক্ষমতা অনুসারে বিভিন্ন তথ্যের সাহায্যে বোঝান যেতে পারে। একই ইতিহাস বিভিন্ন শ্রেণীতে পড়ান হয়। এক্ষেত্রে কোন শ্রেণীর শিক্ষার্থীকে শিক্ষক কি বোঝাতে চান তা যদি স্থির থাকে তাহলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বা লক্ষ্যে পৌছবার জন্য যা দরকার শিক্ষক ততটুকু তথ্যই উপস্থাপন করবেন। লক্ষ্য অনুসারে তথ্য নির্বাচনের উপর শিক্ষার সাফল্য অনেক খানি নির্ভরশীল।

নতুন একটি বিষয়ে যখন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া হয় তখন কি ভাবে বিষয়টি শিক্ষক তাদের নিকট উপস্থিত করবেন তার উপর বোঝা না বোঝা অনেকখানি নির্ভর করে। উপস্থাপন করবার পূর্বে বিষয়টিকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করে নেওয়া দরকার। স্তর পরম্পরা বিষয়টিকে, ছাত্রদের সামনে তুলে ধরতে হবে। প্রতিটি স্তরের মধ্য দিয়ে সেদিনকার পাঠের যা উদ্দেশ্য

তাকে পরিস্ফুট করে তুলতে পারলেই পাঠ সার্থক হবে। পাঠ বোঝাবার জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ই বলা হল কিন্তু কোন নির্দিষ্ট ক্রম অনুসরণ করা হল না তা হলে দেখা যাবে শিক্ষণীয় বিষয়টি শিক্ষার্থীদের বোধগম্য হয়নি। বিক্ষিপ্ত তথ্যের মাঝে আসল বিষয় বস্তুটি হারিয়ে যাবে। পাঠকে গ্রহণযোগ্য করতে হলে শিক্ষার্থীদের মনকে শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে আগ্রহশীল করে তুলতে হলে সুনির্বাচিত তথ্যরাজিই যথেষ্ট নয়, শিক্ষকের উপস্থাপনার গুনে অনেক জটিল বিষয়ও শিক্ষার্থীরা গ্রহণ করতে পারে। স্তর বিভাগের সময় ছাত্রদের সামর্থ্যের কথা ভুললে চলবে না। একটি পর্ব শেষ হলে ছাত্রদের মনে যেন স্বাভাবিক ভাবেই পরের পর্ব সম্পর্কে কৌতূহল জাগে। তারা যেন মনে না করে একটি সম্পূর্ণ নতুন বিষয় তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে পূর্ব পাঠের সাথে তার কোন সম্পর্কই নেই। নতুনের সূত্রপাত পুরাতনের মধ্যেই হবে। একটি জিনিষ জেনে পরের জিনিষটি বুঝবার জন্য যে আগ্রহ, জানা থেকে অজানার দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা শিক্ষকের উপস্থাপনার গুণেই সার্থক হতে পারে।

"Thus, by carefull articulating the syllabus and bringing out the connexion as vividly as possible, the material can be made into a medium for continuous exploration, and each topic becomes an introduction for the next. By emphasizing the fact of connextion the abler pupils can be encouraged to adopt the attitude of expecting connextions and development, and of actively searching for these. When dealing with a syllabus which allows of this continuous development, it is advantageous to divide the material into topics and sub-topics, each of which is a comprehensible unity, at the end of which reference may be made to the next following topic, giving rise to anticipatory curiosity. The teachers can often take a leaft out of the book of the publishers of serial stories and makers screen serials and close each episode at an intriguing and exciting juncture, whetting the appetite the pupils for the next topic (M. A. Pinsent, The Principles of Teaching Method.)

কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে সহজ বোধগম্য করে তোলাবার জন্য যদি প্রয়োজন হয় তাহলে অন্য অন্য বিষয়ের অবতারণাও করা যেতে পারে। পাঠে বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য ও সরল করে তোলবার জন্য প্রাসঙ্গিক অন্য বিষয় মূল বিষয়টির সাথে উপস্থাপন করা দরকার হয়। অনুবন্ধ প্রণালীতে একটি বিষয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। ইতিহাসের সাথে ভূগোলের, ইতিহাসের সাথে সাহিত্যের যোগসূত্র স্থাপন করা খুবই সহজ—কোন কোন ক্ষেত্রে অপরিহার্য। বুনিয়াদি শিক্ষায় কেন্দ্রীয় বিষয়ের সঙ্গে অনুবন্ধ প্রণালীতে অপর সকল বিষয় শেখান হয়। প্রজেক্ট পদ্ধতিতে একটি প্রজেক্ট স্থির করে সেই প্রজেক্ট কার্যে পরিণত করতে অনুবন্ধ প্রণালীতে অনেক বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। (প্রজেক্ট ও বুনিয়াদি শিক্ষা দ্রষ্টব্য)।

একটি নতুন বিষয় শিক্ষার্থীদের শেখাবার সময় তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে বিষয়টি যদি দক্ষতামূলক-পাঠ (skilled lesson) হয় তাহলে বার বার অভ্যাস না করলে তাকে আয়ত্ত করা যায় না। যে কোন নতুন পাঠই যদি স্মৃতিতে ধরে রাখতে হয় তা হলে পুনরাবৃত্তি বা অভ্যাসের ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য শিক্ষক যখন পাঠ দেবেন তখন প্রতি স্তর বা পর্বের পর আলোচ্য বিষয়টির পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন। পাঠ বোঝা আর আয়ত্ত করা ঠিক এক নয়। কবিতা রসানুভূতি-মূলক পাঠ (appreciation lesson), বুঝিয়ে দিলে কবিতার রসগ্রহণে ও অর্থবোধে শিক্ষার্থীর কোন অসুবিধা হয় না কিন্তু শিক্ষার্থী যদি বার বার অভ্যাস না করে তাহলে কবিতাটি তার আয়ত্ত হয় না। জ্ঞানমূলক-পাঠ (Knowledge lesson) যেখানে মুখস্তের প্রয়োজন নেই সেখানে বুঝিয়ে দিলেই শিক্ষকের কাজ শেষ হল না অধীত বিষয়কে সম্পূর্ণ ভাবে আয়ত্ত করতে হলে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন আছে। অভ্যাস না করলে শেখা বিষয়টির একটা বড় অংশই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে।

শিক্ষার কয়েকটি মূলনীতি (Some Maxims of Education)

শিশুপ্রকৃতি জেনে নিয়ে যে সব প্রণালী অনুসরণ করলে শিক্ষা দেওয়া সহজতর ও আধুনিক মনোবিজ্ঞান সম্মত হবে সে সম্পর্কে আলোচনার পরও আরো কতকগুলি মূলনীতি সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার। জটিল শিক্ষা-প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে এই বহু আলোচিত ও পরীক্ষিত মনোবিজ্ঞানসম্মত নীতি গুলির যথাযথ প্রয়োগ শিক্ষার মত জটিল কাজকে সহজ করে তুলবে। আমাদের মনে রাখতে হবে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষায় ব্যক্তিগত খেয়াল খুশীর কোন স্থান নেই। শিক্ষায় একটা সুসংবদ্ধ প্রণালী ধরে আমাদের অগ্রসর হতে হবে।. এই সুসংবদ্ধ প্রণালী বা রীতিই হচ্ছে কতগুলি শিক্ষানীতিকে (Maxims of Education) মেনে চলা।

১। জানা থেকে অজানায় নিয়ে যাওয়া
(Proceed from Known to Unknown)

শিশু পূর্বে যা শিখেছে বা যা অভিজ্ঞতালাভ করেছে তার উপর ভিত্তি করে নতুন জ্ঞান লাভ করবে। শিক্ষায় হার্বার্ট যে apperceptive mass-এর কথা বলেছেন তা শিক্ষায় জানা থেকে অজানার দিকে যাবার তত্ত্বকেই স্বীকার করে। শিশুকে যখন শিক্ষা দিতে সুরু করা হয় তখন প্রথম নির্ভর করতে হবে শিশু কতটুকু জানে সেই তথ্যের উপর। সেই জানা থেকেই তার কৌতূহল জাগ্রত করে নতুন নতুন তথ্যের অবতারণা করা হবে। ছেলেরা গান্ধীজীর ছবি দেখেছে, গান্ধীজীর জন্মদিনে ছুটি পায়। অথচ তাঁর জীবনী সম্পর্কে তাদের জ্ঞান সুস্পষ্ট নয়। এই সামান্য সূত্র থেকেই গান্ধীজীর জীবনী ও আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ধীরে ধীরে ছেলেদের কাছে উপস্থাপন করা সম্ভব। শিক্ষার স্তর বিভাগ আলোচনায় আমরা দেখেছি স্তরগুলি এমন ভাবে ভাগ করা হয় যার ফলে একটি নতুন পর্ব বাস্তবে সুরু হল তখন তাকে নতুন বলে মনে হবে না। পূর্ববর্তী স্তরের স্বাভাবিক পরিণতি রূপেই যেন আমরা সেখানে এসে পৌঁছেছি এমনি ভাবে নতুন পর্বটি উপস্থাপিত হবে। একটি পর্বের সাথে সাথে অপরটি হবে দৃঢ় সন্নিবদ্ধ। শিক্ষায় পূর্বজ্ঞানকে ভিত্তি করেই আমাদের নতুনের দিকে যাত্রা করতে হবে।

২। সহজ থেকে জটিলের দিকে যাওয়া

(Proceed from Simple to Complex)

শিক্ষক মাত্রেই এই নীতিকে জানেন ও মেনে চলেন, এটা সাধারণ ভাবেই আমরা বুঝতে পারি যে শিক্ষার একটা ক্রম রয়েছে। সেখানে সহজ থেকে ধীরে ধীরে আমাদের কঠিনের দিকে অগ্রসর হতে হবে। সহজ থেকে কঠিন বা জটিলের দিকে যাওয়া কথাটা যত সহজ ভাবে বলা হয় প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা তত সোজা নয়। সহজ (simple) কথাটা আপেক্ষিক (relative)। একে শিক্ষার্থীর বয়স ও মানসিক বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। যুক্তির দিক থেকে (logically) বিচার করে শিশুর কাছে সহজ বলে যা আমাদের মনে হয় মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে (Phycho-logically) বিচার করে প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে তা শিশুর কাছে সব সময় সহজ হয় না। আমরা জানি একটি সম্পূর্ণ বাক্য শেখানোর আগে একটি একটি করে শব্দ শেখানো যুক্তির দিক থেকে সঙ্গত। কিন্তু কার্যত দেখা গিয়েছে ছোট ছোট বাক্য দিয়ে সুরু করলে ভাষাশিক্ষা সুষ্ঠু ও সহজ হয়। তেমনি সরল রেখা বক্ররেখা প্রভৃতি নানাবিধ রেখা আঁকতে পারদর্শী করে চিত্র আঁকতে শেখানোর চেষ্টা যতটা কার্যকরী হবে তার চেয়ে শিশুর সামনে একটি সহজ চিত্র তুলে ধরে আঁকতে দিলে সে আঁকায় বেশী উৎসাহ বোধ করবে। অর্থাৎ যুক্তি নির্ভর হয়ে শিশু মনোবিজ্ঞানের দিকে চোখ বুজে থাকলে সহজ জটিল বুঝতে ভুল হবে। সহজ বলতে শিশু যাকে সহজ মনে করবে তাই সহজ—If the teacher applies the maxim literally it might lead him to the mistaken notion of analysing the subject-matter for the child and then teaching the elements which then have to be confind into more complex wholes, e. g. alphabetical method of teaching, reading, or an introduction to geometry which being with defination, axioms and pos-tulate (A Short History of Educational Ideas By S. J. Curtis and M. E. A. Boult wood).

এই নীতিকে যদি শব্দগত অর্থ (literal meaning) অনুযায়ী প্রয়োগ করতে চেষ্টা করা হয় তাহলে ভুল হবে। শুধু এই নীতিটি নয় শিক্ষার প্রতিটি নীতির প্রয়োগের সময় তার তাৎপর্য নির্ণয় করতে হবে শিশু-প্রকৃতি ও মন

বুঝে। শিশুর কাছে বিষয়বস্তু কি ভাবে উপস্থাপন করলে শিশুর পক্ষে গ্রহণ করা সহজ সাধ্য হবে সেই ভাবেই আমাদের শিক্ষার নীতি সমূহ প্রয়োগ করতে হবে।

৩। মূর্ত থেকে বিমূর্ত বিষয়ের দিকে যাওয়া
(Proceed from Concrete to Abstract)

যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, চোখে দেখে হাতে ধরে যাকে বোঝা যায় শিশুরা প্রথমে তাকেই চিনে নেয়। তাদের চিন্তায় প্রথম আসে মূর্ত জিনিষটি, ধীরে ধীরে তারা বিমূর্তের ধারণা করতে পারে। প্রথমে শিশু একটি পাখী দেখে—একটি দুটি এমনি করে বহু পাখী দেখবার পর পাখী সম্পর্কে তার সাধারণ ধারণা জন্মায়। ছেলেদের অঙ্ক শেখানোর সময় দেখা গিয়েছে যোগ-বিয়োগের সাধারণ নিয়ম প্রথমেই বোঝাবার চেষ্টা না করে কোন জিনিষ (যেমন মার্বেল), যদি তাদের হাতে ধরিয়ে শেখাবার চেষ্টা করা যায় তাহলে ভাল ফল পাওয়া যায়। তবে মনে রাখতে হবে সাধারণ নিয়ম শেখানোই আমাদের লক্ষ্য। প্রত্যক্ষগোচর দ্রব্যটি যত শীঘ্র সম্ভব বাদ দিয়ে সাধারণ সূত্রের দিকে যাওয়া যাবে আমাদের কাজ ততই সার্থক হবে। নীতিটিকে স্মরণ রেখে শিক্ষক তাঁর নব নব উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে শিক্ষার ব্যাপার এগিয়ে যাবেন।

৪। বিশেষ থেকে সাধারণের দিকে যাওয়া
(Proceed from Particular to General ,

নির্দিষ্ট বস্তুর ধারণা থেকে সাধারণ সূত্রগঠন যুক্তিবিজ্ঞানে আরোহী পদ্ধতি (Inductive Method) অনুসারে করা হয়। প্রথম আমরা উদাহরণ দিয়ে সুরু করি তারপর সাধারণ সূত্রে পৌছাই। বহুক্ষেত্রে আগুন ও ধোঁয়ার সাথে অজাঙ্গী সম্পর্ক দেখেই আমরা যেখানে ধোঁয়া সেখানেই আগুন সিদ্ধান্ত করি। এখানে কয়েকটি ঘটনা যা আমরা অবলোকন করেছি তা হচ্ছে মূর্তজ্ঞান(concrete example) তারপর যে সাধারণ সিদ্ধান্ত করা হল তা হচ্ছে বিমূর্তজ্ঞান (abstract conception.)

৮। যুক্তির পথ বনাম মনোবিজ্ঞানের পথ
(Logical vs. Psychological)

এর পূর্বে আমরা শিক্ষায় যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্ত ও শিক্ষায় শিশু-মনোবিজ্ঞানের বাস্তব প্রয়োজনের দিক নিয়ে আলোচনা করেছি। বিষয় বস্তুর উপস্থাপনায় আমরা যুক্তিনির্ভর পথ অনুসরণ করি। নির্দিষ্ট পাঠের পর্ব বিভাগ করে যুক্তিসিদ্ধ পথ ধরে আমরা লক্ষ্যে পৌছাবার চেষ্টা করি। শিশু-মনোবিজ্ঞান নির্দিষ্ট বিষয়পাঠে শিশুমনে কি প্রতিক্রিয়া হল তা বিচার করা হয়। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে শিশুর মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথা বিচার করে যুক্তিসিদ্ধ পথের সংস্কার করতে হবে। যখন যুক্তি তর্ক দিয়ে বিচার করে শিশুশিক্ষার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয় তখন সেখানে আমাদের বিচার বুদ্ধিই প্রাধান্য লাভ করে। শিশুর মন তাকে কি ভাবে গ্রহণ করবে সেটা হয়ে দাঁড়ায় গৌণ। শিক্ষার প্রথম অবস্থায় মনোবিজ্ঞানের পথই প্রসস্ত। সহজ থেকে জটিলের দিকে যাওয়ার নীতি অনুসারে অঙ্কনের ক্ষেত্রে সরল রেখা, বক্র রেখা প্রভৃতি আঁকিয়ে হাত পাকালে একটি পুরো চিত্র আঁকা সহজ হয়। শিশুর সামনে একটি পশুর চিত্র রেখে তাকে বিভিন্ন রকমের রেখা আঁকতে দিলে সে বিশেষ উৎসাহ বোধ করবে না। সে প্রথমেই গোটা ছবিটা আঁকতে চাইবে। শিশুর মনের দিকে চেয়ে শিশুর চাওয়াকেই মেনে নিতে হবে। শিশু কিছুটা অগ্রসর হলে শিশুর চিন্তায় শৃঙ্খল আসে—তার চিন্তা ধারা একটা নির্দি পথ ধরে অগ্রসর হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে শিশুমন অপরিণত —এই অপরিণত অবস্থায় সে যা গ্রহণ করতে পারবে, যে পথে অগ্রসর হবে তার পক্ষে শেখা সহজ হবে শিশুর শিক্ষায় সেই পথই অনুসরণ করতে হবে, যুক্তির পথ আমাদের নির্দেশ দেয় 'যা হওয়া উচিত'—কিন্তু শিশু পক্ষে উচিত-অনুচিত জ্ঞান জন্মবার জন্য সময়ের প্রয়োজন। যুক্তিসি প্রণালীর অবদান পরিণত বুদ্ধির কাছে। মনোবিজ্ঞানের প্রণালীতে শিশু কি হওয়া উচিত ছিল, সেটা বড় কথা নয়, শিশু যে অবস্থায় সেখান থেকে তার যাত্রা শুরু। শিশু মনের গতি-প্রকৃতিকেই মনোবিজ্ঞানী জানতে চাইবে—তার শিক্ষা মনের গতিকেই অনুসরণ করবে। শিক্ষায় আম মনোবিজ্ঞানের পথ ধরেই যুক্তিসিদ্ধ পথে পৌছাতে পারি। যখন শিক্ষ, শিক্ষার্থী অপেক্ষা বিষয়বস্তুর প্রাধান্য ছিল তখন শিক্ষক শিশুমনের দিকে লক্ষ

দেবার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করতেন না। বিষয়বস্তুর সুসংবদ্ধ বিন্যাসের উপরই জোর দেওয়া হত। আধুনিক শিশু-মনোবিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন সুশৃঙ্খলভাবে ধাপে ধাপে অগ্রসর হবার যুক্তিনির্ভর যে প্রণালী আমরা এতদিন অনুসরণ করেছি শিশুশিক্ষার পক্ষে সে পথই সর্বোত্তম পন্থা নয়। সহজ থেকে জটিলের দিকের নীতি আলোচনা কালে আমরা দেখেছি যুক্তির বিচারে যা সহজ, শিশুর মন তাকে সব সময় সহজ বলে মেনে নিতে চায় না। তাই আজকের দিনে ভাষাশিক্ষায় একটি শব্দ শিখিয়ে সুরু না করে প্রত্যক্ষ্য রীতি (direct method) অনুসারে বাক্য দিয়ে সুরু হয়—শিশু সম্পূর্ণ মনের ভাবকে প্রকাশ করতে সুযোগ পেলে তার শেখা সহজ হয়।

শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতা বিকাশ লাভ যাতে হয় শিক্ষক সেই চেষ্টাই করবেন—তবে তা সুরু হবে শিশু-মনোবিজ্ঞানকে অনুসরণ করে। শিক্ষায় যুক্তির পথে আমাদের আসতে হবেই কিন্তু শিশুর মন ও তার বিচার বুদ্ধি পরিণত হবার পূর্বে তার উপর কিছু চাপিয়ে দিলে তার ফল শুভ হয় না, সেইজন্য তার মন প্রস্তুত করতে হবে। শিশুর জ্ঞানের পরিধি ধীরে ধীরে বাড়বে। শিশুর শিক্ষা কিছুদূর অগ্রসর হবার পর তার মানসিক গঠন উপযুক্ত হলে যুক্তিসিদ্ধ প্রণালী শিক্ষায় প্রয়োগ করতে পারা যায়।

৬। আরোহী ও অবরোহী পদ্ধতি

(Inductive and Deductive Method)

যুক্তিসিদ্ধ শিক্ষার পথে আমরা দু'টি পদ্ধতির অনুসরণ করি। একটি আরোহী পদ্ধতি অপরটি অবরোহী পদ্ধতি। শিশুশিক্ষার প্রথম অবস্থায় কতকগুলি উদাহরণ তার সামনে তুলে ধরা হয় কিম্বা নিজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে একটা জিনিষের বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সাথে পরিচিত হবার পর সে সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণায় উপস্থিত হয়। আগুনে নিজে হাত পুড়িয়ে বা বিভিন্ন জিনিষ আগুনে পুড়তে দেখেই শিশু অগ্নির দাহিকা শক্তি সম্পর্কে ধারণা করতে শেখে। কাঠ জলে ভাসে—টুকরো টুকরো কাঠ জলে ভাসিয়ে বা ভাসতে দেখেই সে এই সিদ্ধান্তে আসে। মানুষ মরণশীল—মানুষ মরছে এই দৃষ্টান্ত দেখিয়েই তাকে এ কথা বোঝান সম্ভব।

দৃষ্টান্ত থেকে সাধারণসূত্রে পৌছান শিশুর পক্ষে সহজ সাধ্য নয়, তবুও যাতে তারা নিজেরা পর্যবেক্ষণ করে চিন্তা করে, কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারে সে চেষ্টা করা দরকার। জানা থেকে অজানায় যাওয়া (From known to unknown), বিশেষ থেকে সাধারণ সূত্র গঠন (From Particular to general) ইত্যাদি নীতির ক্ষেত্রে এই আরোহী পদ্ধতিকেই সক্রিয় দেখা যায়। মনে রাখতে হবে আমরাই যদি শিশুর হয়ে সূত্র গঠন করি তাহলে আরোহী পদ্ধতি মূল্যহীন হয়ে পড়ে। শিশুর চিন্তাশক্তির বিকাশ, যুক্তিপ্রয়োগ করবার ক্ষমতা বৃদ্ধির মধ্যেই এই আরোহী পদ্ধতির সার্থকতা।

কোন সূত্র গঠিত হলে সেই সূত্রকে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে যাচাই করে দেখা দরকার। সাধারণ সূত্রকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাকে বলা হয় অবরোহী পদ্ধতি। এখানে আমরা সাধারণ থেকে বিশেষের দিকে আসি (Proceed from general to particular)। মানুষ মরণশীল, রাম একজন মানুষ—তাই রাম মরণশীল। এখানে মানুষ মরণশীল এই সাধারণ সূত্রটি রাম নামক বিশেষ মানুষটির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। শিশু যখন কয়েকটি উদাহরণ থেকে সাধারণসূত্রে পৌছাল, তারপর সেই সাধারণ সূত্রকে আবার বিশেষ ক্ষেত্রে সে প্রয়োগ করতে পারে কিনা তাও দেখা দরকার। এতে যেমন সাধারণসূত্রের পরীক্ষা হয় তেমনি প্রয়োগের (application) মাধ্যমে শিশুর জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। যুক্তিনির্ভর শিক্ষার ক্ষেত্রে আরোহী ও অবরোহী দু'টি পদ্ধতিরই ব্যবহার করতে পারা যায়। একই পাঠে উভয় পদ্ধতির প্রয়োগ করলে শিক্ষার্থীর যুক্তি প্রয়োগের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রেণীশিক্ষা ও শিক্ষার পদ্ধতি

'শিশুর প্রকৃতিকে জেনে মনোবিজ্ঞানের সহায়তায় যুক্তি সিদ্ধ পথে ব্যক্তিগত শিক্ষার শ্রেষ্টতা আধুনিক বহু শিক্ষাব্যবস্থায় স্বীকৃত হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে দেখা যাবে সব ছেলে মেয়ে প্রায়ই একই রকমের তবুও তাদের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য রয়েছে। একটি শিশু আরেকটি থেকে বিভিন্ন আবার একই শিশু বিভিন্ন সময়ে ভিন্নরূপ আচরণ করে। ছেলেদের প্রকৃতিতে এই ব্যক্তিগত বৈষম্য এই বৈষম্যকে মেনে নিয়েই মন্তেসরী পদ্ধতি, মিসেস পার্ক হার্স্টে এর ডাল্টন পদ্ধতি, উইনেটকা পদ্ধতি প্রভৃতি বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে। ব্যক্তিগত শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুরা তাদের শক্তি-সামর্থ্য অনুসারে শিক্ষা করে। শিক্ষক বা পরিচালিকা তাদের কাজ দেখাশুনা করেন ও প্রয়োজনীও ক্ষেত্রে সাহায্য করেন। মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তিগত বৈষম্য তাকে মেনে নিয়ে ব্যক্তিমুখীন শিক্ষাব্যবস্থা করায় বিশেষ সুফল পাওয়া গিয়েছে। শ্রেণীশিক্ষায় ব্যক্তিগত দোষত্রুটিগুলি সংশোধনের সুযোগ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। শ্রেণীশিক্ষায় শিক্ষকই সমস্ত ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করেন। শিশুর স্বাধীনতা এখানে সীমিত—শিশু নিজ বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ বা বিকাশের কোন সুযোগ শ্রেণীগত শিক্ষায় পায় না। মেধাবী ছাত্র ও পশ্চাৎপদ ছাত্র সবার ক্ষেত্রেই এই শিক্ষার কতকগুলি অসুবিধা রয়েছে। শ্রেণীগত শিক্ষার বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করবার উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন ব্যক্তিগত শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তিত হয়।

যদিও শিশুকেন্দ্রিক আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয় "It has told the knell of class teaching" (Sir John Adams), তবুও যেখানে ব্যাপকভাবে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে সেখানে শ্রেণীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। প্রতিটি শিশুর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তার উপযোগী করে ব্যক্তিগত শিক্ষাব্যবস্থায় যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় শ্রেণীশিক্ষায় তা সম্ভব নয়। তবুও যখন শিক্ষাপদ্ধতি নির্দ্ধারণের প্রশ্নটি আমরা বিচার করব তখন বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তা করা দরকার। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় শ্রেণীশিক্ষারই প্রাধান্য। আমরা একই শ্রেণীতে ২৫।৩০টি

ছাত্রকে নিয়ে একসাথে শিক্ষা দেই। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি শ্রেণীশিক্ষাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করে নিয়ে শ্রেণীশিক্ষার সুবিধা-অসুবিধা আলোচনা করে কিভাবে শ্রেণীশিক্ষার ত্রুটিকে যথাসম্ভব দূর করে একটি আদর্শ শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে তোলা যায় সেই কথাই আমাদের চিন্তা করতে হবে।

শ্রেণীশিক্ষা :—শ্রেণীশিক্ষা বলতে আমরা বুঝি একই বয়সের (Chronological age) কয়েকজন শিক্ষার্থীকে যাদের মানসিক শক্তি ও মেধা (mental age) প্রায় একইরকমভাবে বিকাশলাভ করেছে বলে আমাদের বিশ্বাস, তাদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (ধরা হোক ১ বছর) একটি পূর্বনির্দ্ধারিত পাঠক্রমকে একই সাথে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই পাঠক্রম ধাপে ধাপে শিক্ষার্থীর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সহজ থেকে জটিলতর বিষয়ের দিকে নিয়ে যায়।

সুবিধা :—শ্রেণীশিক্ষায় সাধারণভাবে দেখা যায় একই শ্রেণীর অনেক ছাত্র প্রায় একই রকম অসুবিধার সম্মুখীন হয়। ব্যক্তিগত শিক্ষায় প্রতিটি ছাত্রকে ভিন্ন ভিন্ন করে একই জিনিষ বোঝাবার ব্যবস্থা করতে হয়। শ্রেণীশিক্ষায় এক সাথে ২৫।৩০টি ছাত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় বলে শিক্ষকের বহু সময় বেঁচে যায়—শক্তিও অনেক কম ব্যয় হয়। ব্যক্তিমুখীন শিক্ষায় যে পরিমাণ শিক্ষকের প্রয়োজন শ্রেণীশিক্ষায় তার চেয়ে অনেক কম শিক্ষক দিয়ে সে কাজ পাওয়া যায়। এর ফলে অল্প লোক দিয়ে, অনেক কম সময়ে কম শক্তি ও অর্থ ব্যয় করে অধিকতর লোকের শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব। ব্যক্তিমুখীন পাঠের ক্ষেত্রে উপকরণ ও নানারূপ সাজসজ্জা যত বেশী প্রয়োজন হয় শ্রেণীশিক্ষায় পাঠের সাজ সরঞ্জাম ও বহু প্রকার উপকরণও অনেক কম প্রয়োজন।

শ্রেণীশিক্ষায় সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি পায়। শ্রেণীশিক্ষায় ছেলেরা দলগত সংস্কার দ্বারা পরিচালিত হয়ে কাজ করে। শ্রেণীতে যখন কোন একটি বিষয়ের পাঠ চলে তখন যোগ্য শিক্ষক যদি সবার মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেন তাহলে সবাই সমানভাবে পাঠে অংশ গ্রহণ করে সুন্দরভাবে পাঠটি শেষ করতে পারে। একই সাথে কাজ করা ও শেখা এর মধ্য দিয়ে যে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে ওঠে তাই হচ্ছে শ্রেণীশিক্ষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

শ্রেণীশিক্ষায় পরস্পর সহযোগিতা ও সাহায্যের সুযোগ রয়েছে। কোন বিষয়ে যদি একটি ছেলে দক্ষতা অর্জন করে সে সেই বিষয়ে তার সহপাঠীকে

সাহায্য করতে পারে। আবার সে যদি কোন বিষয়ে পিছিয়ে থাকে তাহলে তাকে শ্রেণীর অপর কোন ছেলে সাহায্য করতে পারে। এরূপ পারস্পরিক সাহায্যে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দিলে শ্রেণীর সবাই উপকৃত হয়—"This attitude, that some are good at one thing some another, and those who are good must really help those who are not, seems epitomize the right tone in the class room" (N. Cathy. A first Book on Teaching)

শ্রেণীশিক্ষায় শিক্ষার্থীর মধ্যে উৎসাহ ও আগ্রহের সৃষ্টি করা সহজ—দেখা গিয়েছে শ্রেণীশিক্ষায় উৎসাহবোধটা অনেকটা সংক্রামক। ব্যক্তিগত শিক্ষায় ছেলেরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কাজ করে। একজন জানে না আরেকজন কি করছে—ফলে একজনের মনোভাব (উৎসাহ কি আগ্রহ) আরেকজনের মধ্যে সংক্রামিত হবার সুযোগ পায় না। শ্রেণীশিক্ষায় শিক্ষক সমগ্র শ্রেণীর মধ্যে একটা উদ্দীপনার সৃষ্টি করে কাজটি সুষ্ঠুভাবে শেষ করতে পারেন।

শ্রেণীশিক্ষায় একজন অপর জনকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। একটি ছেলে যখন এগিয়ে চলে তখন অপর ছেলেদের মাঝেও সেভাবে এগিয়ে চলার প্রেরণা আসতে পারে। শিক্ষায় কিছুটা প্রতিযোগিতা থাকা ভাল—শ্রেণীশিক্ষায় সে সুবিধা রয়েছে। তবে যেন অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা না হয় তা দেখতে হবে।

রসানুভূতিমূলক পাঠে (appreciation lesson) শ্রেণীশিক্ষার উপযোগিতা এত বেশী যে তার ফলে যেখানে শিক্ষাপদ্ধতি ব্যক্তিমুখীন সেখানেও রসানুভূতিমূলক পাঠ শ্রেণীগতভাবে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

শ্রেণীশিক্ষার অসুবিধা ও অসুবিধা দূরীকরণের উপায়:—শ্রেণীশিক্ষা ব্যবস্থার একটি পূর্ব-সিদ্ধান্ত হচ্ছে, একই শ্রেণীতে যাদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তাদের পাঠ গ্রহণ ক্ষমতা ও ধারণশক্তি একই রকম এবং তাদের মানসিক গঠনও অনেকখানি একই রকম। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় একটি শ্রেণীতে প্রতিটি ছাত্র একে অপর থেকে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বিভিন্ন। একই শ্রেণীতে একই মানের শিক্ষার্থী সমাবেশের যত চেষ্টাই করা হোক না কেন শ্রেণীর সবচেয়ে ভাল ছেলেটির সাথে সবশেষের ছেলেটির মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান থেকে যাবেই। মানসিক গঠন ও বৌদ্ধিক বিকাশ কোনদিক থেকেই একই রকম ছেলে পাওয়া যায় না। তাই শিক্ষক যখন একটি শ্রেণীতে শিক্ষা দেন তিনি দেখতে পান তার সামনে যারা রয়েছে

যাদের তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন তাদের মানসিক গঠন, বুদ্ধির বিকাশ, গ্রহণের ক্ষমতা, জ্ঞানের পরিধি প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই একটা বৈষম্য রয়ে গিয়েছে। অথচ তাঁকে একই সাথে এই বিভিন্নমুখী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতে হবে। শ্রেণী-শিক্ষার এটাই সবচেয়ে বড় অসুবিধা, শিক্ষক কোন ছেলেদের দিকে দৃষ্টি রেখে পাঠপদ্ধতি স্থির করবেন। যে দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই শ্রেণীর মান নির্ণয় করুন না কেন সবার সমান উপকার শ্রেণীশিক্ষায় সম্ভব নয়। ভালর দিকে চাইলে মন্দরা কিছু বুঝবে না। শুধু মন্দ ছেলেদের কথা মনে করে তাদের দিকে চেয়ে পাঠ পরিচালনা করলে ভালদেরও টেনে পিছনে নিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার একমাত্র উপায় হচ্ছে যারা মাঝামাঝি তাদের দিকে চেয়ে পাঠ পরিচালনা করা। অবশ্য এতেও যে অসুবিধা নেই তা নয়—ভাল মন্দ দু'দিক থেকেই আপত্তি আসতে পারে। এক্ষেত্রে মেধাবী ছেলেদের পাঠের অগ্রগতি ব্যাহত হয়, আবার পশ্চাৎপদ ছেলেদের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু কয়েকটি মাত্র ভাল ও কয়েকটি মাত্র মন্দ ছেলেদের জন্য অধিকাংশ ছেলের পাঠের ক্ষতি সম্ভব নয়। কারণ দেখা গিয়েছে একটি শ্রেণীতে মাঝামাঝি রকমের ছাত্র সংখ্যাই বেশী। কঠোরভাবে ক্লাস প্রমোশন নিয়ন্ত্রণ করলে হয়ত এই ত্রুটি কিছুটা দূর করা যায় কিন্তু শিক্ষক মাত্রেই জানেন আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ক্লাস প্রমোশনে কঠোরতা অবলম্বন করার পথে কতগুলি বাস্তব অসুবিধা রয়েছে তাই এই পন্থা কার্যকরী করা সম্ভব নয়।

শ্রেণীশিক্ষার অসুবিধা রয়েছে অথচ এদেশের শিক্ষা থেকে শ্রেণীশিক্ষা ব্যবস্থা লোপ করার কোন সম্ভাবনা অদূর ভবিষ্যতেও আছে বলে আমাদের মনে হয় না। তাই বাস্তব অবস্থাকে মেনে নিয়ে প্রচলিত শ্রেণীশিক্ষাকে যতটা সম্ভব দোষ মুক্ত করার চেষ্টা আমাদের করতে হবে। শিক্ষক হিসাবে আমরা ব্যক্তিগত শিক্ষাপদ্ধতির গুণাগুণ বিচার করে তার মধ্যে যতটা সম্ভব শ্রেণীশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারলে আমাদের কাজ সার্থক হয়েছে বলে মনে করতে হবে। কোন উদ্যোগী শিক্ষক যদি কোন পদ্ধতি অনুসরণ করে সুফল পান তিনি তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারেন। সাধারণ উপদেশ শিক্ষকদের যা দেওয়া হয় তা অনুসরণ করেও এই সমস্যাটিকে আমরা শিক্ষকের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন কোরব। শিক্ষকদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা সর্বক্ষেত্রে বাঁধাধরা নিয়মের পথ অনুসরণ করে চলে না। তাই বাস্তব অভিজ্ঞতা আমাদের ক্ষেত্রবিশেষে কাজে লাগাতে হবে। শ্রেণীশিক্ষার

অসুবিধাকে মেনে নিয়ে যথাসম্ভব এই ব্যবস্থার দোষ ত্রুটিগুলি দূর করার চেষ্টা করা দরকার।

শ্রেণীশিক্ষার প্রধান সমস্যা হচ্ছে শ্রেণীগঠন কি রীতিতে হওয়া উচিত তা স্থির করা। বহু অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভিমত হচ্ছে, একই রকম ছেলেদের নিয়ে সমজাতীয় দল বা শ্রেণী গঠন করতে হবে। এই সমজাতীয় দল বিভিন্ন ভাবে গঠন করা যেতে পারে। যেমন—একই রকমের ছেলে মেয়েদের নিয়ে দল, যে সব ছেলে মেয়ে পড়ায় একই রকম দক্ষতা দেখিয়েছে তাদের নিয়ে দল, একই বুদ্ধ্যাঙ্ক সম্পন্ন ছেলেদের নিয়ে দল—প্রভৃতি বিভিন্ন রকমে দল গঠন করবার কথা আমরা জানি। দল গঠনের এসব অভিমত নিয়ে আলোচনা করলে কতগুলি অসুবিধা স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দেবে। একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে একই বয়সের ছেলেদের নিয়ে যে দল গঠন করা হল, কিছুদিন বাদেই তাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সমবয়সী ছেলে-মেয়ে নিয়ে যে শ্রেণী বা দল গঠন করা হয় তার মধ্যে বিশেষ বুদ্ধিমান, সাধারণ বুদ্ধিমান, নির্বোধ বা পশ্চাৎপদ অর্থাৎ যাদের আমরা বলে থাকি ভাল-মাঝারি-মন্দ এই তিনটি ভাগ স্বাভাবিক ভাবেই এসে যাবে। কেহ কেহ একই শ্রেণীর ভাল-মন্দ-মাঝারি এদের নিয়ে বিভিন্ন বিভাগ section-গঠন করবার কথা বলেন। এতে প্রথম আপত্তি আসবে অভিভাবকদের পক্ষ থেকে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি অভিভাবকেরা প্রায়ই অনুরোধ করেন তার ছেলেটিকে যেন 'A' section-য়ে দেওয়া হয়। তাঁরা ধরে নেন যত ভাল ছেলে বুঝি 'A' section-য়ে দেওয়া হয় ও সেখানে পড়া ভাল হয় তাই সেখানে দিলে তার ছেলের পড়া ভাল হবে। যদি একই শ্রেণীর ভাল-মন্দ-মাঝারি ছেলেদের নিয়ে A-B-C এই তিনটি বিভাগ সৃষ্টি করা হয় তাহলে 'C' অর্থাৎ 'মন্দ' এই ভাগের ছেলেদের মধ্যে একটা হীনমণ্যতা বোধের সৃষ্টি হবে ও 'A' এই বিভাগের ছেলেদের মধ্যে নিজেদের সম্পর্কে উচ্চ ধারণার সৃষ্টি হয়ে তাদের মনের ভারসাম্য নষ্ট হবে। অর্থাৎ দু'দিক থেকেই মানসিক বিপর্যয় সৃষ্ট হবার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই এ পদ্ধতি মনোবিজ্ঞান সম্মত নয়। তারপর তিনটি বিভাগ করবার মত পর্যাপ্ত ছাত্র নাও থাকতে পারে। দু'চারটি ছেলে নিয়ে বিভাগ সৃষ্টি করবার আর্থিক সঙ্গতি স্কুলের থাকে না। পাঠ আয়ত্ত করবার ক্ষমতা অনুযায়ী দল গঠন করাও সহজ নয়। একই ছেলে একটি বিষয় আয়ত্ত করতে যে দক্ষতা দেখাবে অপর একটি বিষয় আয়ত্ত করতে একইরূপ দক্ষতা তার নাও থাকতে পারে।

সমজাতীয় ছেলেদের নিয়ে শ্রেণী বা দল গঠন করার প্রচেষ্টা খুবই বাঞ্ছনীয় কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে একমাত্র বয়সের ক্ষেত্রে ছাড়া সমজাতীয় দলের সমস্ত আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। ক্ষমতায়, আগ্রহে, ঔৎসুক্যে, দক্ষতায় বিভিন্ন দিক থেকে সমজাতীয় দলে বৈষম্য দেখা দেবেই। সাধারণ (average standard) বলতে আমরা যা বুঝি প্রকৃত পক্ষে সেটাও ঠিক সিদ্ধান্ত নয়—কারণ ব্যক্তিগত পার্থক্য (individual difference) থেকে যাবেই।

এরপর স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন হবে তাহলে ব্যক্তিগত শিক্ষাব্যবস্থা' ছাড়া অন্য কোন পথ কি আর নেই। কিন্তু শিক্ষার প্রসার যে ভাবে হচ্ছে তাতে এই গরীব দেশের পক্ষে ব্যক্তিগত শিক্ষাব্যবস্থার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। তাই শ্রেণীশিক্ষার বর্তমান কাঠামোর মধ্যেই সুষ্ঠু পঠন-পাঠন ও শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের চেষ্টা করতে হবে। শ্রেণীশিক্ষায় শিক্ষক সতর্ক না হলে প্রায়ই ছাত্রেরা নিষ্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। ছাত্ররা শিক্ষকের কথা শোনা ছাড়া তাদের পাঠের আর কোন অংশ গ্রহণ কববার আছে বলে মনে করে না। অনেকে পাঠ মন দিয়ে শোনেও না। একজন শিক্ষকের পক্ষে পড়াবার সময় সব কয়েকটি ছেলে মনদিয়ে পড়া শুনছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখা কষ্টসাধ্য। কিন্তু সার্থক-শিক্ষকের বিচারের কষ্টিপাথরই হচ্ছে ক্লাস-নিয়ন্ত্রণ ও ক্লাসের সব কয়টি ছেলেকে পাঠে মনোযোগী রাখা।

শ্রেণীশিক্ষায় শিক্ষক সবাইকে পড়ান। সবাই সমবেত ভাবে একটি সমস্যার সমাধান করে। এই সবাই মিলে পারাটাকে প্রায়ই ব্যক্তি বিশেষের পারা বলে ভুল করা হয়। অর্থাৎ একটি সমস্যামূলক পাঠ সমবেতভাবে সমাধান করবার পর জিজ্ঞেস করলে সবাই বলবে বুঝেছি। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জিজ্ঞেস করলে দেখা যাবে অনেকেই উত্তব দিতে পারছে না। সমবেত প্রচেষ্টায় একটা সমস্যার সহজ সমাধান হতে পারে কিন্তু তাকে আয়ত্ত করতে হবে ব্যক্তিগতভাবে। শিক্ষার্থীরা 'বুঝেছি' বললেই শিক্ষক যদি মনে করেন তাঁর কর্তব্য শেষ হয়েছে তাহলে ভুল করা হবে। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সবাইকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে হবে তারা বিষয়টি ব্যক্তিগতভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছে কি না। প্রশ্ন করলে বহুক্ষেত্রেই দেখা যায় ছেলেরা উত্তর দিতে পারছে না। সমবেত সঙ্গীতে যে ছেলে অংশ গ্রহণ করল তাকে একা গাইতে দেওয়া হলে সে তা পেরে উঠবে না। শ্রেণীশিক্ষা যেন সমবেত-সঙ্গীতের মত না হয় তা দেখতে হবে। একটি অঙ্ক বোর্ডে করে দেওয়ার

সময় ছেলেরা মাথা নাড়লেই তুষ্ট হলে চলবে না। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অঙ্কটি করতে পারল কিনা তাও জেনে নিতে হবে। সমষ্টিগত ভাবে শিখে ব্যক্তিগত ভাবে তাকে প্রয়োগ করতে পারলেই তার শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে।

আমরা দেখেছি ব্যক্তিগত শিক্ষায় শিক্ষার্থীর সুপ্ত সম্ভাবনাকে যেভাবে বিকাশের সহায়তা করা যায় শ্রেণীশিক্ষায় প্রতিটি ছাত্রকে সেভাবে সহায়তা করবার ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। (শ্রেণীশিক্ষায় গোষ্ঠী-বোধ যেভাবে জাগ্রত হয়—ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে ততটা সহায়ক নয়। একই সাথে শিক্ষাদেবার কালে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বিকাশের সুযোগ না পেয়ে অনেকটা ছাঁচে ঢালা জিনিষের মত গড়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে নানারূপ প্রশ্ন করে শিক্ষায় যাতে শিক্ষার্থীরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারে সেই সুযোগ সৃষ্টি করে শ্রেণী পাঠের ত্রুটি দূর করতে হবে। শ্রেণীর সব ছাত্রেরমধ্যে একই সাথে আগ্রহ ও উৎসাহ সৃষ্টি—তাদের পাঠ গ্রহণে সক্রিয় করে তুলবার দায়িত্ব শিক্ষকের। অভিজ্ঞ শিক্ষক যদি এই দায়িত্ব পালনে সক্ষম হন তাহলে শ্রেণীশিক্ষার ত্রুটি দূর করা অনেকটা সম্ভব।

ব্যক্তিগত শিক্ষায় ব্যক্তিত্ব বিকাশের যে সুযোগ রয়েছে শ্রেণীশিক্ষায় তা নেই—এই অন্তরায় দূর করতে হলে শিক্ষার্থীদের জন্য সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীর (Co-curricular activities) ব্যবস্থা করতে হবে ও শিক্ষার্থীরা যাতে তাতে অংশ গ্রহণ করে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। বিদ্যালয়ের নানারূপ সহপাঠক্রমিক কাজে ছেলেরা যদি অংশ গ্রহণ করে তাহলে শ্রেণীকক্ষে দলবদ্ধ পাঠে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার যে অসুবিধা শ্রেণীকক্ষের বাইরে সে অন্তরায় আর থাকে না। পাঠবহির্ভূত বিভিন্ন কাজে অংশ গ্রহণ করে সে নিজের সম্ভাবনা ও সুপ্ত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সার্থক করে তুলতে পারে।

ব্যক্তিগত শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেও একথা বলা যায় যদি শ্রেণীশিক্ষায় শিক্ষার্থীকে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবার সুযোগ করে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়তা করা যায় তাহলে শ্রেণীশিক্ষার ত্রুটি বহুল পরিমাণে দূর হতে পারে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় যখন শ্রেণীশিক্ষা অপরিহার্য তখন সেই ব্যবস্থাকে যতটা সম্ভব ত্রুটি মুক্ত করে গ্রহণ করা যায় সে চেষ্টা করতে হবে। শ্রেণীশিক্ষা সম্পর্কে আমাদের কোনরূপ বিরূপ মনোভাব থাকা উচিত নয়। কারণ ভারতের শিক্ষাপরিস্থিতে শ্রেণীশিক্ষাকে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া আর শিক্ষাপ্রসারের পথ নেই।

শ্রেণীশিক্ষার সীমাবদ্ধক্ষেত্রে কি করে শিক্ষাকে সার্থক করে তোলা যায় সে সম্পর্কে Miss Cathy তাঁর A first Book on Teaching গ্রন্থে মূল্যবান কয়েকটি নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

1. Know exactly what you are going to teach.
2. Organise thoroughly.
3. Make the best of all apparatus that can be obtained.
4. Teach the whole class.
5. Try to be clam and natural.
6. Remember the test of good class-teaching is class working.
7. Make full use of the children's knowledge.

এর সাথে যোগ করা যেতে পারে—

৪ Make an ally of routine in matters where routine helps.

9. Observe and have observed by pupile the common courtesies.

10. Enlist the Co-operation of the class in discipline.

Miss Cathy প্রথমেই বলেছেন যা শেখাতে যাচ্ছি তা ঠিকভাবে জেনে নিয়ে যেতে হবে। বিষয়বস্তুকে সঠিকভাবে আয়ত্ত না করে ক্লাসে ছেলেদের পড়াতে যাওয়া একটা অপরাধ। যা পড়ান হবে সে সম্পর্কে যদি শিক্ষকের সুস্পষ্ট ধারণা না থাকে তাহলে তিনি কি শেখাবেন? ক্লাসের পাঠ্য বইতে যতটুকু তথ্য আছে ততটুকু তথ্যের উপর নির্ভর করে ক্লাসে যাওয়া উচিত নয়। অষ্টম শ্রেণীর ইতিহাস বইতে আকবর সম্পর্কে সামান্য আলোচনাই আছে। শিক্ষক যদি মনে করেন আমার এইটুকু জানাই যথেষ্ট তাহলে তিনি ছাত্রদের কৌতূহল বা নতুন জানার আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করতে পারবেন না। এর ফলে ছেলেদের সেই বিষয় সম্পর্কে আগ্রহ বা উৎসাহ স্তিমিত হয়ে যাবে। শুধু তাই নয় শ্রেণীর শৃঙ্খলা রক্ষাও কঠিন হয়ে উঠবে। যে পাঠ সম্পর্কে উৎসাহ নষ্ট হয়ে যায় সেখানে ছেলেদের কোনো যোগ থাকে না—এরকম পরিস্থিতিতে পড়ান অসম্ভব। শিক্ষকের পাঠপ্রস্তুতি শিক্ষার সাফল্যের পক্ষে সর্বাধিক প্রয়োজন। দিনের নির্দিষ্ট পাঠ ও প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত হয়েই শিক্ষক ক্লাসে যাবেন। দ্বিতীয় সূত্রে বলা

হয়েছে পাঠকে সম্পূর্ণভাবে সংগঠন করতে হবে। এটি প্রথম সূত্রে বলা সূত্রের পরিপূরক। অসংবদ্ধ জ্ঞান শিক্ষায় কোন কাজে আসে না। উপস্থাপন করবার সময় বিষয়টিকে কিভাবে উপস্থিত করা হবে তা এই পাঠসংগঠনের উপরই নির্ভরশীল। পাঠ সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত হলেই শিক্ষক বুঝতে পারবেন কি কি তার প্রয়োজন সেইভাবে তিনি পাঠসংগঠন করে ক্লাসে যাবেন।

পাঠ সহজবোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে হলে নানা শিক্ষা-উপকরণ দরকার। কিন্তু কানে শুনে ও চোখে দেখে যে শিক্ষা তা ছেলেদের কাছে যতটা গ্রহণযোগ্য হয় শুধু ক্লাসে শিক্ষকের বক্তৃতা শুনে তা হয় না। কিন্তু শুধু শিক্ষাউপকরণ থাকলেই যথেষ্ট নয়। তার সুষ্ঠু ও সময়োপযোগী ব্যবহারও জানা চাই। অনেক সময় দেখা যায় ইতিহাসের শিক্ষক মানচিত্র নিয়ে ক্লাসে যাননি, পড়াতে পড়াতে যখন খেয়াল হল একখানা মানচিত্র দরকার তখন শ্রেণীশিক্ষক মানচিত্র নেবার জন্য লোক পাঠান। বোর্ড প্রতি শ্রেণী-কক্ষে একখানা থাকে। কিন্তু অঙ্কের শিক্ষক ছাড়া অন্য কোন শিক্ষকের বোর্ডের দরকার হয় বলে মনে হয় না। পাঠকে সরস করে তুলতে হলে গতানুগতিক শিক্ষা-উপকরণ ছাড়াও প্রয়োজন হলে শিক্ষক নিত্য-নতুন উপকরণ উদ্ভাবন বা সংগ্রহ করবেন। উপকরণ খুবই প্রয়োজন—বিশেষ করে নিম্নশ্রেণীতে যেখানে শিক্ষার্থীদের বিমূর্ত বিষয় সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট হয়নি সেখানে উপকরণে গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু মনে রাখতে হবে এর আধিক্য আবার ভাল নয়। উপকরণের বাহুল্য যেন বিষয়বস্তুকে ছাড়িয়ে না যায়। বিষয়বস্তুকে পরিস্ফুট করে তুলতে যতটুকু প্রয়োজন তার বেশী উপকরণ পরিহার করে চলতে হবে।

শ্রেণীশিক্ষার ত্রুটি সম্পর্কে আলোচনাকালে আমরা দেখেছি শিক্ষকের সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে পড়াব কাকে? প্রায়ই দেখা যায় শিক্ষক বিশেষ বুদ্ধিমান গুটি কয়েক ছেলেদের দিকেই বিশেষ আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন। এটা খুবই স্বাভাবিক যাদের কাছ থেকে 'চটপট' সঠিক মনের মত উত্তরটি পাওয়া যায় প্রশ্নগুলি তাদের কাছেই করতে ইচ্ছা হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় ক্লাসের সামনে একটি প্রশ্ন রাখবার সাথে সাথে দু'চারটি ছেলে 'আমি বলি', 'আমি বলি' বলে লাফিয়ে ওঠে। কোন কোন ক্ষেত্রে জিজ্ঞেস করবার আগেই জবাব দিয়ে দেয়। শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের এই অভ্যাসটি বন্ধ করে দিতে হবে, তা না হলে অধিকাংশ ছেলেই অবহেলিত হবে। তাই শিক্ষক যখন পড়াবেন তাঁর সামনে থাকবে সমস্ত ক্লাস। প্রশ্ন ক্লাসের

সব ছেলেদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। ভাল মন্দ সবাই যেন সমানভাবে পাঠে অংশ গ্রহণ করতে পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কাজ হিসাবে যে এটা অত্যন্ত কঠিন তাতে সন্দেহ নেই। ৩০।৪০টি ছেলে যারা স্বভাবতঃই চঞ্চল তাদের মনোযোগ কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একই বিষয়ে নিবদ্ধ রাখা খুব সহজ সাধ্য নয়। সবাইকে সমান ভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে, ভুল সংশোধন করতে হবে—তারপর পড়া আদায় করে নিতে হবে। শ্রেণীতে শিক্ষক দাঁড়াবেন যেন তিনি সব ক্লাসটি দেখতে পান। প্রায়ই দেখা যায় শিক্ষক মহাশয় চেয়ার ছেড়ে উঠতে চান না। তাকে উঠে তো দাঁড়াতেই হবে—প্রয়োজন হলে ক্লাসের বিভিন্ন স্থানে তাঁকে ঘুরতে হবে। শিক্ষক যা বলবে সবাই যেন তা শুনতে পায়, খুব আস্তে বলা বা অযথা চীৎকার কোনটাই ভাল নয়।

পড়াতে গিয়ে যতটা সম্ভব স্বাভাবিক ও শান্ত থাকতে হবে। শিক্ষক-জীবনের সুরুতে সবাই একটু ভয় ও একটু উদ্বেগ নিয়ে সুরু করেন। নিজেকে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত করিয়ে নিতে হবে, স্বাভাবিক হয়ে ওঠবার চেষ্টা করতে হবে। নিজের মনে ভয় কি সংশয় থাকলে কোন শিক্ষকের পক্ষে শ্রেণীশৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব নয়। সাধারণতঃ নির্দিষ্ট পাঠ সম্পর্কে শিক্ষকের প্রস্তুতির অভাব বা আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকলে একটা আড়ষ্টতার সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষকের ব্যর্থতার ফলে ছেলেরা অমনোযোগী হয়ে ওঠে—গণ্ডোগোল করে, পড়ায় আগ্রহ থাকে না—এই অবস্থায় আর যাই হোক পড়া হয় না। ছেলেদের মনে ভীতির সৃষ্টির জন্য একটা কৃত্রিম গাম্ভীর্যের মুখোস পরে, ক্লাস করতে যাওয়াও ঠিক নয়—এখানেও স্বাভাবিক সহজ ভাবটি নষ্ট হয়ে একটা আড়ষ্টতার সৃষ্টি হয়। যাদের পড়াব তাদের যদি জানা থাকে তখন এই উপসর্গ আর থাকে না। ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হবার সাথে শিক্ষক স্বাভাবিক হয়ে ওঠেন। শিক্ষক সব ভুলে যদি পাঠে তন্ময় হয়ে যেতে পারেন তখন শিক্ষার্থী আর বিষয় এই দুই'ই তাঁর সামনে থাকবে, ভয়, উদ্বেগ আর সংশয় কিছুই থাকবে না।

শ্রেণীশিক্ষায় শিক্ষককে যেমন মনে রাখতে হবে তিনি সবাইকে পড়াচ্ছেন তেমনি তাঁকে সজাগ থাকতে হবে—দেখতে হবে সবাই কাজে ব্যস্ত আছে কি না? সবাই যদি পাঠে অংশ গ্রহণ না করে, সক্রিয় না থাকে তাহলে শ্রেণীশৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। অনেক সময় শিক্ষকেরা লক্ষ্য করে থাকবেন শ্রেণীতে একটি কাজ দেওয়া

হয়েছে—চু'চার জন অতি অল্প সময়েই কাজটি শেষ করে ফেলল—সে ক্ষেত্রে যদি তাদের নতুন কাজ না দিয়ে অন্য সবার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের বসিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয় তাহলে তারা চুপ করে শান্ত হয়ে বসে থাকবে না—গল্প করবে, গণ্ডগোল করবে, না হয় পাশের ছেলেকে সাহায্য করবে, তাদের শান্ত রাখবার একমাত্র উপায় তাদের নতুন কাজ দেওয়া, তারা তা আনন্দের সাথে বিশেষ তৎপর হয়েই করবে। এ-সম্পর্কে Ryburn বলেছেন—"Nothing will kill the interest of good pupils more quickly than to hold them back and make them sit, mentally inactive. This must always be avoided." শিক্ষক মাত্রেই এই কথাটি মনে রাখবেন।

7 শিক্ষাকে বলা হয় 'Bipolar process' দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী দু'জনেই এতে সমভাবে অংশ গ্রহণ করবে। শিক্ষকদের মধ্যে অনেক সময় দেখেছি তিনি শুধু বলেই যাচ্ছেন। বক্তৃতাধর্মী পাঠে শিক্ষক জানবার চেষ্টা করেন না—ছেলেরা কতটা বুঝতে পেরেছে—তাদের নিজেদের কিছু বক্তব্য আছে কি না? আমাদের মনে রাখতে হবে—"The main object of Education is not to teach but to develop" (Pestalozzi,). আর একজন শিক্ষাবিদ সোজা কথায় তাঁরা শিক্ষক-ছাত্রদের বলতেন 'not putting in but leading out.' বিদ্যালয়ের শিক্ষায় বক্তৃতাকে যতটা সম্ভব পরিহার করে চলতে হবে (অবশ্য রসধর্মী পাঠে তা সম্ভব নয়)। শিক্ষার্থী যাতে পাঠে অংশ গ্রহণ করতে পারে সেইভাবে পাঠ দিতে হবে। পাঠ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে ছাত্রদের পূর্ব জ্ঞান পরীক্ষা করবার একটা রীতি আছে, এই রীতিকে যদি শুধু নিয়মরক্ষার জন্যই ব্যবহার করা হয় তাহলে তা হয়ে ওঠে যান্ত্রিক (Mechanical)। শুধু পূর্ব জ্ঞান পরীক্ষা করলেই কাজ শেষ হল না—শিক্ষার্থীর পূর্বার্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হবে, নতুন জ্ঞান আহরণের জন্য। ছেলেরা যদি পাঠে অংশ গ্রহণ করবার সুযোগ পায়—নতুন কিছু তাদের মুখ দিয়ে বলান যায় তাহলে তাদের আগ্রহ বাড়বে তাদের আত্ম-বিশ্বাস জন্মাবে। পড়াবার সময় ছাত্রদের সহযোগিতা শিক্ষকের কাম্য হওয়া উচিত। যেখানে শিক্ষক শুধু পড়িয়ে যান সেখানে 'class progress' বজায় থাকবে কিন্তু সত্যিকারের শিক্ষার Progress কতটা হবে বলা শক্ত।

একটি আপত্তি আসতে পারে পাঠে ছাত্রদের অংশ গ্রহণের ফলে শিক্ষক পূর্ব প্রস্তুতি মত পাঠ-পরিকল্পনাকে (Lesson plan) অনুসরণ করতে

পারবেন না। নির্দিষ্ট পাঠ যদি শিক্ষকের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন থাকে তাহলে ছাত্রদের সহযোগিতায় আলোচনায় প্রাসঙ্গিক যে বিষয়ই আসুক না কেন তার সাথে পাঠ-পরিকল্পনার সামঞ্জস্য বিধান খুব কঠিন নয়। শিক্ষকের প্রস্তুতির জন্য পাঠ-পরিকল্পনা খুবই প্রয়োজনীয় কিন্তু তার উপর আমরা যেন অতি মাত্রায় নির্ভরশীল না হয়ে পড়ি। একথা মনে রাখা দরকার শিক্ষক একজন শিল্পী—যদি তিনি পাঠদান কালে নতুন নতুন বিষয়ের অবতারণা করতে না পারেন তাহলে তাঁর নিজের কাজটা তাঁর কাছে অত্যন্ত একঘেয়ে ও নীরস মনে হবে—শিক্ষাদানে তিনি আর কোন আনন্দই পাবেন না। পূর্ব পরিকল্পনা কখনও শিক্ষকের নতুন সৃষ্টির পথকে রুদ্ধ করতে পারে না। একটি কথা মনে রাখতে হবে তিনি যেন প্রসঙ্গ ছেড়ে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের মধ্যে গিয়ে জড়িয়ে না পড়েন। ছেলেরা অনেক সময় গল্পপ্রিয়-শিক্ষকদের সেদিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে এবং বহু ক্ষেত্রে সফলও হয়। যখন শিক্ষকের খেয়াল হয় তিান প্রসঙ্গান্তরে চলে গিয়েছেন তখন হয়ত ঘণ্টা বেজে গিয়েছে। শিক্ষকের পাঠ-পরিচালনায় সতর্ক থাকতে হবে—গল্পের ফাঁদে তিনি যেন না পড়েন।

শ্রেণীশৃঙ্খলা ও সৌজন্যবোধঃ—পড়াবার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন শ্রেণীশৃঙ্খলার। শিক্ষকের যে সব গুণ থাকা দরকার তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তার ব্যক্তিত্ব ও শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষমতা। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে না উঠলে শ্রেণী-শৃঙ্খলা রক্ষা কঠিন হয়ে ওঠে। শৃঙ্খলা রক্ষা নতুন-পুরাতন সব শিক্ষকের কাছেই একটা সমস্যা। এজন্য কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আমরা মেনে চলি কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে শিক্ষকের নিজের যোগ্যতা। কতকগুলি সাধারণ নিয়ম সম্পর্কে ছেলেরা যাতে অভ্যস্ত হয় শিক্ষক প্রথমেই সেদিকে দৃষ্টি দেবেন। ক্লাসে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হলে সবাই যাতে একসাথে চেঁচিয়ে না ওঠে, একজন উত্তর দেবার সময় আরেকজন বলে না দেয়—বা হয়নি বলে বাধার সৃষ্টি না করে। যাকে জিজ্ঞেস করা হল শিক্ষকের চেষ্টা করতে হবে তার কাছ থেকেই উত্তরটি আদায় করতে। মাঝ পথে বাধার সৃষ্টি হলে জানা থাকলেও সে বলতে পারবে না। পড়াবার সময় বা প্রশ্ন করবার সময় যেন ছেলেরা নিজেদের মধ্যে গল্প না করে। অনেক সময় দেখা গিয়েছে শিক্ষক পড়াচ্ছেন পিছনের বেঞ্চে তখন একটি ছেলে আরেক জনের খাতা থেকে অঙ্ক টুকছে। এই ত্রুটিগুলি থেকে ক্লাসকে ছেলেদের মুক্ত রাখা যায় শিক্ষক মহাশয় সেদিকে

যথা সম্ভব সতর্ক থাকবেন। ক্লাসে শিক্ষক যদি শুধু চেয়ারে আশ্রয় না নিয়ে একটু নড়াচড়া করেন তাহলে সেদিকে তার সতর্ক দৃষ্টি রাখা সম্ভব।

(৫) শৃঙ্খলা রক্ষায় ও সৌজন্য বোধ সৃষ্টি ব্যাপারে ছেলেদের সাহায্য ও সহযোগিতা বহুক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী হয়। শ্রেণীশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ছাত্রদের উপর ন্যস্ত করা হলে তাদের দায়িত্ববোধ বাড়ে ও তাদের মধ্যে নেতৃত্বের সৃষ্টি হয়। স্কুল-স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় ছেলেদের উপর কাজের ভার দিয়ে বহুক্ষেত্রেই সুফল পাওয়া গিয়েছে। অন্তর্জাত-শৃঙ্খলা শ্রেণী বা বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষায় ও ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ জন্মাবার জন্য অধিকতর উপযোগী।

শিক্ষক যদি স্নেহ ও ভালবাসা দিয়ে ছাত্রদের বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারেন তাহলে তাদের কাছ থেকে স্বতঃউৎসারিত শ্রদ্ধা ও প্রীতি তিনি অর্জন করতে পারবেন। শ্রেণীশৃঙ্খলা রক্ষা করাও সহজসাধ্য হবে।

পূর্বালোচনায় আমরা দেখেছি শিশুর শিক্ষাপদ্ধতি নির্দ্ধারণে শিশু-প্রকৃতিকে জানা বিশেষ দরকার। শিক্ষার একটা লক্ষ্য আছে—এর পিছনে একটা উদ্দেশ্য রয়েছে। এই উদ্দেশ্য.ক সফল করতে হলে শিশুর বৈশিষ্ট্য, অন্তর্নিহিত শক্তি ও প্রবণতাকে জেনে সার্থক শিক্ষাপদ্ধতি রচনা করতে হবে। শিশুর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার কর্মপ্রবণতা—শিশু কর্মচঞ্চল। আমাদের দেখতে হবে শিক্ষায় কি করে এই কর্মপ্রবণতাকে কাজে লাগান যায়। সমস্ত স্বাভাবিক স্বাস্থ্যবান শিশুই কাজ করতে চায়। যার মধ্যে কর্মবিমুখতা রয়েছে একটু খোঁজ করলেই দেখা যাবে সে দেহে কি মনে অসুস্থ। ঠিকপথে কর্মপ্রবণতাকে পরিচালিত করে একে শিক্ষার সহায়ক করে তোলা এক সমস্যা। কারণ ছেলেরা যে কাজ করতে চাইবে বা যে কাজ করে থাকে তা প্রায়ই ক্ষেত্রেই শিক্ষার অনুকূল নয়—বা বিদ্যালয়ে শিশুর কর্মশক্তিকে যে ভাবে কাজে লাগাবার চেষ্টা করা হয় অধিকাংশ শিশুই সে ভাবে কাজ করতে চাইবে না। শিশুর কর্মপ্রবণতাকে কাজে লাগাতে হলে আমাদের কয়েকটি নীতিকে মনে রাখতে হবে।

শিশুর কর্মপ্রবণতাকে কাজে লাগাতে হলে শিশুকে জানতে হবে—শিশুর আগ্রহ ও ক্ষমতা দুইই শিক্ষকের জানা দরকার। সাধারণভাবে শিশুপ্রকৃতি ও তার বিকাশের ধারাকে জানতে হবে, সেই সাথে প্রতিটি ছেলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সন্ধান রাখতে হবে। যে ছেলের বিশেষ প্রবণতা যেদিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে তাকে সেই দিকে পরিচালিত করতে পারলেই বাঞ্ছিত ফল লাভ হবে। কাজ বলতে আমরা সর্বদা যেন মনে রাখি দৈহিক কাজই কাজ নয়—এর

সাথে মানসিক কাজও আছে। দেহের পুষ্টির জন্য দৈহিক কাজের প্রয়োজন অবশ্যই আছে, বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য মানসিক বৃত্তিসমূহের পরিপুষ্টির জন্য মানসিক কাজও প্রয়োজন। নৈতিক উন্নতির কথাও চিন্তা করে কাজের পরিবেশকে সেভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে—অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য কাজের পরিধিকে সর্বত্র বিস্তৃত করতে হবে।

প্রথমেই দেখতে হবে—কাজ করবার যে স্বাভাবিক ইচ্ছা শিশুর মনে রয়েছে তাকে যেন অযথা রুদ্ধ করা না হয়। সাধারণ কর্মপ্রবণতাকে রুদ্ধ করে ঈপ্সিত ফল পাওয়া যায় না। যদি দেখা যায় শিশু বাঞ্ছিত পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছে না তখন তাকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে ঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে। শিশু যখন কাজের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে চায় তখন তার প্রকাশের পথকে রুদ্ধ করলে তার প্রতিক্রিয়া কখনও শুভ হয় না। শিশুর সামনে কতগুলি কাজের সুযোগ রাখতে হবে। এসব কাজের মধ্য দিয়ে তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি প্রকাশের পথ খুঁজে পাবে। কাজগুলি এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যার ফলে প্রবৃত্তির সমাজ-সম্মত রূপই (Sublimated form) ফুটে উঠবে। যুযুৎসা (Pugnacity) একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তাকে প্রতিযোগিতার কাজে লাগান যেতে পারে। সঞ্চয় মনোবৃত্তিকে (Acquisition) নানা জিনিষ সংগ্রহের কাজে লাগান যেতে পারে। নির্মাণের ইচ্ছাকে (construction) নতুন নতুন জিনিষ গড়ে তোলার কাজে লাগান যায়। কৌতূহল প্রবৃত্তিকে (curiosity) জ্ঞান আহরণের কাজে লাগান যায়। যদি এসব প্রবৃত্তি বিপথে চালিত হয় তাহলে শিশুর জীবনে বিপর্যয় দেখা দেয়।

শিক্ষক সর্বদা ছেলেদের কাজে উৎসাহ দেবেন। অতি সাধারণভাবে যে কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে সেখানেও তাকে উৎসাহ দিতে হবে যাতে সে আরো সুনিপুণভাবে কাজটি সম্পন্ন করতে পারে। যদি সহানুভূতির সাথে কাজটির ভুল দেখিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তার উৎসাহ উত্তরোত্তর বেড়েই যায়। শিক্ষক যদি ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন, বিরক্তি প্রকাশ করেন বা অযথা তিরস্কার করেন তাহলে ছেলেদের কাছ থেকে কাজ আদায় করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। ছেলেদের নিজেদের শক্তি সম্পর্কে নিজেরাই সচেতন নয়—তাদের মধ্যে আছে একটা দ্বিধা একটা সংশয়। এই দ্বিধা ও সংশয় কাটিয়ে উঠতে দরকার শিক্ষকের সাহায্য। সহানুভূতি ও উৎসাহ লাভ করলে কষ্টসাধ্য কাজও শিশু সম্পন্ন করতে পারে। ছেলেরা

যদি মনে করে তার কাজটির মূল্য আছে তাহলে তার নিজের সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস জন্মায়—তার মধ্যে যে সৃজনী প্রতিভা রয়েছে আত্মবিশ্বাস জন্মালে তা প্রকাশের স্বাভাবিক পথ খুঁজবে।

কাজে বা শিক্ষায় যদি নতুনত্বের অভাব দেখা যায় তাহলে শিক্ষার্থীর উৎসাহ স্তিমিত হয়ে আসে। গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় বৈচিত্র্যসৃষ্টির প্রয়াস খুবই কম। শ্রেণীশিক্ষায় বৈচিত্র্যসৃষ্টির যে সামান্য সুযোগ রয়েছে তাকে কাজে লাগাতে হবে। সময় তালিকা তৈরীর সময় দৃষ্টি রাখতে হবে একই রকমের বিষয় যেন পড়ান না হয়। বাংলা ব্যাকরণ, ইংরেজী ব্যাকরণ, সংস্কৃত ব্যাকরণ যদি পর পর ছেলেদের পড়ান হয় সেদিন তাদের পড়ায় আর উৎসাহ থাকবে না। এতে মানসিক ক্লান্তি এসে তার বোধশক্তিকে আচ্ছন্ন করে দেবে। কাজের ক্ষেত্রে যদি বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে না পারা যায় তাহলে ছেলেদের উৎসাহ ধীরে ধীরে কমে আসবে। পড়ার সাথে খেলাকে যুক্ত করে শিক্ষাপরিবেশকে আনন্দময় করে তুলতে হবে। সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমকে শিক্ষার সাথে যুক্ত করে শ্রেণীশিক্ষার ক্রটি থেকে শিক্ষাকে যুক্ত করতে হবে।

মানুষের জীবন কর্মময়। শিক্ষার প্রাঙ্গণ পার হয়ে গিয়েই শিক্ষার্থীকে বিশ্বের বিশাল কর্মশালায় প্রবেশ করতে হবে। কর্মের দীক্ষা তাকে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্য দিয়েই গ্রহণ করতে হবে। সুপরিকল্পিত কাজের মধ্য দিয়ে তার দেহ মন ও চরিত্র গঠন করতে হবে। কাজের মধ্য দিয়ে তার মধ্যে যে সম্ভাবনা আছে যে শক্তি আছে তা প্রকাশ পাবে। কাজের মধ্য দিয়েই তার ব্যক্তিত্ব গঠিত হবে। যদি শিশুকে সমাজের উপযুক্ত নাগরিক রূপে গড়ে তুলতে হয় তাহলে জীবনযুদ্ধে সম্মুখীন হবার মত শিক্ষা তাকে দিতে হবে। বিদ্যালয় হচ্ছে ভবিষ্যত জীবনের প্রস্তুতিক্ষেত্র। শিক্ষা হচ্ছে তার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি এমনভাবে নির্দ্ধারিত করতে হবে যাতে সেই শিক্ষালাভ করে বিশ্বের কর্মযজ্ঞে সেও অংশ গ্রহণ করতে পারে। আমাদের শিক্ষাপ্রণালী নির্দ্ধারণে আমাদের লক্ষ্য থাকবে কি করে আজকের শিশু গণতান্ত্রিক সমাজের সুনাগরিক হয়ে উঠতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিক্ষাদানের কৌশল

শিক্ষা দেবার নীতি নির্দ্ধারণের পথে আমাদের সামনে আসে শিশুকে শিক্ষা দেবার প্রশ্ন। শিক্ষা দিতে শিক্ষক কি রীতি অবলম্বন করবেন, শিক্ষা দিতে তাকে কোন পন্থা অনুসরণ করতে হবে শিক্ষককে তা জানতে হবে। শিক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য রীতি, পদ্ধতি ও কৌশল না জেনে শিক্ষকতা সুরু করলে পদে পদে বাধার সম্মুখীন হতে হবে—কাজটিও সুষ্ঠু ভাবে সমাধান হবে না।

শিক্ষকের কাজ শিক্ষা দেওয়া। এই "শিক্ষা-দেওয়া" কথাটা পূর্বে যে অর্থে ব্যবহৃত হত বর্তমানে ঠিক সেই অর্থে ব্যবহার হয় না। সে সময় ছিল শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে দাতা-গৃহীতার সম্পর্ক। একটি পূর্ণ পাত্র থেকে শূন্য পাত্রে জল ঢেলে দিয়ে তাকে ভর্তি করবার রীতি অনুসরণ করে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিতেন। সে ছিল শুধু দেবারই সম্পর্ক। সেখানে শিশুর একমাত্র ভূমিকা ছিল শুধুমাত্র নিষ্ক্রিয় গৃহীতার ভূমিকা। তারপর শিক্ষা-দর্শে পরিবর্তনের সাথে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কেরও পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষাকে এখন বলা হয় Bipolar Process, শিক্ষা দেওয়ার অর্থ, শিক্ষক শুধু দিয়েই যাবেন তাই নয়। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পারস্পরিক প্রচেষ্টায় শিশুর জানার ক্ষেত্র বিস্তৃত হবে। বর্তমান শিক্ষায় শিক্ষার্থীও সমভাবে সক্রিয়। শিক্ষক কি ভাবে শিশুকে নতুন জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করবেন, কি রীতি বা পদ্ধতি অবলম্বন করবেন তাকেই আমরা শিক্ষা দেবার কৌশল বলেছি—সার্থক শিক্ষক হতে হলে শিক্ষা দেবার মূল কতগুলি রীতি-পদ্ধতি তাঁকে আয়ত্ত করতে হবেই।

শিক্ষা দেওয়া কাজটি অত্যন্ত জটিল। সাধারণ শিক্ষায় উচ্চ ডিগ্রী থাকলেই সার্থক শিক্ষক হওয়া যায় না। অন্যান্য দশটি বৃত্তির মত শিক্ষকতাও শিক্ষা সাপেক্ষ। আমার জানা বিষয়টি কি করে একটি তরুণ শিক্ষার্থীকে তার পক্ষে বোধগম্য ভাষায় ও সহজবোধ্য পন্থায় শেখান যায় শিক্ষককে তা জানতে হবে। শিক্ষাতত্ত্ব, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি জানার সাথে বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাদান কৌশল বা পদ্ধতি জানা না থাকলে শিক্ষক হিসাবে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। যাদের শিক্ষকতার জন্মগত

প্রবণতা রয়েছে তাদেরও আধুনিক শিক্ষার রীতি পদ্ধতি সব জানা দরকার। ক্লাসে পড়া দেওয়া, পরের দিন পড়া জিজ্ঞেস করা ও নতুন করে বাড়ীর জন্য পড়া দিয়ে দেওয়া—সাধারণ ভাবে মনে করা হয় এই হচ্ছে শিক্ষকের কাজ। কিন্তু সার্থক শিক্ষকের বিচার হবে শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে ও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে কতটা সচেতন করতে পেরেছেন তার উপর। সার্থক শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে।

"The fundamental distinction between a successful teaching and unsuccessful teaching lies in the amount and value of learning that is stimulated in the pupils............Teaching does not mean, performing the operations which teachers perform. It means getting pupils to learn and nothing else. The successful teacher studies his problems formulates his aims, select his procedures, combines them, and carries them out primarily in terms of observed effect upon the pupils taught. The unsuccessful teacher usually takes these effects for granted. Herin lies the distinction.—Instruction in Indian Secondary School. Ed. E. A. Macnee.

আমরা পূর্ব অধ্যায়ে আলোচনা করেছি শিক্ষকের উপস্থাপনার গুণেই শিক্ষার্থী পাঠ সম্পর্কে কৌতুহলী হয়। শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ সৃষ্টি করতে না পারেন তাহলে তিনি যাই বলুন না কেন শিক্ষার্থীর মনে তা রেখাপাত করবে না। উপস্থাপনের সময় অভিজ্ঞ শিক্ষক ছেলেদের মন পাঠাভিমুখী করবার জন্য সচেষ্ট হন। শিক্ষাদানকালে উপস্থাপনের সাফল্যের জন্য আমরা যে সব কৌশল অবলম্বন করে থাকি তা হচ্ছে—বর্ণনা, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, প্রশ্নোত্তর, দৃষ্টান্ত, পাঠটীকার ব্যবহার, বিভিন্ন শিক্ষা-উপকরণের ও সাজ-সরঞ্জামের সাহায্য গ্রহণ ইত্যাদি। আমরা একটি একটি করে এদের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহার-রীতি সম্পর্কে আলোচনা করব।

বর্ণনা :—শিক্ষায় বিশেষ করে শ্রেণী-শিক্ষায় বর্ণনার একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। শ্রেণীশিক্ষায় বক্তৃতাধর্মী পাঠে ছাত্ররা অংশ গ্রহণ করবার কোন সুযোগ পায় না। তবু শ্রেণীশিক্ষায় বিশেষ করে রসানুভূতি মূলক পাঠে বর্ণনাকে সম্পূর্ণ ভাবে বর্জন করা সম্ভব নয়। শিক্ষক যা পড়াবেন অর্থাৎ

তাঁর নির্দিষ্ট পাঠ উপস্থাপনায় প্রথম তাঁকে বর্ণনার আশ্রয় নিতে হয়। কোন একটি বিষয়বস্তুকে হৃদয়গ্রাহী করে ছেলেদের সামনে তুলে ধরতে হলে শিক্ষককে গল্প করবার কৌশল আয়ত্ত করতে হয়। বর্ণনা যদি আকর্ষণীয় না হয় তাহলে ছেলেদের মধ্যে নতুন বিষয় সম্পর্কে আগ্রহের সৃষ্টি হবে না। বর্ণনার সাহায্যে শিক্ষক বিষয়টিকে প্রাণবন্ত করে তুলবেন। তিনি হবেন দক্ষ কথাশিল্পী, তাঁর বর্ণনার গুণে বিষয়-বস্তুর একটি জীবন্ত চিত্র ছেলেদের চোখের সামনে ফুটে উঠবে। ছেলেরা স্বভাবতঃই গল্প শুনতে ভালবাসে, শিক্ষার্থীদের সেই গল্প শোনার প্রবণতাকে কাজে লাগিয়ে তাদের মনে নির্দিষ্ট পাঠ সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে।

নতুন পাঠে কোন কিছু বর্ণনার সময় শিক্ষক ছাত্রদের পূর্ব-জ্ঞানের পটভূমিকায় বিষয়টি স্থাপন করবেন। পূর্ব-জ্ঞানের সাথে নতুন বিষয়টি যুক্ত হলে ছেলেদের মনে আগ্রহ সৃষ্টি হবে, বিষয়টিকে জানবার জন্য তারা মনোযোগী হবে।

বর্ণনাকালে শিক্ষকের ভাষা হবে সহজ, সরল, বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে শ্রেণীতে শিক্ষা দিবেন ভাষা যেন সেই শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত হয়। শিক্ষকের বলায় যেন কোন জড়তা বা অস্পষ্টতা না থাকে। উচ্চারণ-শুদ্ধির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। ছাত্ররা শিক্ষকের উচ্চারণ অনুসরণ করে তাই শিক্ষকের এ বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। উচ্চারণ যেন আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য-দোষ মুক্ত থাকে। ছাত্রজীবনে অতি উচ্চ শিক্ষিত একজন বাংলা শিক্ষকের চরম ব্যর্থতার কথা মনে আছে তার প্রধান দোষ ছিল তিনি বাংলা পড়াতে গিয়ে তার নিজস্ব জেলার উচ্চারণ ভঙ্গী ছাড়তে পারেন নি। বর্ণনার মধ্যে যেন একটা আন্তরিক সুর ফুটে ওঠে। রসনাভূতিমূলক পাঠের সময় বর্ণনা যদি আবেগপূর্ণ না হয় তাহলে তা হৃদয়গ্রাহী হবে না। বর্ণনাকালে অযথা চীৎকার বা অত্যন্ত নিম্ন স্বরে বলা কোনটাই ঠিক নয়। বর্ণনার গুণে ঘটনা ছেলেদের মানস-চোখে ভেসে উঠবে—তাহলেই বর্ণনা সার্থক হবে।

বর্ণনার সময় যেন পাঠের লক্ষ্য স্থির থাকে। বর্ণনার মধ্য দিয়ে লক্ষ্যে পৌছানই হবে পাঠের উদ্দেশ্য। পাঠের যদি কোন স্থির লক্ষ্য না থাকে তাহলে ছেলেরা বুঝতে পারবে না বিষয়টি কেন পড়ান হচ্ছে। বর্ণনাকালে লক্ষ্যে পৌছবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করা হবে। অপ্রয়োজনীয় অবান্তর বিষয় আলোচনা হলে শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য থেকে দূরে

সয়ে আসবে। অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়ে পড়াবার সময় বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশের উপর জোর দিয়ে পড়াতে হবে—এবং সেদিকে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে।

বর্ণনা অনেকটা গল্পের মত করে করতে হবে—যাতে বর্ণনা সরল ও সহজবোধ্য হয়। বর্ণনা যেন একঘেয়ে না হয়। দীর্ঘ সময় ধরে একটানা বর্ণনা বিরক্তির উৎপাদন করতে পারে। বর্ণনার মধ্যে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করতে না পারলে ছেলেরা ক্লান্তি বোধ করবে—তাদের আর উৎসাহ থাকবে না। এজন্য বিভিন্ন পাঠ-উপকরণের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ :—বর্ণনাকালে আলোচ্য বিষয়টিকে বর্ণনার মাধ্যমে যথাসম্ভব সহজ ও প্রাঞ্জল করে তোলার চেষ্টা করতে হবে। তবুও প্রতি বিষয়ের মধ্যে দু'একটি অংশ থাকে যা বেশ কঠিন—সাধারণ বর্ণনার মধ্য দিয়ে তা বোঝান সম্ভব নয়। কঠিন দু রকম হতে পারে, ভাষার দিক থেকে কঠিন আর ভাবের দিক থেকে কঠিন। বর্ণনার মধ্য দিয়ে যে অংশ ছাত্ররা বুঝতে পারেনি সে অংশ ব্যাখ্যা করে বিষয়কে ভাল করে বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিতে হবে। কঠিন ভাষায় যে অংশ রয়েছে সহজ ভাষায় তাকে প্রকাশ করলেই অনেক সময় ছেলেরা বুঝতে পারে। কিন্তু ভাব যেখানে কঠিন সেখানে সহজ ভাষায় প্রকাশ করলেই হবে না ব্যাখ্যা করে বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের বোঝবার সীমার মধ্যে এনে দিতে হবে।

প্রশ্ন :—শিক্ষা দেবার জন্য যে সব পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তার মধ্যে প্রশ্ন হচ্ছে বিশেষ কার্যকরী পন্থা। শিক্ষায় ছাত্রদের সহযোগিতা লাভের উপায়ই হচ্ছে প্রশ্ন। বর্ণনার মধ্য দিয়ে পাঠ যেভাবে অগ্রসর হয় সেখানে ছাত্রদের শোনা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন কাজ থাকে না। তাই শিক্ষার্থীকে পাঠের সক্রিয় অংশীদার করতে হলে 'প্রশ্নোত্তর' মাধ্যমের অংশ গ্রহণ করতে হবে। পাঠকালে প্রশ্নের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও কৌতূহল সৃষ্টি করতে পারা যায়। যা পড়ান হচ্ছে তা শুনেছে কিনা জানা যায় ও পড়া বুঝতে পেরেছে কিনা বা প্রয়োগ করবার যোগ্যতা অর্জন করেছে কিনা শিক্ষক তাও জানতে পারবেন।

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষাদানের রীতি অতি প্রাচীন। প্রাচীন ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থায় 'বিদ্যাবিচার' নামক প্রথা ছিল—সেখানে প্রশ্ন-উত্তরের মধ্য দিয়েই শিক্ষার্থীর জ্ঞান পরীক্ষা হত। প্রশ্নিন অভিপ্রশ্নিন প্রভৃতি শব্দে বোঝা যায় শিক্ষায় প্রশ্নের ব্যবহার অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল। গীতায়

শিক্ষালাভের উপায় সম্পর্কে বলা হয়েছে প্রনিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। প্রশ্ন শুধু গুরুই করতেন না, শিষ্যরাও প্রশ্ন করত। "বিদ্যাবিচার" বিতর্কে প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়েই বহু কূটপ্রশ্নের মীমাংসা হত। সক্রেটীসের শিক্ষা-পদ্ধতিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে তিনি শিক্ষার্থীর মুখ দিয়ে অভিপ্রেত উত্তর বের করে নিতেন। এই পদ্ধতিকে সক্রেটীক পদ্ধতি, বলা হয়। মধ্যযুগে ইউরোপের বিদ্যালয়ে "disputations" বলে যে রীতি প্রচলিত ছিল তাও প্রশ্নোত্তরের মধ্যেই জ্ঞান-পরীক্ষা। প্রশ্নোত্তর অতি প্রাচীন বহুল প্রচলিত সর্বজন গ্রাহ্য শিক্ষাদানের কৌশল।

শিক্ষাদানের কৌশল বলে অধ্যায় স্থরু হলেও আমাদের মনে রাখতে হবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের তত্ত্বকথা শিক্ষার্থীর মনে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া আমাদের কাজ নয়। শিক্ষার্থীর সামনে যে সমস্যাগুলি রয়েছে সে নিজেই তা পর্যবেক্ষণ করবে—তারপর বিচার বিশ্লেষণ করে তা সমাধান করবে, একটা সিদ্ধান্তে আসবে। শিক্ষকের কাজ হবে সুনির্বাচিত প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর যুক্তি ও চিন্তাকে ঠিক পথে পরিচালিত করে ঠিক সমাধানটি বের করে নেওয়া। ("Teaching means skillful questions to force the mind to see to arrange etc.")

শিক্ষা দেবার কৌশলের মধ্যে 'প্রশ্ন' যেমন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, তেমনি প্রশ্ন করাও অত্যন্ত জটিল কাজ। যোগ্যতার সাথে প্রশ্ন করবার উপরেই শিক্ষার সাফল্য নির্ভরশীল। শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর চিন্তা শক্তিকে উদ্দীপ্ত করা। সুদক্ষ শিক্ষকের চিন্তা-উদ্রেককারী (Thought Provoking) প্রশ্নের মধ্য দিয়েই তা সম্ভব হতে পারে। মামুলী গতানুগতিক প্রশ্নে শিক্ষার্থীর মনে ঔৎসুক্য জাগিয়ে তুলে, শিক্ষার্থীর মধ্যে নতুন জিনিষকে জানবার আগ্রহ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।

প্রশ্নের উদ্দেশ্য :—সাধরণ দৈনন্দিন জীবনে দেখা যায় যে জিনিষটি আমরা জানি না সে সম্পর্কে প্রশ্ন করে আমরা সে বিষয়টিকে সম্পূর্ণ জেনে নিতে চাই। নতুন জিনিষ জানা, নতুন তথ্যের সন্ধানই আমাদের প্রশ্নের উদ্দেশ্য। কিন্তু স্কুলে পড়বার সময় শিক্ষক যে প্রশ্ন করেন তার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ অন্য প্রকার। শিক্ষার্থীর কাছে প্রশ্ন করে শিক্ষক নতুন কোন জ্ঞান অর্জন করতে চান না। তাহলে তিনি কেন প্রশ্ন করেন—এখানে প্রশ্নের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষক জানতে চান প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানে কি না। শিক্ষকের জানা নয়, শিক্ষার্থীর জ্ঞান পরীক্ষাই প্রশ্নের প্রথম উদ্দেশ্য। জ্ঞান

পরীক্ষার সাথে সাথেই জ্ঞানার্জনে সহায়তা করা প্রশ্নের দ্বিতীয় লক্ষ্য। প্রশ্ন নানারকম হতে পারে, পরীক্ষামূলক প্রশ্ন (Testing question) অনুসন্ধানী প্রশ্ন (Searching question), শিক্ষামূলক প্রশ্ন (Training or Developing question), শাসনমূলক প্রশ্ন (Disciplinary question.) পরীক্ষামূলক প্রশ্নের প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে অধীত বিষয় শিক্ষার্থী কতটা আয়ত্ত করতে পেরেছে, কতটা মনে রাখতে পেরেছে তা জেনে নেওয়া। পূর্বজ্ঞান পরীক্ষার জন্য যে প্রশ্ন করা হয় তা পরীক্ষামূলক প্রশ্ন—এই জাতীয় প্রশ্নের উদ্দেশ্য হচ্ছে• পূর্বপাঠের সাথে নতুন পাঠকে যুক্ত করা। পাঠের সুরুতেই পূর্বজ্ঞান স্মৃতিতে আনবার জন্য শিক্ষক কয়েকটি সুনির্বাচিত প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীর মনকে প্রস্তুত করবেন ও পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে তার মনে আগ্রহ সৃষ্টি করবেন। পরীক্ষামূলক প্রশ্নের মধ্যে এই জাতীয় প্রশ্নকে প্রস্তুতী-করণ প্রশ্ন (Preparatory question) বলা যায়। যেমন স্বাধীনতা দিবস বা নেতাজী দিবসকে উপলক্ষ্য করে আমরা স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করতে পারি।

পাঠ চলা কালে নির্দিষ্ট পাঠকে কয়েকটি পাঠে ভাগ করে প্রত্যেকটি পাঠের বিষয়বস্তু বর্ণনা ও ব্যাখ্যার সাহায্যে শিক্ষক বুঝিয়ে দেন। পাঠ চলাকালীন শিক্ষক প্রশ্ন করে জেনে নেবেন ছাত্ররা শুনছে কিনা বা ঠিক বুঝতে পেরেছে কিনা। এতে ছাত্রের সাথে শিক্ষকের পরীক্ষাও হবে। পাঠ চলাকালীন এই জাতীয় পরীক্ষামূলক প্রশ্নের উত্তর অধিকাংশ ছাত্রই যদি দিতে না পারে তাহলে বুঝতে হবে শিক্ষক যা পড়াচ্ছেন বা যেভাবে পড়াচ্ছেন ছেলেরা তা বুঝতে পারেনি। এক্ষেত্রে শিক্ষক তার ত্রুটি সংশোধনের জন্য সচেষ্ট হবেন। পাঠ চলাকালীন ছাত্ররা যাতে অমনোযোগী না হয় সে জন্য প্রশ্নের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর মনকে পাঠে নিবদ্ধ রাখতে হয়, তাই এই জাতীয় প্রশ্ন অতি দরকারী।

একটি পর্ব শেষ হয়ে যাবার পর নতুন পাঠ সুরু করবার পূর্বে আলোচিত বিষয় কতটা আয়ত্ত করতে পেরেছে তা জানবার জন্য ও পুনরালোচনার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন। একে পুনরাবৃত্তিমূলক প্রশ্ন (Recapitulatory question) বলা যায়। কোন একটা জিনিষকে জানবার পর সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে হলে বার বার অভ্যাস করতে হয়। প্রয়োগের স্তরেও (application stage) নানারূপ প্রশ্ন করে আলোচিত বিষয়টির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের ভিত্তিকে দৃঢ় করতে হবে।

ছেলেরা অনেক সময় বহু বিষয় মুখস্থ করে। স্মৃতি শক্তির উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতার ফলে তারা নিজেদের বিচার বুদ্ধির প্রয়োগ করতে সমর্থ হয় না। প্রয়োগের স্তরে এই ত্রুটিগুলি দূর করবার জন্য প্রশ্ন করতে হবে। নতুন পরিস্থিতিতে তাদের অধীত বিদ্যাকে যাতে প্রয়োগ করতে পারে সে ভাবে না হলে শিক্ষা নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায়।

প্রশ্ন করবার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে ছেলেরা যাতে আত্মবঞ্চনার সুযোগ না পায় তা দেখা। তারা অনেক সময় ক্লাসে যা পড়ান হল তা না বুঝেই মাথা নেড়ে সায় দিয়ে যায়। সত্য সত্যই তাঁরা মনে করে বিষয়টি তারা বুঝতে পেরেছে—প্রশ্ন করলেই তাদেব এই ভুলটি ভেঙ্গে যায়। কারণ না বুঝে তো উত্তর করা চলে না। সবাই লক্ষ্য করেছেন ক্লাসে যখন শিক্ষক একটি Phrase-এর অর্থ বলেন ছেলেরা বলবে বুঝতে পেরেছি, কিন্তু শিক্ষক যেন এখানেই থেমে না থাকেন। Phrase বা Idiom দিয়ে বাক্য রচনা কবতে না পারলে তা শেখার কোন সার্থকতা নেই। প্রশ্ন করে দেখে নিতে হবে সেই Phrase বা Idiom-টি সার্থক প্রয়োগ করতে সে পেরেছে কি না?

চিন্তা উদ্দীপ্ত করবার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে প্রশ্ন করা। এজন্য চিন্তাউদ্দীপকারী অনুসন্ধানী প্রশ্নের (thought provoking searching question) সাহায্য নেওয়া যায়। অনুসন্ধানী প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে নতুনকে জানবার জন্য উৎসাহ ও আগ্রহের সৃষ্টি হয়। চিন্তা-উদ্রেককারী অনুসন্ধানী প্রশ্নগুলি 'কেন', 'কি করে' দিয়ে সুরু হয়। একটু না ভেবে শুধু মুখস্ত বিদ্যার উপর নির্ভর করে এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা চাই ছেলেরা নিজেরাই একটু চিন্তা করুক। মুখস্ত যা করা হয়েছে তা প্রয়োগ করতে পারে কিনা তা জানা যেমন দরকাব স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশও তেমনি প্রয়োজন। প্রশ্নের মধ্যে 'কেন'ব ব্যবহাবে আমাদের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

শিক্ষামূলক প্রশ্নের (Training or Developing) উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই উত্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে নতুন জ্ঞান আহরণ করবে। শিক্ষকের প্রশ্নের ধারাকে অনুসরণ করে তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করে উত্তর দেয় ও শিক্ষকের সুপরিচালনায় তারা নতুন তথ্যকে আবিষ্কার করে। শিক্ষক সাধারণতঃ পরিচিত বিষয় নিয়ে সুরু করবেন। তারপর উত্তরের সূত্র ধরে একটির পর একটি প্রশ্ন করে তার লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হবেন। শিক্ষার্থীরা যতটা সম্ভব নিজেরাই উত্তর খুঁজে বের করবে।

যেখানে তারা জানে না সেখানে শিক্ষক অবশ্যই তাদের সাহায্য করবেন। এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের পরিচিত বিষয় নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রেই বিশেষ কার্যকরী হয়। অনুবন্ধ প্রণালীতে (correlation) যেখানে শিক্ষা দেওয়া হয় সেখানে Developing প্রশ্নের মাধ্যমে নতুন বিষয় শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়।

শাসনমূলক প্রশ্ন (Disciplinary question) শিক্ষার্থী কতটা শিখেছে, মনোযোগ দিয়ে পাঠ শুনছে কিনা, শ্রেণীর পাঠ বুঝতে পেরেছে কিনা প্রভৃতি নানা উদ্দেশ্য ছাড়াও প্রশ্ন করবার আরেকটি উদ্দেশ্য আছে—তা হচ্ছে শ্রেণী-শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও পরোক্ষভাবে ছাত্রদের শাসন করা। অনেক সময় ছেলেরা পাঠে অমনোযোগী হয়ে ক্লাসে গণ্ডগোল সৃষ্টি করে—তখন যা পড়ান হচ্ছে সে বিষয় সম্পর্কে দু'একটি কঠিন প্রশ্ন ছেলেদের সামনে রাখতে হয়। অমনোযোগী ছেলেদের পক্ষে তার উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়, তার ফলে তারা লজ্জিত হয়। অনেক সময় ভাল ছেলেরা পাঠকে অবহেলা করে—তারা মনে করে তাদের সব জানা হয়ে গিয়েছে—পাঠ্যবিষয় থেকে কঠিন প্রশ্ন করে তাদেরও শাসন করা যায়।

প্রশ্ন কখন করা হবে:—দিনের নির্দিষ্ট পাঠ সুরু হবার পূর্বেই প্রথম প্রশ্ন করে পাঠের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। পাঠ প্রস্তুতি পূর্বে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষক যা শিক্ষা দিতে চান সেদিকে ছাত্রদের দৃষ্টি বা মনোযোগ আকর্ষণ করা। শিক্ষক প্রথমে জানতে চেষ্টা করবেন যা তিনি পড়াতে যাচ্ছেন সে সম্পর্কে ছাত্রদের কোন ধারণা আছে কি না? একে বলা হয় পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা। অনুসন্ধানী প্রশ্নের মধ্য দিয়ে এই স্তরে পাঠ সুরু হবে। পূর্বজ্ঞান পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সেদিনের পাঠ সম্পর্কে তাদের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করে পূর্বজ্ঞানের সাথে তিনি যে নতুন বিষয় শিক্ষা দিতে যাচ্ছেন তাকে সম্বন্ধযুক্ত করবেন।

এর পর উপস্থাপন পাঠ—পাঠ-চলাকালীন প্রশ্ন করে জেনে নিতে হবে যা পড়ান হচ্ছে ছেলেরা তা বুঝতে পারছে কি না। খুব বিচার বিবেচনা করে শিক্ষককে প্রশ্ন করতে হবে। শিক্ষক যা বর্ণনা করেছেন তার একটি পর্ব শেষ করে প্রশ্ন করবেন। রসানুভূতিমূলক পাঠ একটি গল্প বা কবিতা পড়া হতে থাকলে সেই গল্পটি শেষ না করে পাঠ একটু এগিয়ে যাবার পরই প্রশ্ন সুরু করলে পাঠে রসভঙ্গ করা হবে। শুধু রসানুভূতিমূলক পাঠ নয়—জ্ঞানমূলক পাঠ যেমন ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। প্রথম একটি পর্ব

বুঝিয়ে আবার সেই পর্বটি সম্পর্কে আলোচনাকালে শিক্ষক প্রশ্ন করবেন। প্রশ্নগুলির মধ্যে একটা শৃঙ্খলা থাকবে, প্রশ্নগুলি হবে প্রগতিমূলক (Developing), একটি প্রশ্নের উত্তরের মধ্য থেকে স্বাভাবিক ভাবেই আরেকটি প্রশ্ন এসে যাবে। এমনিভাবে চিন্তাধারার বিকাশ লাভ ঘটবে। শিক্ষার্থীর অন্তর্দৃষ্টি, অনুমান শক্তি, চিন্তা, বুদ্ধি, বিচার শক্তির বিকাশ প্রভৃতি উদ্দেশ্য সামনে রেখেই তাদের কাছে প্রশ্ন করতে হবে।

৯. পাঠ অভ্যাস করতে হলে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন আছে। যা পড়ান হয়েছে শিক্ষক যদি আবার তাই বলে যান তা খুব কার্যকরী হয় না। এক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তিমূলক প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রদের সক্রিয় সহযোগিতায় পঠিত অংশের আলোচনা হলে পাঠ আয়ত্ত করা ছেলেদের পক্ষে সহজ হয়।

প্রশ্ন করবার রীতি (Techinque of questioning) :—শিক্ষায় প্রশ্নের কার্যকরীতা অত্যন্ত বেশী, কিন্তু এই কার্যকরী শক্তিকে শিক্ষায় সার্থক করে তুলতে হলে শিক্ষককে জানতে হবে কি করে প্রশ্নের প্রয়োগ করা হয়। শিক্ষককে শ্রেণীশিক্ষায় প্রশ্ন করবার সময় একটা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে অগ্রসর হতে হবে।

শিক্ষকেরা ক্লাসে যখন প্রশ্ন করেন—তখন দেখা যায় একটি ছেলের দিকে আঙুল নির্দেশ করে বা নাম ধরে ডেকে বলেন. "তুমি বলতো·· ···?" এতে ক্লাসে অন্য সবাই ভাবে প্রশ্ন যখন আমাকে করা হয়নি— তখন এর উত্তর কি হবে সে সম্পর্কে আমার চিন্তার কিছু নেই। আগে নাম ধরে ডাকা তারপর তাকে প্রশ্ন করা ঠিক নয়। শিক্ষক প্রশ্ন সমস্ত ক্লাসকে উদ্দেশ্য করে করবেন— তারপর তাদের একটু ভাবতে দেবেন কেউ যেন বুঝতে না পারে তিনি কার নাম ধরে উত্তর দিতে আহ্বান করবেন। ফলে সবাই সম্ভাব্য উত্তর সম্পর্কে চিন্তা করবে। কোন নির্দিষ্ট ছাত্রকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন না করে সমস্ত শ্রেণীর সামনে প্রশ্নটি রাখলে—শ্রেণীর সব ছেলেরাই পাঠে মনোযোগী থাকবে। প্রতি শ্রেণীতেই দেখা যায় দুচারটি ছেলে থাকে যারা প্রশ্ন করবার সাথে সাথেই চিৎকার করে উঠে—'আমি বলি', অনেক সময় জিজ্ঞেস করবার পূর্বেই জবাব দিয়ে দেয়। শিক্ষককে এক্ষেত্রে সাবধান থাকতে হবে। একসাথে একজনের বেশী যেন উত্তর না দেয়। এ অভ্যাস ত্যাগ করতে হলে দু'একদিন একটু কঠোর মনোভাব দেখাতে হবে তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

প্রশ্ন যতটা সম্ভব ছড়িয়ে করতে হবে। শুধুমাত্র ভাল ছেলেদেরই যেন প্রশ্ন করা না হয়। পিছনের বেঞ্চে বসলে প্রশ্নের হাত থেকে রেহাই পাওয়া

যাবে শিক্ষক এ মনোভাব সৃষ্টির সুযোগ কখনও দেবেন না। প্রশ্ন যেন সারিবদ্ধভাবে পর পর করা না হয়। সারিবদ্ধভাবে প্রশ্ন করলে ছেলেরা তার সুযোগ নেবে। প্রশ্ন ঘুরিয়ে করতে হবে—শেষের দিকে প্রশ্ন করে—মাঝের দিকে কি সামনের দিকে চলে আসলে ছেলেরা সব সময় তৈরী থাকবে। প্রতি ছেলেই যেন ভাবে এখনি আমাকে প্রশ্ন করা হবে, তাহলেই তারা প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য সচেষ্ট থাকবে। যারা হাত তুলেছে শুধু তাদেরই জিজ্ঞেস করা হবে না। হাত না তুলেই যদি রেহাই পাওয়া যায় তাহলে কেউ পড়া তৈরী করে আসবে না।

একই প্রশ্ন বার বার বলা হবে না। একই প্রশ্ন একাধিকবার বলা হলে ছেলেরা প্রথম যখন প্রশ্ন করা হবে তখন প্রশ্নে মনোযোগী হবে না। তবে শিক্ষক যদি মনে করেন প্রশ্নটি ছেলেরা বুঝতে পারেনি তাহলে প্রশ্নটি আবার বলা যেতে পারে। প্রয়োজন হলে প্রশ্নের ভাষার পরিবর্তন করতে পারেন।

একজনকে উত্তর দিতে আহ্বান করেই যেন তার কাছ থেকে সাথে সাথে উত্তর আশা করা না হয়। তাকে ভাবতে সময় দিতে হবে। সময় কতটুকু দেওয়া হবে তা নির্ভর করবে প্রশ্নের ধরণের উপর। প্রশ্ন কঠিন হলে উত্তর দিতে একটু বেশী সময় লাগবে। তারপর সব ছেলেই ভাল নয়, শিক্ষক জানেন কোন ছেলেটি কি রকম বুদ্ধি ও মেধা সম্পন্ন। অল্প মেধার ছেলেকে একটু বেশী সময় দিতে হবে।

কোন ছেলে ভুল উত্তর দিলে তা নিয়ে যেন হাস্য-পরিহাস না করা হয়। এতে সে লজ্জিত ও সঙ্কোচিত হয়ে পড়বে এবং অন্য সময় প্রশ্নের উত্তর জানা থাকলেও বলতে সাহসী হবে না। শিক্ষকের সহানুভূতিপূর্ণ সদয় ব্যবহার নির্ভুল উত্তর আদায়ের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। যাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হবে তাকে এমনভাব দেখান হবে যেন সে ইচ্ছা করলেই উত্তর দিতে পারে। আংশিকভাবে শুদ্ধ উত্তর দিলে তাকে সময় দিয়ে চেষ্টা করতে হবে যাতে সে ভেবে চিন্তে ঠিক উত্তর দিতে পারে। কিন্তু যেখানে প্রশ্নের উত্তর স্মৃতির উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ মুখস্থ না থাকলে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় সে ক্ষেত্রে যে জানে না তার কাছ থেকে উত্তর আদায়ের চেষ্টা করার অর্থ হচ্ছে অযথা সময় নষ্ট করা। এসব ক্ষেত্রে যে ছেলে নির্ভুল উত্তর দিতে পারে তার কাছ থেকে উত্তর নিয়ে যারা জানে না তাদের শিখে নিতে হবে।

কোন ছেলে যদি দেখা যায় অমনোযোগী হয়েছে তাহলে তাকে প্রশ্ন করা হবে। একটি প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধ হলেও শিক্ষক আরো দু'একজনকে জিজ্ঞেস

করতে পারেন। এতে যাদের মনে সংশয় আছে তারা পিছিয়ে যাবে—এও এক ধরণের পরীক্ষা, শিক্ষকের প্রশ্ন যেন একই রকম না হয়। তিনি বিভিন্ন প্রশ্ন করে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করবেন।

আদর্শ প্রশ্নের লক্ষণ :—পড়াতে গিয়ে প্রশ্ন আমরা সবাই করি, কিন্তু সব প্রশ্নই পাঠ-প্রগতির সহায়ক নয়। আমাদের যেমন প্রশ্ন করবার রীতি জানতে হবে, তেমনি জানতে হবে প্রশ্ন কিরূপ হবে। আদর্শ প্রশ্নের লক্ষণ হচ্ছে প্রশ্নের সাথে সাথে শিক্ষার্থীর মন সক্রিয় হয়ে উঠবে—সে চিন্তা করবে আর স্মৃতি চারণা করবে, সেই সাথে তার পর্যবেক্ষণ শক্তিকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করবে (……it should incite the pupil to genuine activity of mind ; it should cause him to observe, remember and think" —T. Raymont).

প্রশ্ন করবার সময় প্রথমেই প্রশ্নের ভাষা সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে। একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন করতে হবে। সহজ সরল ভাষায় প্রশ্ন করা হবে যাতে ছেলেরা বুঝতে পারে শিক্ষক তার কাছে কি জানতে চাইছেন। প্রশ্নের ভাষা সহজবোধ্য না হলে জানা উত্তরও ছেলেরা বলতে পারবে না।

প্রশ্নটি যেন শ্রেণীর উপযোগী হয়। পঞ্চম শ্রেণীর ছেলের কাছে যদি জানতে চাই সূর্যগ্রহণ কি করে হয়—তাহলে তারা উত্তর দিতে পারবে না। যে শ্রেণীর ছেলেরা যে প্রশ্নের উপযোগী তাদের সেরূপ প্রশ্ন করতে হবে। প্রশ্ন খুব সোজা বা খুব কঠিন হবে না। যে প্রশ্নের উত্তর দু' একটি ভাল ছেলে ছাড়া দিতে পারেনি বুঝতে হবে প্রশ্ন শ্রেণীর উপযোগী হয়নি।

প্রশ্ন যেন দ্ব্যর্থ ভাষায় রচিত না হয়। প্রশ্নটি এমনভাবে রচিত হবে যার একটি মাত্র উত্তরই সম্ভব। যে প্রশ্নের একাধিক উত্তর হতে পারে সে প্রশ্ন ভাল প্রশ্ন নয়।

যে প্রশ্নের উত্তর বর্ণনাত্মক সে প্রশ্ন পরিহার করা উচিত। সাধারণতঃ যে প্রশ্নের উত্তর সংক্ষিপ্ত হয় সেইরূপ প্রশ্ন করতে হবে।

যে প্রশ্নের উত্তর শুধুমাত্র 'হ্যাঁ' বা 'না' বলে সারা যায় সে প্রশ্ন করা উচিত নয়। এতে চিন্তা ভাবনার বিশেষ প্রয়োজন হয় না—আন্দাজ অনুমান করেই উত্তর দেবার চেষ্টা করে। আকবর কি সুশাসক ছিলেন? এই জাতীয় প্রশ্ন চিন্তা শক্তি উদ্দীপ্ত করে না। অনুমান-নির্ভর উত্তর যেখানে সম্ভব সেই প্রশ্ন এড়িয়ে চলতে হবে।

সম্পূর্ণরূপে স্মৃতি শক্তির উপর নির্ভর করে যে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া চলে সে সব প্রশ্ন আদর্শ প্রশ্নের মধ্যে পড়ে না তবে স্মৃতি শক্তি নির্ভর প্রশ্নকে সম্পূর্ণ-রূপে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়।

যে প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নের মধ্যেই রয়েছে তা করা ঠিক নয়। বিষধর সাপে কামড়ালে কি মানুষ মরে? এর উত্তর প্রশ্নের মধ্যেই রয়েছে—অনুমান করে আন্দাজে হ্যাঁ বা না বলে দিলেও চলে, উত্তরের জন্য চিন্তা করতে হয় না। এ প্রশ্নও করা ঠিক নয়।

প্রশ্ন নানা রকমের হবে—এবং বইয়ের ভাষায় হবে না। শিক্ষক নিজের ভাষায় প্রশ্ন করবেন।

প্রশ্ন করবার রীতি পদ্ধতি ও আদর্শ প্রশ্নের লক্ষণ নিয়ে আলোচনার পরও আমাদের একটি কথা মনে রাখতে হবে—সুযোগ্য শিক্ষক তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি অনুসরণ করে যদি ছাত্রদের শিক্ষা দিতে সমর্থ হন তাহলে তিনি নিজস্ব সৃষ্ট রীতি পদ্ধতিই অনুসরণ করবেন। তাঁকে শুধু মনে রাখতে হবে, যে প্রশ্ন শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তিকে উদ্দীপ্ত করে ও পর্যবেক্ষণের প্রেরণা যোগায় সেইরূপ প্রশ্ন আদর্শ প্রশ্ন—"One golden rule of questioning is make your pupils observe and think"—T. Raymont. কোন বাধা ধরা নিয়ম মেনে সব সময় প্রশ্ন করা চলে না। শিক্ষক সাধারণ নিয়মগুলি জানবেন এই জন্য যে ত্রুটিগুলি তিনি জেনে তবে নিজ অভিজ্ঞতা—বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে প্রশ্ন করবেন। নিয়মভঙ্গ করেও যদি তিনি শিক্ষার্থীর পাঠে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেন, বিচারবুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি বিকাশে সহায়তা করতে পারেন তাহলেই কাজ সার্থক হবে।

প্রশ্নের উত্তর ও সংশোধন :—আমরা যখনই শ্রেণীর সামনে একটি প্রশ্ন করি তখন আমাদের উদ্দেশ্য থাকে সার্থক উত্তর আদায় করা। সঠিক উত্তরের মধ্যে প্রশ্নের সার্থকতা। যতক্ষণ না সঠিক ও নির্ভুল উত্তর আদায় করতে পারা যাবে ততক্ষণ শিক্ষকের কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সর্বক্ষেত্রেই যে শিক্ষার্থীর কাছ থেকে আদর্শ-উত্তর মিলবে তা আশাকরা উচিত নয়। চেষ্টা করতে হবে যতটুকু সে জানে ততটুকু যাতে সে পরিষ্কার করে বলতে পারে। তার উত্তর ভুল হতে পারে, নির্ভুল হতে পারে, দুয়ের মাঝামাঝি হতে পারে। সে যাই বলুক না কেন তাকে বলতে দিতে হবে, শিক্ষক তা আগ্রহের সাথে

শুনবেন। উত্তর ভুল হলেও তাকে নিরুৎসাহ করা বা তিরস্কার করা ঠিক নয়। বরং তাকে উৎসাহিত করতে হবে যাতে সে ঠিক উত্তর দিতে পারে। শিক্ষকের সদয় ব্যবহার ও অনুপ্রেরণায় অনেক কাজ হয়।

প্রশ্নের উত্তর ছেলেরা বই মুখস্ত করে বইয়ের ভাষায় না দিয়ে নিজের ভাষায় যতটা সে বুঝতে পেরেছে তাই গুছিয়ে বলবার চেষ্টা করবে। তোতাপাখীর মত মুখস্ত করা উত্তরকে বাদ দেবার চেষ্টা করতে হবে। এতে ছেলেদের চিন্তাশক্তির বিকাশ হয় না। উত্তরের ভাষা হবে সহজ এবং উত্তরটি হবে সংক্ষিপ্ত। যা তার কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয়েছে ঠিক তার উত্তরই যেন হয়। উত্তর যেন আংশিক না হয়। উত্তরটি যথা সম্ভব একটি সম্পূর্ণ বাক্যে প্রকাশ করতে হবে। ছেলেরা অনেক সময় যা বলা উচিত তার চেয়ে বেশীও বলে—সেখানে ছাত্রকে স যত করতে হবে।

প্রশ্নের উত্তর এমন ভাবে বলতে হবে যাতে শ্রেণীর সব ছেলেই উত্তরটি শুনতে পায়।

প্রথম উত্তরটি যদি সঠিক নাও হয় তাহলেও চেষ্টা করতে হবে যাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে তার কাছ থেকে বা সমস্ত ক্লাসের থেকে যাতে নির্ভুল উত্তর আদায় করা যায়। উত্তরটি মনমত না হলে বলতে পারা যায়, হয়েছে, কিন্তু আরো ভাল করে কে বলতে পারে? কোন উত্তর ভুল হলে কোথায় ভুল তা ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে। শিক্ষক যদি হয়নি বলে কর্তব্য শেষ করেন তাহলে ছেলেদের ভুল কোনদিনই সংশোধিত হ' না। শিক্ষক সব সময় কোথায় ভুল ও কেন ভুল হল এটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবেন। তবে শিক্ষক উত্তর বলে না দিয়ে যদি ক্লাসের ছেলেদের কাছ থেকে উত্তরটি বের করে নিতে পারেন তাহলেই ভাল হয়।

প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবার সাথে সাথে সমস্বরে সবাই যেন চিৎকার করে না ওঠে। তাহলে শ্রেণীর শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব হবে না, এবং কে কতটা জানে তাও সঠিক ভাবে বোঝা যাবে না। শিক্ষক এ সম্পর্কে খুব সতর্ক থাকবেন, দরকার হলে কঠোর মনোভাব অবলম্বন করবেন।

ছাত্রদের প্রশ্ন ঃ—শ্রেণী-শিক্ষার ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনাকালে আমরা দেখেছি শ্রেণী-শিক্ষায় শিক্ষকই একমাত্র বক্তা—তিনি সক্রিয় আর সব নির্বাক শ্রোতা। শ্রেণীশিক্ষার এই ত্রুটী দূর করতে হলে ছাত্ররা যাতে যথা

সম্ভব পাঠে অংশ গ্রহণ করতে পারে আমাদের সেই চেষ্টা করা উচিত। ছাত্রদের সাথে আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠ পরিচালনাই সর্বক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয়। পড়াবার সময় যদি ছেলেরা উৎসাহী হয়ে প্রশ্ন করে—কিছু জানতে চায় তাহলে মনে করতে হবে ছেলেরা পড়ায় মনোযোগী ও আগ্রহশীল। অনেক সময় ছেলেরা ক্লাসে কোন প্রশ্ন করলে তাদের থামিয়ে দেওয়া হয়। ছাত্রদের প্রশ্ন সম্পর্কে এই মনোভাব খুবই নিন্দনীয়। শিক্ষক ছাত্রদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করবেন। তবে মনে রাখতে হবে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত কৌতূহল শ্রেণীতে বসে মেটান সম্ভব নয়। কোন বিষয় আলোচনা কালে প্রাসঙ্গিক ভাবে যে সব প্রশ্ন উত্থাপিত হবে শিক্ষক সেই সব প্রশ্নের মীমাংসা করে দেবেন। এক সাথে সবাই মিলে প্রশ্ন করে যেন গণ্ডগোলের সৃষ্টি না করে সে সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে—এটা শ্রেণী-শৃঙ্খলা রক্ষার সহায়ক বা সুশিক্ষার পরিচায়ক নয়।

শিক্ষক প্রথম চেষ্টা করবেন ছেলেদের প্রশ্নের উত্তর তাদের কাছ থেকে পাওয়া যায় কিনা তাই জানতে। প্রশ্নটি শ্রেণীর সামনে রাখলে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা বা সমবেত প্রচেষ্টায় ছেলেরা যদি উত্তর দিতে পারে তাহলে তাদের আত্মপ্রত্যয় বাড়বে। প্রয়োজন হলে শিক্ষক প্রশ্নের উত্তর বিশদ ভাবে বুঝিয়ে দেবেন। শিক্ষক যদি নিজে কোন প্রশ্নের সঠিক উত্তর না জানেন তাহলে তা স্বীকার করতে লজ্জা পাওয়া উচিত নয়—তিনি বলবেন—আমি এখন সঠিক বলতে পারছি না—পরে তোমাদের ভাল করে বুঝিয়ে দেব। এতে দোষের কিছু নেই, কারণ শিক্ষক সবজান্তা নন। কিন্তু তিনি যদি একটা ভুল উত্তর দিয়ে আসেন তবে সেটা দোষের হবে। ছেলেরা যখন সঠিক উত্তর জানতে পারবে তখন তিনি তাদের চোখে ছোট হয়ে যাবেন। শুধু তাই নয়—ভুল বলে এসে তাকে সমর্থন করবার চেষ্টা করতেও দেখেছি, এটা সবচেয়ে মারাত্মক।

কোন কোন সময় দুষ্টু ছেলেরা মাষ্টার মশায়কে জব্দ করবার জন্য বা পরীক্ষা করবার জন্য নানারূপ উদ্ভট প্রশ্ন করে। এক্ষেত্রে শিক্ষক দৃঢ় হবেন ও শিক্ষার্থীকে প্রশ্রয় দেবেন না।

শিক্ষাক্ষেত্রে 'প্রশ্নের' অপরিসীম গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হয়েই শিক্ষককে শিক্ষাদানের এই কৌশলটি আয়ত্ত করতে হবে। প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে শুধু শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষা হয় না দৈনন্দিন শ্রেণীতে যে পাঠ

দেওয়া হচ্ছে বর্ণনা ও প্রশ্নের মাধ্যমে অগ্রসর হলে পাঠ আয়ত্ত করাও সহজ হয়। প্রশ্ন শুধু শিক্ষার্থীর পরীক্ষাই নয়—শিক্ষকেরও পরীক্ষা। শিক্ষক কি ভাবে গ্রহণ করেন ও ভুল সংশোধন করেন তার মধ্য দিয়ে শিক্ষকের যোগ্যতার পরিমাপ করা চলে। এ সম্পর্কে G. S. Krishnayya যা বলেন তা প্রণিধানযোগ্য :—By a conscious process of good questioning, an intelligent teacher can lead his educational traveller through unfamiliar regions to a desired destination. The right question is the psychological basis of all learning. It is certainly the best means of stimulating thought. A teacher's skill can be measured by the way he handles the most important pedagogical instrument. (Instructions in Indian Secondary Schools - Ed. E. A. Macnee.)

সপ্তম অধ্যায়

শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ

শ্রেণীশিক্ষায় শিক্ষক বক্তা, শিক্ষার্থী শ্রোতা। শিক্ষক যদি ভাল বক্তা হন তাহলে যে বিষয় পড়াচ্ছেন বর্ণনার মাধ্যমে তার একটি নিখুঁত চিত্র ছেলেদের সামনে তুলে ধরতে পারবেন—ছেলেরা বর্ণনার গুণে মনে করবে ঘটনাটি যেন তাদের সামনে বাস্তব হয়ে ফুটে উঠেছে। কিন্তু তিনি যদি পড়াবার সময় বিষয় সম্পর্কীয় একটি চিত্র ছেলেদের দেখাতে পারেন তাহলে সেই দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে—ছেলেদেরও বুঝতে সুবিধা হবে। শিক্ষকমাত্রই জানেন অনেক কথা বলে যা বোঝান যায় না—একটি ছোট দৃষ্টান্ত দিয়ে তা সহজেই বোঝান যায়—Example is better than precept এই প্রবাদ বাক্যের মূলে গভীর সত্য রয়েছে। দৃষ্টান্ত সহযোগে পাঠ সর্বক্ষেত্রে কার্যকরী, বিশেষ করে নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের শিক্ষায় শোনাবার চেয়ে দেখাবার উপযোগিতা অনেক বেশী। কারণ বড়রা মুখে শুনে কোন একটা বিষয় সম্পর্কে যা ধারণা করতে পারবে শিশুদের ধারণা শক্তি কম তাই শুধু মুখে শুনে কোন জিনিষ সম্পর্কে ততটা সুস্পষ্ট ধারণা করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

আমরা সাধারণভাবে বলি—চোখে দেখে কানে শুনলেই বিশ্বাস হবে। শিক্ষায় আমরা কানে শোনা (audio) আর চোখে দেখা (visual) এই দুইয়ের সাহায্যই লই। শিক্ষকের কাছ থেকে যা শুনলাম তা আমরা ভুলিনা, যা দেখি তা আমাদের মনে থাকে, যদি শোনার সাথে সাথে দেখি তাহলে সেটা নিশ্চয়ই আমাদের মনে আরো দীর্ঘস্থায়ী হয়। তাই শিক্ষায় আমরা বহু কথা বলে ব্যাখ্যা করে বোঝাবার চেয়ে এই চোখে দেখে কানে শুনে (audio-visual aids) শেখাবার পথটি বেছে নিয়েছি। তাই আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় বর্ণনাবহুল পাঠে ছেলেদের মনকে আকর্ষণ করবার জন্য বহু শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করা হয়। চোখে দেখে শেখার উপযোগিতাকে মেনে নিলেও সবসময় বাস্তব জিনিষটি ছেলেদের সামনে হাজির করা সম্ভব নয়। এই অবস্থায় আমরা বিকল্প জিনিষের সাহায্য গ্রহণ করি। পশুরাজ সিংহের বিবরণ শুনিয়ে বাস্তব জ্ঞানের জন্য ছেলেদের সব সময় সিংহ দেখাতে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়—এক্ষেত্রে সিংহের

ছবির সহায়তায় শিশুর জ্ঞানকে অনেকটা বাস্তবধর্মী করে তোলা যায়। ভূগোল পড়াবার সময় পাহাড়-পর্বত-নদী নালা সব কিছু চোখে দেখিয়ে শেখান যায় না—এক্ষেত্রেও ছবি দেখিয়ে মানচিত্রের সাহায্যে ভূগোলের অনেক তথ্য ছেলেদের সুন্দর ভাবে শেখান যায়।

যে সব বস্তু ব্যবহার করলে ছেলেদেব কল্পনা শক্তিকে উদ্দীপ্ত করে তোলা সম্ভব হয় ও তাদের শিক্ষণীয় বিষয়কে স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল করে তোলা যায় তাকেই শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ বলা চলে। শিক্ষা-সহায়ক বহু প্রকার উপকবণ শিক্ষাকার্যে ব্যবহার করা হয়। কতকগুলি উপকরণ দ্রব্যমূলক। যেমন উদ্ভিদবিদ্যা শেখাবার জন্য লতাপাতা, ফুল-ফল, নানা গাছ-গাছড়া ইত্যাদি। প্রকৃত বস্তুটির ব্যবহার যেখানে হয় সেখানে শিক্ষার্থীকে কল্পনা করে আর কিছু বুঝতে হয় না। বাস্তব বস্তুটির সাথে পরিচয় হবার পর সে সম্পর্কে আর কল্পনার কোন অবকাশ থাকে না। কোন জিনিষের আদর্শ (model), ছবি, ম্যাপ, চার্ট, নক্সা প্রভৃতি বিকল্প বস্তু। বাস্তবের অভাব পূরণের জন্য এসব উপকরণ ব্যবহার করা হয়। যেখানে এই উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করা হয় সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে কিছুটা কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। প্রকৃতি-বিজ্ঞান শিক্ষায় শিশু-শিক্ষার্থীর বুঝবার সুবিধার জন্য যতটা সম্ভব অকৃত্রিম বস্তুর সাহায্য নেওয়া দরকার। একটু বয়স্ক শিক্ষার্থীর জন্য চার্ট, ম্যাপ প্রভৃতির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। একটু বড় হলেই শিক্ষার্থীর পক্ষে বিমূর্ত বস্তুর ধারণা করা সম্ভব।

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষা-উপকরণের বহুল ব্যবহার শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ ফলপ্রদ হয়েছে। শিক্ষা-সহায়ক উপকরণের ব্যবহারেরর ফলে যে সব জিনিষ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের পথে অনেক বাধা ছিল ছবি দেখে বা মডেল দেখে তারা সে সম্পর্কে সহজেই একটা ধারণা করতে পারে। শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষাসহায়ক উপকরণের সমাবেশে একটা বাস্তব পরিবেশের সৃষ্টি হয়। একটানা নীরস বর্ণনার মাঝে বৈচিত্র্য সম্পাদনে শিক্ষাসরঞ্জাম বিশেষ কার্যকরী। শিক্ষা-উপকরণের সাহায্যে পড়ান হলে বিষয়টি শিক্ষার্থীর মনে গাঁথা হয়ে যায়। প্রায়ই দেখা যায় ছোট-ছেলেদের বিজ্ঞান বইয়ে জবাফুল কি ঐ জাতীয় কোন ফুলের বিবরণ রয়েছে। শিক্ষক যদি পড়াবার সময় দু'একটি ফুল এনে দেখিয়ে ছেলেদের সামনে ফুলের গঠন ও তার বিভিন্ন অংশের সাথে ছেলেদের পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন তাহলে ছেলেরা শুধু সহজে বুঝবে না মনেও রাখবে।

একটি জিনিষ সামনে রেখে শিক্ষা দিলে ছেলেরা নানাভাবে জিনিষটি দেখবে এতে তাদের পর্যবেক্ষণ শক্তিও বাড়বে এবং বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ-ক্রিয়া কি ভাবে করতে হয় সে সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ হবে।

প্রাক্ প্রাথমিক কি প্রাথমিক স্তরে খুব কম জিনিষই আছে যা উপকরণ ব্যতীত ঠিক ভাবে শেখান যায়। শিক্ষাসরঞ্জাম সমূহ সহজ সরল হলে শিশু-শিক্ষার্থীর পক্ষে বোঝবার সুবিধা হয়। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় অল্প আয়াসে ও অল্প খরচেই বহু উপকরণ সংগ্রহ করা যায়। উচ্চশ্রেণীর বিজ্ঞান-বিষয়ক সাজ সরঞ্জাম সংগ্রহ করা বেশ কিছুটা ব্যয় সাধ্য। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াগুলি পরীক্ষা করে না দেখলে শুধু বই পড়ে বা মুখে শুনে শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিষয়টা আয়ত্ত করা কষ্টসাধ্য। তাই বিজ্ঞান শিক্ষার উপকরণ সমূহ ছাত্রদের সামনে যতটা সম্ভব উপস্থিত করবার ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষার উপযোগী কয়েকটি সরঞ্জাম ও তার ব্যবহার : বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার উপযোগী কতকগুলি সাজ-সরঞ্জাম অতি সহজেই যোগাড় করা যেতে পারে। যেমন উদ্ভিদ বিদ্যা শেখবার জন্য নানারকম লতাপাতা ফুল-ফল ইত্যাদি, জীববিদ্যার জন্য হাঁস, ব্যাঙ, খরগোস, কয়েক প্রকার পাখী; ভূতত্ত্বের জন্য পাথর, চক, বালি, নানারকম মাটি। রসায়নের জন্য কয়েক প্রকার এসিড, ধাতু। ইতিহাস ও ভূগোল শিক্ষার জন্য মানচিত্র, গ্লোব, চার্ট, ঐতিহাসিক মানচিত্র, প্রাচীন ছবি ইত্যাদি। এছাড়া শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ডে বহু ছবি, নক্সা, চার্ট এঁকে দিতে পারেন। শিক্ষা-উপকরণের মধ্যে ব্ল্যাকবোর্ডের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এছাড়া ম্যাজিকল্যাণ্টার্নের সাহায্যে কোন বিষয়ে ধারাবাহিক ছবি দেখিয়ে সুন্দর ভাবে বিষয়টি শেখান যায়। সিনেমাকে যদি শিক্ষামূলক কাজে লাগান হয় তাহলে সিনেমা একটি শক্তিশালী শিক্ষার মাধ্যম হতে পারে।

চোখে দেখে ছাড়াও কানে শুনেও অনেক কিছু শেখা যেতে পারে। গ্রামফোন, রেডিও, বিতর্ক সভা, টেপ রেকর্ডার, কোন বিষয়ে বক্তৃতা ইত্যাদি। এছাড়া ছেলেদের এদিক ওদিক বেড়াতে নিয়ে গেলে নতুন নতুন বহু জিনিষ দেখেও সে সম্পর্কে শুনে তারা বহু কিছু শিখতে পারে। গ্রামের ছেলেদের যদি সহরে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে তারা অনেক নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। কলকাতার নিকটবর্তী পল্লীঅঞ্চলের ছেলেদের জন্য ছুটির দিনে শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে—শুধু কলকাতা থেকেই তারা অনেক কিছু শিখতে পারে। সহরের ছেলেদের গ্রামে যাওয়া বিশেষ

দরকার, দেশের সাথে পরিচয় না হলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। বিভিন্ন শিল্প-নগরী, বহুমুখী নদী-পরিকল্পনার বাঁধ বইয়ের মাধ্যমে চেনবার সাথে যদি সেখানে ঘুরিয়ে আনবার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে তারা বহু অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। শিক্ষার উপকরণ সমূহ দক্ষ শিক্ষক যদি নিপুণ ভাবে ব্যবহার করতে পারেন তাহলে ছেলেরা এতে প্রচুর আনন্দ পাবে ও উৎসাহের সাথে বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।

শিক্ষাসহায়ক উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা যেমন রয়েছে এই উপকরণগুলি ব্যবহার সম্পর্কে কিছুটা সতর্কতার প্রয়োজনও রয়েছে। শিক্ষকেরা অনেক সময় অতি উৎসাহের বশে উপকরণের আধিক্য সৃষ্টি করেন। শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয়ের কোন কোন শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে অত্যধিক উপকরণ ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যায়। আমাদের মনে রাখতে হবে উপকরণের বাহুল্যে আসল বিষয়বস্তুটি যেন চাপা পড়ে না যায়—

"Like most other good things, illustration may be overdone. There has been a tendency, especially in our training colleges for teachers, to exalt what is essentially a means to the position of an end, a tendency doubtless encouraged by the mode of examination in practical teaching that has prevailed. Though the ability to illustrate appositely and readily is one of the marks of good teacher, yet it can not be too strongly emphasised that a highly finished and elaborated diagram, picture or model is quite insufficient in itself to make a lesson a good one. Speaking generally the utmost simplicity should be aimed at, and those illustrations which are so simple that they can be made or worked out in the presence of the class are best of all"—T. Raymont.

উপকরণের প্রয়োজন বিষয়বস্তুকে বোঝাবার জন্য, তাই ছবি কি নক্সা যেন খুব জমকালো না হয়। উপকরণ যদি অত্যন্ত চাকচিক্যপূর্ণ হয় তাহলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দৃষ্টি ছবিতেই আটকে থাকবে—বিষয়বস্তু তলিয়ে যাবে। সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয় বিষয়টিকে সহজবোধ্য করে তোলবার জন্য—উপকরণ যেন মূল বিষয়ের স্থান অধিকার করে না বসে। মনে রাখতে

হবে পাঠ্য বিষয়টি মুখ্য, উপকরণ গৌণ। শিক্ষার্থীর মন যেন পাঠ থেকে সরে উপকরণের মধ্যে নিবদ্ধ না হয়। যে শ্রেণীতে পড়ান হবে সরঞ্জামগুলি যেন সেই শ্রেণীর ছেলেদের উপযোগী হয়। নীচের শ্রেণীর ছেলেদের সামনে জটিল কোন উপকরণ উপস্থিত করলে তাদের বোধগম্য হবে না। সরঞ্জাম যেন বিষয় উপযোগী ও প্রাসঙ্গিক হয়। উপকরণটি দেখলেই যেন শিক্ষার্থীরা যা পড়ান হবে সে সম্পর্কে ধারণা করতে পারে। শুধু তাই নয় খেয়াল রাখতে হবে শিক্ষক যে সব উপকরণ নিয়ে ক্লাসে যাবেন তার পিরিয়ডের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তিনি যেন তার ব্যবহার করতে পারেন তা না হলে কতকগুলি উপকরণ বয়ে নিয়ে যাবার অর্থ হয় না। বহু সময় দেখা গিয়েছে প্রয়োজনীয় উপকরণ নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাতে সময় রয়েছে, ছেলেদের মধ্যেও যথেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু শিক্ষকের দক্ষতার অভাবে উপকরণ সমূহের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হল না। শিক্ষক মনে রাখবেন ক্লাশে গিয়েই উপকরণ গুলি ছেলেদের সামনে খুলে রাখা ঠিক নয়। তাহলে তারা উপকরণ সম্পর্কেই কৌতুহলী হবে শিক্ষক কি বলেন তা শুনতে চাইবে না। শিক্ষক নির্দিষ্ট পাঠ নিয়ে আলোচনা কালে যখন উপকরণটি উপস্থাপনের সময় আসবে তখনই তার ব্যবহার করবেন। তাহলেই ছেলেরা জিনিষটির প্রয়োজনীয়তা এবং বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারবে ও উপকরণের সত্যিকারের প্রয়োজন সিদ্ধ হবে।

বিভিন্ন শিক্ষাসহায়ক উপকরণ

পাঠ্যপুস্তক :—শিক্ষায় সাজসরঞ্জাম ও উপকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা কালে আমরা বহু প্রকার শিক্ষাউপকরণের নাম উল্লেখ করেছি। উপকরণ বলতে সাধারণ ভাবে আমরা বুঝি যে বস্তু পাঠকালে ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীর ইন্দ্রিয় ও কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে, বর্ণনামূলক বা যুক্তিমূলক বিষয়কে সহজ ও প্রাঞ্জল করে তুলতে পারা যায় তাই হচ্ছে শিক্ষা উপকরণ। এই অর্থে পাঠ্যপুস্তককে শিক্ষাউপকরণের মধ্যে উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু শিক্ষাদানে পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শিক্ষাসহায়ক উপকরণের পর্য্যায়ভুক্ত করা না হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক বাদ দিয়ে পড়ান সম্ভব নয়। পাঠ্যপুস্তক যে

শিক্ষা সহায়ক এবিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। যে যুগে শিক্ষার বিভিন্ন উপকরণের উপযোগিতার স্বীকৃতি ছিল না বা ব্যবহার ছিল না তখন পাঠ্যপুস্তক ছিল শিক্ষাদানের প্রধান উপকরণ। আজকাল শিক্ষক শ্রেণীতে পাঠ মুখে বলেন—শ্রেণীতে পড়াবার সময় বইয়ের সাহায্য গ্রহণ করেন না। এজন্য অনেকে ঠাট্টা করে বলেন, আগের দিনে ছেলেরা পড়া শিখে এসে শিক্ষকের কাছে বলত আর আজকাল শিক্ষক পড়া শিখে এসে ছাত্রদের কাছে বলেন। পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারে অত্যধিক অবহেলা সম্পর্কে এটি একটি সতর্কবাণী। অতিরিক্ত পুঁথি-নির্ভর—তা যেমন ঠিক নয় তেমনি বই একেবারে বাদ দেওয়ার চেষ্টাও শুভ নয়। বিষয়বস্তু ভেদ, ছাত্রদের বয়স ও বোধশক্তির পার্থক্যের অনুসারে পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার করা উচিত। ছেলেরা যতদিন ভাল করে পড়তে না পারে ততদিন পাঠ্য বইয়ের ব্যবহার খুব কম হবে। যতটুকু হবে তার মধ্যে পড়ার সাথে দেখার বস্তুর সমাবেশ করতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নীচের শ্রেণীতে পাঠ হবে প্রধানতঃ মৌখিক। একটু উঁচু শ্রেণীতে উঠলে শিক্ষকের পড়ার সাথে শিক্ষার্থীরা বইয়ের ব্যবহার কিছুটা শিখবে। কিন্তু মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষকের দেওয়া পাঠই হবে মুখ্য—বই হবে তার পরিপূরক। কিন্তু শিক্ষককে পাঠ্যপুস্তকের উপর নির্ভরশীল হতে হবে। শুধু মাত্র শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট একখানি বই নয়—নির্দিষ্ট পাঠ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রাসঙ্গিক আরো অনেক বইয়ের সাহায্য শিক্ষক গ্রহণ করবেন। পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত না হয়ে ক্লাসে যাওয়া শিক্ষকের পক্ষে একটা অপরাধ। পাঠ্যবই শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের নিকটই শিক্ষাসহায়ক মূল্যবান অত্যাবশ্যক উপকরণ।

ব্ল্যাকবোর্ড:—শিক্ষাসহায়ক উপকরণের তালিকায় ব্ল্যাকবোর্ডের স্থান সর্বাগ্রে। যে স্কুলের কোন উপকরণ নেই সেখানেও একখানা ব্ল্যাকবোর্ড আছে। ব্ল্যাকবোর্ড বাদ দিয়ে স্কুলের কথা কল্পনা করা যায় না। বোর্ড সর্বজন পরিচিত, একটি অত্যাবশ্যক অপরিহার্য উপকরণ। এরচেয়ে সুলভ ও স্কুলে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত উপকরণ বোধ হয় দুটি নেই। সব শ্রেণীতেই ব্ল্যাকবোর্ডের প্রয়োজন রয়েছে। তবে নীচের দিকে মুখের কথার সাথে যদি ব্ল্যাকবোর্ডে নানা রেখা চিত্র অংকন করা যায় তাহলে বিষয়টি তাদের কাছে মূর্ত হয়ে ওঠে। প্রাথমিক পাঠে বাজারে কেনা সাজসরঞ্জাম ব্যবহার অপেক্ষা শিক্ষক যদি তাদের চোখের সামনে পড়াবার সাথে সাথে নানা

রকম নক্সা, চিত্র ইত্যাদি ব্ল্যাকবোর্ডে এঁকে দেন বা কিছু লিখে দেন তাহলে তিনি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বেশী আকর্ষণ করতে পারবেন। "The map that grows before the children's eyes as the lesson proceeds; and the sand or clay model that is moulded in the presence of the class, as the feature after feature of the object is disclosed, are far more effective than the most ornate production presented at the outset in its complete form." T. Raymont. চোখে দেখে আর শিক্ষকের মুখে শুনে অর্থাৎ শ্রবনেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয়ের যুগপৎ ব্যবহারে বিষয়বস্তু ছেলেদের মনে গাঁথা হয়ে যায়। অনেক সময় শিক্ষকেরা ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বোঝেন না, বা জেনেও যতটা ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহার করা দরকার ততটা কাজে লাগান না! শিক্ষকতা করতে লক্ষ্য করেছি অঙ্কের শিক্ষক ছাড়া ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে কেউ যান না। এমনকি সাধারণ বিজ্ঞানের শিক্ষক পর্যন্ত বাজারে কেনা ডায়গ্রাম ছাড়া বোর্ডে কিছু এঁকে বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন না। ইতিহাস শিক্ষকের যে বোর্ড ব্যবহারের প্রয়োজন আছে একথা বোঝাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। আমাদের শিক্ষকদের মনে রাখা দরকার সাধারণ স্কুলে শিক্ষার সহায়ক উপকরণ মাত্র একটি তা হচ্ছে ব্ল্যাকবোর্ড। ক্লাসের শোভাবর্দ্ধনের জন্য যেন ব্ল্যাকবোর্ড রাখা না হয়—আমরা ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহার করব তবেই তার সার্থকতা।

পড়াবার সময় নতুন কি কঠিন, গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তুলনামূলক বিষয় ইতিহাসের সন তারিখ, কোন যুগের প্রধান ঘটনা, সময়-রেখা প্রভৃতি বোর্ডে লিখে দেওয়া দরকার। তাহলে ছেলেরা সহজে বিষয়টি মনে রাখতে পারবে। পড়া শেষ হলে সারাংশ বোর্ডে লিখে দেওয়া উচিত। সারাংশ লিখবার সময় শিক্ষক ছাত্রদের সাহায্য গ্রহণ করবেন। বোর্ডের সাহায্য বিনে অংক শেখান যায় না। কিন্তু বোর্ডে শুধু শিক্ষকই অংক করে দেবেন না ছেলেরাও অংক করবে। বোর্ডের কাজে তাদের পরীক্ষা হবে, আত্মপ্রত্যয়ও জন্মাবে।

ক্লাসের ব্ল্যাকবোর্ড যেন সব সময় পরিষ্কার থাকে। বোর্ড পরিষ্কার রাখবার দায়িত্ব ক্লাস মনিটারের উপর থাকা উচিত। বোর্ডের লেখা পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট হবে। বোর্ডের লেখায় অসাবধানতা জনিত ভুল যেন কখনও না হয়। বিস্তৃত বিবরণ বোর্ডে লেখা সম্ভব নয়, বোর্ডের লেখা হবে

সংক্ষিপ্ত। চিত্র, নক্সা প্রভৃতি আঁকা হলে অন্য বিষয় সুরু করবার পূর্বে বোর্ডের চিত্র মুছে দিতে হবে, না হলে ছেলেদের মন বিষয়ান্তরে আনা যাবে না। শিক্ষক বোর্ডে যা লিখবেন ছেলেরা তা খাতায় লিখে নেবে। লিখবার সময় তিনি বোর্ড আড়াল করে দাঁড়াবেন না। পিছন ফিরে লিখলে ক্লাসে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারে। বোর্ডের পাশে দাঁড়িয়ে লেখাই সঙ্গত, তাহলে ক্লাসের উপর নজর রাখা সম্ভব।

মানচিত্র ও গ্লোবঃ—বহুল প্রচলিত শিক্ষাসহায়ক উপকরণ সমূহের মধ্যে মানচিত্র ও গ্লোব অন্যতম। ভূগোল, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় পাঠে মানচিত্রের ব্যবহার অপরিহার্য্য। ভূগোলের প্রাথমিক পাঠে পৃথিবী গোলাকার এ সম্পর্কে মুখে অনেক কথা বলে ছেলেদের যতটুকু বোঝান যাবে একটি গ্লোব সামনে রেখে জিনিষটা বুঝিয়ে দিলে অল্পকথায় ছেলেরা বুঝবে। পৃথিবীর একদিকে যখন দিন আরেকদিকে তখন রাত মুখে শুনে মনে রাখবে, গ্লোবটি সামনে রাখলে চোখে দেখে কানে শুনে মনে গাঁথা হয়ে থাকবে। উঁচু ক্লাসে আন্তর্জাতিক সীমা রেখা পার হলে জাহাজে একটি দিন কেন এগিয়ে কি পিছিয়ে দেওয়া হয় মুখে বলে একথা যেমন বোঝান যায় তার চেয়ে অনেক সুন্দর করে বোঝান চলে একটি গ্লোব বা পৃথিবীর মানচিত্র সামনে রাখলে। দ্রাঘিমারেখা, অক্ষাংশ প্রভৃতির ব্যবহার, দ্রাঘিমার পার্থক্যের জন্য সময়ের পার্থক্য, দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশের সাহায্যে কোন একটি স্থানের অবস্থান নির্ণয় এসব বিষয় গ্লোব ও মানচিত্রের সাহায্যে শেখান হলে ছেলেরা সহজেই বুঝতে পারে।

মানচিত্রের সাহায্য ব্যতীরেকে [redacted] পড়ালে সে পড়া ত্রুটীপূর্ণ হতে বাধ্য। সাধারণ ভাবে প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক মানচিত্র আমরা ব্যবহার করি। দেশের সীমারেখা, বিভিন্ন রাষ্ট্রের অবস্থান, মানচিত্রের সাহায্য ছাড়া ঠিকমত বোঝান যায় না। যে কোন স্থানের অবস্থান জানতে আমরা প্রথমেই মানচিত্রের সাহায্য গ্রহণ করি। প্রাকৃতিক মানচিত্র থেকে ছেলেদের নদী, পাহাড়, খনিজ সম্পদ, কৃষিজ সম্পদ কোথায় কিরূপ তা বুঝাতে পারি। মানচিত্রে বিভিন্ন রং ও সংকেতের সাহায্যে বিভিন্ন জিনিষের উৎপাদন ও অবস্থান বোঝান হয়, এর ফলে কোন দেশের কোথায় কি পাওয়া যায় তা বুঝতে ছেলেদের কষ্ট হয় না। বিদ্যালয়ে শুধু মানচিত্র দেখিয়ে শেখানই হবে না, মানচিত্রের সাহায্যে তাদের অধীত জ্ঞানের পরীক্ষা নেওয়া হবে। শিক্ষক ছাত্রদের ম্যাপে বিভিন্নস্থান, নদ-নদী,

পর্বত, খনিজ, কৃষি ও শিল্পসমৃদ্ধ স্থান সমূহের নির্দেশ করতে বলবেন। বাড়ী থেকে ছাত্রদের মানচিত্র এঁকে আনতে বলবেন—ছেলেরা উৎসাহের সাথে তা করে আনবে—সৃজনাত্মক কাজের মধ্য দিয়ে তারা নতুন জিনিষ শিখতে পারবে।

ইতিহাস পাঠে ও মানচিত্রের সাহায্য অপরিহার্য। ভারতের ইতিহাসে প্রকৃতির প্রভাব পড়াতে গিয়ে যদি ছেলেদের ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান ও তার তাৎপর্য মানচিত্রের সাহায্যে বোঝান না হয় তাহলে তারা ঠিক ভাবে পাঠ আয়ত্ত করতে পারবে না। ভারতের প্রাচীন যুগের কাহিনীতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, বিদেহ, কোশল মগধ প্রভৃতি বহু রাজ্যের নাম রয়েছে, ঐতিহাসিক মানচিত্রের সাহায্যে স্থানগুলির অবস্থান নির্দেশ না করে দিলে ছেলেরা বুঝতে পারবে না তাদের কোন দেশের ইতিহাস পড়ান হচ্ছে। ইউরোপের নবজাগরণের ইতিহাস পড়াতে গ্রীস, ইতালী, ইস্তাম্বুল প্রভৃতি দেশের সাথে যদি ছেলেদের মানচিত্রের মধ্য দিয়ে পরিচয় করিয়ে না দেওয়া যায় তাহলে তাদের জ্ঞানের ভিত্তি দৃঢ় হয় না। তাই শুধু ভুগোল পাঠে নয় ইতিহাস পাঠেও মানচিত্রের উপযোগিতা একটুও কম নয়।

নক্সা ও চার্ট :—বহু বিষয় আছে যা মুখে বোঝাবার সাথে চার্ট বা নক্সা থাকলে বুঝতে সুবিধা হয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ইতিহাস পড়াতে যদি চার্টের সাহায্যে বিভিন্ন বছরের ক্রমোন্নতির স্তরগুলি বুঝিয়ে দেওয়া হয় তাহলে বছরে কি হারে উন্নতি হয়েছে সে সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা হয়। শুধু মুখে শোনা পরিসংখ্যানের মধ্য দিয়ে যা বোঝান যায় সেই সাথে তুলনামূলক চিত্রের (স্তম্ভগ্রাফ) সাহায্যে অল্প কথায় বিষয়বস্তুকে আরো সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট করে তোলা যায়। বাজারের কেনা নক্সা ও চার্ট ছাড়াও পড়াবার সময় শিক্ষক বোর্ডে চার্ট বা নক্সা তৈরী করে নেবেন। ইতিহাস পাঠে বংশ তালিকা, সময়রেখা, শাসনতন্ত্র পড়াবার সময় ক্ষমতার উৎস থেকে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের রূপ, জ্যামিতি পাঠে বিভিন্ন রূপ জ্যামিতিক চিত্র শিক্ষক বোর্ডে আঁকবেন এতে পাঠ বুঝতে ছেলেদের সুবিধা হবে।

মডেল :—শিক্ষায় চার্ট ও ছবির ব্যবহারের সাথে মডেলের ব্যবহার করা যেতে পারে। মডেল হচ্ছে একটি জিনিষের যথা সম্ভব সঠিক অনুকৃতি। ছবি দেখে কোন একটি জিনিষ সম্পর্কে যে ধারণা হয় মডেল

দেখলে সে জিনিষ সম্পর্কে ধারণা আরো বাস্তব হয়। নীচের শ্রেণীতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে শিক্ষা-উপকরণ রূপে মডেলের উপযোগিতা খুবই বেশী। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পরা যে সব সুন্দর সুন্দর মূর্তি তৈরী করেন তা দেখে ছেলেমেয়েরা আনন্দ পায় অনেক কিছু শিখতেও পারে। মূর্তি গড়াতে ছেলেরা ভালবাসে। তাদের তৈরী মূর্তি দিয়ে যদি স্কুলে শিক্ষামূলক কোন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা যায় তাহলে তারা উৎসাহের সাথে সে কাজে অংশগ্রহণ করবে।

ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণঃ—কিছু বলার সাথে সাথে বিষয়ানুগ চিত্রের সাহায্যে বিষয়টিকে আরো সুন্দর করে শ্রোতার কাছে পরিস্ফুট করে তোলবার জন্য ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের ব্যবহার হয়। প্রচারকার্যের জন্য ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের প্রচলন রয়েছে। শিক্ষা সহায়ক উপকরণ রূপেও ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের ব্যবহার সম্ভব। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ধারাবাহিক স্লাইড তৈরী করে নিয়ে যদি একটির পর একটি ছবি ছেলেদের সামনে তুলে ধরা যায় তাহলে ছেলেরা আনন্দ পায় তেমনি তারা নতুন বিষয় শিখতে পারে। এজন্য একটি নির্দিষ্ট কক্ষ থাকতে পারে যেখানে রুটিনমত বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে কোন নির্দিষ্ট বিষয় পড়ান হবে। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর কক্ষেও ঘর অন্ধকার করে দেওয়ালের উপর ছবি ফেলে পড়ান যেতে পারে। আমাদের দেশের স্কুলে এর ব্যবহার নেই কিন্তু শ্রব্য ও দৃশ্যের সহযোগে পড়াবার এই প্রয়োজনীয় পদ্ধতিটিকে আমাদের গ্রহণ করা উচিত।

এপিডায়োস্কোপঃ—এই উপকরণটি ম্যাজিকল্যাণ্টার্ণের পরিবর্তিত সংস্করণ। এর জন্য কোন স্লাইডের দরকার হয় না। বইয়ের যে কোন ছবিকে কাগজে এঁকে বা অন্য কোন ছবিকে বড় করে দেখান যায়। শিক্ষক পড়াবার সময় কোন ছবি বা ডায়গ্রামকে এপিডায়োস্কোপের সাহায্যে বড় করে দেখিয়ে ছেলেদের পড়াতে পারেন।

সিনেমাঃ—ম্যাজিকল্যাণ্টার্ণের স্থির চিত্র অপেক্ষা ফিল্মের সচল (যদি সম্ভব হয় সবাক) চিত্রের অবদান অনেক বেশী। স্কুলের পক্ষে ফিল্ম প্রজেক্টিং মেসিন ক্রয় করা সহজ সাধ্য নয়। যদি শিক্ষাবিভাগ থেকে শিক্ষামূলক চিত্র তুলে বিভিন্ন স্কুলে দেখাবার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে ছেলেদের আনন্দের ব্যবস্থার স্থানে শিক্ষার ব্যবস্থাও হতে পারে। ফিল্মের মাধ্যমে কিছু শেখবার পূর্বে শিক্ষক ক্লাসে আলোচনা করে নেবেন কোন বিষয়ের

উপর ছবি দেখান হচ্ছে এবং তার গুরুত্ব কি? সিনেমা ব্যবসায়ীরা যদি শুধু লাভজনক প্রমোদ চিত্র না তুলে দু'একখানা শিক্ষামূলক চিত্র তোলেন তাহলে সিনেমা শিক্ষার একটি শক্তিশালী মাধ্যমরূপে পরিণত হতে পারে।

রেডিও ঃ—শিক্ষা সহায়ক উপকরণ সমূহের মধ্যে আধুনিক কালে রেডিও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। রেডিও মাধ্যমে শিক্ষামূলক আলোচনা সমূহ ছেলেদের শোনাবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সরকার থেকে বহু স্কুলে রেডিও দেওয়া হয়েছে। অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কলকাতা কেন্দ্রে দুপুরে বিদ্যার্থী মণ্ডলের আসরে ছেলেদের উপযোগী নানা বিষয় আলোচনা হয়ে থাকে। দেশের যে সব পণ্ডিত ব্যক্তিদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা প্রত্যক্ষ-ভাবে শোনবার কোন সুযোগই দূরের ছেলেদের হয় না রেডিয়োর আলোচনার মাধ্যমে ছেলেদের পক্ষে তা শোনবার সুযোগ হয়েছে। বেতার কর্তৃপক্ষ ছেলেদের উপযোগী যে সব আলোচনার আয়োজন করেন আমাদের উচিৎ তার সুযোগ গ্রহণ করা। যদি বেতাব কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষা বিভাগের সহযোগিতায় প্রোগ্রাম করা হয় তাহলে আলোচনার নির্দিষ্ট সময়ের সাথে স্কুল রুটিনের সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে যার ফলে ছেলেরা আলোচনা শুনবার সুযোগ পাবে।

টেপ রেকর্ডার ঃ—এই ব্যয় বহুল শিক্ষাউপকরণটির প্রচলন আমাদের দেশে হয়নি। কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে এ একটি সম্ভাবনাপূর্ণ উপকরণ। কোন বিষয় সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির ব্যক্তব্য টেপ রেকর্ড করে এনে ছেলেদের শোনান যায়। শিক্ষাবিষয়ক কোন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রেকর্ড করে রেখে পরে তার ব্যবহার করা চলে। ছেলেদের পড়া রেকর্ড করে তাদের ভুল দেখিয়ে দেওয়া, উচ্চারণ শুদ্ধি, গান শেখান প্রভৃতি কাজে টেপ-রেকর্ডের ব্যবহার চলতে পারে। আমাদের দেশেও এই উপকরণটির ব্যবহার সর্ব ভাবে কাম্য।

টেলিভিসন ঃ—আমাদের দেশে টেলিভিসনের প্রচলন নেই তাই বর্তমানে শিক্ষাউপকরণ রূপে এদেশে এর ব্যবহারের প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশ সমূহে এর ব্যাপক ব্যবহারে সুফল পাওয়া গিয়েছে। রেডিয়োতে শুধু কানে শোনার মাধ্যমে আমরা শিক্ষালাভ করতে পারি, টেলিভিসনে কানে শুনে চোখে দেখে শেখার ব্যবস্থা হলে তার চেয়ে অনেক বেশী উপকার হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

দেয়াল-পত্রিকা ও নিউজ-বুলেটিন :—খুব অল্প খরচে ছেলেদের সহযোগিতায় দেয়াল-পত্রিকা ও নিউজ-বুলেটিনের ব্যবস্থা স্কুলে করা যেতে পারে। নিউজ-বুলেটিনে দৈনিক সংবাদপত্র থেকে প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করে সংক্ষিপ্তভাবে লিখে ছেলেদের জানান যেতে পারে, বা কাগজ থেকে প্রধান খবরগুলি কেটে নিউজ-বুলেটিন তৈরী করা যেতে পারে। দৈনিক-সংবাদ বা সপ্তাহিক সংবাদপরিক্রমা এই পর্যায়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদ-সমীক্ষার মধ্য দিয়ে ছেলেরা অনেক তথ্য জানতে পারবে।

দেওয়ালপত্রিকায় ছোট ছোট লেখা আর ছবি থাকবে। যদি প্রতি শ্রেণীর পক্ষ থেকে সম্ভব না হয় স্কুল থেকে মাসে একখানা দেওয়ালপত্রিকা বের করা যেতে পারে। এতে ছেলেদের মধ্যে একটা লিখবার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। যারা আঁকতে পারে তারা সুযোগ পেয়ে উৎসাহিত হবে। নিউজ-বুলেটিন ও দেওয়ালপত্রিকা পরিচালনার দায়িত্ব ছেলেদের উপর দেওয়া দরকার। একজন শিক্ষক পরামর্শদাতারূপে থাকবেন।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ :—বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা ছেলেদের দেওয়া হয় তা পুঁথিগত। পুঁথিনির্ভর বিদ্যা সংকীর্ণ কারণ এর সাথে বাস্তব জগতের সম্পর্ক থাকে না। এখানে শিক্ষার সাথে জীবনের সম্পর্ক না থাকায় সে শিক্ষা কার্যকরী বা ফলপ্রদ হয় না। দেশভ্রমণের মধ্য দিয়ে ছেলেরা বইয়ে যা পড়ছে, সে সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে। পুঁথিগত বিদ্যা হচ্ছে পরোক্ষ জ্ঞান, এই জ্ঞানকে কার্যকরী করে তুলতে হলে দেশ ভ্রমণকে শিক্ষার অঙ্গ করে তুলতে হবে। দেশভ্রমণই শিক্ষাকে পরিপূর্ণতা দান করে (Travelling makes education perfect)।

বর্ত্তমানে শিক্ষাব্যবস্থায় দেশভ্রমণ শিক্ষার এক অপরিহার্য অঙ্গ বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বইয়ের মধ্যে আবদ্ধ থেকে আমরা জগতকে পাই না। প্রাচীন যুগে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার উদ্দেশ্যে বহুদূর দেশে যেত, এতে তাদের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হত। বিভিন্ন সমাজের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, রাজনৈতিক অবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা সবকিছু সম্পর্কে বাস্তবজ্ঞানের জন্য দেশ-ভ্রমণের উপযোগিতা. রয়েছে। দেশ-ভ্রমণে আমরা সকল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞান আহরণ করি। বিদ্যালয়ের গণ্ডির বাইরে পাঠ্য পুস্তকের সীমা ছাড়িয়ে বিশাল বিশ্ব রয়েছে তার সাথে পরিচয় হয় দেশভ্রমণের মধ্য দিয়ে। এতে মনের

সংকীর্ণতা দূর হয়ে জীবন ও জগত সম্পর্কে দৃষ্টি-ভঙ্গি প্রসার হয়, মানুষে মানুষে যে কৃত্রিম ব্যবধানের প্রাচীর তা দূর হয়ে বৃহত্তর মানব সমাজের সাথে আত্মীয়তা বাড়ে।

দেশভ্রমণের মত একই সাথে শিক্ষা ও আনন্দলাভের উপায় খুব কমই আছে। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দেখলে ইতিহাসের পাতায় যা পড়েছে তার পরিবেশের মধ্যে প্রাচীনযুগের একটি চিত্র চোখের সামনে ভেসে উঠবে। নালন্দার ভগ্নস্তূপের উপর দাঁড়ালে ইতিহাসের ছাত্র ভারতের অতীত গৌরবের একটি উজ্জ্বল চিত্র দেখতে পায়। আবার আধুনিক যুগের শিল্প উন্নয়ন পরিকল্পনায় দেশ কি ভাবে এগিয়ে চলছে তার সাথে বাস্তব পরিচয়ের জন্য বিভিন্ন নদী পরিকল্পনা ও শিল্প-সহরগুলিতে যে সব কারখানা গড়ে উঠেছে তা দেখিয়ে আনা দরকার। পাশ্চাত্য দেশ সমূহে শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে শিক্ষামূলক পরিভ্রমণ যেভাবে গ্রহণ করা হয়েছে আমাদের দেশে শিক্ষার্থীদের জন্য সেভাবে শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা এখনও হয়নি।

আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলির আর্থিক সঙ্গতি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, ছাত্রদের পক্ষেও যত প্রয়োজনীয়ই হউক না কেন ভ্রমণের জন্য বিশেষ কিছু খরচ করা সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। এইজন্য আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে যেভাবে সম্ভব সেইভাবে দেশভ্রমণের পরিকল্পনা করা উচিত। শিক্ষা-মূলক ভ্রমণ পরিকল্পনায় অভিভাবকদের সাহায্য ও সহযোগিতা যাতে পাওয়া যায় সেই চেষ্টা করতে হবে। দূরের পথে যেতে হলে যারা যাবে তাদের অভিভাবকদের অনুমতি নিতে হবে। বিশেষ সঙ্গতি সম্পন্ন অভিভাবকদের কাছ থেকে যাতে আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায় সে চেষ্টা করা দরকার—তাহলে সবার চেষ্টা ও সহযোগিতায় স্কুলের পক্ষে ভ্রমণ ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে।

শিক্ষামূলক পরিভ্রমণের পিছনে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকবে—এজন্য পরিকল্পনা অনুসারে সব ব্যবস্থা করতে হবে। দেশভ্রমণ পরিকল্পনায় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে সব শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য একই রকম ব্যবস্থা হবে না। নিম্নশ্রেণীর ছেলেদের জন্য প্রথম প্রয়োজন পরিবেশ পরিচিতির। এজন্য তাঁদের নিজেদের গ্রামের মধ্যে বা নিকটস্থ কোন জায়গায় দর্শনীয় কিছু থাকলে তাদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে। নতুন জিনিষ সম্পর্কে কৌতূহল যাতে তারা নিজেরাই মেটাতে পারে সেজন্য তাদের ধীরে ধীরে সুযোগ দিতে হবে। একটু বড় হলে ছেলেদের কাছের সহর বা কোন কলকারখানা দেখাবার সুযোগ থাকলে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। বই

পড়ে তারা যা শিখেছে এসব দেখে তারা সে সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। সহরের ছেলেদের গ্রাম ও গ্রামের লোকের জীবনযাত্রা সম্পর্কে বিশেষ অজ্ঞতা থাকে—তা দূর করতে হলে সহরের ছেলেদের গ্রামে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া দরকার। গ্রামের ও সহরের স্কুলের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিনিময় মূলক ব্যবস্থায় এজাতীয় ভ্রমণের আয়োজন সুষ্টুভাবে করা যায়।

বড় ছেলেদের জন্য ঐতিহাসিক স্থান বা বড় শিল্পনগরীতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। স্থান নির্বাচনে সে স্থানের গুরুত্ব তার ইতিহাস প্রভৃতি ছেলেদের ভালকরে বুঝিয়ে দিতে হবে। দেশ দেখতে যাবার যাবতীয় ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা ছেলেরা করলে ভাল হয়। এই জাতীয় প্রজেক্টের মাধ্যমে অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া যায়। প্রত্যেকটি ভ্রমণ-পরিকল্পনা শিক্ষামূলক ও আনন্দমূলক হবে। ভ্রমণের মধ্যে ছেলেরা শ্রেণীকক্ষের বাইরে বৃহত্তম মানবসমাজের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পায়। দেহের স্বাস্থ্যের জন্য, মানসিক উন্নতির জন্য, জীবন ও দৃষ্টির প্রসারতার জন্য শিক্ষামূলক দেশ ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হলে ছাত্রদের অশেষ কল্যাণ সাধিত হবে।

অষ্টম অধ্যায়

অনুবন্ধ প্রণালী

শিক্ষায় একটি পাঠক্রম অনুসৃত হয়। এই পাঠক্রমে বহুবিষয়ের সমাবেশ করা হয়। পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির প্রত্যেকটিকে একক ও অন্যনিরপেক্ষ ধরে নিয়ে সেই ভাবে সময় তালিকা রচনা করে শ্রেণীতে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ জানার' বিষয় গুলিকে ভিন্ন ভিন্ন করে খণ্ড খণ্ড ভাবে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদেওয়া হয়। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যায় আমরা যে সব বিষয়কে অন্যনিরপেক্ষ বা স্বতন্ত্র মনে করি সে সব বিষয় সব সময় স্বতন্ত্র নয়। তাদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ট যোগসূত্র রয়েছে। পাঠক্রমের বিভিন্ন বিষয়গুলিকে আমরা "রুদ্ধকক্ষ" (Closed compartment)— একটির সাথে আরেকটির কোন সম্পর্ক নেই একথা যেন মনে না করি। আমাদের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি একটির সাথে অপরটি নিঃসম্পর্কীয় নয়। নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে জ্ঞান আমাদের মধ্যে সঞ্চিত হয় সেই জ্ঞান-রাশি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুসজ্জিত হয়। হার্বাট বলেন পুরাতন জ্ঞানের সাহায্যেই আমরা নতুন জ্ঞান আহরণ করি। জীবনের যাত্রা-পথে প্রতিনিয়ত আমরা নতুন অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছি—নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করছি। এই নতুন অভিজ্ঞতাকে পুরাতন অভিজ্ঞতার আলোকে বিচার করে তার সাথে সম্পর্কযুক্ত করে নেওয়া হচ্ছে। এমনি করে পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানরাশির সাহায্যে আমাদের জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুশৃঙ্খল যুক্তিসঙ্গত ঐক্যবদ্ধ চিন্তাধারাই আমাদের চরিত্র গঠন করে। হার্বাট বলেন আমাদের চরিত্র নির্ভর করে আমাদের ইচ্ছাশক্তির উপর, ইচ্ছাশক্তি আকাঙ্খার উপর, আকাঙ্ক্ষা আগ্রহের উপর ও আগ্রহ চিন্তাবৃত্তের উপর। এই চিন্তাধারার মধ্যেই আমাদের অন্তর্নিহিত যত কর্মপ্রেরণা, এখানেই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য নিহিত। চিন্তাধারার ব্যাপক ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহারের মধ্য দিয়েই চরিত্র সুগঠিত হতে পারে—("Since character depends upon will, will upon desire, desire upon interest and interest upon 'circle of thought', in which the whole inner activity has its abode, it follows that the main business of education lies here, for a strong character can

be formed only by cultivating an extensive and coherent 'circle of thought'.) হার্বার্টের মতে সুশৃঙ্খল ও সম্বন্ধ চিন্তাধারা সৃষ্টি করাই শিক্ষার আসন্ন উদ্দেশ্য (immediate aim), তিনি বলেন শিক্ষার পূর্ণশক্তির ব্যবহার তাঁরাই করেন যাঁরা জানেন কি করে শিশুর তরুণ মন জুড়ে দৃঢ় সুসংবদ্ধ বিস্তৃত চিন্তাবৃত্তের সৃষ্টি করতে হয়—Those only wield the full power of education who know how to cultivate in the youthful soul a large circle of thought closely connected in all its parts."

হার্বার্টের শিক্ষাতত্ত্বের পূর্বসঞ্চিত ধারণার সাথে সুসংবদ্ধ ও সম্পর্কযুক্ত হয়ে নতুন ধারণা গড়ে উঠে ও চিন্তাধারার ঐক্য সাধিত হয়—এই মতবাদকে আশ্রয় করেই তাঁর অনুগামীরা বিভিন্ন বিষয় একটি আর একটির সাথে সম্পর্ক যুক্ত এই মতবাদের অর্থাৎ অনুবন্ধ প্রণালীর সৃষ্টি করেন। এই তত্ত্ব অনুসরণ করে বলা যায় জ্ঞান অখণ্ড এবং প্রত্যেক বিষয়ের জ্ঞান পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলিকে পরস্পর সম্পর্কহীন স্ব স্ব প্রধান মনে করলে ভুল করা হবে। অনেক সময় আমরা অত্যন্ত নিকট সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলিকেও আলাদা করে দেখি। লেখা-পড়া দুটো বিষয় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এদেরও ভিন্ন ভিন্ন করে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইতিহাস-ভূগোল, অঙ্ক-বীজগণিত এদের মধ্যে যে ঐক্যসূত্র রয়েছে সেকথা আমরা ভুলেই যাই। এই বিষয়গুলির একটি পড়াতে গিয়ে প্রাসঙ্গিক ভাবেই আর একটি এসে যায়। পাঠ্য প্রতিটি বিষয়কে ছেলেদে পৃথক পৃথক ভাবে না পড়িয়ে একই শ্রেণীভুক্ত বিষয়সমূহের মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপন করে যদি সে বিষয়গুলি একসাথে পড়ান যায় তাহলে ছেলেদের পক্ষে বুঝতে সুবিধা হয়। সমজাতীয় বিষয় সমূহের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে পড়াবার প্রণালীকেই অনুবন্ধ প্রণালী বলা হয়। অনুবন্ধ প্রণালীর শিক্ষাকে প্রসঙ্গানুগ শিক্ষাও বলা হয়ে থাকে। এক বিষয় আলোচনা কালে আলোচনার সূত্র ধরে প্রাসঙ্গিক অন্য বিষয় অবতারণা করা ও বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যথাসম্ভব বিভেদ ঘুচিয়ে একসাথে পড়ানই হল অনুবন্ধ প্রণালীর গোড়ার কথা। প্রসঙ্গক্রমে এমন সব শিক্ষণ-সম্ভাবনাপূর্ণ বিষয় উপস্থিত করতে হবে যে বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতি প্রয়োগের সঙ্গে তার সম্পর্ক হবে অবিচ্ছেদ্য। অনুবন্ধ প্রণালীতে পড়াবার সুবিধা উপলব্ধি করে বর্তমানে শিক্ষাবিদদের মধ্যে শিক্ষায় বিশেষ করে শিশুশিক্ষায় অনুবন্ধ প্রণালীকে অনুসরণ করবার একটা প্রবণতা দেখা গিয়েছে।

অনুবন্ধ প্রণালীর প্রথম সুবিধা এতে বিষয়-বাহুল্য কমান সম্ভব। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার একটা ত্রুটি সম্পর্কে শিক্ষকেরা বলেন শিক্ষার্থীদের মাথায় বিষয় ও সেই সাথে বইয়ের বোঝা এত বিরাট যে তা বইবার ক্ষমতা শিক্ষার্থীদের আছে কিনা আমরা সে সম্পর্কে খোঁজ নেবার প্রয়োজন বোধ করি না। নিকট সম্পর্ক যুক্ত বিষয় গুলিকে এক করে বিষয়-বাহুল্য কমান যায় কিনা সে কথা চিন্তা করা দরকার। এক বাংলা ভাষার মধ্যেই গদ্য পদ্য, ব্যাকরণ, রচনা, ভাবসম্প্রসারণ ইত্যাদি বহু ভাগ করে এজন্য সময় তালিকায় ভিন্ন ভিন্ন সময় নির্দেশ করে দেওয়া হয়। এই বিভাগের সাথে ভিন্ন ভিন্ন বই পাঠ্য করা হয়। এই জাতীয় বিষয়-বিভাগ স্বাভাবিক নয়। কৃত্রিম বিষয়-বিভাগ শিক্ষার্থীর মনে ভীতির সৃষ্টি করে। একই মূল বিষয়কে খণ্ড খণ্ড করে পড়াবার ফলে বিষয়টির সামগ্রিক রূপ সম্পর্কে ধারণা করতে বেগ পেতে হয়। একটু চেষ্টা করলেই বিষয় ভাগ না করে গদ্য পড়াবার সময় ব্যাকরণ ও সেই সাথে রচনা শেখান যায়।

বিশেষজ্ঞ শিক্ষকেরা নিজেদের বিষয়গুলিকে স্বয়ং-সম্পূর্ণরূপে দেখেন। তাঁর বিষয়ের সাথে যে অন্য বিষয়ের যোগ হতে পারে একথা অনেক সময় চিন্তা করেন না। অঙ্কন শিক্ষক ছাত্রদের অঙ্কনের রীতি-পদ্ধতি শেখাবার সাথে যদি ভূগোলের নানারূপ চিত্র, ইতিহাসের কোন চিত্র, উদ্ভিদ বিদ্যা ও রসায়নের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি আঁকতে শেখান তাহলে বিশেষজ্ঞ শিক্ষক হয়েও আর পাঁচটা বিষয় শিখতে সাহায্য করতে পারেন। বিষয় সমূহের মধ্যে চুলচেরা ভাগের ফলে পড়াবার অসুবিধা শিক্ষক মাত্রেই উপলব্ধি করেন। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যে একটা স্বাভাবিক যোগসূত্র রয়েছে এ সম্পর্কে সচেতন না হবার ফলেই পাঠক্রমে বহুবিষয়ের সমাবেশ করে অসুবিধার সৃষ্টি করা হয়। এক বিষয় যে অন্য বিষয় শিখতে সাহায্য করতে পারে, তার উপর নতুন আলোকসম্পাত করতে পারে সেদিকে চোখবুজে থাকার ফলেই কৃত্রিম বিষয়-বিভাগের সৃষ্টি হয়। এর ফলে জ্ঞান যে অখণ্ড ও অবিভাজ্য সে কথা ভুলে শিক্ষার্থীরা মনে করতে শেখে জ্ঞান হচ্ছে কতগুলি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সমষ্টি। এজন্য শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হতে পারে—

"Total neglect of natural affinities of the subjects of instruction undoubtedly increased the embarrassments caused by crowded curricula, it shuts out the light which one study often sheds upon another, it leads to artificiality

of treatment and loss of interest, it deliberately trains the pupil to take a false view of knowledge as mere agglomeration of independent parts, and to crown all it leaves room for deversities of aim when the aim is essentially the one." T. Raymont.

ইতিহাসের সাথে ভূগোলের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ইতিহাস পাঠকে সার্থক করতে হলে আমাদের মানচিত্রের সাহায্য নিতে হয়। কোন একটি জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তার জাতীয় ইতিহাসের পটভূমিকা রচনায় প্রকৃতির প্রভাব জানতে ভূগোলের সাহায্য দরকার। ইতিহাসের সাথে সাহিত্যের সংযোগ সাধন করাও সম্ভব। পলাশীর যুদ্ধের ইতিহাস পড়াতে গিয়ে 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য থেকে অংশবিশেষ পাঠ করে শোনান যায়। চন্দ্রগুপ্তর ইতিহাস আলোচনা কালে 'চন্দ্রগুপ্ত নাটক' ছেলেদের সামনে আলোচনা করলে পাঠ সহায়ক হয় ছেলেরাও আনন্দ পায়।

অনুবন্ধ প্রণালীর প্রয়োগ:—অনুবন্ধ প্রণালীতে পড়াবার স্বভাবিক সুবিধাগুলি মনে রেখে আমাদের সতর্কভাবে এই প্রণালীকে প্রয়োগ করতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ের সংযোগ স্বাভাবিক ও সাবলীল হওয়া দরকার। কষ্ট-কল্পিত কৃত্রিম সংযোগ সাধনের চেষ্টা করলে অনুবন্ধ প্রণালীর উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। অনুবন্ধ প্রণালীতে পড়াবার সময় কিভাবে বিষয় সংযোগ করা যায় তা বুঝে নিয়ে আমরা কয়েকটি নিয়ম অনুসরণ করতে পা.।

পড়াবার সময় একই বিষয়ের মধ্যে অনুবন্ধ পণালীর সাহায্যে সেই বিষয়ের বিভিন্ন দিক শেখাতে পারি। বাংলাকে—গদ্য, পদ্য, ব্যাকরণ, রচনা প্রভৃতি বহু খণ্ডে ভাগ না করে বাংলা পদ্য বা গদ্য পড়াবার সময় ব্যাকরণ (Textual grammar) পড়ান সম্ভব। রচনা শেখা, ভাবসম্প্রসারণ, সার-সংক্ষেপ প্রভৃতি একই সাথে শেখান যেতে পারে। এইজন্য সময় তালিকায় (Time table) পিরিয়ড নির্দিষ্ট না করে বাংলা শিক্ষকের উপর দায়িত্ব দেওয়া হবে তিনি তাঁর সুবিধামত বিষয় সমূহ অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দেবেন। এছাড়া ইতিহাস কি গণিত প্রভৃতি বিষয়ের মধ্যেও একটা নিজস্ব ধারাবাহিকতা রয়েছে। ইতিহাসে এক যুগকে বাদ দিয়ে তার পরবর্তী যুগের বৈশিষ্ট্য সমূহ আয়ত্ত করা যায় না। অঙ্কের শিক্ষক জানেন পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানের সাহায্য না নিয়ে নতুন কোন পদ্ধতি শেখান যায় না। একই বিষয়ের

মধ্যে বিভিন্ন অংশের সংযোগ সাধন ও সামঞ্জস্য বিধান অপরিহার্য। পড়াতে গিয়ে বা আলোচনাকালে স্বাভাবিক ভাবেই একটি অধ্যায় বোঝাতে আরেকটি অধ্যায়ের সাহায্য নিতে হয়।

অনুবন্ধ প্রণালীর আরেকটি রূপ হচ্ছে এক বিষয় পড়াতে গিয়ে অন্য বিষয় প্রসঙ্গক্রমে উপস্থাপন করা। ইতিহাস পড়াতে ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়াতে ইতিহাস অপরিহার্য রূপেই এসে পড়ে। কোন দেশের ইতিহাস পড়াতে সুরুতেই সেই দেশের ইতিহাসের উপর প্রকৃতির প্রভাব বলে যে অধ্যায়টির আলোচনা করি তা সেই দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যকে জেনেই আলোচনা করি। ইতিহাস পড়াতে সাহিত্যের অবতারণা করা বহু ক্ষেত্রেই হয়। ঐতিহাসিক চিত্রাদির সাহায্যে পাঠকে সরল করে তোলা যায়। সাহিত্যের রসাস্বাদনের সাথেও ভূগোলের যোগ সাধন করা যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের "যেদিন সুনীল জলধি হইতে—" কবিতাটি পড়াবার সময় ভারতের মানচিত্রের সাহায্য গ্রহণ খুবই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। এমনি করে বিভিন্ন বিষয় পড়াতে আমরা অনুবন্ধ প্রণালীর সাহায্য নিতে পারি।

অনুবন্ধ প্রণালীর প্রয়োগের রূপ ও রীতি কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে সাধারণ একটা নিয়ম থাকলেও একটি বিষয় পড়াবার সময় কি ভাবে অন্য একটি বিষয়ের সাহায্য নেওয়া হবে বা একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে দু'তিনটি বিষয় অনুবন্ধ প্রণালীর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে তা শিক্ষকের ব্যক্তিগত প্রয়োগ কৌশলের উপর নির্ভর করে। শিক্ষকের জ্ঞান যদি সীমাবদ্ধ হয় বা বিশেষজ্ঞ শিক্ষক যদি নিজের বিষয়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে অন্য বিষয়ের সীমায় প্রবেশ করতে প্রস্তুত না থাকেন তাহলে তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অনুবন্ধ প্রণালী প্রয়োগ করা বা তার সাহায্য গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

অনুবন্ধ প্রণালীর প্রয়োগ দু'ভাবে হতে পারে—পূর্ব পরিকল্পিত ও আকস্মিক।

পূর্বপরিকল্পিত পদ্ধতিতে পাঠ-পরিকল্পনা কালে স্থির করে নিতে হবে একই সাথে একাধিক বিষয় উপস্থাপন করে কি ভাবে মূল বক্তব্যটি পরিস্ফুট করা হবে ও সেই সাথে আনুসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কেও জ্ঞানার্জনে সহায়তা করা হবে। সব কয়টি বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রেখে পাঠ-পরিকল্পনা করে নিলে শিক্ষকের পক্ষে পাঠ পরিচালনা সহজতর হয়।

পাঠ-পরিকল্পনা করে পড়াতে গিয়েও আমরা লক্ষ্য করেছি আলোচনা কালে নতুন বিষয় উপস্থিত হয়। পাঠকে সহজবোধ্য করে তুলতে যদি

প্রাসঙ্গিক ভাবে কোন কথা এসে যায়—ছেলেরা যদি কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তবে তাকে এড়িয়ে না গিয়ে তার সাহায্যে ছেলেদের বোঝাবার চেষ্টা করাই সঙ্গত। বাংলা শিক্ষক 'আত্মবিলাপ' কবিতা পড়াবার সময় মধুসূদনের জীবনকাহিনী আলোচনা কালে যদি রবীন্দ্রনাথের "ঘরেও নহে পারেও নহে যে জন আছে মাঝখানে—সন্ধ্যাবেলায় কে ডেকে নেয় তারে" লাইন দু'টি আবৃত্তি করে মধুসূদনের জীবনের সাথে তুলনা করেন তাহলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পলাশীর যুদ্ধের কাহিনী পড়াতে পড়াতে "বণিকের মানদণ্ড দেখাদিল পোহালে শর্বরী, রাজদণ্ড রূপে" লাইনটি আবৃত্তি করে শোনাতে প্রায়ই দেখা যায়—এটা সবসময় পূর্বপরিকল্পনা জাত নয়। রাষ্ট্র-বিজ্ঞান পড়াতে গিয়ে ইতিহাসের নজীর তুলে ধরা বা ইতিহাস পড়াতে ভূগোলের সাহায্য নেওয়া স্বাভাবিক ভাবেই এসে যায়। অভিজ্ঞ শিক্ষক মাত্রেই জানেন কি করে কখন অনুবন্ধ প্রণালীর সাহায্য গ্রহণ করলে পাঠ সার্থক হবে।

অনুবন্ধ প্রণালীর প্রয়োগকালে সতর্ক থাকতে হবে সংযোগ সাধনে আমরা যেন কষ্টকল্পনার আশ্রয় না নেই ও সংযোগ যেন কৃত্রিম না হয়। যখন একটি বিষয় পড়াতে গিয়ে আরেকটি বিষয়ের সাহায্য গ্রহণ করব তখন সেই অপ্রধান বিষয়টি মূল বিষয়কে বুঝতে যতটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে বেশী স্থান জুড়ে না বসে। মূল বিষয়ের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্কযুক্ত স্বতঃ-স্ফূর্ত ভাবে যে সব বিষয় আনা সম্ভব সেই বিষয়গুলির যোগসাধন করতে হবে। মূল বিষয়টি বুঝতে অসুবিধা হতে পারে বা ছেলেদের মন মূল বিষয় থেকে বিক্ষিপ্ত হতে পারে এমন কোন বিষয় উল্লেখ করা হবে না। গৌণ বিষয় যাই অবতারণা করা হোক না কেন তার লক্ষ্য হবে মূল বিষয়টিকে বুঝতে সাহায্য করা। পাঠের স্বচ্ছন্দ সাবলীল গতিকে ব্যাহত করতে পারে এমন কোন বিষয় অবতারণা করলে অনুবন্ধ প্রণালীর কোন সার্থকতা থাকবে না।

অনুবন্ধ প্রণালীর কেন্দ্রীকরণ (Plan of Concentration)—অনুবন্ধ প্রণালী সম্পর্কে যাঁরা চরমপন্থী তাঁরা এই প্রণালীকে কেন্দ্রীয়করণের পক্ষপাতী। তাঁরা মনে করেন বিভিন্ন বিষয়কে ঐক্যসূত্রে বাঁধতে হলে কোন একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে অন্য বিষয় সমূহ শিক্ষা দিতে হবে। কেন্দ্রীভূত অনুবন্ধ প্রণালীতে কোন বিষয়কে কেন্দ্রীয় বিষয়রূপে গ্রহণ করা হবে এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। রেমন্ট মনে করেন সাত আট বছরের

ছেলেমেয়েদের রবিনসন ক্রুশোর কাহিনীকে কেন্দ্রীয় বিষয় রূপে গ্রহণ করে নানাবিধ বিষয় শেখান যায়। রবিনসন ক্রুশোর গল্পে জাহাজ, সাগর, দ্বীপ, ভেলা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা কালে প্রসঙ্গক্রমে এসব বিষয় সম্পর্কীয় বহু তথ্য ছেলেদের শেখান যায়। গল্পটি পড়ে—লেখা ও পড়া দুই হয়। এ বিষয় নিয়ে ছবি আঁকা, মডেলিং, সহজ অংক প্রভৃতি শেখান যায়। সেইসাথে "I am monarch of all I survey" কবিতাটি শেখান যেতে পারে।

ইতিহাসকে কেন্দ্রীয় বিষয় রূপে গ্রহণ করে একটু-বড়দের শিক্ষাব্যবস্থা করবার অভিমত কেহ কেহ প্রকাশ করেছেন। যেমন পলাশীর যুদ্ধকে কেন্দ্রীয় পাঠ রূপে গ্রহণ করা হল—এখানে ইতিহাস, সাহিত্য, রচনা, ভূগোল, সেই যুগের যুদ্ধ প্রণালী, মানচিত্র অংকন প্রভৃতি শেখান যেতে পারে। এছাড়া গণিতও জুড়ে দেওয়া যায়। বুনিয়াদী শিক্ষায় কোন একটি শিল্পকে কেন্দ্র করে (craft centred) বহু বিষয় শেখাবার ব্যবস্থা আছে। বুনিয়াদী শিক্ষায় অনুবন্ধ প্রণালীকে যে ভাবে গ্রহণ করা হয় তাকে concentration method বলা যেতে পারে। তবে আদর্শগত পার্থক্য আছে। বুনিয়াদী শিক্ষায় বিষয়সম্বলিত জ্ঞান পরিবেশন করাটাই বড় কথা নয়—তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য জীবনঘনিষ্ট ও ব্যাপক তাই এমন কয়েকটি কাজকে বেছে নিয়ে কেন্দ্রবদ্ধ প্রণালীতে শিক্ষাদেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে যে কাজ উদ্দেশ্যমূলক ও বহু সম্ভাবনাপূর্ণ।

বর্তমানে কেন্দ্রবদ্ধ প্রণালীতে প্রকৃতি-বিজ্ঞানকে কেন্দ্রীয় বিষয় রূপে গ্রহণ করে শিক্ষা দেবার প্রচেষ্টা চলছে—আমেরিকার কর্ণেল পার্কার এই মতের প্রধান প্রবক্তা।

কেন্দ্রবদ্ধ প্রণালী সম্পর্কে একজন চিন্তাশীল লেখক বলেছেন :—"True concentration is not the strained and mechanical bringing together of diverse subject matter into the same recitation, but fixing the attention on all the relations of the given subjects matter and thus drawing into the movement the other subject required for the mastery of one under consideration....If the thing be taught in the only way it can truly be taught, whatever subjects are needed will inevitably be drawn into the process." Arnold Tompkins.

কেন্দ্রবন্ধ প্রণালীর ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে কষ্টকল্পনা বা যান্ত্রিক সংযোগ সাধনের ফলে এই প্রণালীর কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের (specialist teacher) দৃষ্টি একটি মাত্র বিষয়ের উপর নিবদ্ধ থাকার ফলে বিষয় সংকীর্ণ ক্ষেত্রে আবদ্ধ হয়ে সংকীর্ণ মনোভাবের সৃষ্টি করে কেন্দ্রীয় অনুবন্ধ প্রণালী (concentrated scheme) এই ত্রুটিকে দূর করবার জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু গোঁড়া কেন্দ্রবন্ধ প্রণালীর অনুসারী শিক্ষক যদি মাত্রা না রেখে এই প্রণালীর প্রয়োগের চেষ্টা করেন তাহলে বহু অসুবিধা দেখা দিতে পারে। উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক বিষয় না হয়ে অন্য কোনে বিষয় আনতে গেলেই কষ্টকল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। পলাশী যুদ্ধের ইতিহাস বোঝাতে মানচিত্রের প্রয়োজন হয়, সাহিত্য ও চিত্রাংকনের সাহায্য নেওয়া যায় কিন্তু যদি এর সাথে অংকের সংযোগ সাধন করতে হয় তাহলেই তাকে কষ্টকল্পনা বা অবাস্তব সংযোগ সাধন বলতে হবে। তাছাড়া মূলবিষয় যেখানে ইতিহাস পাঠ সেখানে অংক টেনে আনলে ইতিহাস বুঝবার পক্ষে সহায়ক বা ইতিহাসের নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর কোন নতুন আলোক সম্পাত করতে পারে না। অংকের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা আছে তাও রক্ষিত হয় না। যে বিষয় টেনে আনলে প্রয়োজন সিদ্ধ হবে না সে বিষয় আনবার কোন যৌক্তিকতা নেই। সে বিষয় সযত্নে পরিহার করে চলতে হবে। অনুবন্ধ বা কেন্দ্রবন্ধ প্রণালীতে পড়াবার সময় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যাদের পড়ান হচ্ছে তাদের গ্রহণ করবার বা বোঝবার ক্ষমতা কতটুকু। ছাত্রদের মানসিক বিকাশের স্তর অনুযায়ী অনুবন্ধ প্রণালীর প্রয়োগ পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করতে হবে।

অনুবন্ধ প্রণালীর ব্যবহারিক দিক ঠিক কিরূপ হবে তা নির্ভর করে শিক্ষকের যোগ্যতার উপর। পূর্ব পরিকল্পিত বিষয়ের প্রয়োগ ছাড়াও শিক্ষক তার নব নব উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োগ করে বিচিত্র ধরণের সম্ভাব্য বিষয়ের সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন। শিক্ষকের শিক্ষাদান কৌশল শিক্ষাপদ্ধতিকে সার্থক করে তুলবার ক্ষেত্রে সর্বাধিক মূল্যবান। সমগ্র বিষয় সম্পর্কে যে শিক্ষকের সম্যক ধারণা জন্মেছে তিনি অতি সহজেই পাঠকালে প্রসাঙ্গানুগ বিষয়ের সাহায্য গ্রহণ করে তার স্থিরকৃত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেন—

"All successful grouping of instruction depends on the teacher himself and on the width of his culture. If he has himself a well stored mind, he can not fail to see how a lesson on geography suggests relation to history and economics and nature knowledge—relations which should be elicited from his class, so far as relevant to the lesson of the day." Dr. S. S. Laurie.

সমন্বিত-শিক্ষা প্রণালী :—কেন্দ্রবদ্ধ প্রণালীতে কখনও কেন্দ্রীয় বিষয়টিকে স্বতন্ত্র বিষয়রূপে পড়ান হয় এবং কেন্দ্রীয় বিষয়টি পড়াবার সাথে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় শেখান হয়।

কোন কোন জায়গায় কেন্দ্রীয় বিষয়টিকে স্বতন্ত্রভাবে না শিখিয়ে অন্যসব বিষয়ের সাথে এক সাথে পড়ান যেতে পারে। এখানে কেন্দ্রীয় বিষয়টিকে আর স্বতন্ত্র বিষয়রূপে দেখা হয় না। এই পাঠপদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় বিষয় শুধুমাত্র অন্য বিষয় সমূহের সাথে সংযোগ সাধনে সহায়তা করে। একে সমন্বিত-শিক্ষা প্রণালী (Integrated Teaching) বলা হয়।

সমন্বিত-শিক্ষায় শিক্ষণীয় বিষয় গুলিকে সম্পর্কহীন বা বিচ্ছিন্ন রূপে উপস্থাপন করা হয় না। বিচ্ছিন্ন ও অমূর্ত বিষয়ের মাধ্যমে শিক্ষায় ছেলেদের শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট হয় না। বিষয় সমূহ শিক্ষার্থীদের মনে গভীর রেখাপাত করতে সমর্থ হয় না—বিষয়গুলি সম্পর্কে তাদের ভাসা ভাসা জ্ঞান জন্মে। সমন্বিত শিক্ষায় এই ত্রুটি দূর করবার জন্য বাস্তব ঘটনার সাথে শিক্ষণীয় বিষয়টিকে যুক্ত করে সজীব ও মূর্তরূপে বিষয়গুলি উপস্থাপন করে শিক্ষাকে সার্থক করে তোলবার চেষ্টা করা হয়। বাস্তব জীবনের কোন প্রত্যক্ষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে যদি শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে নানারূপ আচার আচরণ ও কর্মের মধ্য দিয়ে শিক্ষা জীবনের অঙ্গীভূত করে তোলা সম্ভব। ছোট শিশুদের ঘরবাড়ী তৈরী, পুতুল খেলা, পুতুলের বিয়ে খেলাগুলি খুবই আনন্দদায়ক—এই খেলাগুলির মধ্য দিয়ে তাদের কল্পনাশক্তি ও সৃজনীশক্তি দুই'ই বিকাশ লাভ করে। শিক্ষা এখানে স্বাভাবিক ও জীবনের অঙ্গীভূত করে তোলায় ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ। একটু বড় ছেলেদের ধীরে ধীরে জটিল বাস্তব বিষয়ের সাথে পরিচয় ঘটিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কোন জাতীয় উৎসব বা কোন জাতীয় নেতার উৎসব পালন, দেশ ভ্রমণ, কোন সামাজিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে সমন্বিত শিক্ষার সুষ্ঠু আয়োজন সম্ভব। সমন্বিত শিক্ষায় শিক্ষার্থীর ব্যক্তি-জীবন ও সামাজিক-জীবনে শিক্ষা-মূলক বিষয়গুলিকে অবলম্বন করে সেই বিষয়সমূহ উপস্থাপন করে জীবন ও শিক্ষাকে সমন্বিত করে তোলা যায়। সমন্বিত শিক্ষায় জীবন ও শিক্ষার মধ্যেই শুধুমাত্র যোগ সাধিত হয় না, শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যেও একটা সহজ ঐক্য সাধন সম্ভব হয়। বাস্তবজীবনের সাথে সম্পর্ক বিরহিত শিক্ষায় যে শক্তির বিরাট অপচয় হচ্ছে সমন্বিত শিক্ষায় সে অপচয় দূর করে জীবন ও শিক্ষার মধ্যে একটি সঙ্গতি সাধন সম্ভব।

নবম অধ্যায়

পাঠ-পরিকল্পনা

পাঠ-পরিকল্পনা কি ?

আমরা যখন কোন একটি কাজে আত্মনিয়োগ করি তখন সে কাজটি সম্পর্কে আমাদের জানতে হয় কাজটি কি—কি করে সম্পন্ন করা সম্ভব, কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে আমাদের কিভাবে প্রস্তুত হতে হবে ইত্যাদি। কাজে লাগিয়ে দেওয়া হল আর যে করে হোক কাজটি শেষ করে দিয়ে এলাম তা কখনও ত্রুটি শূন্যভাবে সুসম্পন্ন হয় না। প্রস্তুতি নেই, পরিকল্পনা নেই—এভাবে কোন কাজ হতে দেওয়া আর উদ্দেশ্যহীন নৌকা চালান একই কথা। শিক্ষকের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব রয়েছে তা হচ্ছে শ্রেণী-পাঠনা (Class Teaching)। চিরাচরিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক সামনে বই রেখে উপস্থিত মত কিছু বলে আসেন, ছাত্র নিষ্ক্রিয় শ্রোতার মত মুখ বুজে বসে থাকে—কতটুকু শোনে বলা কঠিন। শ্রেণী-পাঠনার দায়িত্ব যথাযথ রূপে পালন করতে হলে শিক্ষকের একটি পরিকল্পনার প্রয়োজন। এক বছরে তিনি যতটা পড়াবেন সেই সমগ্র বিষয়টি কি করে বিভিন্ন ইউনিটে ভাগ করে নিলে তাঁকে দিনে কতটা পড়াতে হবে এ সম্পর্কে তিনি একটি ছক তৈরী করে নেবেন। তাঁকে স্থির করতে হবে তিনি কি পড়াবেন, কি ভাবে পড়াবেন, পড়াবার সময় কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে শিক্ষণীয় বিষয়টি শিক্ষার্থী সহজেই বুঝতে পারবে ও তিনি যা বোঝাবেন তা হৃদয়গ্রাহী হবে। শিক্ষকের এই প্রস্তুতির মধ্যে থাকবে একটা ধারাবাহিকতা—সারা বছরের কাজ ছোট ছোট অংশে (unit) ভাগ করে তিনি রোজকার পাঠ পরিচালনা করবেন। সুষ্ঠুরূপে দৈনন্দিন শ্রেণীশিক্ষা পরিচালনার জন্য এই যে প্রস্তুতি বা পরিকল্পনা এরই লিখিত রূপকে বলা হয় পাঠটীকা বা পাঠপরিকল্পনা।

পাঠ-পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষকের জন্য একটি বিষয় শিক্ষা দেবার নির্দিষ্ট সময় (period) নির্ধারিত রয়েছে। সেই পূর্বনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তিনি যখন কোন একটি বিষয় শিক্ষা দেবেন তখন তাঁকে এমন ভাবে পাঠ-পরিকল্পনা করতে হবে যাতে তিনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেদিনের পাঠ শেষ করতে পারেন। পাঠ পরিকল্পনা কালে তিনি মনে রাখবেন যাদের তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন সেই শিক্ষার্থীদের

মনে আগ্রহ সৃষ্টি করে পাঠ সম্পর্কে তাদের উৎসাহী করে তুলতে হবে—নাহলে সেদিনের পড়া তাদের মনে কোন রেখাপাত করবে না। আজকের দিনে শিক্ষার অর্থ এই নয় যে শিক্ষক বলবে শিক্ষার্থী শুনে যাবে। শিক্ষা একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া (bipolar process)। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করে এমন ভাবে পাঠ পরিচালনা করবেন যাতে তারাও সমভাবে পাঠে অংশ গ্রহণ করতে পারে। পাঠে শিক্ষক সাহায্যকারীর ভূমিকা গ্রহণ করবেন কারণ শিক্ষা-রঙ্গমঞ্চের নায়ক শিশু। তাদের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করবার কৌশল জানা না থাকলে তাদের পাঠে উৎসাহী করা সম্ভব হবে না। শিক্ষণীয় বিষয় যদি নীরস হয় তবু তাকে যথাসম্ভব আনন্দ মধুর করে তোলবার চেষ্টা পাঠ পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে করতে হবে। পাঠ পরিচালনার সময় ছেলেরা শুধু কান দিয়ে শুনবে কিন্তু সেই সাথে চোখ দিয়ে দেখে বিষয়টি যাতে আরো ভাল ভাবে বুঝতে পারে দরকার হলে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। পাঠ পরিকল্পনার সাথে আমাদের ভাবতে হবে বিমূর্ত বিষয়কে মূর্ত করে তুলতে বর্ণনার সাথে কি শিক্ষা সহায়ক উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করা যায়। পড়াবার সময় শিক্ষার্থীর একাধিক ইন্দ্রিয় যাতে সক্রিয় হয় সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

পাঠ-পরিকল্পনাকালে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে তার মধ্যে যেন অযথা পাণ্ডিত্যের প্রকাশ না পায়। যে শ্রেণীর পাঠটীকা রচনা করা হবে সেই শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বয়স, বুদ্ধি, গ্রহণ করবার ক্ষমতা, পূর্বজ্ঞান প্রভৃতি বিচার করে তাদের উপযোগী পাঠটীকা রচনা করবেন। একদিনের প্রচেষ্টায় কতটুকু তাদের শেখান যেতে পারে বা কতটুকু তারা বুঝতে পারে সে সম্পর্কে পূর্বধারণা না থাকলে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। পূর্বপরিকল্পনা ও প্রস্তুতি থাকলে এমন কোন বিষয় শিক্ষক অবতারণা করবেন না যা ছেলেদের কাছে কঠিন বলে মনে হতে পারে।

শিক্ষক যদি পাঠটীকা রচনা না করে শ্রেণীতে যান তাহলে তার সামনে পাঠের কোন স্থির লক্ষ্য থাকবে না। তিনি কোন দিকে নিয়ে যাবেন, তাঁর বক্তব্যের লক্ষ্য কি এ সম্পর্কে ধারণা করতে না পারলে শিক্ষার্থীরা শ্রেণীপাঠ অনুসরণ করতে পারবে না। পূর্বপরিকল্পনার অভাবে পাঠ লক্ষ্যচ্যুত হয়ে সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

পাঠ সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট ধারণা নিয়ে শিক্ষক যখন একটি পাঠটীকা রচনা করেন তখন তিনি পূর্বেই স্থির করতে পারেন পাঠকে আকর্ষণীয় করে তুলতে

হলে কি কি শিক্ষা-উপকরণ প্রয়োজন, কোন কোন বিষয় উপস্থাপন সম্ভব, অনুবন্ধ প্রণালীর সাহায্য গ্রহণ সম্ভব কিনা ইত্যাদি। শিক্ষার মত একটি জটিল কাজকে সুসম্পন্ন করতে হলে শিক্ষককে অবশ্যই প্রস্তুত হয়ে শ্রেণীতে যেতে হবে। শিক্ষকের প্রস্তুতির বাস্তব রূপায়ণ হয় পাঠটীকার মাধ্যমে। বিষয়বস্তু শিক্ষকের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন থাকলেই সর্বদা সার্থক পাঠটীকা রচনা করা সম্ভব নয়। কিভাবে আধুনিক শিক্ষামনোবিজ্ঞান সম্মত পাঠটীকা রচনা করা যায় এ বিষয়ে আমাদের হার্বার্ট পথ দেখিয়েছেন।

হার্বার্টের পঞ্চ সোপান পদ্ধতি

হার্বার্ট বলেন জন্মের সময় শিশুর মন থাকে শূন্য। প্রকৃতি ও সমাজের সংস্পর্শে শিশু যে অভিজ্ঞতাগুলি অর্জন করে সেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই শিশুর মানসিক বিকাশ ঘটে। মনের দুটি ক্ষমতা থাকে—একটি হচ্ছে পরিবেশের সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করে উপস্থাপিত উপকরণগুলিকে ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করবার ক্ষমতা (Perception)। আর একটি হচ্ছে উপলব্ধিগুলিকে আয়ত্ত করে নিজের মধ্যে গ্রহণ করবার ক্ষমতা (Assimilation)। পুরাতন পূর্বসঞ্চিত ধারণা ও চিন্তার প্রয়োগ করে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে নিত্য নতুন ধারণা মনের আয়ত্ত হয়। এই আয়ত্তকরণকে বলা হয় সমবেক্ষণ (Apperception)। এই পুরাতন ধারণার সাহায্যে নতুন ধারণার আয়ত্তীকরণ অর্থাৎ সমবেক্ষণবাদের উপরেই হার্বার্টের শিক্ষানীতি প্রতিষ্ঠিত। পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানের সম্প্রসারণ দ্বারাই নতুন জ্ঞানলাভ হয়। হার্বার্টের মতে শিশুকে যে নতুন জ্ঞানের সাথে পরিচয় করান হবে সেই জ্ঞানকে তার পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানের সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া চাই। নতুন বিষয় শিক্ষা দেবার সুরুতেই শিক্ষককে জানতে হবে সেই নতুন বিষয় আয়ত্ত করবার উপযুক্ত পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানরাশি (apperceptive mass) শিশুর আছে কিনা। শিশুর জানা বিষয়ের সাথে সম্বন্ধিত করে নতুন বিষয়ের উল্লেখ করলেই নতুন বিষয় সম্পর্কে শিশুর মনে আগ্রহ বা ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হবে। তাই নতুন পাঠ সুরু করবার পূর্বে শিক্ষককে সেই নতুন পাঠের সঙ্গে সুকৌশলে ছাত্রের আয়ত্তীকৃত পুরাতন জ্ঞানের সংযোগ ঘটিয়ে দিতে হবে। তাহলে নতুন জ্ঞান আয়ত্ত করা শিশুর পক্ষে সহজ হবে।

হার্বার্ট বলেন আমাদের মনে কোন ধারণা গঠিত হতে হলে দুটি ব্যাপার ঘটে। প্রথমে কোন বস্তুর মূর্তি মনের সামনে আসে, মন তখন তাতে নিবিষ্ট হয়। একে বলা হয় মনোনিবেশ (concentration)। তারপর নতুন

বস্তুটির সঙ্গে পূর্বসঞ্চিত আয়ত্তীকৃত ধারণার সংযোগ হয়ে মনে নতুন অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয়। কোন বস্তুর প্রতি মন নিবিষ্ট হলে বস্তুটি মনের সামনে ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। যতই বস্তুটি মনে সুস্পষ্ট হতে থাকে ততই মনের পূর্বসঞ্চিত ধারণাগুলির সঙ্গে তার সংযোগ ঘটতে থাকে এবং ব্যক্তির চিন্তাধারার সাথে মিশে যেতে থাকে। চিন্তাবৃত্তে (circle of thought) পড়লেই মন নতুন ধারণাকে সাজিয়ে গুছিয়ে মনের পূর্বসঞ্চিত একই ধরণের ধারণাগুলির সঙ্গে এক শ্রেণীভুক্ত করে রাখে। তারপর প্রয়োজন মত বিশেষ শ্রেণীভুক্ত সেই ধারণা বা অভিজ্ঞতাকে সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতির মধ্য দিয়ে বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়। তাই দেখা যাচ্ছে হার্বার্টের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অনুসারে শিক্ষা প্রক্রিয়ার স্তরে হচ্ছে—সুস্পষ্টতা (clearness), সংযোগ (association), শ্রেণীভুক্তি (classification or systematisation), প্রয়োগপদ্ধতি (method).

হার্বার্টের এই শিক্ষাতত্ত্বের চারটি স্তরকে তাঁর অনুগামীরা কিছুটা পরিবর্তিত করে পাঁচটি সোপানে দাঁড় করান। সুস্পষ্টতা (clearness) স্তরটি শিক্ষাক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই স্তরটিকে ভেঙ্গে তিনি আয়োজন (Preparation) ও উপস্থাপন (Presentation) এই দু'টি অংশে ভাগ করেন। হার্বার্টের শিক্ষাতত্ত্বকে অনুসরণ করে তাঁর অনুগামীরা যে পঞ্চ-সোপান শিক্ষাপদ্ধতির (Five formal steps of Instruction) সৃষ্টি করেন তার পাঁচটি সোপান হচ্ছে প্রস্তুতি বা আয়োজন (Preparation), উপস্থাপন (Presentation), তুলনা (Comparison), সূত্র গঠন (generalisation), প্রয়োগ বা অভিযোজন (application)·

(বিস্তারিত আলোচনার জন্য তৃতীয় অধ্যায় দেখুন)

হার্বার্ট নির্দেশিত আদর্শকে গ্রহণ করে বর্তমানে পাঁচটি সোপানকে সংক্ষিপ্ত করে তিনটি সোপানে পরিবর্তিত করে বর্তমানে পাঠটীকা রচিত হয়। এই তিনটি সোপান হচ্ছে আয়োজন (Preparation), উপস্থাপন (Presentation) ও অভিযোজন (Application)। হার্বার্টের পঞ্চ-সোপানের তুলনা ও সূত্রগঠন এই দু'টি সোপান উপস্থাপনের মধ্যে নিয়ে নেওয়া হয়েছে।

শিক্ষাকে সার্থক করে তোলবার জন্য হার্বার্ট নির্দেশিত পঞ্চসোপান পদ্ধতি নীতিগত ভাব গ্রহণ করে পাঠটীকা রচনার প্রণালী বর্তমানে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত হলেও এই পদ্ধতির কয়েকটি ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন থাকা দরকার।

আধুনিক শিশুকেন্দ্রীক শিক্ষা ব্যক্তিমুখীন। ব্যক্তিগত পার্থক্যকে স্বীকার করে নিয়ে প্রতিটি শিশুর শক্তি, রুচি, আগ্রহ, প্রবণতা প্রভৃতি বিচার করে শিক্ষার ব্যবস্থা করাকেই শিশুকেন্দ্রীক শিক্ষা বলা হয়। পূর্বকল্পিত পাঠটীকায় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে পূর্বধারণাকে কাজে লাগান। শিক্ষক শ্রেণীগত ভাবে পাঠটীকা রচনা করেন। ব্যক্তিমুখীন শিক্ষায় যে ভাবে প্রতিটি ছাত্রের ব্যক্তিগত উৎকর্ষসাধনের চেষ্টা করা হয় এখানে তা সম্ভব নয়। পঞ্চসোপান শিক্ষাপদ্ধতির মূলভিত্তি হার্বার্টের শিক্ষাদর্শন। বর্তমান মনোবিজ্ঞানীরা মনের গঠন ও ধারণা করবার শক্তি সম্পর্কে হার্বার্টের মতবাদকে অভ্রান্ত বলে মনে করেন না।

পাঠটীকা-নির্ভর পাঠে শিক্ষক প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় তারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করাবার সুযোগ পায় না।

এ পদ্ধতিতে যে ভাবে পাঁচটি সোপানের মধ্যে বিষয়কে সীমাবদ্ধ করে শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে তার ফলে শিক্ষার মত একটি স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া কৃত্রিম ছাঁচে ঢালা ও যান্ত্রিক (Mechanical) হয়ে দাঁড়ায়। পঞ্চসোপান-পদ্ধতি শিক্ষকের স্বাধীনতা হরণ করে নেয়। এই পদ্ধতিকে নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করতে হলে প্রয়োজন মত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এছাড়া বাস্তব দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় স্কুলের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঁচটি সোপানকে যথাযথ অনুসরণ করে পড়ান সম্ভব নয়।

এপ্রসঙ্গে বলা চলে শ্রেণীশিক্ষার বহু দোষ ত্রুটি জেনেও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় শ্রেণীশিক্ষা ব্যবস্থা মেনে নেওয়া হয়েছে। শ্রেণীশিক্ষাকে যতটা সম্ভব দোষ মুক্ত করবার জন্য হার্বার্টের শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োগ করা যায়। পাঠটীকা রচনায় ও পাঠ পরিচালনায় শিক্ষক যতটা সম্ভব ছেলেদের সহযোগিতায় তাদের প্রকাশের পথ উন্মুক্ত করে দেবেন। পঞ্চসোপান শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষকের স্বাধীনতা খর্ব করেছে একথা বলা ঠিক নয়। পঞ্চসোপান পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের কাঠামোটিই স্থির করে দেওয়া হয়েছে। যোগ্য অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষাদানকালে তাঁর প্রয়োজন মত পাঠটীকার পরিবর্তন সাধন করতে পারেন। কৌতূহলী শিক্ষার্থীদের সব প্রশ্নই পাঠটীকার পরিকল্পিত পথ ধরে যাবে না। সে ক্ষেত্রে শিক্ষকের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের স্বাধীনতা আছে। পাঁচটি সোপান অনুসরণ

সম্ভব নয় বা সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজন নেই বলেই বর্তমানে তিনটি সোপানের সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণ দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও শ্রেণীশিক্ষা-ব্যবস্থায় হার্বার্টের শিক্ষাপদ্ধতির উপযোগিতাকে কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

পাঠটীকা প্রস্তুত প্রণালী :—কোন একটি বিষয়ের পাঠটীকা রচনার সময় শিক্ষককে কয়েকটি বিষয় মনে রাখতে হবে। প্রথমেই তাঁকে খেয়াল রাখতে হবে কোন শ্রেণীর জন্য পাঠটীকা রচিত হচ্ছে। শ্রেণীভেদে ছাত্রদের বয়স ভেদ হয়, গ্রহণের শক্তির তারতম্য হয়। অনেক সময় একই কবিতা বা গদ্যাংশ উঁচু ও নীচু শ্রেণীতে পড়ান হয়—পাঠটীকা রচনায় শ্রেণীর কথা বিবেচনা করতে হবে। তারপর সময়—আমাদের অনেক কিছু বলার থাকতে পারে কিন্তু সময় মাত্র ৪০ মিনিট। তাই এমন ভাবে পাঠটীকা রচনা করতে হবে যাতে সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যেন নির্দিষ্ট পাঠ শেষ করা যায়।

ছেলেদের কি বিষয়ে পাঠ দেওয়া হবে তা আগে থেকেই স্থির করে নিতে হবে। শুধু বিষয় স্থির করলেই চলবে না, কোন বিষয়ের কতটুকু পাঠ দেওয়া হবে, সেদিনকার বিশেষ পাঠ কি সে সম্পর্কে ছাত্রদের জানিয়ে দিতে হবে। পাঠের উদ্দেশ্য কি তা স্থির করে পাঠপরিচালনা করতে হবে। শিক্ষার্থীরা যেন বুঝতে পারে নির্দিষ্ট যে পাঠ তারা গ্রহণ করছে তার লক্ষ্য কি? সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সামনে না রেখে কোন বিষয়ের পাঠ সুরু হলে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারবে না তাদের সামনে প্রতিপাদ্য বিষয় কি? পাঠটীকা লক্ষ্যে পৌঁছাবার দিকে দৃষ্টি রেখেই রচিত হবে। পাঠের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ভেদে পাঠপরিকল্পনা ও পাঠপরিচালনার রূপ ভিন্ন হবে। জ্ঞানমূলক পাঠ (knowledge lesson) এবং রসানুভূতিমূলক পাঠের (appreciation lesson) উদ্দেশ্য একরকম হতে পারে না। উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি রেখেই পাঠ পরিচালিত হবে এবং সেই ভাবেই পাঠটীকা রচিত হবে। পাঠের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উদ্দেশ্য থাকতে পারে, পাঠটীকায় তার উল্লেখ থাকবে।

শুধুমাত্র শিক্ষকের মুখে শুনে ছেলেদের তৃপ্তি হয় না, তাই পাঠকে সব দিক থেকে আকর্ষণীয় করে তোলবার জন্য কানে শোনার সাথে চোখে দেখার কি কি সরঞ্জাম ব্যবহার করা যেতে পারে তাও পূর্বে, স্থির করে নিতে হবে। যে সব শিক্ষা-উপকরণ পাঠকালে ব্যবহৃত হবে পাঠটীকায় তার উল্লেখ থাকবে।

পাঠদান কালে শিক্ষার্থীর মনকে প্রস্তুত করা এক কঠিন কাজ। আয়োজন বা প্রস্তুতির উপর পাঠ পরিচালনার সাফল্য অনেকখানি নির্ভরশীল। ছেলেদের মধ্যে যদি আগ্রহ সৃষ্টি না হয়, তারা যদি নতুন বিষয় সম্পর্কে কৌতূহলী না হয় তাহলে তাদের পড়াবার চেষ্টা পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হবে। নির্দিষ্ট পাঠ সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করবার জন্য ও যে বিষয়ে পাঠ দেওয়া হচ্ছে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান কতটা আছে শিক্ষক প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করে তা জেনে নেবেন। পূর্বজ্ঞান পরীক্ষার মধ্য দিয়েই প্রশ্ন করে সেদিনকার নতুন পাঠের সাথে পুরাতন অভিজ্ঞতার সংযোগ সাধন করে দেবেন। যদি বিষয়টি নতুন হয় তাহলে বিষয়ানুগ প্রশ্ন করে আগ্রহ উদ্দীপ্ত করে শিক্ষার্থীর মনকে পাঠ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করবেন। আমাদের মনে রাখতে হবে একই শ্রেণীর সমস্ত ছেলের পূর্বজ্ঞান ঠিক একই রকম নাও হতে পারে। তাই প্রস্তুতি পর্বে আমাদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে আগ্রহ সৃষ্টি করে পাঠের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা। আগ্রহ সঞ্চার করতে শিক্ষক কি পন্থা অবলম্বন করবেন সে সম্পর্কে শিক্ষক তাঁর স্বাধীন বিচারবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার সাহায্য নেবেন।

পাঠের উপযুক্ত পরিবেশে শিক্ষার্থীর মনকে নির্দিষ্ট পাঠ গ্রহণে প্রস্তুত করে—তার মনে কৌতূহল সৃষ্টি করে শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন। এর পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের ঠিক জানা ছিল না কি নিয়ে আলোচনা হবে, পাঠঘোষণার পর পাঠ একটি সুনির্দিষ্ট পথ ধরে অগ্রসর হবে।

পাঠ সুরু হলে শিক্ষক ধীরে ধীরে বিষয় বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করবেন। পাঠের সুবিধার জন্য নির্দিষ্ট পাঠকে কয়েকটি পর্বে (unit) ভাগ করা যেতে পারে। শিক্ষক ধারাবাহিক ভাবে একটির পর একটি পর্ব বা অংশ শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থিত করবেন। বিষয় বস্তু ভেদে (জ্ঞানমূলক, রসানুভূতিমূলক, দক্ষতামূলক) পাঠ উপস্থাপনের রীতি-পদ্ধতি ভিন্নরূপ হবে। উপস্থাপনের ক্ষেত্রে প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা জ্ঞানমূলক পাঠে যে ভাবে করা হবে রসানুভূতিমূলক পাঠে সে ভাবে করা হবে না। (পাঠটীকা দেখুন)।

নির্দিষ্ট পাঠ আলোচনার পর শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝতে পেরেছে এবং যতটুকু বুঝতে পেরেছে তা প্রয়োগ করতে পারে কিনা জানবার জন্য আলোচ্য বিষয় থেকে শিক্ষক কতগুলি প্রশ্ন করবেন। শিক্ষার্থীরা যদি তাদের অধীত বিদ্যাকে সার্থক ভাবে প্রয়োগ করতে পারে তাহলে বুঝতে

হবে ছেলেদের পাঠ আয়ত্ত হয়েছে। এই প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ছেলেদের অধীত জ্ঞানের ভিত্তিও দৃঢ় হয়।

শ্রেণীতে যে পাঠ আলোচনা হল তার কঠিন অংশ বা আলোচনার সারাংশ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় বোর্ডে লিখে দেবেন। বোর্ডে লিখিত অংশ শিক্ষার্থীরা লিখে নেবে। পাঠ শেষ হলে বাড়ীর জন্য শিক্ষার্থীদের কাজ দেওয়া হবে। বাড়ীর কাজের মধ্যে যেন বৈচিত্র্য থাকে। যেমন আকবরের সম্পর্কে আলোচনার পর বাড়ী থেকে যা পড়ান হল তা সংক্ষেপে লিখে আনতে বলা চলে কিন্তু বাড়ী থেকে আকবরের রাজ্যের সীমা নির্দেশ করে একখানা ভারতের মানচিত্র এঁকে আনতে বলা ভাল।

পাঠটীকা প্রস্তুত প্রণালীর আলোচনা থেকে আমরা নিম্নরূপ একটি পাঠটীকার কাঠামো তৈরী করতে পারি।

পাঠ-পরিলেখ :

তারিখ—

বিদ্যালয়ের নাম- বিষয় :—

পাঠক্রম :—

ছাত্রসংখ্যা— বিশেষপাঠ :-

গড় বয়স—

সময়—

শিক্ষক —

উদ্দেশ্য— প্রত্যক্ষ

পরোক্ষ

উপকরণ—

প্রস্তুতি—

পাঠ ঘোষণা—

উপস্থাপন—

বোর্ডের কাজ—

অভিযোজন—

বাড়ীর কাজ—

পাঠ-পরিলেখ :

বিদ্যালয়—রামজয়শীল শিশু পাঠশালা

শ্রেণী—সপ্তম 'খ'	বিষয়—দ্রুতপাঠ
ছাত্রীসংখ্যা—৪০ জন	বিশেষ পাঠ—'বেহুলা'
গড় বয়স—১১ বছর+	পাঠ ক্রম— * বেহুলা কর্তৃক লখিন্দরের জীবন আনয়ন এবং মর্তে মনসাদেবীর পূজা প্রচার
সময়—৪০ মিঃ	
তারিখ—১. ৩. ৬৩	
শিক্ষিকা—সন্ধ্যা মজুমদার এম, এ, বি, টি	* অদ্যকার পাঠ

উদ্দেশ্য মুখ্য :—বেহুলা গল্পের বিষয়বস্তু যথাযথ অনুধাবনে এবং দ্রুত পঠনে ছাত্রীদের সহায়তা করা।

গৌণ :—গল্প পাঠে এবং সাহিত্যে ছাত্রীদের আগ্রহ সৃষ্টি করা।

প্রস্তুতি ছাত্রীদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষার্থে এবং অদ্যকার পাঠে তাদের মনকে আগ্রহশীল করে তোলবার জন্য শিক্ষিকা নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করবেন।

(১) লখিন্দরের বিবাহ-বাসর কেন লোহার তৈরী করা হয়েছিল?

(২) মনসা লখিন্দরকে সর্পদংশন করালেন কেন?

(৩) মৃত স্বামীকে বাসর ঘরে দেখে বেহুলা কি করলেন?

পাঠসংজ্ঞাপন আজ আমরা স্বামীর জীবন আনয়নের জন্য বেহুলার স্বর্গলোকে যাত্রা এবং মনসার মর্তে পূজা প্রচার সম্বন্ধে পড়ব।

উপস্থাপন শিক্ষিকা অদ্যকার পাঠ্যাংশটুকু শ্রেণীর সকল ছাত্রীদের দ্রুত পাঠ করতে বলবেন। পাঠের সময় যাতে ছাত্রীরা বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতাকে অনুসরণ করতে পারে সেজন্য শিক্ষিকা নিম্নলিখিত প্রশ্নাবলী বোর্ডে লিখে দেবেন। ছাত্রীরা বোর্ডের প্রশ্নের ভিত্তিতে অদ্যকার পাঠ্যাংশটুকু নীরবে দ্রুত পাঠ করবে। ছাত্রীরা যখন নীরবে পাঠ করবে, তখন শিক্ষিকা সমগ্র শ্রেণীতে ঘুরে ঘুরে ছাত্রীদের নির্ভুল পঠনে এবং কঠিন শব্দের অর্থগ্রহণে সহায়তা করবেন।

(১) বেহুলা স্বামীকে নিয়ে কোথায় যাবার প্রতিজ্ঞা করলেন ?

(২) বেহুলা লখিন্দরের দেহকে কোন পথে ও কিসে করে নিয়ে যাত্রা করলেন ?

(৩) গাঙুরের জলে ভাসতে ভাসতে বেহুলা কি ঘটনা দেখে আশ্চর্য হয়েছিলেন ? বেহুলার আশ্চর্য হওয়ার কারণ কি ?

(৪) নেতাধোপানীকে বেহুলা কিসের জন্য অনুরোধ করলেন ?

(৫) বেহুলা স্বর্গে গিয়ে কি করলেন ?

(৬) বেহুলার নৃত্যে সন্তুষ্ট হয়ে মনসা কি করলেন ?

(৭) স্বামীর প্রাণ, শ্বশুরের চৌদ্দডিঙা ফিরে পেয়ে বেহুলা কাকে দিয়ে মনসার পূজা করাবেন বললেন ?

অভিযোজন ছাত্রীদের নবলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষার্থে শিক্ষিকা নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করবেন।

(১) বেহুলা মৃত স্বামীকে নিয়ে কি করে স্বর্গে পৌছালেন ?

(২) তিনি কিভাবে মনসাকে সন্তুষ্ট করে মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনলেন ?

(৩) চাঁদসদাগর মনসার পূজো শেষ পর্যন্ত করলেন কেন ?

বাড়ীর কাজ বাড়ীথেকে অদ্যকার পাঠের সংক্ষিপ্তসার ছাত্রীদের লিখে আনতে বলা হবে।

পাঠ-পরিলেখ :

তারিখ—৮. ৩. ৬৩
বিদ্যালয়—ক্যালকাটা গার্লস একাডেমি
শ্রেণী—সপ্তম *
ছাত্রী সংখ্যা—৫০
গড় বয়স—১১+
সময়—৪৫ মিঃ
শিক্ষিকা—জ্যোৎস্না দাশ এম, এ, বি, টি

বিষয়—বাংলা কবিতা
পাঠপরিচয়—জন্মভূমির প্রতি
মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
পাঠক্রম * (১) রেখো মা দাসের মনে…জীবন নদে।
(২) কিন্তু যদি রাখ মনে…হইতে শেষ।
নির্দিষ্ট পাঠ—তারকা চিহ্নিত অংশ।

উদ্দেশ্য	মুখ্য :—রসসঞ্চারী পাঠের মাধ্যমে চিন্তা, কল্পনা ও ভাব-বৃত্তির বিকাশ সাধন করে অন্তকার পাঠ বিষয়ের সারমর্ম গ্রহণ ও কবিতার রসাস্বাদনে ছাত্রীদের সাহায্য করা। গৌণ :—ভাষাজ্ঞান, শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি ও কবিতা পাঠে ছাত্রীদের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করা।
উপকরণ	কবিতার লেখক মাইকেল মধুসূদন দত্তের একখানি ছবি।
আয়োজন	যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি করে ছাত্রীদের মনকে পাঠাভিমুখী করবার জন্য এবং কবি ও কবিতা সম্পর্কে তাদের মনে অনুরাগ সঞ্চারের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করা হবে। (১) "নমঃ নমঃ নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি"—এই লাইনটি কাকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে? (১) বঙ্গভূমিকে জননী বলা হয়েছে কেন? (৩) এই কবিতাটি কোন কবির লেখা? (৪) রবীন্দ্রনাথের পূর্বে আধুনিক বাংলার শ্রেষ্ঠ কবির নাম বলতে পার? (৫) মাইকেল মধুসূদন দত্তের দুই একখানা কাব্য গ্রন্থের নাম বলত?
পাঠঘোষণা	আজ আমবা কবি মধুসূদন দত্তের বি৷৷ শ যাত্রার প্রাক্কালে জননী বঙ্গভূমিকে উদ্দেশ্য করে লেখা "জন্মভূমির প্রতি" কবিতাটি পড়ে রসাস্বাদন করব।
উপস্থাপন	(ক) এবার আবেগানুভূতির সাথে ছন্দ, যতি ও ছেদের প্রতি লক্ষ্য রেখে সমগ্র কবিতাটির একটি রসমধুর পাঠ দেওয়া হবে। এই পাঠ ছাত্রীদের মনে কতটা রেখাপাত করেছে জানবার জন্য নিম্নরূপ ক৷েকটি প্রশ্নের অবতারণা করা হবে। (১) রেখো মা দাসেরে মনে—দাস বলতে কবি কাকে বুঝিয়েছেন? মনে রাখবার কথা কবি কেন বলেছেন? (৩) 'মা' বলে কবি কাকে সম্বোধন করেছেন? (খ) এবার ছাত্রীদের বুঝবার সুবিধার জন্য কবিতাটির

প্রথম অংশ পাঠ করে শোনান হবে। কঠিন শব্দের অর্থ ও কঠিন অংশের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া হবে। ছাত্রীদের সহযোগিতায় আলোচনা কালে নিম্নরূপ প্রশ্নগুলি করে ছাত্রীদের মন পাঠে নিবদ্ধ রাখা হবে।

প্রথম অংশ—রেখো মা দাসেরে মনে……জীবন নদে

(১) সাধিতে মনের সাধ ঘটে যদি পরমাদ—

(ক) কবির মনের কি কি সাধ ছিল?

(খ) পরমাদ বলতে কবি কি বোঝাতে চেয়েছেন?

(২) মন কোকনদে—কথাটির অর্থ কি?

(৩) কাহার মনকে কোকনদ বলা হয়েছে?

(৪) 'মধুহীন করোনা'—কি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছ?

এবার ছাত্রীদের কয়েকজনকে কবিতাটি পড়তে বলা হবে ও প্রয়োজন হলে পাঠ সংশোধন করে দেওয়া হবে।

বোর্ডের কাজ ছাত্রীদের সহযোগিতায় কঠিন কঠিন শব্দের অর্থ ও প্রয়োজনীয় অংশের বাখ্যা বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে ও তাদের নিজেদের খাতায় লিখে নিতে বলা হবে।

অভিযোজন নবলব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিকে দৃঢ় করবার জন্য ও পঠিত কাব্যাংশটি ছাত্রীরা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে কিনা জানবার জন্য নিম্নরূপ কয়েকটি প্রশ্ন তাদের কাছে উপস্থাপন করা হবে।

(১) কবি জীবনকে নদীর সাথে তুলনা করেছেন কেন?

(২) "জীবন প্রবাহ বহি কাল সিন্ধু পানে ধায়"

(ক) এই লাইনটিতে কি বোঝান হয়েছে?

(খ) কেন কবি এই লাইনটি রচনা করেছেন?

(৩) অমর কে কোথা কবে?

পৃথিবীতে অমরতা লাভের কি উপায়?

বাড়ীর কাজ আবৃত্তির প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির জন্য ছাত্রীদের বাড়ী থেকে পঠিত অংশ মুখস্থ করে আনতে বলা হবে।

পাঠ-পরিলেখ

বিদ্যালয়—লেক বালিকা বিদ্যালয় বিষয়—ভূগোল

শ্রেণী—সপ্তম 'খ' বিশেষ বিষয়—আগ্নেয় গিরি

ছাত্রী সংখ্যা—৪৫ পাঠক্রম—(১) * আগ্নেয় গিরির গঠন

গড় বয়স—১১+ (২) * অগ্ন্যুৎপাতের কারণ

সময়—৪০ মিনিট (৩) অগ্ন্যুৎপাতের ফলাফল

তারিখ—৮।২।৬২ অদ্যকার পাঠ—তারকা চিহ্নিত অংশ

শিক্ষিকা—বিভা চৌধুরী এম, এ, বি, টি

উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য :—আগ্নেয়গিরির গঠন ও অগ্ন্যুৎপাতের কারণ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা।

পরোক্ষ কারণ :—ছাত্রীদের চিন্তা ও কল্পনাশক্তির বিকাশে সহায়তা করা ও ভূগোলপাঠে আগ্রহের সৃষ্টি করা।

উপকরণ আগ্নেয় গিরির বিভিন্ন অংশ অঙ্কিত চিত্র।

আয়োজন ছাত্রীদের মন পাঠাভিমুখী করিবার জন্য শিক্ষিকা নিম্নরূপ প্রশ্ন করিবেন। প্রয়োজন বোধে পূর্বজ্ঞানের সহায়তা লইবেন।

(১) পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ কিরূপ পদার্থ দ্বারা গঠিত?

(২) পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ পদার্থ উত্তপ্ত কেন?

(৩) ভূ-অভ্যন্তরস্থ উত্তপ্ত পদার্থ কোন কোন উপায়ে ভূ-ত্বকের উপরিভাগে আসে?

(৪) মাঝে মাঝে পৃথিবীর উপরিভাগ কেন কাঁপে?

(৫) ভূ-কম্পনের ফলে পৃথিবীর উপরিভাগে কি কি পরিবর্তন ঘটে?

(৬) আগ্নেয় গিরি হইতে নির্গত পদার্থকে কি বলে?

পাঠ ঘোষণা আজ আমারা অগ্নেয়গিরি ও অগ্ন্যুৎপাতের কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

উপস্থাপন

বিষয় "১"—পৃথিবী এককালে জলন্ত অগ্নিপিণ্ডের মত ছিল। ভূত্বকের উপরিভাগ কঠিন ও শীতল হইলেও উহার অভ্যন্তরভাগ অত্যন্ত উত্তপ্ত। উপরের প্রস্তর, মাটি ইত্যাদির চাপে ভিতরের দ্রব্য তরল অবস্থায় পরিণত হইতে পারে না। যদি কোন কারণে উপরের চাপ হ্রাস পায় তাহা হইলে উহা গলিয়া যায় এবং ভিতর হইতে গলিত পদার্থ জলীয় বাষ্প (উহাকে ম্যাগামা বলা হয়) ভূত্বক ফাটাইয়া উপরে ওঠে এবং স্তরে স্তরে জমিয়া পর্বতের আকার ধারণ করে। সেই পর্বতকে আগ্নেয়গিরি বলে।

পদ্ধতি "১"—আলোচনার সুবিধার্থে সমগ্র পাঠটি চারিটি অংশে বিভক্ত করা হইবে। শিক্ষিকা প্রয়োজনমত আঁকিয়া দেখাইবেন।

১) পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় কিরূপ ছিল?

২) পৃথিবীর উপরিভাগ ও অভ্যন্তরভাগ কিরূপ?

৩) ভূ-অভ্যন্তরের প্রস্তর মাটি ইত্যাদি কেন গলিত হইতে পারে না?

৪) ভূ-অভ্যন্তরস্থ গলিত পদার্থ কি করিয়া ভূত্বকের উপরে আসে?

৫) 'ম্যাগমা' কাহাকে বলে?

৬) আগ্নেয়গিরি কিরূপে সৃষ্টি হয়?

বিষয় "২" ভূগর্ভের উত্তপ্ত পদার্থ যখন উপরে আসে তাহাকে লাভা বলে। ভূ-পৃষ্ঠের এক গোলাকার ছিদ্র দিয়া এই লাভা বাহির হয় ইহাকে আগ্নেয়গিরি-মধ্যস্থ নালী বলা হয়। নলের নীচে একটি প্রকাণ্ড গহ্বরে গলিত পদার্থ সমূহ সঞ্চিত থাকে তাহাকে ম্যাগমা চেম্বার বলে। আগ্নেয়গিরির শিখরে বাটির আকারে এক গহ্বর থাকে তাহাকে জ্বালামুখ বা Crater বলে। অনেক সময় মূল নল দিয়া লাভা না বাহির হইয়া অন্য পথে পর্বত গাত্রের এক ভিন্ন স্থান দিয়া উপরে উঠে এবং তথায় জ্বালামুখ সৃষ্টি করে, এইভাবে একাধিক জ্বালামুখ সৃষ্টি হয়।

পদ্ধতি "২" ১। 'লাভা' কাহাকে বলে?

২) আগ্নেয়গিরির নালী কাহাকে বলা হয়?

৩) ম্যাগমা চেম্বার আগ্নেয়গিরির কোন অংশে থাকে?

৪) ম্যাগমা চেম্বারে কোন কোন জিনিষ সঞ্চিত হয়?

৫) আগ্নেয়গিরির 'জ্বালামুখ' কাহাকে বলে?

৬) একটি আগ্নেয়গিরিতে একাধিক জ্বালামুখ কিভাবে সৃষ্টি হয়?

বিষয় "৩" কোন স্থানে অগ্ন্যুৎপাতের পূর্বে ভূ-পৃষ্ঠ ঘন ঘন আন্দোলিত হয়। ইহাকে ভূমিকম্প বলে। ভূমিকম্পের ঠিক পূর্বে মাটির নীচে গুড় গুড় শব্দও শোনা যায়। হঠাৎ একস্থান ফাটিয়া গলিত লাভা ও ছাই ইত্যাদি আকাশের বহুদূর বিস্তৃত হয়। পরে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হইয়া মোচাকৃতি এক পর্বতের সৃষ্টি করে।

পদ্ধতি "৩" ১) অগ্ন্যুৎপাতের পূর্বে ভূ-পৃষ্ঠের অবস্থা কিরূপ হয়?

২) অগ্ন্যুৎপাতের পূর্বের আন্দোলনকে কি বলে?

৩) আগ্নেয়গিরির পার্শ্বে মোচাকৃতি পর্বত কিভাবে সৃষ্টি হয়?

বিষয় "৪" যে আগ্নেয়গিরি হইতে অবিরত বা মাঝে মাঝে অগ্ন্যুৎপাত ঘটে তাহাকে জীবন্ত (active) আগ্নেয়গিরি বলে। যে আগ্নেয়গিরি হইতে বহুদিন অগ্ন্যুৎপাত হয় না কিন্তু যে কোন সময় হইতে পারে তাহাকে সুপ্ত (dormant) আগ্নেয়গিরি এবং যে আগ্নেয়গিরি হইতে অগ্ন্যুৎপাতের কোন সম্ভাবনা নাহি তাহাকে মৃত আগ্নেয়গিরি বলে। পৃথিবীতে এক হাজারের মত আগ্নেয়গিরি আছে তাহার মধ্যে ৪০০ জীবন্ত আগ্নেয়গিরি।

পদ্ধতি "৪" ১) কোন আগ্নেয়গিরিকে 'জীবন্ত' বলে?

২) সুপ্ত আগ্নেয়গিরি কাহাকে বলে?

৩) মৃত আগ্নেয়গিরি কাহাকে বলে?

৪) পৃথিবীতে মোট কতটি আগ্নেয়গিরি আছে?

৫) মোট কতটি জীবন্ত আগ্নেয়গিরি আছে?

বোর্ডের কাজ—শিক্ষিকা ছাত্রীদের সহায়তায় আলোচনার সারাংশ বোর্ডে লিখিবেন।

অভিযোজন নবলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষার্থে শিক্ষিকা নিম্নরূপ প্রশ্ন করিবেন।

(১) পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় কিরূপ ছিল?

(২) ভূ-অভ্যন্তরস্থ গলিত উত্তপ্ত পদার্থ কিরূপে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে আসে?

(৩) 'ম্যাগমা চেম্বার' কাহাকে বলে? কোন স্থানে ইহার অবস্থিতি?

(৪) অগ্ন্যুৎপাতের পূর্বে ভূ-পৃষ্ঠের অবস্থা কিরূপ হয়?

(৫) আগ্নেয়গিরিতে একাধিক জ্বালামুখ কিভাবে সৃষ্টি হয়?

বাড়ীর কাজ একটি আগ্নেয়গিরির চিত্র আঁকিয়া বিভিন্ন অংশ দেখাইতে বলা হইবে।

পাঠ-পরিলেখ :

তারিখ—১৮. ২. ৬৩

বিদ্যালয়—ক্যালকাটা গার্লস একাডেমি বিষয়—ইতিহাস

শ্রেণী—অষ্টম 'ক' শাখা পাঠ পরিচয়—নবজাগরণ

ছাত্রী সংখ্যা—২৮ পাঠক্রম :—(ক) নবজাগরণ ও তাহার প্রস্তুতি

গড় বয়স—১৩+ (খ) স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রশিল্পে নবজাগরণের প্রভাব।

সময়—৪৫ মিঃ *(গ) ধর্মসংস্কার—মার্টিন লুথার

শিক্ষিকা—জ্যোৎস্না দাস এম-এ-বি-টি অন্তকার পাঠ—তারকা চিহ্নিত অংশ

উদ্দেশ্য **মুখ্য** :—নবজাগরণের যুগে মার্টিন লুথার খৃষ্টধর্মে যে বিরাট পরিবর্ত্তনের সূচনা করেন সেই সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে ছাত্রীদের সাহায্য করা।

গৌণ :—নবজাগরণের যুগের ধর্মসংস্কার সম্পর্কে আলোচনা করে ছাত্রীদের ইতিহাস পাঠে আগ্রহ ও স্বাধীন বিচারশক্তি বিকাশের সহায়তা করা।

উপকরণ মার্টিন লুথারের একখানি চিত্র ও ইউরোপের একটি মানচিত্র।

আয়োজন ঐতিহাসিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে ছাত্রীদের পূর্বজ্ঞানের ওপর নির্ভর করে নিম্নরূপ কয়েকটি প্রশ্ন করা হবে।

(১) ইউরোপের নবজাগরণ কোথায় সুরু হয় ?

(২) নবজাগরণের ওপর কোন্ দেশের প্রভাব কার্য্যকরী হয়েছে ?

(৩) এই যুগে খৃষ্টানদের ধর্মগুরুকে কি বলা হত ?

(৪) এই পোপ কোথায় বাস করেন ?

পাঠ ঘোষণা নবজাগরণের যুগে জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে পরিবর্ত্তনের সূচনা হয়েছিল, ধর্মক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি। এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মসংস্কারক মার্টিন লুথারের জীবনী আজ আমরা আলোচনা করব।

উপস্থাপন ছাত্রীদের বোঝাবার সুবিধার জন্য অন্তকার পাঠ নিম্নরূপে ভাগ করে বর্ণনা ও প্রশ্নের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হবে। আলোচনাকালে প্রয়োজনীয় উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করা হবে।

বিষয় (ক) মধ্যযুগে খৃষ্টান পুরোহিতেরা এক নীতিভ্রষ্ট অনাচারীর জীবন যাপন করত। ফলে ধর্মক্ষেত্রে নানা অনাচার প্রবেশ করেছিল। নবজাগরণের যুগে বাইবেলের অনুবাদের ফলে সাধারণ মানুষ বাইবেলের যথার্থ রূপের সঙ্গে পরিচিত হয়, এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ সুরু করে। স্বয়ং পোপও ধর্ম অপেক্ষা অর্থকেই শ্রেয় মনে করতেন এবং তিনি অর্থ সংগ্রহের জন্য মুক্তিপত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। যে কোন লোক মুক্তি-ক্রয় করে পাপ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারতো। জন ক্যালভিন্, ইরাসমাক্ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ এই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করেন।

পদ্ধতি (ক) ১। মধ্যযুগের মানুষ পুরোহিতদের ওপর কেন বীতশ্রদ্ধ হয়েছিল?

২। বাইবেল অনুবাদের ফল কি হয়েছিল?

৩। মুক্তিপত্র কাহাকে বলে?

৪। পোপ কিরূপ জীবন যাপন করতেন?

উপস্থাপন (ক) যাজক সম্প্রদায়ের অনাচারের বিরুদ্ধে জার্মানীতে মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে এক আন্দোলন দেখা দেয়। এই তরুণ সন্ন্যাসী জার্মানীর উন্‌টেনবার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন, তিনি মানবতাবাদ ও বাইবেলের সরল আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। পোপ সেণ্টপিটার গির্জা নির্মাণের ব্যয় নির্বাহের জন্য মুক্তিপত্র বিক্রয়ের কথা ঘোষণা করলে তিনি তার তীব্র প্রতিবাদ করেন।

(খ) ১। পুরোহিতদের বিরুদ্ধে আন্দোলন কোথায় তীব্র আকার ধারণ করে?

২। এই আন্দোলনের নেতা কে ছিলেন?

৩। তিনি কি কারণে পোপের বিরোধিতা করেন?

৪। পোপ মুক্তিপত্র বিক্রয়ের কথা কেন ঘোষণা করলেন?

(গ) লুথারের আন্দোলনের ফলে চার্চের অনাচারের বিরুদ্ধে প্রবল জনমতের সৃষ্টি হল। লুথার বললেন অনুতাপই পাপ মোচনের একমাত্র উপায়। বাইবেল পড়লেই ধর্মের মূল কথা জানা যায়, সেজন্য পোপের অধীনতা স্বীকারের প্রয়োজন নেই। পোপ দশম লিও ও পঞ্চম চার্লস অনেক চেষ্টা করেও জনমতকে দমন করতে পারলেন না। লুথারের

পক্ষে প্রবল জনমত সৃষ্টি হ'ল। জার্মানী দুটি দলে বিভক্ত হয়ে গেল। প্রাচীন পন্থীরা রোমান ক্যাথলিক ও লুথারের অনুগামীরা প্রোটেষ্ট্যাণ্ট বলে পরিচিত হ'ল।

(গ) ১। মার্টিন লুথার পাপ মুক্তির উপায় সম্পর্কে কি বলেছিলেন?

২। মার্টিন লুথারকে কে কে বাধা দিয়েছিলেন?

৩। এই সময়কার পোপ কে ছিলেন?

৪। মার্টিন লুথারের অনুগামীদের কি বলা হত?

বোর্ডের কাজ আলোচনা শেষে ছাত্রীদের সুবিধার জন্য পাঠের সারাংশ ছাত্রীদের সহযোগিতায় বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে ও তাদের খাতায় লিখে নিতে বলা হবে।

অভিযোজন নির্দিষ্ট পাঠ ছাত্রীরা আয়ত্ত করতে পেরেছে কিনা জানবার জন্য সমগ্র আলোচ্য অংশটির ওপর কয়েকটি প্রশ্ন করা হবে।

১। মার্টিন লুথারের পূর্বে ধর্মসংস্কারের জন্য আর কে কে আন্দোলন করিয়াছিল?

২। মুক্তিপত্র বিক্রয়ের কি উদ্দেশ্য ছিল?

৩। লুথারের অনুগামীদের প্রোটেষ্ট্যাণ্ট কেন বলা হত?

বাড়ীর কাজ ছাত্রীদের বাড়ীথেকে নবজাগরণের একটি 'সময় রেখা' এঁকে আনতে বলা হবে।

———

দশম অধ্যায়

পরীক্ষা ও মূল্যায়ণ পদ্ধতি

বিদ্যালয়ে ছেলেরা শিক্ষার জন্য আসে। শিক্ষক যথা সম্ভব যত্ন নিয়ে তাদের শিক্ষা দেন। শিক্ষার ফলে তারা নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, দক্ষতা লাভ করে, তারা নতুন জ্ঞান অর্জন করে। শিক্ষার ফলে তাদের মধ্যে একটা পরিবর্তন আসে, তারা দক্ষতা ও কৃতিত্ব অর্জন করে জীবনে উন্নতির পথে এগিয়ে যায়। শিক্ষা দ্বারা শিক্ষার্থী যে অভিজ্ঞত', দক্ষতা বা জ্ঞান অর্জন করল তার ফলে তার একটা উন্নতি হল তার পরিমাপ কি করে করা হবে। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুনিচয়ের নিখুঁত ভাবে পরিমাপ করা যায়। কিন্তু পরিমাণগত বস্তুর পরিমাপ যত সহজ মানুষের গুণগত পরিমাপ তত সহজ নয়। লিটারের বা কিলোর মাপে মানুষের যোগ্যতার পরিমাপ সম্ভব নয়। তবুও মানুষের বুদ্ধিমূলক বা জ্ঞানমূলক অগ্রগতি যার পিছনে রয়েছে মানুষের সজ্ঞান প্রচেষ্টা তার নিখুঁত পরিমাপ কষ্টসাধ্য হলেও আমরা পরীক্ষার মাধ্যমে তার পরিমাপ করি। পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের, তার উন্নতির মূল্যায়ণ করা হয়। পরীক্ষা ও মূল্যায়ণ দু'টি কথাকে আমরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যবহার করলেও দু'টি কথার মধ্য দিয়ে আমরা যা বোঝাতে চাই তা হচ্ছে শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত ও মানসিক পরিমাপ।

সাধারণভাবে শিক্ষায় পরীক্ষা কথাটি সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। পরীক্ষা বলতে বুঝি দু'চারিটি বিষয় পড়ে শিক্ষার্থী কতটা পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন করল তা যাচাই করা। মূল্যায়ণ বলতে ব্যাপক অর্থে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশের পরিমাপ বোঝান হয়। মূলতঃ দু'টি কথার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শুধুমাত্র বৌদ্ধিক বিকাশ আর কেতাবী বিদ্যায় দক্ষতার পরিমাপ নয়, শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশের মূল্যায়ণই হচ্ছে পরীক্ষার লক্ষ্য। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে সঠিক পরিমাপ বা মূল্যায়ণ—সেই পরিমাপের মাধ্যমে হচ্ছে পরীক্ষা।

পরীক্ষার ইতিহাস :—পরীক্ষার ইতিহাস অতি প্রাচীন। যতটা জানা যায় চীন দেশেই প্রথম লিখিত পরীক্ষার প্রবর্তন হয়েছিল। খৃঃ পূঃ দু'হাজার বছর পূর্বে চীনদেশে যোগ্যতার বিচারের জন্য রাজকর্মচারীদের পরীক্ষা নেওয়া হত।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষায় পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল না—কিন্তু বিদ্যা-বিবাদ, বাকো-বাক্যম প্রভৃতি থেকে বোঝা যায় শিক্ষাকেন্দ্রে, যজ্ঞ স্থলে বা রাজ-

সভায় তর্কযুদ্ধ বা বিচারের আয়োজন হত। তর্কযুদ্ধে বা বিচারে যে জয়ী হত তাকে উপাধি দান ও অন্যান্যভাবে সম্মানিত করা হত। তক্ষশীলায় পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল কি না জানা যায় না। কিন্তু বৌদ্ধযুগে নালন্দায় ও বিক্রমশীলায় দ্বারপণ্ডিতের কাছে পরীক্ষা না দিয়ে কেহ প্রবেশাধিকার পেত না। একে. বর্তমান যুগের admission test-এর সাথে তুলনা করা যেতে পারে। মধ্যযুগে মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। মিথিলায় ও নবদ্বীপে উপাধি পেতে হলে *কঠিন পরীক্ষায়* উত্তীর্ণ হতে হত।

মধ্যযুগে ইউরোপে তর্কযুদ্ধ বা Disputation-এর ব্যবস্থা ছিল। এই ব্যবস্থা থেকেই পরবর্তীকালে পরীক্ষা প্রথার উদ্ভব হয়। Cambridge বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮২৭ খৃঃ প্রথম মৌখিক পরীক্ষার পরিবর্তে লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। উনবিংশ শতকের ষষ্ঠদশকে ইংলণ্ডে Public Examination প্রথা ব্যাপকভাবে দেখা দেয়। New Castle Commission সর্বপ্রথম পরীক্ষার ফলের উপর সরকারী সাহায্যের প্রথা প্রবর্তন করেন। চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রেও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রবর্তন হয়। ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের অনুকরণে বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়।

পরীক্ষার উদ্দেশ্য :—শিক্ষক শিক্ষা দান করেই তৃপ্ত হন না। তিনি জানতে চান শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীর কতটা অগ্রগতি হল বা জ্ঞান অর্জন করল। শিক্ষার্থীও জানতে চায় তার কতটা উন্নতি হল, অভিভাবকও জানতে চান শিক্ষার অগ্রগতি কতটা হচ্ছে। পরীক্ষার মধ্য দিয়েই আমরা তা জানতে পারি। শিক্ষার্থীকে যা শেখান হয়েছে দলগত ভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষার মধ্য দিয়েই তার পরীক্ষা হয়ে থাকে।

পরীক্ষায় শুধুমাত্র কৃতিত্বের পরিমাপই হয় না, দোষ-ত্রুটি ও পরীক্ষার মাধ্যমে ধরা যায়। শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়েই বুঝতে পারে শিক্ষার্থীর ত্রুটি কোথায়, তার ব্যর্থতার কারণ কি? তা বুঝে নিয়ে দোষ-ত্রুটিগুলি দূর করবার জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই সচেষ্ট হতে পারেন।

পরীক্ষা শুধুমাত্র শিক্ষার্থী কতটা যোগ্যতা অর্জন করল তার পরিমাপ নয়, শিক্ষকের শিক্ষাপদ্ধতি কতটা সাফল্য লাভ করল পরীক্ষার মধ্য দিয়া তারও বিচার হয়। শিক্ষকের শিক্ষায় যদি ত্রুটি থাকে, তিনি যদি দক্ষতার সাথে তাঁর কাজ করে না থাকেন পরীক্ষায় তা প্রতিফলিত হতে বাধ্য। শিক্ষকের শিক্ষাদানের যোগ্যতার উপর শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত অনেকখানি

নির্ভরশীল। এইজন্যই ইংলণ্ডে ও ভারতে সরকারী সাহায্যের ক্ষেত্রে Payment by results প্রথার উদ্ভব হয়েছিল।

পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ-শিক্ষা কোন পথে পরিচালিত হবে তা নির্দ্ধারিত করা যায়। বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর পক্ষে অঙ্কে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন। অঙ্কে একটি নির্দিষ্ট নম্বর না পেলে কোন শিক্ষার্থীকে বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে দেওয়া হয় না। পরীক্ষার মধ্য দিয়েই স্থির করা সম্ভব হয় শিক্ষার্থীর কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয় পড়বার নিম্নতম যোগ্যতা আছে কিনা কারিগরী বা বিভিন্ন বৃত্তি শিক্ষায় admission test করবার উদ্দেশ্যই হচ্ছে প্রার্থীর সেই বিশেষ বিষয়ে শিক্ষালাভের যোগ্যতা আছে কিনা তার বিচার করা। পরীক্ষার মধ্য দিয়েই শিক্ষার কোন বিভাগে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা সর্বাধিক সার্থকতা লাভ করবে তা স্থির করা হয়।

পরীক্ষা পরোক্ষভাবে শিক্ষার্থীর জীবনে উদ্দীপকের কাজ করে। যেহেতু একটি নির্দিষ্ট পাঠক্রম শেষ না হলে এবং তাতে যোগ্যতার নিম্নতম মান অর্জন করতে না পারলে পরবর্তী উচ্চতর পাঠক্রম অনুসারে সুযোগ পাবে না— তাই শিক্ষার্থীদের মধ্যে নির্দিষ্ট পাঠক্রম শেষ করবার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তাই পরীক্ষা গ্রহণের ফলে শিক্ষার্থীরা পড়ার প্রেরণা লাভ করে। এরূপ অস্বাভাবিক ভাবে আগ্রহ সৃষ্টি করা ভাল কি মন্দ তা বিচার সাপেক্ষ কিন্তু পরীক্ষার ফলে যে একটা কৃত্রিম আগ্রহের সৃষ্টি হয় তা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যোগ্যতম প্রার্থী নির্বাচন করা যায়। চাকুরীর ক্ষেত্রে বা কোন পুরস্কার বা বৃত্তি (Scholarship) দেবার ক্ষেত্রে যেখানে পাস ফেলের প্রশ্ন নেই, কয়েকজন মাত্র নির্বাচিত প্রার্থীর মধ্যে সুবিধা বণ্টন করা হবে সেখানে শত শত প্রার্থীর মধ্য থেকে যোগ্য প্রার্থীদের পরীক্ষার মধ্য দিয়েই বাছাই করা সম্ভব।

পরীক্ষার মধ্য দিয়ে কয়েকটি বিষয়ের জ্ঞানের পরিমাপই হয় না—পরীক্ষায় পাস করতে হলে শিক্ষার্থীর পরিশ্রম, অধ্যবসায়, নিয়মানুবর্তিতা, ধৈর্য প্রভৃতির প্রয়োজন। তাই বিষয়গত জ্ঞানের পরীক্ষার সাথে অন্যবিধ প্রয়োজনীয় গুণের পরীক্ষাও হয়।

বিভিন্নরূপ পরীক্ষা :—শিক্ষার্থীর বিষয়গত যোগ্যতা ও ব্যক্তিগত নানাবিধ গুণের মূল্যায়ণের জন্য বিভিন্নরূপ পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। প্রথমেই পরীক্ষাকে দু'টি ভাগে ভাগ করা চলে, মৌখিক ও লিখিত।

মৌখিক পরীক্ষা অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত আছে। এটি হচ্ছে পরীক্ষার আদিম রূপ। মৌখিক পরীক্ষায় একজন করে পরীক্ষার্থী পরীক্ষকের সামনে উপস্থিত হয়ে মৌখিকভাবে প্রশ্নের জবাব দেয়। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেশী হলে একাধিক পরীক্ষক একইরূপ প্রশ্নের দ্বারা পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণ করেন। আবার একাধিক পরীক্ষকের সামনেও পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা হয়। বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থায় মৌখিক পরীক্ষা গৌণ স্থান অধিকার করে আছে। মৌখিক পরীক্ষা থেকেই লিখিত পরীক্ষার সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে ছোট ছেলেমেয়েদের মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। এই পরীক্ষায় ব্যক্তিত্ব ও উপস্থিত-বুদ্ধির পরিমাপ মৌখিক পরীক্ষার মধ্যেই হয়ে থাকে। লিখিত পরীক্ষার সাথে কোন দেশে (ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী) মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। যেখানে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হাজার হাজার সেখানে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ। বহিঃপরীক্ষায় উচ্চতম পরীক্ষার ক্ষেত্রে যেখানে পরীক্ষার্থীরা বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত সে ক্ষেত্রে পরীক্ষার পক্ষে বিভিন্ন জায়গা জুড়ে পরীক্ষা গ্রহণ সম্ভব নয়।

লিখিত পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীকে লিখিত ভাবে কতকগুলি প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। লিখিত পরীক্ষা দু'টি রূপ—রচনাত্মক পরীক্ষা (Essay Type) ও নতুন ধরণের পরীক্ষা (New Type Test) বা বিষয়াত্মক পরীক্ষা (Objective Test).

লিখিত পরীক্ষার প্রাচীনতম রূপ হচ্ছে রচনাত্মক পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় নির্দিষ্ট পাঠক্রম থেকে কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়, পরীক্ষার্থীরা সেই প্রশ্নপত্র থেকে কয়েকটি প্রশ্ন বেছে নাতিদীর্ঘ রচনার মাধ্যমে নিজ নিজ যোগ্যতার পরিচয় দেয়।

বিষয়াত্মক পরীক্ষা (**Objective Test**) অতি আধুনিক কালের সৃষ্টি। রচনামূলক পরীক্ষায় পরিমাপ যেরূপ ব্যক্তিমুখীন (subjective), নতুন ধরণের পরীক্ষায় নির্ব্যক্তিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। নতুন ধরণের পরীক্ষায় বহু প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত ঠিক উত্তরের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

পরীক্ষা গ্রহণের অধিকারী ভেদে পরীক্ষাকে আভ্যন্তরীণ ও বহিঃপরীক্ষা এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। প্রচলিত বহিঃপরীক্ষা (External or Public Examination) সরকারী শিক্ষা বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয় বা আইন অনুসারে গঠিত কোন বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হয়। এইরূপ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান পরীক্ষার দিন ধার্য করা, পরীক্ষা গ্রহণ, প্রশ্নপত্র রচনা, উত্তর পত্রের

পরীক্ষার ব্যবস্থা করান। কোন একটি শিক্ষাস্তরের শেষে বহিঃপরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হয়। এছাড়া বহিঃপরীক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রের ও সমাজের স্বীকৃতিমূলক উপাধি (Degree) বা অভিজ্ঞান-পত্র (Certificate) প্রভৃতি দেওয়া হয়।

আভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় বিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষার্থী যে যোগ্যতা অর্জন করেছে তার পরিমাপ করা হয়, স্কুলের সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক, বার্ষিক প্রভৃতি পরীক্ষা আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা। স্কুলের পক্ষ থেকে এই পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। আভ্যন্তরীণ একটি বা কয়েকটি পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করে পরীক্ষার্থীকে পরবর্তী শ্রেণীর জন্য যোগ্য (উত্তীর্ণ) বা অযোগ্য (অনুত্তীর্ণ) ঘোষণা করা হয়।

প্চলিত পরীক্ষার সুবিধা অসুবিধা :—প্রচলিত পরীক্ষা বা চিরাচরিত পরীক্ষা ব্যবস্থা বলতে আমরা রচনাত্মক (Essay Type) পরীক্ষাকেই বুঝে থাকি। রচনাত্মক পরীক্ষায় কোন বিষয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠক্রম থেকে কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়। প্রশ্নপত্রে বিকল্প প্রশ্ন থাকে ও পরীক্ষার্থীদের সেই প্রশ্নের মধ্য থেকে বেছে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়। পরীক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর নিজেব ভাষায় নিজ নিজ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত লিখে দেয়। উত্তরগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছোট ছোট রচনার আকারে প্রকাশ পায়। পরীক্ষক উত্তরপত্রগুলি পড়ে শিক্ষার্থী অধিত বিষয় কতটা আয়ত্ত করতে পেরেছে বিচার করে সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করে (Scoring) কৃতিত্বের পরিমাপ করেন।

সুবিধা :—প্রচলিত রচনাত্মক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্রে স্বাধীন মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। উত্তরপত্রে প্রতিপাদ্য বিষয় যুক্তি ও বিচারসহ উপস্থিত করবার সুযোগ থাকায় শিক্ষার্থীর স্বাধীন চিন্তাধারা গড়ে ওঠবার সুবিধা হয়। একই প্রশ্নে একটি মাত্র উত্তর নাও হতে পারে। ছেলেরা তাদের জ্ঞানবুদ্ধিমত প্রশ্নের বিভিন্ন দিক বিচার করে যুক্তি দিয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থিত করতে পারে। পরীক্ষার্থীদের স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ থাকায় চিন্তাশক্তি বিকাশের মধ্য দিয়ে তাদের একটা নিজস্ব চিন্তাধারা গড়ে ওঠে। নিজের উপস্থাপিত বিষয়টিকে যুক্তিপূর্ণ করবার প্রয়োজনে শিক্ষার্থীরা শ্রেণীতে নির্দিষ্ট পাঠ্য ছাড়াও বাইরের বইয়ের সাহায্য গ্রহণ করে। বিষয় উপযোগী বহু প্রয়োজনীয় বই পড়বার প্রেরণা তারা লাভ করে।

রচনামূলক পরীক্ষায় নিজের বক্তব্যকে সুশৃঙ্খলভাবে উপস্থিত করতে হয়

এর ফলে চিন্তাধারা ও সমস্যার যুক্তি-গ্রাহ্য বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতা বিকাশ লাভ করে। রসানুভূতিমূলক কল্পনা শক্তির প্রকাশ ও রচনায় শিক্ষার্থীর দক্ষতার পরিচয় প্রচলিত পরীক্ষায় যেভাবে পাওয়া যায় অন্য কোন পরীক্ষায় সেভাবে পাওয়া সম্ভব নয়।

রচনাত্মক পরীক্ষায় শুধুমাত্র পরীক্ষার্থীর বিষয়গত যোগ্যতাই নয় তার প্রকাশ ক্ষমতার বিচারও হয়।

রচনাত্মক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনা ও পরীক্ষা গ্রহণ করা সহজ। পাঠক্রম নির্ধারিত সমস্ত বিষয়ের পরীক্ষাই এই পদ্ধতিতে গ্রহণ করা সম্ভব। রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের রিপোর্টে এই পরীক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে "·· ····that eassy type tests are easy to prepare and administer, that it is possible to use them for all subjects of curriculum and that they have values not possessed by the objective test in as much as they call for comparison, for interpretation of facts, for criticism, and for other forms of higher mental activity."

অসুবিধা :—পরীক্ষার মাধ্যমে যে মূল্যায়ণ হয় তা নির্ভরযোগ্য হবে এই আমরা আশা করি। কিন্তু বর্তমান প্রচলিত রচনামূলক পরীক্ষার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ এই পরীক্ষা ব্যক্তিমুখীন (subjective) হওয়ায় এর নির্ভর যোগ্যতার একান্ত অভাব। পরীক্ষার খাতায় নম্বর (marks) দেওয়া অনেকখানি পরীক্ষকের সময়মাফিক মেজাজ বা খেয়াল খুশীর (personal equation) উপর নির্ভরশীল। যদি পরীক্ষকের মেজাজ ভাল থাকে তাহলে তখন খাতা দেখে যতবেশী নম্বর দেবেন মেজাজ কোন কারণে বিগড়ে গেলে তিনি সে রকম নম্বর দেবেন না। অর্থাৎ বেশী নম্বর কি কম নম্বর পাওয়া শুধুমাত্র উত্তরপত্রের গুণাগুণের উপর নির্ভর করে না, এ অনেকটা পরীক্ষকের খেয়াল খুশীর উপর নির্ভরশীল। Prof. Sandiford কিছুটা ঠাট্টা করে বলেছেন—"It (Pass mark) alters from hour to hour, and does not mean the same thing before lunch and after lunch."

বিভিন্ন পরীক্ষকের বিচারের মান আলাদা—তাই রচনামূলক পরীক্ষায় উত্তরপত্র বিচারে কোন একটা নির্দিষ্ট মান রক্ষিত হয় না। ভিন্ন ভিন্ন বিচারক নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উত্তরপত্রের বিচার করে নম্বর দেন। তার ফলে

একই উত্তরপত্র বিভিন্ন পরীক্ষক দিয়ে পরীক্ষা করান হলে তাঁদের দেওয়া নম্বরে বিরাট পার্থক্য লক্ষিত হবে। এমন কি একই পরীক্ষক এক খাতা দুবার দেখলে দু'রকম নম্বর দেবেন। দুটি ছাত্রের গুণাগুণ বিচারে যদি দেখা যায় একজন ৪৫ নম্বর পেয়েছে আরেকজন ৫৭ নম্বর পেয়েছে তা দিয়ে এদের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্ণয় করা যায় না। কারণ আর একজন পরীক্ষকের বিচারে হয়ত বিপরীত ফলই হতে পারে। এ সম্পর্কে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, কয়েকটি পরীক্ষার কথা এখানে উল্লেখ করা হল তা দিয়েই আমরা বিচারের অনিশ্চয়তা সম্পর্কে ধারণা করতে পারব।

একবার Dr. Ballard কয়েকজন পরীক্ষক দিয়ে কতকগুলি উত্তরপত্র পরীক্ষা করালেন। দেখা গেল পরীক্ষকদের দেওয়া নম্বরের মধ্যে পার্থক্য তো রয়েছে কিন্তু পার্থক্য এত বেশী যে বিশ্বাস করা যায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে একজন পরীক্ষক যে খাতায় ২৫ নম্বর দিয়েছেন আরেকজনকে সেই খাতায় ৭৫ নম্বর দিয়েছেন। প্রত্যেকটি উত্তরপত্র বাছাই করা অভিজ্ঞ পরীক্ষক দিয়ে পরীক্ষা করান হয়েছিল। এর পর যা ঘটল তা আরো আশ্চর্যজনক। তিনি কয়েক বছর বাদে সেই পুরোন উত্তরপত্রগুলিই আবার সেই পরীক্ষকদের দিয়ে পরীক্ষা করালেন এবার দেখা গেল পূর্বে যিনি যে খাতায় ৭৫ নম্বর দিয়েছিলেন তিনিই সেই খাতায় ২৫ নম্বর দিয়েছেন।

Prof. Sandiford বলেছেন, একটি প্রবন্ধ একবছর লিখে একজন ৮০ নম্বর পেয়েছিল। ঠিক সেই প্রবন্ধটিই আরেক বছর লিখে একজন ৩৯ নম্বর পেয়েছিলেন।

School Certificate পরীক্ষায় কয়েকটি উত্তরপত্র একই রকম বিবেচিত হওয়ায় সেই উত্তরপত্রগুলি একই রকম নম্বর পাবার যোগ্য বলে ধরে নেওয়া হয়। তারপর সেই উত্তরপত্রগুলিকে অভিজ্ঞ পরীক্ষকদের কাছে পাঠান হয়। দেখা গেল বিচারে নম্বরের পার্থক্য হয়েছে ২১-৭০ পর্যন্ত। বুদ্ধি দিয়ে কি এর কোন ব্যাখ্যা চলে!

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করলে খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তখন নবম শ্রেণীর ছাত্র, ত্রৈমাসিক পরীক্ষার পূর্বে একটি ব্যাখ্যা প্রাইভেট টিউটারকে দিয়ে লিখিয়ে মুখস্ত করেছিলাম। আরেকটি ছেলেও সেটি লিখে নিয়ে মুখস্ত করেছিল। কপালগুণে ব্যাখ্যাটি পরীক্ষায় এসেছিল। দু'জনেই নির্ভুলভাবে লিখেছিলাম। আমি পেলাম তিন, আর সে ছেলেটি পাঁচ। মাষ্টার মশায়কে বলতে তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসেছিলাম সে কথা আজো মনে আছে। সেদিন

আমার শিক্ষক যা করেছিলেন আজ আমরা খাতা দেখতে গিয়ে ঠিক তাই করি, একথা স্বীকার করতেই হবে।

অতি আধুনিক কালে আমাদের দেশে পরীক্ষা বিষয়ক অনুসন্ধানের ফলে যে তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে তা বিস্ময়কর। বিগত ২রা জানুয়ারী (১৯৬৫ খ্রীঃ) অমৃত বাজার পত্রিকায় University Grants Commission পরীক্ষা সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে যে অনুসন্ধান চালিয়েছেন তার ফলাফল কিছুটা প্রকাশিত হয়েছে। কমিশন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরপত্র বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যারা পরীক্ষায় ফেল করে তাদের শতকরা ৬০ ভাগ পরীক্ষাপদ্ধতির ক্রটির জন্য ফেল করে। পরীক্ষকের ভুলে প্রতি পত্রে ৭ নম্বর কম পায় (Examiner's errors are not less than 7 marks per script)।

একই মানের খাতা বেছে নিয়ে দেখা গিয়েছে যেখানে একজন পরীক্ষক শতকরা ৬০ জন পাশ করিয়েছেন সেখানে অন্য একজন পরীক্ষক পাশ করিয়েছেন মাত্র শতকরা ১১ জন।

ঢাকা টিচার্স ট্রেণিং কলেজের খ্যাতনামা অধ্যক্ষ Dr. West অনুসন্ধান করে একই রকম তথ্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। তাই তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন, "Examinations are the webs of penelope. What the teachers do the examiners undo."

৯ রচনামূলক পরীক্ষায় যে নির্দিষ্ট বিষয়ের পরীক্ষা নেওয়া হয় মূল্যায়ণের সময় বিষয়বস্তু ছাড়াও আরো কয়েকটি উপাদান পরীক্ষকের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। শিক্ষক মাত্রেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানেন ইতিহাস কি ভূগোলের পরীক্ষায় পরীক্ষক বিষয়-জ্ঞানের পরিমাপের সাথে উত্তরদাতার রচনা শক্তি, বানানের নির্ভুলতা, সুন্দর হাতের লেখা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতিকে উপেক্ষা করতে পারেন না। দু'টি ছাত্রের ইতিহাসের উত্তর তথ্যগত দিক থেকে একই রকম হলেও যার খাতায় এই ক্রটিগুলি থাকবে সে কম নম্বর পাবে। ইতিহাসের পরীক্ষা রচনাশক্তি কি বানানের নির্ভুলতা দ্বারা প্রভাবিত হওয়া কতটা সঙ্গত তা বিচার সাপেক্ষ কিন্তু বাস্তবে যা ঘটেছে তাকে অস্বীকার করতে চাই না।

১২ রচনামূলক পরীক্ষায় সমস্ত পাঠক্রমের উপর সুবিচার করা সম্ভব হয় না। তিনশত পাতার একখানা বই থেকে ১০ কি ১২টি প্রশ্ন করা হবে, ছেলেদের তার মধ্য থেকে ৫।৬টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে বলা হবে, সমস্ত বই থেকে প্রশ্ন করা সম্ভব নয়। তার ফলে ছেলেরা বাছাই করে প্রশ্ন নির্বাচিত করে মুখস্ত

করে। Note, Digest, Sure Sucess প্রভৃতির সাহায্যে 'যেন তেন' প্রকারে পরীক্ষা পাশের ফিকির খোঁজে। সারা বছর বই পড়ে একটি ভাল ছেলে হয়ত কম নম্বর পেল, আর একটি সুযোগ সন্ধানী ছেলে কয়েকটি মাত্র প্রশ্ন বেছে নিয়ে 'বরাত জোরে' বেশী নম্বর পেল, এর ফলে ছেলেরা cramming বা rote learning-এর দিকে ঝুঁকে পড়ে। সমস্ত বিষয়টিকে না জেনেও পরীক্ষায় পাশ করতে বেগ পেতে হয় না।

রচনামূলক পরীক্ষায় প্রশ্নকর্তা ছাত্রদের কাছ থেকে কতটুকু জানতে চান তা সব সময়ে বোঝা যায় না। তাই দেখা যায় উত্তর জানা থাকলেও ছাত্রেরা প্রশ্নের সঠিক উত্তর লিখতে পারে না। এ ছাড়া প্রশ্নপত্র অনেক সময় দীর্ঘ হয়, ছেলেরা অনেক সময় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্তর দিতে পারে না।

এই পরীক্ষায় সঠিক মূল্যায়ণের পথে অনেক বাধা আছে বলে রাধাকৃষ্ণণ কমিশন বলেছেন বিষয়াত্মক পরীক্ষার সাথে রচনাত্মক পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে এই জাতীয় পরীক্ষায় সুফল পাওয়া যেতে পারে। নতুন ধরণের পরীক্ষার ব্যাপক প্রয়োগ যতদিন সম্ভব না হচ্ছে ততদিন এই পরীক্ষা ব্যবস্থার কি করে উন্নতি সাধন করা যায় আমাদের সে চেষ্টা করতে হবে। এইজন্য প্রশ্ন নির্বাচন ও নম্বর দেওয়া পদ্ধতির পরিবর্তন প্রয়োজন। পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি, এ-সম্পর্কে পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থীর ধারণা থাকবে। এই জাতীয় পরীক্ষায় বিষয়বস্তুর সাথে চিন্তা, যুক্তি, বিচারপূর্বক উপস্থাপন, সৃজন ধর্মী ভাষ্য, প্রভৃতির উপর জোর দিতে হবে। কমিশন বলেছেন,—"By itself this type of examination may not be expected to fulfill he basic conditions of a good test, but in conjunction with more objective techniques it may be utilised to great advantage. Moreover, until such time as objective examinations at all educational levels are evolved, this type will hold the field. It should, therefore, be the concern of all eaucational organisations to improve this type also. This improvement can be brought about in the selection of test content, in the framing of questions, and in the scoring of results. The exact purpose of the examination must be understood by both the examiner and the students. The emphasis in this type of examination should be expressly on thought, acute reasoning,

critical exposition, creative interpretation and other types of mental activity in relation to the materials of the course. Its main concern should be with topics involving relations and problems."

নতুন বস্তুনিষ্ঠ (নৈর্ব্যক্তিক) পরীক্ষা (New Type Objective Test):—প্রচলিত রচনামূলক পরীক্ষার দোষত্রুটি নিয়ে বহুদিন থেকে আলোচনা হচ্ছে। এর দোষত্রুটি কি করে দূর করা যায় তা নিয়ে আলোচনার সাথে ইউরোপ ও আমেরিকায় সঠিক মূল্যায়ণের নতুন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় কি না তাই নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল। আমরা দেখেছি রচনামূলক পরীক্ষার দু'টি প্রধান ত্রুটি। একটি ব্যক্তিমুখীনতা (Subjectivity) অপরটি নম্বর দেওয়ায় অনিশ্চয়তা (inaccuracy in marking)। প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার ব্যক্তিমুখীনতা দূর করে কৃতিত্বের মূল্যায়ণ যতটা সম্ভব নির্ভুল ও নির্ভর যোগ্য করে তোলবার উদ্দেশ্যে নতুন বস্তুনিষ্ঠ (objective) পরীক্ষাপদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে।

নতুন বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষা নানারকম হতে পারে। যেমন, সত্য মিথ্যা নির্দ্ধারণ (True or False Type), সম্পূর্ণ করণ বা শূন্যস্থান পূরণ (Completion Type), শুদ্ধ উত্তর নির্বাচন (Multiple choice), সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন (Short answer Test), সামঞ্জস্য সন্ধান (Matching Test) স্মৃতি মন্থন (Recall Type).

সত্য মিথ্যা বিচার—এই জাতীয় প্রশ্নে একই সাথে কতকগুলি শুদ্ধ কতকগুলি অশুদ্ধ উত্তর দেওয়া থাকে। ছেলেদের বলা হয় যেগুলি শুদ্ধ সে গুলির পাশে ✓ চিহ্ন ও যে গুলি অশুদ্ধ সেগুলির পাশে × চিহ্ন দিয়ে দেখিয়ে দাও।

১। হর্ষবর্দ্ধন বিভিন্ন দেশে ধর্ম মহাপাত্র প্রেরণ করেন।

২। ফা-হিয়ান নালন্দায় অধ্যয়ন করেছিলেন।

৩। আকবর দীন ইলাহি ধর্মের প্রবর্তন করেন।

সম্পূর্ণ করণ—এই জাতীয় প্রশ্নে একটি বাক্যে একটি কি দু'টি শব্দ উহ্য থাকে। ছেলেদের বলা হয় উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে বাক্যটি পূর্ণ করতে। সম্পূর্ণকরণ তথ্যগত হতে পারে আবার রচনামূলকও হতে পারে।

১। বন্দেমাতরম সঙ্গীত—রচনা করেছিলেন

২। বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা—

৩। জন্মিলে—হবে—কে কোথা কবে।

শুদ্ধ উত্তর নির্বাচন—প্রশ্নের নীচে সত্য মিথ্যা অনেক উত্তর দেওয়া হয়ে থাকে তার মধ্য থেকে শুদ্ধ উত্তরটি খুঁজে বের করে নিতে হবে।

তাজমহল নির্মান করেন আলাউদ্দীন খিলজী, মহম্মদ তুগলক, শাহজাহান, বাহাদুর শা।

নর্মদা একটি পাহাড়ের নাম, একটি দ্বীপের নাম, একটি নদীর নাম, একটি সহরের নাম।

সামঞ্জস্য সন্ধান—কতগুলি প্রশ্নের উত্তর এলোমেলো ভাবে দেওয়া থাকে সে গুলিকে ঠিক মত সাজিয়ে দিতে হয়।

১৫২৬ খৃঃ প্রথম পাণিপথের যুদ্ধ

১৮৫৮ খৃঃ পলাশীর যুদ্ধ।

১৫২৬ খৃঃ সিপাহী যুদ্ধ।

স্মৃতি মন্থন—সম্পূর্ণ স্মৃতির উপর নির্ভর করে এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়।

ষ্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন কে?

পৃথিবীর দীর্ঘতম নদীর নাম কি?

ভারতে জাতীয় কংগ্রেস কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

সাদৃশ্য অনুযায়ী সাজান :—

রূপা তামা পিতল সোনা কাঁসা।

বাঘ ছাগল মহিষ সিংহ গরু।

সংক্ষিপ্ত উত্তরে প্রশ্ন—এই জাতীয় প্রশ্ন স্মৃতিনির্ভর হতে পারে। ইচ্ছা করলে এই প্রশ্নকে এমন ভাবে তৈরী করা যেতে পারে যাতে শিক্ষার্থীকে একটু ভাবতে ও দু কথা লিখতে হয়।

বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষার সর্বপ্রধান সুবিধা হচ্ছে এ পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা। এই পরীক্ষা নৈর্ব্যক্তিক হওয়ার জন্য উত্তর পত্রের মূল্যায়ণে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত খেয়াল খুশী, ভাল লাগা, মন্দ লাগা, সময় মাফিক মেজাজ প্রভৃতির কোন স্থান নেই।

এই পরীক্ষায় একটি প্রশ্নের একটি নির্ভুল উত্তর হতে বাধ্য তাই উত্তরপত্র বিচারের মানের তারতম্য হবার কোন সম্ভাবনা নেই। শুদ্ধ উত্তর লিখলে সমস্ত পরীক্ষকই সমান নম্বর দিতে বাধ্য। পরীক্ষকের মনমত উত্তর হয়নি তাই তিনি কম নম্বর দিয়েছেন একথা বলার সুযোগ এখানে নেই। পরীক্ষক পক্ষপাতিত্ব করেছেন এই অভিযোগ কেউ করবে না।

রচনামূলক পরীক্ষায় বিষয়-জ্ঞানেব সাথে ভাষা-জ্ঞান, রচনার অন্যান্য দোষ গুণ দ্বারা পরীক্ষক প্রভাবিত হন এছাড়া পরীক্ষক একই সময় সবদিকে সমান মনোযোগ দিতে পারেন না। বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষায় শুধু মাত্র একটি নির্দিষ্ট উত্তর ছাড়া দ্বিতীয় উত্তর হবার অবকাশ নেই, তাই মান নির্ণয় সহজ ও নির্ভুল হয়।

এই পরীক্ষায় প্রশ্নের সংখ্যা বহু হওয়ায় সমগ্র পাঠক্রমের উপর প্রশ্ন করা চলে। বেছে বেছে সামান্য কয়েকটি প্রশ্ন মুখস্ত করে ভাল নম্বর পাওয়ার সুযোগ এখানে নেই। পরীক্ষায় বেশী নম্বর পেতে হলে কি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে সমগ্র পাঠক্রম আরত্ত করতে হবে। বিষয়টি না জেনে যা ইচ্ছা খুশী লিখলে এখানে নম্বর পাওয়া যায় না। রচনামূলক পরীক্ষায় উত্তর না জেনেও বুদ্ধিমান ছেলেরা মূল প্রশ্নটিকে এড়িয়ে এমন ভাবে লিখতে পারে যাতে অনেক সময় পরীক্ষক ফাঁকি ধরতে পারেন না। কিছু নম্বর দিয়ে বসেন, এই পরীক্ষায় পাশ কাটিয়ে জবাব দেবার অবকাশ নেই।

এই পরীক্ষায় সময়-পরিশ্রম কম লাগে। ছোট ছোট প্রশ্নের জবাব লিখতে কম সময় দরকার হয় তাই ছেলেরা চিন্তার সময় পায়। উত্তরপত্র পরীক্ষা করতে তেমন খুব বেশী সময় প্রয়োজন হয় না। খাতা দেখতে খুব অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন হয় না। উত্তরগুলি নির্দিষ্ট থাকার জন্য পরীক্ষকের গুরুত্ব কমে গিয়েছে।

নতুন পরীক্ষায় প্রচলিত পরীক্ষার দোষ ত্রুটি অনেকটা দূর করা সম্ভব হলেও এই পরীক্ষাপদ্ধতিরও কতকগুলি ত্রুটি রয়েছে। এই পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি হল শিক্ষার্থীর সুশৃঙ্খল চিন্তা-শক্তি প্রকাশের সুযোগ এই ধরণের পরীক্ষায় নেই। বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করে যুক্তির দ্বারা কোন বিষয় প্রতিপাদন বা উপস্থাপন করবার কোন সুযোগ ও স্বাধীনতা এখানে নেই। ঘটনামূলক জ্ঞান, বিশেষ করে স্মৃতি নির্ভর জ্ঞানের পরীক্ষা নির্ভুল ভাবে এই পদ্ধতিতে হয়। কিন্তু রচনাশক্তি বিকাশের উপর কোন জোর এই ব্যবস্থায় দেওয়া হয় না। কোন মৌলিক রচনা যুক্তিমূলক লেখার

মাধ্যমে প্রকাশ করবার বা স্বকীয় চিন্তাধারা গড়ে তোলবার সুযোগ এই পরীক্ষাপদ্ধতিতে নেই।

প্রশ্নপত্র রচনা পরিশ্রম সাধ্য, এই জাতীয় প্রশ্নপত্র ছাপতে ব্যয়ও অধিক হয়। মুদ্রন খরচ বিদ্যালয়ের পক্ষে বহন করা কষ্ট সাধ্য। সকলেই এই জাতীয় প্রশ্নপত্র রচনা করতে পারেন না। অভিজ্ঞতা-হীন শিক্ষককে বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনা করতে দিলে মামুলি ধরণের প্রশ্ন পত্র রচিত হবে।

এই জাতীয় পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর অনেক সময় কিছুটা আন্দাজ বা অনুমান করে দেওয়া সম্ভব। একটি দাগ বা একটি ক্রশ চিহ্ন অথবা হ্যাঁ কি না অনুমান করে লিখে দিলেও কোন কোন সময় কাজে লেগে যেতে পারে। কোথায় যে উত্তরটি অনুমান নির্ভর এ কথা বলা খুবই কঠিন। তাই Prof. Sandiford বলেছেন, পরীক্ষক সব সময় ঠিক করতে পারেন না কোথায় জ্ঞানের শেষ ও অনুমান সুরু হয়—The examiner can not tell when knowledge stops and guessing begins.

নতুন পরীক্ষায়ও দেখা যাচ্ছে এই ব্যবস্থা ত্রুটি শূন্য নয়। Raymont বলেছেন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে দু'টি উদ্দেশ্য সার্থক করতে হবে একটি শিক্ষার্থীর জ্ঞানের নির্ভুল পরিমাপ, দ্বিতীয় হচ্ছে উন্নত ধরণের পাঠ-প্রেরণা যোগান। বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষার মূল্যায়ণ যাতে নির্ভুল হয় সে দিকে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিধিকে বাড়াতে যে পরিমান পড়াশুনা করা দরকার সে দিক থেকে কোন প্রেরণা যোগায় না। রচনামূলক পরীক্ষায় একটি প্রশ্নের ভাল উত্তর লিখতে শুধুমাত্র শ্রেণীপাঠ্য বই-ই যথেষ্ট নয়, আরো বহু গ্রন্থের সাহায্য প্রয়োজন কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষায় নিজের পাঠক্রমের বাইরে থেকে কিছু প্রকাশের সুযোগ নেই। তবুও দোষ ত্রুটিকে মেনে নিয়ে বলা যায় নতুন পরীক্ষা কতকগুলি ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী। রাধাকৃষ্ণণ কমিশন নতুন পরীক্ষা পদ্ধতিকে কাজে লাগাবার কথা বলেছেন। কমিশন বলেছেন—……"that a battery of psychological and achievement tests be developed for use with Higher Secondary school students for the final test at the end of twelve years of schooling."

রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের সুপারিশ সত্ত্বেও আমরা রচনামূলক পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করতে পারি না। কারণ সাহিত্য বিষয়ে যেখানে রচনাশক্তি ও কল্পনাশক্তির পরীক্ষার প্রয়োজন সেখানে বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষা খুব উপযোগী নয়। Prof. Sandiford বলেছেন, দোষ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এই নতুন পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকরী এবং প্রয়োজনানুরূপ পুরাতন পদ্ধতির সংমিশ্রণে নতুন পদ্ধতিকে ত্রুটিমুক্ত করা যেতে পারে। অর্থাৎ প্রচলিত পরীক্ষাপদ্ধতির সাথে নতুন পদ্ধতির সামঞ্জস্য বিধান করে পুরাতন পদ্ধতিকে যথা সম্ভব দোষ মুক্ত করবার চেষ্টা করলে একে অধিকতর নির্ভরশীল করে তোলা যায়। পরীক্ষাপদ্ধতিকে ত্রুটি মুক্ত করতে হলে নৈর্ব্যক্তিক করতে হবে তাহলে পরিমাপ নির্ভুল হবে। অন্যান্য কুশলতা রচনাশক্তি, বিচার ও যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা এবং কল্পনা শক্তি পরিমাপের জন্য রচনা-মূলক পরীক্ষার সাহায্য নিতে হবে। দু'টি ব্যবস্থার সংমিশ্রণে অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। কি করে এই অসুবিধা দূর করা যায় তা নিয়ে অনুসন্ধান করতে হবে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আমাদের স্থির করতে হবে মিশ্রপদ্ধতিকে আমাদের পরীক্ষায় প্রয়োগ করবার উপযোগী করে তোলা যায় কিনা।

পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতির "Education & Research" উপসমিতির ৫।১।৬৫ তারিখে একটি সভায় রচনামূলক ও বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষা পদ্ধতির সংমিশ্রণে বর্তমান পরীক্ষার সংস্কার করা যায় কিনা সে সম্পর্কে আলোচনা করে প্রাথমিক পর্যায়ে কয়েকটী নির্দিষ্ট স্থলে আদর্শ মিশ্র প্রশ্নের সাহায্যে পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করেছেন। কিছুদিন পূর্বে বিদ্যানগরে (বর্দ্ধমান) পশ্চিমবঙ্গের বহু অভিজ্ঞ প্রধান-শিক্ষক "পরীক্ষা পদ্ধতি" সম্পর্কে বিচার বিবেচনার জন্য এক আলোচনা চক্রে সমবেত হয়েছিলেন। সেই আলোচনায় সকলেই রচনামূলক পরীক্ষার ত্রুটি সম্পর্কে আলোচনা করলেও তাকে বাদ দেবার কথা বলতে পারেননি। বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষার সাথে যুক্ত করে প্রচলিত রচনামূলক পরীক্ষাকে কি করে দোষমুক্ত করা যায় তাঁরা সে চেষ্টা করবারই পক্ষপাতী।

আভ্যন্তরীণ ও বহিঃপরীক্ষা—(Internal and External or Public examination)

আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা: বিদ্যালয়ের শ্রেণীশিক্ষায় শিক্ষার্থীরা কি পরিমাণ যোগ্যতা অর্জন করল তা পরিমাপ করবার জন্য সাপ্তাহিক, মাসিক,

ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। বিদ্যালয় থেকে এই পরীক্ষা পরিচালনা করা হয়। এই পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করেই ছেলেদের উন্নতি অবনতির বিচার ও ক্লাস প্রমোশনের ব্যবস্থা করা হয়।

বহিঃপরীক্ষা বা সাধারণী পরীক্ষা বিদ্যালয়ের বাইরের কোন স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান থেকে করা হয়। আমাদের দেশে বহিঃপরীক্ষা সরকারী শিক্ষা বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড পরিচালনা করে। প্রতিটি স্তরের জন্য একটি সাধারণ পাঠক্রম থাকে যা সব স্কুল বা কলেজে অনুসৃত হয়। তারপর নির্দিষ্ট শিক্ষাকাল শেষে সেই স্তরের শেষে সকলে একটি পরীক্ষা দেয়। পরীক্ষা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান প্রশ্নপত্র রচনা, উত্তর পত্রের বিচার ও ফলাফল ঘোষণার ব্যবস্থা করে থাকে। পরীক্ষায় সাফল্যের প্রমাণ স্বরূপ সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা, ডিগ্রী প্রভৃতি দেওয়া হয়।

বহিঃপরীক্ষায় দু'টি উদ্দেশ্য সাধিত হয়। যোগ্যতা নির্দ্ধারণ ও নির্বাচন। প্রতিযোগিতামূলক বহিঃপরীক্ষায় বহু প্রার্থীর মধ্য থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রার্থীকে বেছে নেওয়া হয়। সাধারণ ভাবে বহিঃপরীক্ষায় পরীক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট মান করতে পারলেই যোগ্যতার বিচারে উত্তীর্ণ ঘোষিত হয়। মুদালিয়র কমিশন বলেছেন, The purpose (of the external examination) is twofold, selective and qualifying—selecting those who have successfully completed a course and qualifying those from among many for the next higher."

সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় বহিঃপরীক্ষার প্রভাব অসীম! এর ভাল মন্দ দু'দিকই আছে। তাই বহিঃপরীক্ষার প্রশংসা ও নিন্দা দুই শুনতে পাওয়া যায়। আমরা এ ব্যবস্থার দোষ গুণ দুদিক নিয়েই আলোচনা করব।

মুদালিয়র কমিশন বহিঃপরীক্ষার উপযোগিতা সম্পর্কে বলেছেন, "External examination have a stimulating effect both on the pupils and on the teachers by providing well defined goals and objective standard of evaluation."

ছাত্র, শিক্ষক ছাড়াও একটি দিক রয়েছে তা হচ্ছে স্কুলের দিক। এ সম্পর্কে কমিশনের অভিমত হচ্ছে, "Finally external examination has another gread advantage, namely that it helps a school to compare itself with other schools."

আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় বহিঃপরীক্ষার ফল শুভ হয়নি। পরীক্ষা শিক্ষাব্যবস্থার একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। কিন্তু পরীক্ষাই শিক্ষার শেষ কথা নয়। আমাদের শিক্ষব্যবস্থায় পরীক্ষাকে শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় বলে মনে করা হয় না—এদেশে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই শিক্ষার শেষ কথা। বহিঃপরীক্ষার সাফল্য বর্তমান সমাজে বৈষয়িক সাফল্যের একটা প্রধান উপায়। তাই জীবনে অর্থোপার্জন ও প্রতিষ্ঠালাভের জন্য পরীক্ষা পাশ করাই হচ্ছে শিক্ষার্থীর জীবনের শেষ কথা। শিক্ষা নয় পরীক্ষাই যেখানে মুখ্য এবং সেই পরীক্ষা যখন বহিঃপরীক্ষা তাকে নিয়ে যে বহু পঙ্কিলতার সৃষ্টি হবে তা স্বাভাবিক। প্রচলিত পরীক্ষার দোষত্রুটী নিয়ে আলোচনা করতে যে সব ত্রুটির কথা উল্লেখ করা হয় তা বহিঃপরীক্ষায় অত্যধিক গুরুত্ব আরোপের জন্য বহু পরিমাণে সৃষ্টি হয়েছে। ডিগ্রীর সর্বনাশা মোহ শিক্ষার কি ক্ষতি করেছে সে সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণণ কমিশন বলেছেন "A university degree is a kind of passport for jobs. With great economic pressure due to the prevaling poverty in the country, the insistence on a university degree as the minimum requirement even for posts of minor officials and clerks, has put a premium on a number of evils which have come to be associated with the examination system. It has subjected teaching to the examination, made it almost impossible to provide true education and to develop wider interests, and has created temptations of cheating, corruption and favouritism. The obsession to secure, as it were a ticket in the lottery of job seeking has over shadowed the educational purposes which a good examination can serve."

সাধারণ ভাবে পরীক্ষা সম্পর্কে এ মন্তব্য করা হলেও বিশেষ ভাবে বহিঃপরীক্ষা সম্পর্কেই এ মন্তব্য প্রযোজ্য। বহিঃপরীক্ষাকে কেন্দ্র করেই শিক্ষাজগতে একটা অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছে। সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী আজ এই পাপচক্রের কবলিত। শিক্ষাব্যবস্থায় এর ক্ষতিকর প্রভাব সুস্পষ্ট।

বহিঃপরীক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে Raymont বলেছেন,

বহিঃপরীক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকেরা পরীক্ষাকে তাঁদের সর্ব কর্মের কেন্দ্রে স্থাপন করেন। তারফলে স্কুলের সময়-তালিকা, পড়াবার গতি-প্রকৃতি সব কিছু বহিঃপরীক্ষার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তিনি বলেছেন এই ব্যবস্থায় জীবনে বৈষয়িক সাফল্যকে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন অপেক্ষা অধিক মূল্যবান প্রয়োজনীয় মনে করবার প্রেরণা যোগায়। প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ ও অনুরাগ সৃষ্টি করা। কিন্তু এখানে কোনক্রমে পরীক্ষার বাধা অতিক্রম করাই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য।

পরীক্ষা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ পরীক্ষক অনেকসময় প্রয়োজনীয় অংশ অপেক্ষা অপ্রয়োজনীয় অসার অংশের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি মনে করেন যারা অপ্রয়োজনীয় অংশ জানে, প্রয়োজনীয় অংশ তারা অবশ্যই আয়ত্ত করেছে। এই বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিষয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অংশকেই তারা বাদ দিয়ে চলেন। এর ফল শিক্ষার উপর মারাত্মক ক্ষতিকর হয়।

বহিঃপরীক্ষায় তথ্যগত বিষয়ের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় যা শুধুমাত্র মুখস্থ করেই লেখা চলে। শিক্ষার্থীর বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্তে আসবার সুযোগ যেখানে নেই সেখানে শিক্ষার্থীরা মুখস্ত করেই পরীক্ষা পাশ করে। মুখস্ত করে পাশ করবার সুযোগ যেখানে রয়েছে সেখানেই প্রশ্ন বেছে পড়বার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। সম্ভাব্য প্রশ্নের বাইরে শিক্ষার্থীরা কিছু শিখতে চাইবে না।

এছাড়াও পরীক্ষার সময় অতিরিক্ত দৈহিক ও মানসিক শ্রমে শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য হানি ঘটে।

বহিঃপরীক্ষার কুফলের প্রতিকার সম্পর্কে Raymont কয়েকটি সুপারিশ করেছেন—তিনি বলেছেন পরীক্ষক সুনির্বাচিত প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষা ও শিক্ষাদান ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করতে পারেন। পরীক্ষক মনে রাখবেন তিনি যে প্রশ্ন করছেন তা দিয়ে শুধু শিক্ষণীয় জ্ঞানেরই পরীক্ষা হয় না, পরবর্তী কালে ছাত্ররা কি ভাবে পড়বে কি ভাবে প্রশ্ন তৈরী করবে ও পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হবে তাও তারা প্রশ্নের ধরণ দেখে স্থির করবে। পরীক্ষার প্রশ্ন শিক্ষক কি ভাবে পড়াবেন তা স্থির করতে অনেকখানি প্রভাবিত করে। তাই পরীক্ষক প্রতিটি প্রশ্ন নির্বাচন করবার সময় খেয়াল রাখবেন তার প্রশ্নটির প্রভাব সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় ভাল হবে কি মন্দ হবে। তার প্রশ্ন কি সহজবোধ্য এবং যে শ্রেণীর জন্য করা হয়েছে

তার উপযুক্ত? এই প্রশ্নকি পড়াবার ধারাকে ঠিক পথে চালিত করবে? এই প্রশ্ন কি মুখস্থ করতে প্রেরণা যোগাবে? প্রতিটি প্রশ্ন করবার পূর্বে পরীক্ষক এসব কথা বিশেষভাবে চিন্তা করবেন।

শিক্ষকদের মধ্য থেকেই পরীক্ষক নিযুক্ত করতে হবে। শিক্ষক যে ভাবে শিশুদের মনকে জানেন একজন মস্ত পণ্ডিত যিনি স্কুলের শিক্ষার সাথে যুক্ত নন তিনি তাদের সে ভাবে জানতে পারেন না। বহিঃপরীক্ষার প্রভাব কতটা বাইরের লোকের পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। সাধারণ ছেলের মান ও শিক্ষাগত যোগ্যতা একজন স্কুলের শিক্ষক যতটা জানেন স্কুলের শিক্ষার সাথে সম্পর্কহীন একজন পণ্ডিতের পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। তাই স্কুলের শিক্ষার সাথে যাঁর সম্পর্ক নেই তাঁকে প্রশ্ন পত্র রচনা করতে দেওয়া উচিত নয়।

শিক্ষা ও পরীক্ষার সাথে ঘনিষ্ঠ যোগ থাকবে। বহিঃপরীক্ষা ঘন ঘন হওয়া উচিত নয়। শিক্ষার্থীর স্কুলজীবনের শেষেই একবার বহিঃ-পরীক্ষা হওয়া উচিত।

বহিঃপরীক্ষার বহু দোষ একথা মেনে নিয়েও একে শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বাদ দেবার কথা কেউ বলেননি। মুদালিয়র কমিশন বহিঃপরীক্ষার গুরুত্ব হ্রাস করবার কথা বলেছেন। কমিশনের মতে শিক্ষার্থীর সম্পর্কে শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার পূর্বে আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলও বিচার করে দেখা দরকার "In the final assessment of the pupils due credit should be given to the internal tests and internal records of the pupils. Even the public examination need not be compulsory for all, that is if pupils desire they need not be taken."

ফলশ্রুতি:—পরীক্ষা পদ্ধতির বিভিন্ন দিক আলোচনা করে একথা বলা চলে যে পরীক্ষার যত দোষ ত্রুটিই থাক না কেন পরীক্ষা শিক্ষাব্যবস্থার একটা অপরিহার্য অঙ্গ। একে আমরা ত্যাগ করতে পারব না। প্রচলিত পরীক্ষার সংস্কার সাধন করে কি করে নির্ভরযোগ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যায় তা নিয়ে যে আলোচনা হল সেই আলোচনা সূত্র ধরে পরীক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য নিম্নরূপ কয়েকটি আলোচনা করা যেতে পারে।

রচনামূলক পরীক্ষা ও নতুন-পদ্ধতির পরীক্ষার মধ্যে সংমিশ্রন করে [illegible] নতুন পরীক্ষা-পদ্ধতির সৃষ্টি করতে হবে। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর [illegible] ভাবে তৈরী করতে হবে যার উত্তর শুধু মাত্র স্মৃতিনির্ভর হবে না। উত্তর সংক্ষিপ্ত হবে কিন্তু কিছুটা চিন্তাশক্তি ও রচনাশক্তি প্রকাশের সুযোগও থাকবে। তাহলে note, made easy, digest থেকে উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না এবং প্রশ্ন সংখ্যা বেশী করবার সুযোগ থাকায় সমগ্র পাঠক্রম থেকেই প্রশ্ন করা সম্ভব হবে।

স্কুলের শিক্ষার সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত নেই এমন কোন লোককে বহিঃপরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনার দায়িত্ব দেওয়া হবে না।

ইংরেজী ব্যতীত সমস্ত প্রশ্নপত্র মাতৃভাষায় রচিত হবে।

রচনা মূলক প্রশ্নে কোন বিকল্প প্রশ্ন দেওয়া হবে না।

চুড়ান্ত ফলাফল শুধুমাত্র বহিঃপরীক্ষা নির্ভর থাকবে না। আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলের উপরও যথোচিত গুরুত্ব দিতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে একটি মাত্র পরীক্ষা থাকবে। আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফলের সাথে সহ-পাঠক্রমিক কাযাবলী বিচার করতে হবে। সর্বাঙ্গীন বিকাশের মূল্যায়ণের জন্য সর্বাত্মক পরিচয়লিপির সাহায্য গ্রহণ করা হবে।

আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ক্ষেত্রে একটি মাত্র পরীক্ষার উপর নির্ভর করে কোন ছেলেকে আটকে রাখা হবে না। তিনটি পরীক্ষার ফলাফলের উপর পরীক্ষার্থীর কৃতিত্বের বিচার হবে। পরপর দুইটি পরীক্ষার বা একই বিষয়ে দুইটি পত্রের নম্বরের মধ্যে অস্বাভাবিক পার্থক্য দেখা গেলে প্রধান শিক্ষক সেই পত্রের পুনরায় বিচারের ব্যবস্থা করবেন।

যে শিক্ষার্থী উচ্চতর শিক্ষার প্রয়াসী নয় তাকে বহিঃপরীক্ষার দায় থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। চাকুরীর ক্ষেত্রে School leaving Certificate-কে যারা বহিঃপরীক্ষায় পাশ করেছে তাদের সাথে সমপর্য্যায়ের বলে বিবেচনা করতে হবে।

— —

একাদশ অধ্যায়

সর্বাত্মক পরিচয় পত্র (Cumulative Record card)

বিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা কতটা জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে তা জানবার জন্য বা পরিমাপের জন্য সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক প্রভৃতি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ সুবিধা ও প্রয়োজন মত পরীক্ষার ব্যবস্থা করে তার ফলাফল অভিভাবকদের জানায়। বিভিন্ন পঠিত বিষয়ের উন্নতি বা অবনতির পরিচয় জ্ঞাপক এই পত্রিকাকে প্রগতি-পত্র (Progress Report) বলা হয়। এই প্রগতি-পত্রে শিক্ষার্থীর জ্ঞানমুখী বিদ্যার যে পরিচয় দেওয়া হয় তা থেকে শিক্ষার্থী আমরা অতি সীমাবদ্ধ ভাবে জানতে পারি। বিদ্যালয়ের পাঠক্রম নির্দ্ধারিত কয়েকটি বিষয়ে শিক্ষার্থী কত নম্বর পেল তা জেনেই আমাদের শিক্ষার্থীকে জানা হয়না। এছাড়া আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রগতি-পত্র পাঠান একটা প্রথা রক্ষার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্কুলের পক্ষ থেকে বা অভিভাবকের পক্ষ থেকে কোন ছেলে ত্রৈমাসিক পরীক্ষায় বা ষান্মাসিক পরীক্ষায় ফল খারপ করলে তার ত্রুটি সংশোধনের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা করা হয় না। আর প্রগতি-পত্রে ছেলের প্রগতি সম্পর্কে একটা আংশিক ধারণা মাত্র হয়।

আধুনিক শিক্ষার গোড়ার কথাই হচ্ছে যাকে শিক্ষা দেওয়া হবে তাকে সম্পূর্ণ ভাবে জেনেই তার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। একটি শিশুকে গড়ে তুলতে হলে তার প্রকৃতিকে জানা দরকার। শুধু জ্ঞানমূলক দিকের পরিমাপ নয় সামাজিক ও দৈহিক দিক ও নানাবিধ প্রয়োজনীয় গুনের ও ক্ষমতার বার্তা আমাদের জানা দরকার। যে ছেলেটি শিক্ষার জন্য এল তার দেহ মন ও বুদ্ধির ধারাবাহিক বিকাশের খোঁজ যদি না রাখা যায় তাহলে তার জন্য সুষ্ঠু শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। কয়েকটি বিষয়ে কিছু জ্ঞান অর্জনকেই আমরা শিক্ষা বলি না। শিক্ষা হচ্ছে জীবনের সর্বাঙ্গীন সুষ্ঠু বিকাশ। এই বিকাশ কি ভাবে হচ্ছে তা আমাদের জানা দরকার। শিক্ষার্থীর সামাজিক পরিচয় নিয়ে যদি তাকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করা হয় তাহলে সর্বাঙ্গীন বিকাশের উন্নতির ধারাবাহিক পরিচয় জ্ঞাপক একটি পত্রের ব্যবস্থা করতে হবে—এই পত্রকে

বলা হয় সর্বাত্মক পরিচয়পত্র (Cumulative Record Card)। এই জাতীয় পরিচয়পত্র কি ভাবে রাখা হবে সে সম্পর্কে মুদালিয়র কমিশন বলেছেন—"For this purpose a proper system of school records should be maintained for every pupil indicating the work done by him in the school from day to day, month to month, term to term, year to year. Such a school record will present a clear and continuous statement of the attainment of the child in different intellectual pursuits throughout the successive stages of his education. It will also contain a progressive evaluation of development in other directions of no less importance, such as the growth of his interest, aptitudes and personality traits, his social adjustment, the practical and social activities in which he takes part. In other words it will give a complete career, such records should be a common feature of all schools all over the country."

সর্বাত্মক পরিচয়পত্রে প্রত্যেক শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে আসবার পর থেকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কি করেছে সেই সব প্রয়োজনীয় সংবাদ লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। বিদ্যার্থী তার সমগ্র বিদ্যালয়-জীবনের বিভিন্ন স্তরে কি অর্জন করল তার পরিচয় এই পত্র থেকে পাওয়া যাবে। শুধু মাত্র জ্ঞান-মূলক বা বৌদ্ধিক বিকাশের তথ্যই নয় তার বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহ, প্রবণতা, ব্যক্তিত্বের পরিচয়, সামাজিক সঙ্গতি বিধানের ক্ষমতা, বিভিন্ন সামাজিক কর্ম যাতে সে অংশ গ্রহণ করেছে সব কিছুর পরিচয় এই লিপি থেকে পাওয়া যাবে। যদি শিক্ষার্থী বিদ্যালয় ছেড়ে যায় তাহলে তার পরিচয় জ্ঞাপক পত্রটি সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। পত্রটি হবে এখানে গোপনীয়। প্রগতি-পত্র যেরূপ পরীক্ষার শেষে অভিভাবকের কাছে পাঠান হয় সর্বাত্মক পরিচয়-পত্র সে ভাবে পাঠান হবে না। অভিভাবক যদি বিদ্যালয়ে এসে ছেলের সম্পর্কে জানতে চান তাহলে তিনি তা দেখতে পারেন। প্রধান শিক্ষক যদি কোন বিষয় জানান প্রয়োজন বোধ করেন তাহলে এই পত্রের অংশ-বিশেষ অভিভাবকের কাছে পাঠাতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক পর্ষদের

উপদেষ্টা কমিটি ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম শ্রেণীর জন্য একটি ও ৯ম, ১০ম, ১১শ শ্রেণীর জন্য একটি কার্ডের ব্যবস্থা করতে বলেছেন।

সর্বাত্মক পরিচয় লিপি রাখবার উদ্দেশ্য :—

প্রচলিত পরীক্ষা বিশেষ করে বহিঃপরীক্ষা সম্পর্কে সবদিক থেকেই বহু অভিযোগ উঠেছে অথচ বহু দোষ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকে বহিঃপরীক্ষাকে বাতিল করে দেওয়া সম্ভব নয়। বিভিন্ন শিক্ষা-কমিশন তাই বহিঃপরীক্ষার গুরুত্ব কমিয়ে অন্য কোন উপায়ে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা পরিমাপের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করেছেন। সর্বাত্মক পরিচয় লিপির মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ পরিমাপের সুষ্ঠু ব্যবস্থা সম্ভব। বহিঃপরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না করে যদি সর্বাত্মক পরিচয় পত্রের সহায়তা গ্রহণ করা যায় তাহলে বর্তমান-প্রচলিত বহিঃপরীক্ষার ত্রুটি থেকে শিক্ষাকে কিছুটা মুক্ত রাখা সম্ভব হয়। Cumulative record card অর্থাৎ সঞ্চয় মূলক পরিচয় পত্রেব সিদ্ধান্ত যেহেতু একটি মাত্র পরীক্ষার উপর নির্ভর করে হয় না—ইহা বহু পরিমাপের সমষ্টি, তাই সার্বাত্মক পরিচয় পত্রের উপর অধিকতর নির্ভর করা যায়।

বর্তমান বহিঃপরীক্ষার স্থানে বিদ্যালয়ের দেওয়া School leaving Certificate কে 'স্কুল শিক্ষা' শেষের চূড়ান্ত অভিজ্ঞান বলে গ্রহণ করবার দাবী উঠেছে। বিভিন্ন স্কুলের পবীক্ষার মধ্যে যে মনের তারতম্য তার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হলে সর্বাত্মক পরিচয়পত্রের মাধ্যমেই সম্ভব।

এই পরিচয়পত্রে সাধারণ লেখাপড়ায় শিক্ষার্থী কিরূপ যোগ্যতার পরিচয় দিল শুধু তাই থাকবেন। তাতে শিক্ষার্থীর জীবনের বিভিন্নদিকের সামগ্রিক পরিচয় লিপিবদ্ধ থাকবে। বহুমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার পর শিক্ষার্থীকে সামগ্রিক ভাবে জানা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কোন ছেলে কি জাতীয় শিক্ষার বা বৃত্তির উপযোগী তা নির্দেশ করতে হলে ছেলেদের ক্ষমতা আগে জানতে হবে। শিক্ষার্থীর আগ্রহ, প্রবণতা, দক্ষতা, প্রভৃতি বিষয়ক পরিচয় থাকার ফলে সে কোন শিক্ষা নিলে জীবনে সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে সে সম্পর্কে পথ নির্দেশ করা সম্ভব হবে।

শিক্ষার্থীর সাধারণ পাঠে অবনতি ঘটলে তার কারণ অনুসন্ধান করে ও দূর করা সহজ হবে। যদি দেখা যায় সে ক্লাসের পড়ায় পিছিয়ে যাচ্ছে তখন

দেখতে হবে অন্যদিকে সে কিরূপ যোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছে। যদি সর্বাত্মক পরিচয়-পত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় অন্য সব দিক থেকেই তার দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে যোগ্যতা থাকলেও সে তা পড়ার দিকে কাজে লাগাচ্ছে না। তখন যাতে সে পড়ায় মনোযোগী হয় সেদিকে সচেষ্ট হতে হবে।

ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় খবর এতে লিপিবদ্ধ থাকায় কোন ছেলের যদি স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখা না যায় বা অবনতি পরিলক্ষিত হয় তাহলে স্কুলের পক্ষ থেকে যা করণীয় সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে বা অভিভাবককে জানান হবে যাতে তিনি যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন।

সর্বাত্মক পরিচয়-পত্রকে যেন উন্নত ধরণের প্রগতি-পত্র বলে মনে করা না হয়। ছেলেমেয়ের পড়াশুনার উন্নতি অবনতির খবর পিতামাতাকে জানান হ' ত্যাদের পড়ায় উৎসাহিত করা বা শিক্ষার্থীদের উপর বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ কঠোরতর করা এর কোনটাই সর্বাত্মক পরিচয়-পত্রের উদ্দেশ্য নয়। শিক্ষক যে ছেলেটিকে নানাভাবে, নানাদিক থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন তাকে জীবনে চলার পথে যাতে সাহায্য করতে পারেন, সঠিক পথ বেছে নেবার নির্দেশ দিতে পারেন সেইজন্যই ছাত্রের সর্বাঙ্গীন পরিচয়জ্ঞাপক এই লিপির প্রয়োজন।

ক্রমবিকাশশীল শিশুজীবনের সাথে পরিচয় রাখতে হলে বছরের পর বছর শিশুর বিকাশের স্তরগুলি এতে লিপিবদ্ধ থ'কায় শিশুর মধ্যে কোন অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখা দিলে তার সম্পর্কে কি করা উচিত সে কর্তব্য নির্দ্ধারণেও এই মন্তব্য-লিপি থেকে সাহায্য পাওয়া যায়।

বিদ্যালয়ে একশ্রেণী থেকে উর্দ্ধতম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার পর নতুন শ্রেণী-শিক্ষক এই পরিচয়-লিপি থেকে তাকে চিনে নিয়ে তাঁর কাজ সুরু করতে পারেন।

সর্বাত্মক পরিচয় পত্রের বিষয়বস্তু :—সর্বাত্মক পরিচয়-পত্রে শুধুমাত্র কয়েকটি পরীক্ষার ফলাফল লিপিবদ্ধ থাকবে না। ছেলেমেয়েদের সর্ববিধ পরিচয় যাতে জানা যাবে সেইভাবে এই পরিচয়পত্র রাখা হবে।

ব্যক্তিগত বৈষম্যকে স্বীকার করে নিয়ে যদি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয় তাহলে এই পত্রে সামগ্রিক পরিচয় লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে।

প্রথমেই ছাত্রের নাম, বয়স, জন্ম তারিখ, বিদ্যালয়ের ভর্তি হবার তারিখ, শ্রেণী ইত্যাদি থাকবে। এরপর পারিবারিক পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হবে।

অভিভাবকের পরিচয়—তাঁর আর্থিক অবস্থা শিক্ষা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ ইত্যাদি বিশদভাবে লেখা থাকবে।

স্বাস্থ্যের পরিচয় :—উচ্চতা, শরীরের ওজন, কোন অসুখে ভুগছে কিনা, দেহগত কোন ত্রুটি আছে কিনা, বছরের পর বছর এগুলি লিপিবদ্ধ করে দৈহিক বিকাশ ও সাধারণ স্বাস্থ্যের খবর রাখা হবে।

বুদ্ধির পরিচয় :—বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ কতটা হয়েছে, আদর্শীকৃত পরিমাপের (Standardised Test) সাহায্যে তার পরিমাপ করতে হবে ও বুদ্ধ্যাঙ্ক (I. Q) স্থির করতে হবে।

স্বভাব, উপস্থিতি, দায়িত্ববোধ প্রভৃতি সম্পর্কে সংবাদ লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে।

পাঠোন্নতির বিবরণ :—বিভিন্ন পরীক্ষায় শিক্ষার্থী কি নম্বর পেয়েছে এই অংশে তা লিপিবদ্ধ থাকবে, প্রচলিত প্রগতি-পত্রে যে সব বিষয় লিপিবদ্ধ থাকে এই অংশে তার উল্লেখ থাকবে।

পাঠবহির্ভূত কার্যক্রম :—শিক্ষার্থী সাধারণ পাঠ্য বিষয়ের বাইরে বিভিন্ন কার্যে কিরূপ যোগ্যতার পরিচয় দিল তা থেকে তার যে সব কার্যক্ষমতা, রুচি, প্রবণতার পরিমাপ করবার জন্য নানা রূপ তথ্য সংগ্রহ করে রাখতে হবে।

অভিনয়, সঙ্গীত :—চিত্রকলা, চারুশিল্প প্রভৃতি বিষয়ে আগ্রহ, হাতে কলমে কাজ করবার দক্ষতা কতটা অর্জন করেছে সে সব লিপিবদ্ধ থাকবে।

সামাজিক ক্রিয়াকর্মে অংশ গ্রহণ করে কিনা, খেলাধূলায় ও স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্পর্কে উৎসাহ ও কর্মক্ষমতার পরিচয়, নেতৃত্ব, আত্মবিশ্বাস, সংগঠন ক্ষমতা প্রভৃতি জানতে হবে।

শ্রেণী-শিক্ষক অন্যান্য শিক্ষক থেকে খোঁজ নিয়ে ও আলোচনা করে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করবেন।

বিভিন্ন বিষয় উন্নতি অবনতির পরিমাপ গণিতের সংখ্যা দিয়ে স্থির না করে Five Piont Scale দিয়ে ঠিক করা অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়। A. B. C. D. E এই পাঁচটি প্রতীকের সাহায্য গুণাগুণ বিচার ও একটি ছাত্রের থেকে অপর ছাত্রের মানের পার্থক্য বোঝান যেতে পারে। A—খুব ভাল, B—ভাল, C—সাধারণ, D—খারাপ, E—খুব খারাপ এইভাবে ছাত্রদের মান নির্ণয় করা হবে।

প্রচলিত ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষাব্যবস্থাকে দোষমুক্ত করতে হলে সর্বাত্মক পরিচয় পত্রের ব্যাপক প্রচলন প্রয়োজন। এই পরিচয় পত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করলেই এর মূল্য স্বীকৃত হবে। বার্ষিক পরীক্ষা শেষে দায়সারা ভাবে average-য়ে যে রকম টিক মারা হচ্ছে তাই যদি চলতে থাকে তাহলে সর্বাত্মক পরিচয়-পত্র রাখবার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হবে। এই সম্ভাবনাপূর্ণ পরিচয় পত্রিকার সঠিক ব্যবহারে শিক্ষকদের উপর অভিভাবকদের নির্ভরতা বৃদ্ধি পাবে। তাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে কর্তব্য নির্দ্ধারণে শিক্ষকদের সহযোগিতা ও পরামর্শ গ্রহণ করবেন। ছাত্রদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করবার প্রয়োজনীয়তায় শিক্ষক অভিভাবকদের মধ্যে সহযোগিতা মূলক মনোভাবের সৃষ্টি হবে। শিক্ষা যদি হয় শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি তাহলে তার মূল্যায়ণ সাধারণ প্রচলিত পরীক্ষার মাধ্যমে সম্ভব নয়। শিক্ষার্থী সামগ্রিক ভাবে ধীরে ধীরে কিভাবে উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে তার পরিমাপ সর্বাত্মক পরিচয়-পত্রের মাধ্যমেই রাখা সম্ভব।

(সর্বাত্মক পরিচয় পত্র পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

গোপনীয়/প্রবর্ত্তনের তারিখ········· নিম্ন/উচ্চ বিদ্যালয়

শ্রেণী

সর্ব্বাত্মক বিবরণ পত্র

সাধারণ বিবরণ

ছাত্রের নাম (আগে পদবী) ············ছাত্র/ছাত্রী ···········.........

জন্ম তারিখ ———————————————

পিতা/অভিভাবকের নাম··

ঠিকানা··

বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা··

··

ভর্ত্তি বহির নম্বর························· তারিখ·······························

বিদ্যালয় পরিবর্ত্তন··

··

ভর্ত্তি বহির নম্বর···································তারিখ···························

———

(প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বৎসরের শেষে একবার মাত্র বিবরণের উল্লেখ করিতে হইবে)

১। স্বাস্থ্যের বিবরণ (Health Record)

বৎসর	সাধারণ স্বাস্থ্যের মান			শারীরিক বিকৃতি	গুরুতর অসুস্থতা	বিশেষ মন্তব্য
	ভাল	সাধারণ	খারাপ			
১ ৬···						
১৯৬···						
১৯৬···						

২। দায়িত্বশীল পদ ও পুরস্কার প্রভৃতি

Position of responsibility held in school and awards etc. obtained

১৯৬...	
১৯৬....	
১৯৬....	

৩। আগ্রহ (Interest)

বিভিন্ন শ্রেণী	১৯৬....			১৯৬....			১৯৬....		
	উল্লেখযোগ্য	সাধারণ	মন্দ	উল্লেখযোগ্য	সাধারণ	মন্দ	উল্লেখযোগ্য	সাধারণ	মন্দ
(ক) ভাষাগত									
খ) বিজ্ঞান সম্পর্কিত									
গ) যান্ত্রিক									
ঘ) শিল্পকলা সম্পর্কিত									
ঙ) সঙ্গীত সম্বন্ধীয়									
চ) কৃষি সম্বন্ধীয়									
ছ) বাণিজ্যিক									
জ) গৃহকার্য এবং ব্যবস্থাপনা									

৪। বিদ্যালয়ে কৃতিত্ব (School Achievement)

বিভাগ	বিষয় সমূহ	১৯৬....			১৯৬....			১৯৬....	
		সাপ্তাহিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের শতকরা গড়	স্থান	মন্তব্য	সাপ্তাহিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের গড় হিসাব	স্থান	মন্তব্য	সাপ্তাহিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের শতকরা গড়	স্থান
ভাষা সাহিত্য									
অঙ্ক									
সমাজ বিদ্যা									
বিজ্ঞান									
কলা									
কারুশিল্প									
সঙ্গীত									
শরীর বিদ্যা									
কার্যকারী									
অন্যান্য বিষয়									

৫। সহ-কার্যসূচীর কর্মাঙ্গ (Co-Curricular Activities)

বিভাগ	১৯৬...			১৯৬			১৯৬...		
	সাধারণের উপরে	সাধারণ	সাধারণের নীচে	সাধারণের উপরে	সাধারণ	সাধারণের নীচে	সাধারণের উপরের	সাধারণ	সাধারণের নীচে
(ক) খেলাধুলা									
(খ) বুদ্ধিগত ও সাহিত্য সম্পর্কিত									
(গ) প্রমোদজনক									
(ঘ) সমাজসেবা									
(ঙ) অন্যান্য (এন্, সি. সি, স্কাউট ইত্যাদি									

৬। ব্যক্তিত্ব (Personality)

বৃত্তি	১৯৬...			১৯৩...			১৯৬....		
	গড়ের উর্দ্ধে	সাধরণ	গড়ের নীচে	গড়ের উর্দ্ধে	সাধারণ	গড়ের নীচে	গড়ের উর্দ্ধে	সাধরণ	গড়ের নীচে
(ক) উদ্যোগ									
(খ) শ্রমশীলতা									
(গ) দায়িত্ব									
(ঘ) সহযোগিতা									
(ঙ) আবেগগত সাম্য									
(চ) আত্মবিশ্বাস									
(ছ) কাজে স্বভাব									

৭। অন্যান্য বিবরণ (Other Information)

১। যদি আচরণগত সমস্যা থাকে, তবে তাহা উল্লেখ করুন :

(১৯৬....)..

(১৯৬...)..

(১৯৬...)..

২। যদি ছাত্রের উল্লেখযোগ্য কোনও ক্ষমতা বা অক্ষমতা থাকে তাহার উল্লেখ করুন :

Year	Skill	Disability.
১৯৬....		
১৯৬ ..		
১৯৬....		

৩। ছাত্রের কোন্ বিভাগে সুপারিশ করেন : সাধারণ/বৈজ্ঞানিক /যান্ত্রিক

৪। আপনার মনোনয়নের কারণ নির্দ্দেশ করুন ... .
... ...

৫। কোন্ ধরণের বৃত্তি ছাত্রের পক্ষে উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করেন...
....

৬। সংক্ষেপে এই মনোনয়নের কারণ নির্দ্দেশ করুন... ....
....

৭। ছাত্রের প্রতি নির্দ্দেশ দানের জন্য যে তথ্য প্রয়োজন মনে করেন...

১৯৬.... ১৯৬ . ১৯৬...

প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর স্বাক্ষর

শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ

বিদ্যালয় সংগঠন

SCHOOL ORGANISATION

প্রথম অধ্যায়

বিদ্যালয়গৃহ খেলারমাঠ, আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জাম

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পর্বের সুরু যেদিন থেকে সমাজে হয়েছিল সেদিন থেকেই শিক্ষার্থীর জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় গুরু বা শিক্ষকের কাছে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবার ব্যবস্থা হয়। প্রাচীন ভারতে বিদ্যার্থীকে তপোবনে গুরুগৃহে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে হত। শিক্ষায় পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই বোধ হয় প্রাচীন ভারতের আচার্যকুল নগরের কলকোলাহলের বাইরে শান্ত নির্জন পরিবেশে শিক্ষার আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু মুক্ত পরিবেশে শিক্ষা দীর্ঘ দিন স্থায়ী হয়নি। জীবনের জটিলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে শিক্ষা ব্যবস্থারও পরিবর্তন সুরু হয়। বৌদ্ধযুগে আমরা প্রথম আধুনিক অর্থে সংগঠিত বিদ্যালয় দেখতে পাই। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় বিহার বা মঠকে আশ্রয় করে বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ গড়ে উঠেছে। সে যুগের ধর্মাশ্রয়ী শিক্ষা মন্দির, মঠ, বিহার, মসজিদ, গির্জাকে কেন্দ্র করেই শিক্ষা গড়ে উঠেছে। ভারতে মসজিদ সংলগ্ন মক্তব আর চণ্ডীমণ্ডপে প্রাথমিক বিদ্যালয় আজও দেখতে পাওয়া যায়। শুধুমাত্র শিক্ষার জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানরূপে বিদ্যালয়ের নিজস্ব গৃহ, সাজসরঞ্জাম ও আসবাব পত্রের ব্যবস্থা আধুনিক যুগের শিক্ষার অঙ্গরূপেই দেখা দিয়াছে।

মানুষের জীবনে পরিবেশের প্রভাব অত্যন্ত গভীর ও সুদূর প্রসারী। বিদ্যালয়ে মানুষের জীবনের একটি বিশেষ সময় অতিবাহিত হয়—সে সময়টি হচ্ছে মানবজীবন গড়ে ওঠবার সময়। দীর্ঘদিন শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে যেতে হয়। শিক্ষার্থীর অজ্ঞাতসারেই তার দেহ ও মন বিদ্যালয় পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত

হয়। তাই শিক্ষার জন্য আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারলে আমাদের শিক্ষা প্রচেষ্টা সর্বাঙ্গসুন্দর হবে না। বিদ্যালয়ে আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টির সময় আমাদের মনে রাখতে হবে বিদ্যালয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে ছেলেরা পড়তে আসবে। বিভিন্ন পরিবারের পরিবেশ বিভিন্ন রূপ। আর্থিক ও শিক্ষাগত পার্থক্যের জন্য পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদায় অসমান পরিবার সমূহের ছেলেদের জন্য গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় একই রূপ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা থাকবে। বিদ্যালয়ে এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি করতে হবে যার প্রভাবে সবার মধ্যে যেন একই রূপ দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে ও পারিবারিক আবহাওয়ার বাইরে সর্ববিধ কলুষতামুক্ত স্কুলের পবিত্র পরিবেশে সবাই যেন শিক্ষার মধ্য দিয়ে নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের সমান সুযোগ পায়। বিদ্যালয় সমাজের আদর্শ রূপ কল্পনায় একজন শিক্ষাবিদ বলেছেন—"Balanced purified society." বিদ্যালয়ের পরিবেশের মধ্যে এলে মানুষে মানুষে আমরা কৃত্রিম ভেদ সৃষ্টি করেছি সেকথা যেন শিক্ষার্থীর মন থেকে নিঃশেষে মুছে যায়। চিন্তায়, বাক্যে কর্মে একটা ঐক্য বোধ সৃষ্টি হবার পরিবেশ হবে বিদ্যালয়ের পরিবেশ। বিদ্যালয় হচ্ছে সমাজের প্রতিচ্ছবি। বিদ্যালয় সমাজের পরিবেশ হবে আদর্শ সমাজের অনুরূপ, তবে সমাজের কলুষতা যেন সেখানে থাকে না। বিদ্যালয় সমাজের শান্ত পবিত্র পরিবেশের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিশুর জীবনযাত্রা সুরু হবে।

প্রাচীন যুগে মুক্তাঙ্গনে শিক্ষার ব্যবস্থা প্রশস্ত ছিল। বর্তমান যুগে উন্মুক্ত স্থানে, গাছের ছায়ায় শিক্ষার সম্পূর্ণ আয়োজন করা সম্ভব নয়। জীবনের ও সমাজের জটিলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে শিক্ষা-ব্যবস্থাও জটিল হয়ে উঠেছে। শিক্ষার আজ বহু দিক—নানাবিধ শিক্ষার সুষ্ঠু আয়োজন করতে হলে প্রয়োজন বহুবিধ সাজসরঞ্জাম, গবেষণাগার, পাঠাগার, বিষয়কক্ষ প্রভৃতির। তাই আর মুক্তাঙ্গনে শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার প্রসারের সাথে সহরে সহরে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপিত হয়েছে—সেখানে গাছের ছায়া, উন্মুক্ত প্রান্তর কিছুই নেই। এছাড়া গ্রাম্য পরিবেশেও বাইরে স্কুল করার পথে ঝড়জলের অসুবিধা রয়েছে। স্থায়ীভাবে মুক্তাঙ্গনে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। শান্তিনিকেতন ও হারদ্বার গুরুকুলের কথা বলা হয়ে থাকে। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে শান্তিনিকেতনে গাছের নীচে পড়াতে দেখেছি—বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের

যে রকম বাড় বাড়ান্ত আর চারদিকে যেভাবে বড় বড় দালান উঠেছে তার ফলে পূর্ব ব্যবস্থা চালু রাখা সম্ভব হচ্ছে বলে মনে হয় না।

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যালয়ের জন্য নিজস্ব ঘর অত্যাবশ্যক। বিদ্যালয়গৃহে শিক্ষার্থীর জীবনের অনেকখানি সময় অতিবাহিত হবে। বিদ্যালয়ে ছেলেরা ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠবে। অপরিহার্যরূপে বিদ্যালয় পরিবেশের ছাপ ছেলেদের মনে গাঁথা হয়ে রইবে। যে স্থানকে বা যে গৃহকে আমরা শিক্ষার পবিত্র আবাস বলে মনে করি সেই পবিত্র শিক্ষা নিকেতন কিরূপ হওয়া উচিত, কোন পরিবেশে একটি আদর্শ বিদ্যালয় গড়ে উঠতে পারে সে বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক হয়ে, সবদিক বিবেচনা করেই আমাদের বিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচন করতে হবে। কোন রকমে একখানা বাড়ী যোগাড় করে স্কুলের সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিলে আজকাল ছাত্র যোগাড় করতে অসুবিধা নেই। যেখানে স্কুলের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হয় না সেই পরিবেশে স্কুল খুললে তার প্রভাব ছেলেদের পক্ষে কখনও শুভ হবে না।

বিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচন :—

বিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচনে শিক্ষকদের কোন হাত নেই, যারা বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হন তারাই বিদ্যালয়ের জন্য স্থান নির্বাচন করেন। বিদ্যালয়ের জন্য স্থান নির্বাচনকালে প্রথমেই দেখতে হবে স্থানটি খোলা ও আলো হাওয়া যুক্ত কিনা। বড় সহরে খোলা জায়গায় স্কুলের জন্য স্থান সংগ্রহ করা খুব সহজ নয়। ছোট সহরে একটু দূরে আলো-বাতাস যুক্ত খোলা জায়গা পাওয়া যায়। গ্রামের স্কুলের স্থান নির্বাচনকালে দেখতে হবে স্কুল যেন এমন জায়গায় হয় যে দু'তিন গ্রামের ছেলেরা সেখানে সহজেই আসতে পারে। শুধু বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের উপযুক্ত জায়গা থাকলেই হবে না। বিদ্যালয়ের সামনে উন্মুক্ত প্রাঙ্গন, বোর্ডিং-এর জন্য জায়গা, খেলার মাঠ প্রভৃতির জন্য ও স্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। সহরের বাইরে বা গ্রামের প্রান্তেই অল্পমূল্যে বিস্তীর্ণ স্থান সংগ্রহ করা যায়। বেশ কিছু জায়গা পাওয়া গেলে দোতলা বা তেতলা বাড়ী বানাতে হবে না। উঁচু দালানের সিঁড়ি দিয়ে বার বার ওঠা নামা করা শিশু শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। জনাকীর্ণ সহরের দূষিত আবহাওয়ার বাইরে স্কুল হলে স্বাস্থ্যের দিক থেকেও হিতকর। ছেলেরা যদি বাড়ী থেকে একটু হেঁটে স্কুলে যায় তাহলে স্বাস্থ্যের দিক থেকে ভালই হবে। মেয়েদের স্কুল যেন সহরে প্রান্তে বা গ্রামের বাইরে না হয়।

স্কুলের জমিতে ছায়াবান বৃক্ষ থাকলে ভাল হয়। যদি কোন গাছ না

থাকে গাছ লাগিয়ে, বাগান করে একটা সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি করতে হবে। ছেলেদের মনের দিক থেকে শান্ত, স্নিগ্ধ মনোরম পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে। গাছ লাগিয়ে ছায়া-ঘেরা একটা পরিবেশের সৃষ্টি করতে পারলে বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য গাছের ছায়ায় দু একটি ক্লাস নিলে ছেলেদের ভালই লাগবে।

স্কুলের জন্য যে জমি নির্বাচিত হবে তা যেন নীচু বা স্যাত স্যাতে না হয় বা কোন জলা ভূমির পাশে না হয়। উঁচু, শুকনো জমিই স্কুলের পক্ষে উপযোগী। স্কুল ঠিক রাস্তার পাশে হওয়া ঠিক নয়, তাহলে গাড়ীর যাতায়াতের শব্দে স্কুলের শান্তি ভঙ্গ ও ছেলেদের মন বিক্ষিপ্ত হবে। ধূলার উপদ্রব স্বাস্থ্যের ক্ষতি করবে। আবার রাস্তার থেকে খুব দূরে হলে যাতায়াতের পক্ষে অসুবিধা হবে। স্কুলের স্থান নির্বাচনে দেখতে হবে কলকারখানা, বস্তি বা সিনেমাঘর যেন স্কুলের কাছে না থাকে। স্কুলের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষার পক্ষে এ সব স্থান অনুকূল নয়।

বিদ্যালয় গৃহ : সুপরিকল্পিতভাবে বিদ্যালয় গৃহটি নির্মিত হবে। বর্তমান প্রয়োজন, ভবিষ্যৎ উন্নতি ও প্রসারের সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি রেখে বিদ্যালয় গৃহের পরিকল্পনা করতে হবে। বিদ্যালয় গৃহ জাঁকজমকপূর্ণ হবে না কিন্তু শ্রী সম্পন্ন হবে। সাধারণ ভাবে তৈরী হলেও তার একটা নিজস্ব অভিজাত্য থাকবে। শিক্ষার উচ্চাদর্শের কথা বিদ্যালয় গৃহের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গঠনের মধ্য দিয়েই ফুটে উঠবে। ছাত্র জীবনে বিদ্যালয় গৃহের প্রভাব সম্পর্কে M. S. Mohiyuddin and M. Siddalingaiya বলেছেন— "A simple dignified and artistic building, suggestive of the purpose for which it is intended is a very desirable thing from many points of view. It's beauty and association help to make the scholars proud of their connection with the school, and they exercise a lasting influence upon the neighbourhood. In a certain measure it is a concrete manifestation of the ideals for which the school stands. It is a permanent material expression of spiritual thing. ("School Organisation and Management).

বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনা স্বাস্থ্যবিধি মেনে করতে হবে। বিদ্যালয় গৃহে যেন প্রচুর আলো বাতাস ঢুকবার ব্যবস্থা রাখা হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ

ভাবে আলো প্রবেশ করলে তা চোখের পক্ষে ক্ষতিকর, তাই আলো যেন ঘরের ছাদে প্রতিহত হয়ে প্রবেশ করে সে ব্যবস্থা রাখতে হবে। আমাদের দেশে স্কুল ঘর দক্ষিণমুখী হলে ভাল হয়, তাহলে গরমের দিনে দক্ষিণ দিক থেকে হাওয়া আসার সুবিধা হয়।

বিদ্যালয় গৃহ কত বড় হবে তা স্কুলের ছাত্র সংখ্যা অনুপাতে ও অন্যান্য প্রয়োজন বিচার করে স্থির করা হবে। যে কোন পরিকল্পনায় যেন ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের সুযোগ রাখা হয়। বিদ্যালয়ের জন্য H L. E. T অথবা U টাইপ বাড়ী প্রশস্ত। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজেদের সুবিধা ও পছন্দ মত এর মধ্য থেকে বেছে নিয়ে যে কোন টাইপের বাড়ী করবেন। বিদ্যালয় গৃহ সম্ভব হলে একতলা হওয়াই সঙ্গত। দোতলা বা তেতলা বাড়ীতে বার বার ওঠানামা করা ছেলেদের স্বাস্থ্যের দিক থেকে ভাল নয়। আজকাল সহরে স্থানাভাবের জন্য দোতলা কি তেতলা স্কুল গৃহ তৈরী হচ্ছে। কলকাতায় চারতলা স্কুলগৃহও দেখা যায়। তবে কলকাতায় যা হচ্ছে তা নিয়মের ব্যতিক্রম। কলকাতায় এমন স্কুল বাড়ীও আছে যেখানে দিনের বেলায় আলো জ্বলিয়ে কাজ করতে হয়। পৌরসভার নিয়ন্ত্রণাধীন প্রাথমিক বিদ্যালয় এমন সমস্ত বাড়ীতে হয় যা সব দিক থেকে বিপজ্জনক। এদিয়ে সাধারণ স্কুল গৃহ কিরূপ হওয়া উচিত তার বিচার করা হবে না। বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণকালে প্রয়োজনীয় শ্রেণী কক্ষের ব্যবস্থা ছাড়াও লাইব্রেরী, কমন-রুম, পরীক্ষণাগার, বিভিন্ন বিষয়কক্ষ, প্রধান শিক্ষকের কক্ষ, শিক্ষকদের বিশ্রাম কক্ষ, অফিস, সাধারণ সম্মেলন বা সভাকক্ষের ব্যবস্থা থাকবে। যদি সম্ভব হয় অভিভাবক যারা বাইরের থেকে স্কুলে কোন কাজে প্রধান বা অন্যান্য শিক্ষকের সাথে দেখা করতে আসবেন তাদের বসবার জন্য ঘর রাখা হবে। স্কুলের আসবাবপত্র ও অন্যান্য জিনিষপত্র রাখবার জন্য একটি গুদাম ঘর থাকবে।

ছেলের সংখ্যা অনুপাতে পায়খানা ও প্রস্রাব ঘরের ব্যবস্থা রাখতে হবে। জল নিষ্কাশনের জন্য উপযুক্ত পয়ঃ প্রণালীর ব্যবস্থা থাকবে।

স্কুলে ছেলেদের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

শ্রেণীকক্ষ ঃ—শ্রেণী কক্ষের আয়তন কত বড় হবে তা প্রতি শ্রেণীতে কতজন শিক্ষার্থী হবে তা দিয়ে স্থির করতে হবে। ছোট একখানা ঘরে ৪০/৫০ জন ছেলে পুরে দিলে সে শুধু স্বাস্থের পক্ষেই ক্ষতিকর হবে না, সেখানে চলা-ফেরার জায়গা থাকবে না, গণ্ডগোল হবে পড়াশুনা হবে না। শ্রেণীকক্ষে

ছাত্র পিছু কতটা জায়গা থাকবে মুদালিয়র কমিশন তা স্থির করে দিয়েছেন। কমিশন প্রতি ছাত্রের জন্য দশ বর্গফুট জায়গা রাখবার কথা বলেছেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় আরো বেশীস্থানের ব্যবস্থা রাখা হয়। ইংলণ্ডে ছাত্র পিছু ১৪ বর্গফুট স্থান রাখতে হয়। আমাদের স্কুলগুলিতে এক একটি শ্রেণীতে ৪০টি, কি তার বেশী ছেলেকে এক সাথে পড়ান হয়। মুদালিয়র কমিশন বলেছেন কোন শ্রেণীতে ৩০জন খুব বেশী হলে ৪০জনের বেশী ছেলে কোন অবস্থায় নেওয়া হবে না। মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ বা মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদের নির্দেশ অনুযায়ী প্রতি শ্রেণীতে বা শ্রেণীর বিভাগে (Section) ছাত্রসংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখা বাস্তবে প্রায়ই সম্ভব হয় না। তাই শ্রেণী কক্ষগুলি ৪০।৪৫ জন ছেলে একসাথে বসে পড়তে পারে এমন ব্যবস্থা থাকা দরকার। একটি শ্রেণীতে ৪০।৪৫টি ছেলে থাকবে এ মোটেই আদর্শ ব্যবস্থা নয়—বাস্তবে যা ঘটছে তাই বলা হল মাত্র। একটী শ্রেণীতে নীচের দিকে যেখানে প্রতিটি ছেলের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে সেখানে ২০।২৫ জন ও একটু উঁচু শ্রেণীতে ৩০।৩৫ জনের বেশী ছাত্র কখনও থাকা উচিত নয়—খুব বেশী হলে ৪০ পর্যন্ত ছাত্র উঁচু শ্রেণীতে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু স্থানীয় অবস্থা বিচার করে কখনও চাপে পড়ে প্রধান শিক্ষক এর চেয়ে বেশী ছাত্র নিতে বাধ্য হন কিন্তু স্কুলের আর্থিক অসুবিধার জন্য বিভাগ খুলতে পারেন না।

শ্রেণীকক্ষসমূহ বর্গাকার Square না হয়ে rectangular আয়তক্ষেত্রাকার হওয়া উচিত। শ্রেণীকক্ষ খুব লম্বা হলে শিক্ষকদের অযথা চিৎকার করতে হবে। পিছনের ছেলেদের বোর্ডের লেখা দেখতে অসুবিধা হবে। তবে সাধারণভাবে শ্রেণীকক্ষের আয়তন ১৮´×২৪´ ফুটের কম হওয়া উচিত নয়। কিছু ছোট কক্ষেরও ব্যবস্থা থাকতে পারে। ঘরগুলি ১৬।১৭ ফুট উঁচু হবে এবং ছাদের কাছে প্রচুর পরিমাণ ভেন্টিলেটারের ব্যবস্থা থাকবে। প্রত্যেক ঘরে একটির বেশী দরজা থাকবে না—এতে ছেলেরা শিক্ষকের অজানিতভাবে বাইরে যেতে পারবে না। ঘরগুলি এমনভাবে তৈরী হবে যাতে শ্রেণীর মধ্য দিয়ে আরেকটি শ্রেণীতে যেতে না হয়। শ্রেণীকক্ষগুলি যদি পরিমাণ মত বড় না হয় তাহলে বেঞ্চ, ডেস্ক, চেয়ার, টেবিল বোর্ড সব মিলিয়ে একটা গুদাম ঘরের অবস্থা হবে। ছেলেদের চলতে ফিরতে অসুবিধা হবে, শিক্ষক যদি শ্রেণীকক্ষে চলাফেরা করতে না পারেন তা হলে অসুবিধার সৃষ্টি হয়, সর্বোপরি পরিমিত ঘর আর প্রচুর আলো হাওয়ার ব্যবস্থা না থাকলে ছাত্রদের স্বাস্থ্যহানির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

ঘরে প্রচুর মুক্ত সূর্যালোক আসবার ব্যবস্থা থাকবে। আবছা আলোর মাঝে

পড়লে ছেলেদের চোখের পক্ষে ক্ষতিকর। তার চেয়ে বড় কথা প্রায় অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঢুকলেই ছেলেদের মনে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। আলো হাওয়া যুক্ত ঘরে মনে যেমন একটা প্রফুল্লভাবের সৃষ্টি হয়, তেমনি প্রায় অন্ধকার ঘরে মনটা দমে যায়। শ্রেণী কক্ষে কতটা আলো থাকবে তার পরীক্ষা হচ্ছে ঘরের যে কোন জায়গায় বসে একটি ছেলে এক ফুট দূরে রেখে সাধারণ ছাপা বিনা কষ্টে পড়তে পারবে

প্রত্যেকটি কক্ষে প্রচুর জানলার ব্যবস্থা থাকবে। ঘরের মেঝের যে ক্ষেত্রফল তার ⅛ বা ⅙ অংশ হবে জানলার ক্ষেত্রফল। জানলা মেঝে থেকে ৩½´ বা ৪ ফুট উঁচুতে বসান হবে। এতে ছেলেদের দৃষ্টি বাইরের দিকে আকৃষ্ট হবার সুযোগ থাকবে না। আলো কোন দিক থেকে আসে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। পেছন দিক থেকে আলো আসলে সামনে যে বই বা খাতা থাকবে তার উপর ছায়া পড়বে ফলে কাজের অসুবিধা হবে। সামনের দিক থেকে আলো আসলে চোখ ঝলসে যাবে। ডান দিক থেকে আলো আসলে চলতে পারে তবু কিছু ছায়া পড়বে। তাই সব চেয়ে ভাল হয় যাতে বাঁ দিক থেকে আলো আসতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে।

আলোর সাথে হাওয়ার কথাও ভাবতে হবে। বদ্ধ ঘরে ৩০।৪০ জন ছেলেকে নিয়ে ক্লাস করলে ছেলেদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। শ্রেণীকক্ষে আবদ্ধ অবস্থায় ছেলেরা সহজেই অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে তারপর যদি বাতাস আসবার ব্যবস্থা না থাকে তবে অতি সহজেই তাদের মধ্যে অবসাদ দেখা দেবে। ঘর বড় হলেই হবে না যাতে ঘরে বিশুদ্ধ বাতাস আসতে পারে ও দূষিত বাতাস বের করে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। বদ্ধঘরের গুমোট আব-হাওয়ার সৃষ্টি হলে ছেলেরা পড়ায় মনোযোগী হতে পারে না তাদের মধ্যে উৎসাহের অভাব ও নিস্তেজ ভাব দেখা দেয়। বাতাস সম্পর্কে যে বলা হয়— 'Air is food as truly as bread and meat' একথা খুব সত্য।

শিক্ষক শ্রেণীকক্ষের দরজার সামনে ছেলেদের দিকে মুখ করে বসবেন। তিনি যাতে একটু উঁচুতে বসতে পারেন সেজন্য প্ল্যাটফর্মের ব্যবস্থা থাকলে ভাল হয়। শিক্ষকের সমগ্র ক্লাসের উপর নজর রাখতে হলে বড় ক্লাসে দাঁড়িয়ে পড়ানই সঙ্গত। কিন্তু দেখা গিয়েছে সব সময় দাঁড়িয়ে পড়ান সম্ভব হয় না, তাই উঁচুতে বসবার ব্যবস্থা হলে সব ছেলের উপর সাধারণভাবে নজর রাখা যায়। শিক্ষকের একপাশে দরজার বিপরীত দিকে ব্ল্যাক বোর্ড থাকবে, তাহলে

বোর্ডে যথেষ্ট আলো পড়বে, ছেলেদেরও দেখতে অসুবিধা হবে না। শ্রেণীকক্ষে যাতে মানচিত্র বা কোন চার্ট ঝুলান যায় সে ব্যবস্থা রাখতে হবে।

আসবাবপত্র :—জীবনে প্রথম যেদিন বিদ্যালয়ের সাথে পরিচিত হই সেদিন পাঠশালায় গিয়ে বসবার আসন নিজেকেই বয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল। দিনের পর দিন শ্লেটের উপর ঝুঁকে পড়ে লিখতে হয়েছে, আঁক কষতে হয়েছে। স্কুলের আসবাব পত্র বলতে ছিল গুরু মশায়ের বসবার একখানা জলচৌকি, আর ছেলেদের নিয়ে যাওয়া চাটাই, ছেঁড়া চটের টুকরো ইত্যাদি। শিক্ষা সহায়ক একমাত্র সরঞ্জাম গুরুমশায়ের বেত। ৪০।৫০ বছর আগে এই ছিল পল্লী বাংলার প্রাথমিক বিদ্যালয় বা পাঠশালার অবস্থা। এর অসুবিধা ও কুফল সম্পর্কে আমরা সবাই জানি। শিশুর দৈহিক গঠনের পক্ষে মাদুরের উপর উবুড় হয়ে লেখা অত্যন্ত ক্ষতিকর। এছাড়া অসুবিধারও অন্ত নেই। এখনও বাংলার গ্রামে একটু ঘুরলেই এ চিত্রের সন্ধান মিলবে। এ ব্যবস্থাকে কোনক্রমেই স্বাভাবিক বা শোভন ব্যবস্থা বলে মেনে নেওয়া যায় না। যেখানে ছেলেরা পড়বে সেখানে বসবার জন্য প্রয়োনীয় ও স্বাস্থ্য সম্মত আসবাব পত্রের ব্যবস্থা রাখতে হবে। বসবার আসন এবং লিখবারও বই রাখবার ডেস্ক খুব বিচার বিবেচনা করে করতে হবে। ছেলেরা যেখানে দীর্ঘদিন বসে লেখাপড়া করবে তার সামান্য ত্রুটির জন্য দেহের গুরুতর ক্ষতি হতে পারে। তাই আসন ও ডেস্ক তৈরী করবার সময় বিভিন্ন শ্রেণীর ছেলেদের বয়স ও দৈর্ঘ্য বিচার করে কাজ করতে হবে।

প্রথমেই খেয়াল রাখতে হবে আসন বা ডেস্কের উচ্চতা একরূপ হবে না। পঞ্চম শ্রেণীর ছেলেদের জন্য আসন ও ডেস্ক উপযোগী দশম শ্রেণীর ছেলেদের জন্য সেই উচ্চতার ডেস্ক ও আসন চলবে না। আসন ও ডেস্ক বহুপ্রকার হতে পারে, যেমন একজনের উপযুক্ত আসন ও ডেস্ক, দু জনের উপযুক্ত বসবার আসন ও ডেস্ক, চারজনের উপযুক্ত বসবার আসন ও ডেস্ক। সুবিধার বিচারে একক আসন ও ডেস্ক সবচেয়ে ভাল। বসবার সুবিধা একজনে আরেকজনের অসুবিধা করতে পারেনা। চলাফেরার সুবিধা—সহজেই উঠে যাওয়া যায় ও ফিরে এসে বসা যায়। স্বাস্থ্যের দিক থেকে ভাল একজন আরেক জনেরও ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতে পারে তাই একজনের ছোঁয়াচে রোগ আরেক জনে সংক্রামিত হতে পারে না। একজনের লেখা আরেক জনে দেখতে পারে না। শিক্ষকের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন ছেলেদের কাছে গিয়ে দেখিয়ে দেওয়া সহজ হয়। অসুবিধা হচ্ছে ক্লাসে জায়গা বেশী লাগে আর অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য।

যে দেশের স্কুলগুলিতে একই জায়গায় একই রকম বেঞ্চে বসে আর হাইবেঞ্চ সামনে দিয়ে সকালে প্রাথমিক স্কুল দুপুরে মাধ্যমিক স্কুল কখনও আবার রাতে কলেজ হয় সেই দেশের স্কুলে একক আসনের ব্যবস্থা বাস্তবে সম্ভব নয়। দুজনের উপযুক্ত আসন ও ডেস্ক সম্পর্কেও সেই কথাই প্রযোজ্য। তবে উপযোগীতার দিক থেকে বিচার করলে এ ব্যবস্থাও ভাল। কলকাতার কিছু স্কুলে একক বা দ্বিআসনযুক্ত ডেস্কের ব্যবস্থা আছে। তবে তা হচ্ছে নিয়মের ব্যতিক্রম। আমরা সাধারণভাবে চারজনের উপযোগী বেঞ্চই দেখি। এই আসনগুলি কখনও ডেস্কের সাথে জোড়া হয় কখনও পৃথক থাকে। চারজনের উপযুক্ত ডেস্ক ও বেঞ্চ খরচের দিক থেকে সুবিধাজনক কিন্তু ব্যবহারের দিক থেকে এর অসুবিধা অনেক। তবু বাস্তব অবস্থাকে মেনে নিয়ে একেই যতটা সম্ভব স্বাস্থ্য সম্মতভাবে ব্যবহার যোগ্য করে নিতে হবে।

ছেলেদের বয়সের ও উচ্চতার পার্থক্য অনুসারে আসন ও ডেস্কের উচ্চতার পার্থক্য হওয়া উচিত। বসবার বেঞ্চও এমন হবে না যাতে ছেলেদের পা ঝুলিয়ে বসতে হয়। আসনের উচ্চতা স্থির করবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে—দেখতে হবে ছেলেরা বেঞ্চে বসলে পা ঠিক মাটি স্পর্শ করে। চারজন ছেলে বসবার উপযোগী বেঞ্চগুলি ৬' ফিট দীর্ঘ হবে। প্রতিটি ছেলের জন্য ১৮" ইঞ্চি স্থান ধরে এ হিসাব করা হয়েছে। আমাদের স্কুলগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১২" ইঞ্চির বেশী স্থান দেওয়া সম্ভব হয় না।

বেঞ্চের সামনে লিখবার জন্য ডেস্ক থাকে। ডেস্ক জোড়া বা পৃথক দুরকমই হতে পারে। জোড়া ডেস্ক হলে একটু অসুবিধা হয়। ডেস্ক যদি জোড়া না থাকে তাহলে প্রয়োজন মত ডেস্ক কাছে আনা ও দূরে সরিয়ে নেওয়া যায়। জোড়া ডেস্ক ও বেঞ্চের দূরত্ব সব সময় নির্দিষ্ট থাকবে বলিয়া সুবিধা হয় না। লিখবার সময় বা দাঁড়াতে গেলে বা বসবার সময় আলগা ডেস্কে এই অসুবিধা হয় না কারণ প্রয়োজনমত দূরত্ব কমিয়ে বাড়িয়ে নেওয়া চলে।

বসবার বেঞ্চ যতটা বড় হবে ডেস্ক ততটা বড় হবে। বেঞ্চে যতজন ছেলে বসবে ডেস্কেও ততজন ছেলে ব্যবহার করবে। ডেস্কের উচ্চতা ছাত্রদের বয়সের পার্থক্য অনুসারে বিভিন্নরূপে হবে। এ সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা কঠিন। স্কুলে বিভিন্ন সাইজের ডেস্ক থাকবে ছেলেদের বয়স ও উচ্চতা অনুসারে কোন শ্রেণীতে কি সাইজের ডেস্ক দেওয়া হবে স্কুল কর্তৃপক্ষ তা ঠিক করবেন। একবার ক্লাস সাজিয়ে দিলে ছয় মাসের পর দরকার হলে আবার ক্লাস ঢেলে নতুন করে সাজাতে হবে। কারণ ছোট ছেলেমেয়েরা ছয়মাসের মধ্যেই

মাথায় অনেকটা বেড়ে যায় তাই নীচু ক্লাসে একবার বেঞ্চ ডেস্ক সাজিয়ে একবছর পর্যন্ত একই অবস্থা রাখা ঠিক নয়। ক্লাস সাজাবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে দু সারি বেঞ্চের মধ্যে যেন বেশ ফাঁক থাকে যাতে ছেলেরা ঠিকমত চলতে পারে ও শিক্ষক যে কোন ছেলের কাছে যেতে পারেন। কোন ক্লাসে ছয় সারির বেশী ডেস্ক থাকা উচিত নয়।

ব্ল্যাকবোর্ড :—শিক্ষা সহায়ক উপকরণের মধ্যে ব্ল্যাক বোর্ড একটি অত্যাবশ্যক উপকরণ। আবার ক্লাস সাজাবার সরঞ্জামের মধ্যে ব্ল্যাকবোর্ড অবশ্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম। প্রতি শ্রেণীতে একটি করে ব্ল্যাকবোর্ড থাকবে। ব্ল্যাকবোর্ড নানারকমের হতে পারে। যেসব ব্ল্যাকবোর্ড আমরা সচরাচর দেখি ও ব্যবহার করি তা হচ্ছে—ইজেলে হেলান দেওয়া ব্ল্যাকবোর্ড, ফ্রেমে আঁটা ঘোরাবার উপযোগী বোর্ড, ঝুলান ব্ল্যাকবোর্ড বা প্লাষ্টার বোর্ড ইত্যাদি।

বোর্ডগুলির মধ্যে ইজেলে হেলান দেওয়া বোর্ড ও ফ্রেমে আঁটা বোর্ডই ব্যবহারের দিক থেকে সুবিধাজনক ও বহুল প্রচলিত। ইজেলের উপর রাখা বোর্ডগুলিকে ইচ্ছামত উপরে উঠান ও নীচে নামান যায় ও দু পিঠ ব্যবহারের কোন অসুবিধা নেই। ফ্রেমে আঁটা বোর্ড ইচ্ছামত ওঠান নামান না গেলেও ঘোরান খুবই সোজা তাই দু পিঠ ব্যবহারের কোন অসুবিধা নেই। বোর্ডে দু পিঠ ব্যবহারের সুযোগ না থাকলে অনেক সময় অসুবিধা হয়। ইজেলে হেলান দেওয়া ও ফ্রেমে আঁটা বোর্ড ইচ্ছামত ক্লাসের যেখানে সুবিধা সেখানে রাখা যায়। সব দিক বিচার করে স্কুলে এই দু রকমের বোর্ড ব্যবহারই সঙ্গত।

ঝুলান বোর্ডের কোন ফ্রেম নেই। দেয়ালে পেরেক পুঁতে দড়ি বা তার দিয়ে একে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এগুলি আকারেও খুব বড় হয় না, দু পিঠ ব্যবহারের সুবিধা নেই ও ইচ্ছামত উঁচু নীচু করা যায় না। এ জাতীয় বোর্ডের ব্যবহার ক্রমেই কমে যাচ্ছে।

পাকা দেওয়ালের গায়ে প্লাষ্টার দিয়ে তৈরী বোর্ড কোন কোন স্কুলে দেখা যায়। এগুলি খুব বড় হয়—একসাথে অনেক কথা লেখা যায়। অসুবিধা ইচ্ছামত স্থানান্তরিত করা যায় না ও শিক্ষককে পিছন ফিরে লিখতে হয়, লিখবার সময় ক্লাসের উপর নজর রাখতে পারেন না।

গ্রাফবোর্ড ইজেল বোর্ড ফ্রেমে আঁটা বোর্ডের একপিঠে উপরে নীচে লম্ব ও শয়ান লাইন টেনে এক বর্গ ইঞ্চি মাপের ঘর কাটা হয়। ছেলেদের গ্রাফ শেখাতে, নক্সা, চিত্র প্রভৃতি আঁকতে এই জাতীয় বোর্ডের দরকার হয়।

ব্ল্যাকবোর্ড নামে ব্ল্যাক হলেও কালো ও সবুজ দু রংয়েরই হতে পারে।

বোর্ডে লিখবার জন্য যে চক ব্যবহার করা হয় তার গুড়ো স্বাস্থ্যের দিক থেকে অত্যন্ত ক্ষতিকর। বোর্ড পরিষ্কার করবার জন্য ভিজে কাটা কাপড় ব্যবহার করলে চকের গুড়ো উড়তে পারে না। স্কুলে যে ডাষ্টার ব্যবহার করা হয় তা দিয়ে মোছবার সময় চকের গুড়ো ওড়ে ও কিছুটা গুড়ো নীচের দিকে ঝরে পড়ে। তাই বোর্ড এমনভাবে তৈরী হওয়া উচিত যাতে চকের গুড়ো নীচে গিয়ে আটকে থাকতে পারে দিনের শেষে জমা গুড়ো পরিষ্কার করে ফেলার অসুবিধে নেই।

ক্লাসের কোন জায়গায় বোর্ড রাখলে সব দিক থেকে সুবিধাজনক তা দেখে নিয়ে বোর্ড রাখতে হবে। ঝোলান বোর্ড ও প্লাষ্টার বোর্ড এমনভাবে থাকে যার ফলে শিক্ষককে পিছন ফিরে লিখতে হয় ও ক্লাসের একদিকে থাকলে সব দিক থেকে ছেলেরা বোর্ডের লেখা দেখতে পায় না—এ অসুবিধা বাঞ্ছনীয় নয়। বোর্ড দরজার বিপরীত দিকে একটু কোনাকুনি করে রাখলে আলোর দিক থেকে সুবিধা হয়। দেখতে হবে বোর্ড যেন শিক্ষকের বাঁ দিকে থাকে তাহলে শিক্ষককে উঠে গিয়ে লিখতে ও ক্লাসের দিকে দৃষ্টি রাখতে কোন অসুবিধা হয় না।

বিষয়কক্ষ।—সাধারণভাবে একই শ্রেণীকক্ষে সেই শ্রেণীর নির্দিষ্ট বিষয় পঠনপাঠন চলবে এই ছিল চিরাচরিত প্রথা। ক্রমে শিক্ষার ব্যবস্থা জটিল হয়ে ওঠায়, বিশেষ করে বিজ্ঞান বিষয়সমূহ পাঠক্রমের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করায় সাধারণ শ্রেণী কক্ষে বসে সব বিষয়ের সুচারুরূপে শিক্ষা দেওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে। সাধারণ বিজ্ঞান ও কয়েকটি জ্ঞানমূলক পাঠ (knowledge lesson) দিতে হলে বিভিন্ন রকম শিক্ষাসহায়ক উপকরণ প্রয়োজন। বিজ্ঞান শিক্ষক যা পড়ান তা যদি ক্লাসে পরীক্ষা করে না দেখান তাহলে পড়া সার্থক হয় না। শ্রেণীকক্ষে কোন একটি প্রক্রিয়া দেখাতে হলে বহু উপকরণ বয়ে নিয়ে যেতে হয়। কোন সময় একটি প্রক্রিয়ার জন্য উপকরণ নিয়ে যাবার পরও হয়ত দেখা গেল আর একটি জিনিষের অভাবে ক্লাসের কাজ বন্ধ রেখে ছুটতে হয় আবার সেই জিনিষ আনতে। নিয়ে আসা নিয়ে যাওয়া এতে সময় নষ্ট, ভেঙ্গে যাবার ভয় আবার প্রয়োজনীয় জিনিষ উপস্থিত মত হাতের কাছে না পেলে কাজ করেও সুখ নেই। এছাড়া প্রতিটি বিষয় পড়াবার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিও সার্থক পাঠের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় পড়াবার জন্য বিশেষভাবে সজ্জিত শ্রেণীকক্ষের প্রয়োজন রয়েছে।

কোন একটি বিষয় পড়াবার সময় যদি সে বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনে অনুরাগ সৃষ্টি করতে হয় তাহলে শ্রেণীকক্ষে সেই বিষয় উপযোগী আবহাওয়া

সৃষ্টি করতে হবে। সাধারণ শ্রেণীকক্ষে বসে বিষয় উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। বিষয় বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে হলে এক একটি বিষয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কক্ষ নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। আজকাল ম্যাজিকলণ্ঠন, এপিডায়স্কোপ প্রভৃতি শিক্ষা উপকরণের সাহায্যে ধারাবাহিকভাবে বহু কিছু শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট কক্ষ না থাকলে এসব উপকরণের ব্যবস্থা সম্ভব নয়। শিক্ষার সাফল্যের দিক থেকে যেমন বিভিন্ন বিষয় পড়াবার জন্য বিষয় কক্ষের প্রয়োজন, তেমনি সময়ের দিক থেকে বিচার করলেও বিষয়-কক্ষে পড়াবার সুযোগ থাকলে যথেষ্ট সময় বাঁচে।

ভূগোলকক্ষ বিভিন্ন প্রকার বহু মানচিত্র দ্বারা শোভিত থাকবে, গ্লোব, রিলিফ, বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য, খনিজ দ্রব্যের নমুনা, মডেল, বিভিন্ন উৎপন্ন দ্রব্যের পরিচয় সঙ্কলিত চিত্র, প্রয়োজনীয় বই ও অন্যান্য সাজ সরঞ্জাম থাকবে। বিষয়কক্ষে প্রবেশ করলে ছেলেদের মনে করবে তারা যেন ভিন্ন জগতে এসে গিয়েছে। শিক্ষক পড়াতে এসে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, মানচিত্র গ্লোব, চার্ট যখন যা দরকার তার সাহায্য গ্রহণ করতে পারবেন। যে সমস্ত শিক্ষা সরঞ্জাম ভূগোল পড়াতে শিক্ষকের প্রয়োজন হয় যেমন মানচিত্র, গ্লোব ম্যাজিকল্যানটার্ণ, এপিডায়স্কোপ প্রভৃতি প্রতিদিন ক্লাসে বয়ে নিয়ে যেতে সময় নষ্ট হয়, অযথা খাটুনী হয়। যদি একদিনে দুটি কি তিনটে ক্লাসে (ভূগোল পড়াতে হয় তাহলে বিভিন্ন উপকরণ তিনটী ক্লাসে) নিয়ে যাবার অনেক অসুবিধা কোন জিনিষ ভেঙেও যেতে পারে। একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীকক্ষ থাকলে সে অসুবিধার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

ইতিহাস পাঠের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ বিভিন্ন যুগের ঐতিহাসিক মানচিত্র, সময় রেখা, ঐতিহাসিক চিত্র প্রভৃতি দিয়ে কক্ষটি সাজিয়ে রাখলে ছেলেদের চিত্তাকর্ষক হবে। এছাড়া বিভিন্ন যুগের মুদ্রার নমুনা, বিভিন্ন যুগের স্থাপত্য শিল্পের যেসব মডেল বাজারে পাওয়া যায়, ছেলেদের হাতে আঁকা বা মাটি দিয়ে তৈরী বিভিন্ন যুগের মানুষের ব্যবহৃত নানা জিনিষ কক্ষে রাখা হলে ছেলেদের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হবে। ম্যাজিকল্যানটার্ণের সাহায্যে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক ইতিহাস, আরো বহু কাহিনী দেখাবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ইতিহাস সম্পর্কে ছেলেদের অনুরাগ সৃষ্টি ও ঐতিহাসিক পরিবেশ সৃষ্টি করে পাঠ দিতে হলে ইতিহাস কক্ষের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শাখায় রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়

শিক্ষার জন্য পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষণাগারের দরকার। এ ছাড়া সাধারণ বিজ্ঞান পড়াতে হলেও বিজ্ঞান কক্ষের প্রয়োজন। সাধারণ বিজ্ঞানের পাঠক্রমে বিজ্ঞানের অনেকটি দিক সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান দেবার ব্যবস্থা আছে—তাই এজন্য খুব উচু-দরের পরীক্ষণাগারের দরকার নেই। তবুও বিজ্ঞানের বহু দিক সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানলাভের জন্য যেসব প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম, চিত্র, চার্ট ছোটখাট পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন উপকরণের দরকার ও শ্রেণীকক্ষে নিয়ে দেখান যায় না। বিজ্ঞান পাঠ সুষ্ঠুভাবে দিতে হলে স্কুলে একটি সুসজ্জিত বিজ্ঞান কক্ষের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। সাধারণ বিজ্ঞানে শুধুমাত্র রসায়ন ও পদার্থ বিদ্যাই পড়ান হয় না। এর সাথে উদ্ভিদবিদ্যা, জীববিদ্যা, দেহবিজ্ঞান প্রভৃতি পড়াতে হয়। বিভিন্ন বিষয় পড়াবার জন্য কি কি সাজসরঞ্জাম প্রয়োজন পাঠক্রম পর্যালোচনা করে তার একটা তালিকা তৈরী করে সেগুলি সংগ্রহ করতে হবে। বিজ্ঞানকক্ষ এমন ভাবে সুসজ্জিত হবে যে সাধারণ বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিষয় পড়াবার উপযোগী সব রকম শিক্ষা সহায়ক উপকরণ যেন বিজ্ঞানকক্ষে বসেই পাওয়া যায়।

বিভিন্ন বিষয় কক্ষের প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ, কক্ষ সাজান ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বিষয় শিক্ষকের উপর ন্যস্ত থাকবে। প্রধান শিক্ষক বিষয়কক্ষ গড়ে তুলতে ও সর্বাঙ্গীন সুষ্ঠু রূপ দিতে যা দরকার বিষয় শিক্ষককে সেভাবে সাহায্য করবেন।

বিষয়কক্ষ শুধুমাত্র বাজারের কেনা জিনিস দিয়ে সাজান উচিত নয়। ছেলেরা যাতে নানারূপ হাতের কাজ দিয়ে কক্ষটি সমৃদ্ধ করে সেজন্য ছেলেদের উৎসাহ দেওয়া হবে। মানচিত্র আঁকতে, সময়রেখা তৈরী করতে, ঐতিহাসিক ছবি আঁকতে, বিজ্ঞান বিষয়ক চার্ট তৈরী করতে, মাটির মডেল তৈরীতে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষকগণ ছেলেদের উৎসাহিত করবেন। মাঝে মাঝে স্কুলে ছেলেদের তৈরী জিনিষের প্রদর্শনী হবে ও তার মধ্য থেকে বাছাই করা ভাল জিনিষ বিভিন্ন বিষয় কক্ষে রক্ষিত হবে। এই ভাবে ছেলেদের কাজে উৎসাহ দিলে সৃষ্টিধর্মী কাজের মধ্য দিয়ে ছেলেদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ ঘটবে।

পরীক্ষাগার (Laboratory) —প্রাক স্বাধীনতা যুগের শিক্ষা ব্যবস্থায় স্কুলেরপাঠক্রমে বিজ্ঞান শিক্ষার সম্ভাবনা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। কলেজীয় শিক্ষা সুরু হবার পূর্বে প্রত্যক্ষভাবে বিজ্ঞান চর্চারকোনসুযোগ ছিল না বললেই চলে। যারা ভবিষ্যতে বিজ্ঞান নিয়ে পড়বে তাদের প্রস্তুতিপর্বরূপে বিদ্যালয় স্তরে Additional Mathematics ও Mechanics পড়াবার ব্যবস্থা ছিল।

কিন্তু খুব কম স্কুলই ছাত্রদের এই সুযোগ দিতে পারত। স্কুল পর্যায়ে আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞান পড়াবার ব্যবস্থা অতি অল্পদিন হল হয়েছে। দেশ স্বাধীন হবার পর দেশকে নতুন করে গড়ে তুলতে যে কর্মযজ্ঞের আয়োজন হয়েছে সে প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলতে হলে চাই বিজ্ঞানী কুশলী কর্মী। জাতি গঠনে বিজ্ঞানের বিশিষ্ট ভূমিকার কথা সামনে রেখে মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে পাঠক্রমে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্কুল থেকে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা না হলে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের ভিত্তিভূমি দৃঢ় হবে না তাই বহুমুখী উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের রুচি ও প্রবণতা অনুযায়ী যে শিক্ষার আয়োজন করা হয়েছে, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাকে তার মধ্যে বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছে। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে বিজ্ঞানের প্রয়োজন এত বেশী ও বিজ্ঞান আমাদের জীবন যেভাবে নিয়ন্ত্রিত করছে যে সর্বশ্রেণীর ছাত্রের পক্ষেই বিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞান থাকা দরকার তাই মাধ্যমিক শিক্ষার সর্বস্তরে সাধারণ ও সমস্ত শাখায় সাধারণ বিজ্ঞান পাঠের ব্যবস্থা হয়েছে।

বিজ্ঞান শিক্ষার মূলকথা হচ্ছে পরীক্ষা নিরীক্ষার সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের শিক্ষা। বিজ্ঞানের বিষয়গুলিকে সাহিত্য, ইতিহাসের মত মুখে বলে বা বক্তৃতাতে ঠিকভাবে বোঝান যায় না। শুধু বই পড়ে বিজ্ঞানী হতে পারে না। পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করতে হবে বা যে জ্ঞান সাধারণভাবে অর্জিত হয়েছে পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে সে জ্ঞানের ভিত্তিকে দৃঢ় করতে হবে। বিজ্ঞান হচ্ছে প্রয়োগ সিদ্ধ জ্ঞান। পরীক্ষাগারে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নিয়ে ছেলেরা যদি বিজ্ঞানের বিভিন্ন সূত্র পরীক্ষা করে দেখবার সুযোগ না পায় তাহলে কখনও তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে না।

রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার যে সামান্য অংশ সাধারণ বিজ্ঞানে রয়েছে তার চেয়ে আরো অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃতভাবে উচ্চতর মাধ্যমিক বিজ্ঞানের ছেলেদের পড়তে হয়। যেসব বিষয় তাদের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেসব বিষয় পরীক্ষাগারে হাতে কলমে শেখার সুযোগ যদি না থাকে তাহলে তারা কিছুই শিখতে পারবে না। এছাড়া জীববিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি শেখবার জন্যও যথেষ্ট পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে—তাকে বাদ দিয়ে শুধু বই পড়িয়ে শেখাবার চেষ্টা হলে ছেলেদের মধ্যে বিষয় সম্পর্কে অনুরাগ সৃষ্টি হবে না তাদের পড়াও সার্থক হবে না।

বিজ্ঞান শিক্ষার ভিত্তিকে দৃঢ়তর করবার জন্য প্রয়োজন পরীক্ষাগারের। কতগুলি বৈজ্ঞানিক তথ্য মুখে মুখে শিখিয়ে বা মুখস্থ করিয়ে পরীক্ষায় পাশ

করান যায় কিন্তু দেশের প্রয়োজন তাতে মেটান যাবে না। যদি বিজ্ঞানী সৃষ্টি করতে হয় তাহলে প্রয়োজন সুসজ্জিত পরীক্ষাগার, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপযুক্ত শিক্ষক। পাঠক্রম নির্দ্ধারিত বিষয়সমূহ যাতে ছেলেরা পরীক্ষা করে দেখতে পারে পরীক্ষাগারে তার সুযোগ থাকবে। আমরা জানি বিজ্ঞান শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ইহার প্রযোগ ধর্মিতার মধ্যে পরীক্ষাগারে ছেলেরা সে সুযোগ পাবে। পরীক্ষাগারে কি কি যন্ত্রপাতি থাকবে তা নির্ভর করে পাঠক্রমের উপর। যে সব বিষয়ে পাঠ দেওয়া হবে তা পরীক্ষা করে দেখবার মত যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম রাখতে হবে। শিক্ষক বিভিন্ন বিষয় পরীক্ষা করে দেখাবেন ছেলেদের কতকগুলি বিষয় নিজেদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে। ছাত্রদের নিজ হাতে কাজ করবার সুযোগ যতটা সম্ভব দিতে হবে।

পরীক্ষাগার গড়ে তুলতে হলে যে অর্থের প্রয়োজন স্কুলের পক্ষে সে অর্থের সংস্থান করা সব সময় সম্ভব হয়ে উঠে না। পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষাগার তৈরী করবার জন্য সরকারী সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন। যন্ত্রপাতি ও আনুসঙ্গিক সাজ-সরঞ্জাম কিনবার জন্য এককালীন অর্থের সাথে কাজ চালু রাখবার জন্য পৌনঃ পৌনিক খরচের দরকার আছে। সর্বোপরি প্রয়োজন হচ্ছে উপযুক্ত শিক্ষকের। বহু স্কুলে দেখা গিয়াছে পরীক্ষাগার রয়েছে যন্ত্রপাতি রয়েছে তবু উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে সুষ্ঠু পঠন ও পাঠন হচ্ছে না। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে গ্রামাঞ্চলে পরীক্ষাগার থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞান বিভাগ পরিচালনা করা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে। উপযুক্ত শিক্ষকের সার্থক শিক্ষাদান পদ্ধতি সাহায্যেই বিজ্ঞান শিক্ষা কার্যকরী করা হয়ে উঠতে পারে শুধুমাত্র পরীক্ষাগার আছে তাই বিজ্ঞান শিক্ষার আয়োজন করতে বাধা কোথায় এ মনোভাব যেন স্কুল কর্তৃপক্ষের মধ্যে প্রবেশ না করে।

পরীক্ষাগারের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কেও যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে। অর্থের সংস্থান হলে যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম কিনে আনা যায়। তার সুষ্ঠু ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা না থাকলে একটি সুসজ্জিত মূল্যবান পরীক্ষাগার অল্প-দিনেই অকেজো হয়ে পড়বে। পরীক্ষাগারের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বিষয়ানুসারে বিভিন্ন শিক্ষকের উপর ন্যস্ত হবে। তিনি তার রক্ষণাধীন সমস্ত জিনিষের তালিকা stock register তুলে রাখবেন বছরে একবার stock register মিলিয়ে দেখে নেবেন সমস্ত জিনিষ আছে কিনা। ভেঙ্গে গেলে বা হারিয়ে গেলে নতুন জিনিষ আনিয়ে নেবার ব্যবস্থা করবেন। যে সব জিনিষ ব্যবহারের জন্য বের করা হয়েছিল তা ঠিক মত উঠিয়ে রাখা হল কিনা সেদিকে

একটু দৃষ্টি রাখলেই কোন জিনিষ হারাবার সম্ভাবনা খুব কম থাকে। বিষয় শিক্ষক পাঠ্যসূচীতে নতুন কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হলে তার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আনাবার ব্যবস্থা করবেন। প্রধান শিক্ষক যদি বিজ্ঞানের শিক্ষক না হন তাহলেও পরীক্ষাগার সুন্দর করে তুলতে ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে শিক্ষকদের পরামর্শ ও সাহায্য করবেন।

স্কুল মিউজিয়াম ঃ—আধুনিক শিক্ষার একটা প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে পুঁথিনির্ভর শিক্ষাকে যতটা সম্ভব বাস্তবধর্মী করে তোলা। সেই প্রচেষ্টার অঙ্গ স্বরূপ বর্তমানে যথাসম্ভব শিক্ষণীয় বিষয়ের সাথে যাতে বাস্তব পরিচয় হতে পারে শিক্ষা তার বহুবিধ আয়োজন করা হচ্ছে। জ্ঞানমূলক বিষয় শেখাবার সময় আজকাল আমরা শিক্ষাসহায়ক বহুপ্রকার সাজসরঞ্জামের সাহায্য গ্রহণ করি। কানে শুনে ছেলেরা যা শেখে সেই সাথে জিনিষটি বা তার অনুকৃতি চোখে দেখাবার ব্যবস্থা করতে পারলে ছেলেদের জ্ঞানের ভিত্তি দৃঢ় হয়।

বিভিন্ন বিষয় শেখাবার জন্য বিষয়কক্ষে বিষয় উপযোগী বহু উপকরণ সমাবেশ করা হয়। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে যাতে ছেলেদের মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টি হয় তাদের মধ্যে জ্ঞানপিপাসা জাগে সেজন্য বিষয়কক্ষের বাইরে এনেও সেসব জিনিষ দেখাবার ব্যবস্থা করা দরকার। জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের সাথে পরিচয় বা যোগস্থাপন করতে হলে পুঁথির বাইরে যে জগৎ তার মাঝে ছেলেদের দাঁড় করিয়ে দিতে হবে। অবাক হয়ে সে দেখবে তার চারদিকে কত জানার আছে। কি করে ছেলেদের জ্ঞানের সীমাকে তার স্কুল বইয়ের বাইরে বা তার পরিচিত পরিবেশের নাগালের বাইরে প্রসারিত করা যায় এ প্রশ্নের উত্তর আমরা কিছুটা স্কুল মিউজিয়ামের মধ্যে পেতে পারি। স্কুল মিউজিয়ামের অর্থে যদি সরকার পরিচালিত সাধারণ যাদুঘরের ছোটখাট সংস্করণ বুঝি তাহলে ভুল করা হবে। স্কুলমিউজিয়মে স্কুলের দৈনন্দিন কাজ চালাবার জন্য যেসব উপকরণ প্রয়োজন তা দিয়েই প্রথম সুরু করা যেতে পারে। বিষয় কক্ষ নিয়ে আলোচনা কালে আমরা দেখেছি জ্ঞানমূলক বিষয়সমূহ ভালভাবে পড়াতে হলে সুসজ্জিত বিষয় কক্ষের প্রয়োজন। বিষয় কক্ষ সাজাবার জন্য স্কুল থেকে বহু সাজ সরঞ্জাম কেনা বা সংগ্রহ করা হয়। স্কুল মিউজিয়াম হবে একটি কেন্দ্রীয় বিষয় কক্ষের মত। মিউজিয়ামের বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন বিভাগের প্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়ে সাজান যেতে পারে। জ্ঞানমূলক বিষয় সমূহের সারা বছরের পড়া কয়েকটি ইউনিটে ভাগ করে নিয়ে ঠিক করে নিতে হবে কখন কোন ইউনিট পড়ান হবে। সেই ইউনিট পড়াতে যে সব সরঞ্জাম প্রয়োজন হবে বিষয় কক্ষে

সেই টার্মের সব সরঞ্জাম রেখে বাকী জিনিষ স্কুল মিউজিয়ামে রাখা যেতে পারে। সারা বছর যখন সব সরঞ্জামের দরকার হয় না তখন স্কুল মিউজিয়ামকে কেন্দ্রীয় বিষয় কক্ষ রূপে ব্যবহার করবার পক্ষে কোন অসুবিধা নেই। নানারকম উপকরণ দিয়ে সাজান মিউজিয়াম দেখে ছাত্রদের মনে কৌতূহল সৃষ্টি হবে নানা বিষয় জানবার জন্ম তাদের মনে আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

স্কুলের ছেলেরা অনেক রকম হাতের কাজ করে। তাদের তৈরী মাটীর পুতুল, মডেল, ছবি, মেয়েদের সূচের কাজ প্রভৃতি দিয়ে প্রতি বছর স্কুলে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সেখান থেকে বাছাই করা জিনিষ মিউজিয়ামে রাখবার ব্যবস্থা করলে ছেলেদের মধ্যে কাজের উৎসাহ সৃষ্টি হবে।

মিউজিয়ামের দুটি দিক থাকবে একটি কেন্দ্রীয় বিষয় কক্ষের দিক, এদিকে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার উপযোগী সাজ সরঞ্জাম দিয়ে সাজান হবে; আরেকটি দিকে ছেলেদেরই তৈরী নানা জিনিষ ও বাইরে থেকে সংগ্রহ করা দ্রব্য-সামগ্রী যা থেকে ছেলেরা পড়ার বাইরে নানা বিষয় সম্পর্কে নতুন জ্ঞান আহরণ করতে পারবে।

স্কুল মিউসিয়াম দেখে বোঝা যাবে বিভিন্ন দিকে ছেলেরা কি জ্ঞান সঞ্চয় করছে। তাদের কাজের নমুনার মধ্য দিয়ে তাদের কাজের অগ্রগতির পরিচয় কিছুটা মিলবে। মিউজিয়ামে স্কুল সম্পর্কীয় বিভিন্ন তথা সম্বলিত চার্ট, গ্রাফ বা মানচিত্র, পরিসংখ্যান থাকবে, যা দেখে ছেলেদের বহুমুখী কর্ম-প্রয়াস সম্পর্কে একটা ধারণা হবে। বিভিন্ন পরীক্ষায় ছেলেদের কৃতিত্ব, খেলাধূলায় ছেলেদের তৎপরতা, গ্রন্থাগারের বই পড়ার আগ্রহ ইত্যাদি হিসাব ও তুলনামূলক তথ্যের সাহায্যে দেখিয়ে স্কুল মিউসিয়ামের দেওয়ালে টাঙিয়ে দেওয়া হবে। এসব তথ্য থেকে স্কুলের বিভিন্ন দিকের কার্যাবলীর একটা সামগ্রিক চিত্র ফুটে উঠবে।

স্কুল মিউজিয়াম আদাৰুন আমাদের দেশে নেই। স্কুল কর্তৃপক্ষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এজাতীয় কাজ করবে এটাও দুরাশা। স্কুল-মিউজিয়ামে শিক্ষামূল্য বিচার করে পরীক্ষামূলকভাবে সরকারী নির্দেশ বা পরিচালনায় যদি কোন স্কুল মিউজিয়াম গড়ে তোলা যায় তাহলে সেখান থেকে আস্তে আস্তে বিভিন্ন স্কুলে স্কুল মিউজিয়াম গড়ে উঠতে পারে।

খেলারমাঠ ও ব্যায়ামাগার:—স্কুলের ছেলেদের জন্ম খেলাধূলার ব্যবস্থা করা স্কুল কর্তৃপক্ষের অবশ্য কর্তব্য। লেখাপড়ার সাথে খেলাধূলার একটা অহিনকুল সম্পর্ক স্থাপন করে দু'টোকে পৃথক করে দেখাই ছিল প্রচলিত

রীতি। খেলাধূলার যে একটা শিক্ষামূল্য আছে একথা আমরা স্বীকার করতে চাই না। খেলাধূলা করা বা ব্যায়াম করা এতে সময় নষ্ট হয় আর বখাটে ছেলেরাই এদিকে মন দেয়। সাধারণ অভিভাবক ছেলেকে স্কুলে পড়তে পাঠান খেলা যে পড়ার একটা অঙ্গ—শিক্ষার অর্থ দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধন একথা স্কুলের কর্তাব্যক্তিরা সব সময় বুঝতে চান না। মানুষের চরিত্রগঠনে খেলাধূলার যে একটা বিশিষ্ট অবদান রয়েছে একথা আধুনিক সব শিক্ষাবিদই স্বীকার করেছেন। ক্লাসের শিক্ষাই শিক্ষার শেষ কথা নয়—খেলার মাঠেও আমরা অনেক কিছু শিখি। মানুষের পৌরুষ সচেতনতার প্রথম সঞ্চার হয় খেলার মাঠে। ওয়াটারলু যুদ্ধ বিজয়ী ডিউক অফ ওয়েলিংটন বলেছিলেন The battle of Waterloo was won on the playing field of Eaton. নেতৃত্বের শিক্ষা খেলার মাঠেই তিনি লাভ করেছিলেন। খেলার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয় দলগত মনোভাব, নেতৃত্বেরশিক্ষা, নিয়মশৃঙ্খলার শিক্ষাও ছেলেরা খেলার মাঠে পেতে পারে। শুধু দেহগঠন, চরিত্রগঠন ও স্বাস্থ্যরক্ষা ছাড়াও খেলার মধ্যে রয়েছে একটা নির্দোষ আনন্দ। এই আনন্দের জন্যই ছেলেরা খেলার দিকে এত আকৃষ্ট হয়।

প্রত্যেক স্কুলেই খেলাধূলার ব্যবস্থা থাকা দরকার, ছেলেদের জন্য outdoor ও indoor খেলার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। outdoor খেলার জন্য দরকার খেলার মাঠের। ফুটবল, হকি, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলার জন্য বড় মাঠের প্রয়োজন কিন্তু সব স্কুলের পক্ষে বড় মাঠ যোগাড় করা সম্ভব নয়, বিশেষ করে সহরাঞ্চলে যেখানে স্থানাভাব সেখানে স্কুলের খেলার মাঠ প্রায়ই থাকে না। এক্ষেত্রে স্কুলের সীমার মধ্যে যতটা খোলা জায়গা রয়েছে তার মধ্যে ভলি বল, বাস্কেট বল, কাপাটি ও অন্যান্য কয়েক দেশীয় খেলার আয়োজন করা সম্ভব। স্কুল ড্রিল ও যেসব স্কুলে N. C. C. গঠিত হয়েছে সেখানে সামরিক কুচকাওয়াচ করলেও দেহ চর্চার কাজ হয়। সব কিছুর জন্যই প্রয়োজন মাঠের। গ্রামাঞ্চলে স্কুলের মাঠ না থাকলেও স্কুলের কাছে কোন পতিত জমি থাকলে মালিকের অনুমতি নিয়ে সেখানে ছেলেদের খেলাধূলার ব্যবস্থা করা যায়। গ্রামের স্কুলে প্রধান শিক্ষক একটু তৎপর হলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে খেলার মাঠের যোগাড় করতে পারেন। স্কুলে একজন খেলার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক থাকবেন, খেলার মাঠে প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকেরা গেলে ছেলেরা উৎসাহিত হয়। মাঝে মাঝে খেলার মাঠে যাওয়া প্রধান শিক্ষকের একটা কর্তব্যও বটে।

ব্যায়াম :—খেলার মাঠের সাথে প্রত্যেক স্কুলে একটি ব্যায়ামাগারও থাকা

খেলাধূলা ও ব্যায়ামের মধ্যে কিছুটা লক্ষ্যের পার্থক্য আছে। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে সুগঠিত পেশীবহুল দেহ গড়ে তোলাই ব্যায়ামের লক্ষ্য। খেলার মধ্যে রয়েছে আনন্দের মধ্য দিয়ে অবসর বিনোদনের আয়োজন (plesurable activity for the sake of recreation)। কিন্তু দুটি কাজের মধ্য দিয়েই দেহ সুগঠিত হয়। বর্ষাকালে মাঠে মাঠে যখন জল ওঠে কি কাদা হয় তখন খেলার ব্যবস্থা সম্ভব নয় কিন্তু তখনও ছেলেরা ব্যায়াম করতে পারে। কিশোর বয়স দেহগঠনের সময় অভিজ্ঞ ব্যায়াম শিক্ষকের নির্দেশে নিয়মিত ব্যায়াম করলে সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যায়। লেখাপড়ায় মস্তিষ্কের চর্চা হয় ব্যায়ামে হয় দেহের চর্চা। শরীর যার সুস্থ নয় তাকে দিয়ে কোন কাজই হয় না। তাই ছেলেরা যাতে নিয়মিত একটু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা করে সে বিষয়ে তাদের বোঝান দরকার ও সুযোগ সুবিধা দেওয়া দরকার।

ব্যায়ামের ব্যবস্থা খোলা জায়গায় হতে পারে। উপরে ছাউনী দেওয়া খোলা বড় ও উচ্চ ঘর ব্যায়ামের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, ব্যায়ামের জন্য কিছু সাজ সরঞ্জামের প্রয়োজন। যে কোন স্কুলের পক্ষে ব্যায়ামের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা খুব কঠিন নয়। এককালীন কিছু টাকা খরচ করে সরঞ্জাম কিনে রাখলে তা দিয়ে বহু দিন কাজ চলতে পারে।

ব্যায়াম ও খেলাধূলার দায়িত্ব পরিচালনার জন্য মাধ্যমিক স্কুলে একজন ব্যায়াম শিক্ষক নিযুক্ত করা প্রয়োজন। ছাত্রদের সাধারণ স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে যে সমীক্ষা হয়েছে তাতে দেখা যায় আমাদের দেশের ছেলেদের স্বাস্থ্যের সামগ্রিকভাবে অত্যন্ত অবনতি ঘটেছে। এ অবস্থার প্রতিকার করতে হলে, একটা সুস্থ সবল জাতি গড়ে তুলতে হলে ছেলেদের খেলাধূলা ও ব্যায়াম সম্পর্কে উদাসীন থাকা চলবে না। সর্বাধিক পরিমাণে ছেলেরা যে সব খেলায় অংশ গ্রহণ করতে পারে ব্যায়াম শিক্ষক সে সব খেলার ব্যবস্থা করবেন। যে স্কুলের পক্ষে ব্যায়াম শিক্ষক নিযুক্ত করা সম্ভব নয় সেই স্কুল থেকে একজন শিক্ষককে বিশেষ ট্রেণিংয়ে পাঠিয়ে শিক্ষিত করে আনা যায়। খেলাধূলা পরিচালনা ও ব্যায়ামের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করতে পারবেন।

সেইপাঠক্রমিক কার্যাবলী অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা দেখুন।)

দ্বিতীয় অধ্যায়

গ্রন্থাগার

শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যালয়ের একটি অপরিহার্য অঙ্গ গ্রন্থাগার। যুগ যুগ ধরে মানুষ যে জ্ঞান রাশি সঞ্চয় করেছে গ্রন্থাগারে সেই সঞ্চিত জ্ঞানরাশি আবদ্ধ রাখা হয়েছে।) সন্ধানী ডুবুরী সেই জ্ঞান সমুদ্র সন্ধান করে অমূল্য রত্নের সন্ধান পায়। খৃষ্ট জন্মের বহু পূর্ব্ব থেকেই গ্রন্থাগারেব সন্ধান পাওয়া যায়— ব্যাবিলন ও মিশরে গ্রন্থাগার অতি প্রাচীন যুগেই বর্তমান ছিল। ভারতে ব্রাহ্মণ্য যুগে আচার্যেব কাছ থেকে মুখে মুখে বিদ্যাশিক্ষাব রীতি ছিল সে যুগের আচার্যরা ছিলেন এক একটি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগাব। বৌদ্ধ যুগে নালন্দা, বিক্রমশীলা ওদন্তীপুর প্রভৃতি মহাবিহাবে বিশাল গ্রন্থশালা ছিল। মুদ্রাযন্ত্র প্রচলিত হবার পূর্বে পুঁথি সংগ্রহ করা ছিল অত্যন্ত পরিশ্রম সাধ্য কাজ। মিশনারীরা এদেশে মুদ্রাযন্ত্রেব প্রতিষ্ঠা করবাব পর থেকে মুদ্রিত বই সংগ্রহ করা সহজ সাধ্য হয়েছে। জ্ঞানের ভাণ্ডাব আর মুষ্টিমেয়ের অধিকারের মধ্যে নেই। সাধারণেব জন্য গ্রন্থাগার স্থাপিত হওয়ায় জ্ঞানের ভাণ্ডারের দ্বার আজ সর্ব্ব-সাধারণের কাছে উন্মুক্ত হয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রধান ক্ষেত্র বিদ্যামন্দির সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই জ্ঞান মন্দিরের রত্নভাণ্ডার গ্রন্থাগাব থাকবে। জ্ঞানের জগৎ ছেলেদের কাছে মুক্ত হবে গ্রন্থাগারের মধ্য দিয়ে।

বিদ্যালয়ে সাধারণ ভাবে একটা পাঠক্রম অনুসরণ করে ছেলেদের পড়ান হয়। নির্দিষ্ট পাঠক্রমের গণ্ডির মধ্যে যদি তাদের পাঠের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে শিক্ষা কখনও পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। কোন একটা বিষয় আয়ত্ত করতে হলে শ্রেণী পাঠ্য বই ছাড়াও অনুসন্ধিৎসু ছাত্রকে আরো বহু বই পড়তে হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জন নয় শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পিপাসাকে বাড়িয়ে দেওয়া ও শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থীকে জ্ঞান বিজ্ঞানের নতুন দিকের সাথে পরিচিত হতে হলে নতুন নতুন বই পড়তে হবে—তা না-হলে তার জ্ঞানের সীমা হবে সংকীর্ণ। ছেলেরা যাতে পাঠ্যাতিরিক্ত বিষয় জানতে পারে—তাদের জ্ঞানের পিপাসা মেটাতে পারে সে জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের প্রয়োজন। কোন বিষয়ে পাঠ্য বইয়ের বাইরে কিছু জানার প্রয়োজন হলে গ্রন্থাগার থেকে বই

নিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। কোন প্রশ্নের উত্তর যদি বিচার বিবেচনা করে যুক্তি তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত করে দিতে হয় তাহলে প্রয়োজন বহু রেফারেন্স বইয়ের। বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার না থাকলে প্রয়োজনীয় বই ছাত্রদের পক্ষে যোগাড় করা সম্ভব নয়। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে যে জ্ঞানের তৃষ্ণা সৃষ্টি করবেন সে তৃষ্ণা ও গ্রন্থাগারের মাধ্যমেই মেটান সম্ভব। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্নরূপ প্রবণতা রয়েছে—তাদের রুচিও বিভিন্ন। এই বিভিন্ন রুচির ছেলেদের বইয়ের চাহিদা মেটাবার জন্য ও বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন। মুদালিয়র কমিশন বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের স্থান অতি উচ্চে নির্দেশ করেছেন। প্রতিটি বিদ্যালয়ে "an intelligent and effective Library service" থাকবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন। গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কমিশন বলেছেন, "The inportance of cultivating the habits of general reading, of reducing the stress placed on text books and making increasing use of the Library as a repository of reference books, standard books and books of general interest."

ছেলেদের মধ্যে পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলবার জন্য ও পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আমাদের শিক্ষকদের মধ্যে এখনও এমন অনেক শিক্ষক আছেন যারা পাঠ্য বইয়ের পরিচিত গণ্ডির বাইরে যেতে চান না। তাদের সমস্ত পঠনপাঠন শ্রেণী নির্দিষ্ট বইখানাকে কেন্দ্র রেই চলে। তারা বুঝতে চান না পড়াবার জন্য শ্রেণী পাঠ্যের অতিরিক্ত বই পড়বার প্রয়োজন তাঁদেরও আছে। শিক্ষক যেখানে নিজেই পরিচিত গণ্ডির বাইরে যেতে চান না সেখানে তিনি ছেলেদের যে সীমার বাইরে যেতে উৎসাহ দেবেন সে আশা করা যায় না। স্কুলে পড়বার সময় যদি ছেলেরা বাইরের বই পড়ার অভ্যাস না করে তাহলে স্কুল ছাড়ার সাথে সাথে বইয়ের সাথে আর কোন সম্পর্কই থাকে না। ছাত্র বয়সে একবার লাইব্রেরীর বই ব্যবহারের অভ্যাস হলে সেই অভ্যাস আর কোনদিন বিদূরীত হয় না। এজন্য যদি প্রয়োজন হয় সুরুতে বাধ্যতামূলকভাবে ছেলেদের হাতে বই ধরিয়ে দিতে হবে তা না হলে পড়ার অভ্যাস তৈরী হবে না।

বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন শুধু শিক্ষার্থীদের জন্যই নয়, শিক্ষকদের জন্যও গ্রন্থাগারের প্রয়োজন আছে। শ্রেণীতে শিক্ষা দিতে হলে শ্রেণীপাঠ্য বইখানা পড়ে গেলেই চলে না তাকে আরো বহু জ্ঞাতব্য বিষয় জানতে হয়।

উৎসুক ছাত্রের সব রকম সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রস্তুতি নিয়ে শিক্ষক ক্লাসে যাবেন। বিনাপ্রস্তুতিতে ক্লাসে যাওয়া যে কোন শিক্ষকের পক্ষেই অনুচিত। প্রয়োজনীয় তথ্য শিক্ষক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার থেকেই সংগ্রহ করতে পারেন। জ্ঞানমূলক বিষয় সমূহ বদ্ধজলাশয়ের মত নয়। জ্ঞানের ক্ষেত্র নিত্য নূতন দিকে প্রসারিত হচ্ছে—জ্ঞানের ভাণ্ডার প্রতিদিনই সমৃদ্ধ হচ্ছে। শিক্ষক যদি প্রগতিশীল চিন্তাধারার সাথে সমান তালে চলতে চান তাহলে তাকে নতুন তথ্য সম্বলিত বই সমূহ পড়তে হবে। এজন্য তার পক্ষে গ্রন্থাগারের সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য। শিক্ষককে হতে হবে আজীবন জ্ঞান তপস্বী। সার্থক শিক্ষক হতে হলে ছাত্রের মত তাকে জ্ঞানানুশীলন করতে হবে। তাই প্রতি বিদ্যালয়ে একটি ভাল গ্রন্থাগারের প্রয়োজন আছে। গ্রন্থাগারের ছাত্র শিক্ষক উভয়ের পক্ষেই সমান প্রয়োজনীয়।

গ্রন্থাগার ও তার বর্তমানরূপ ঃ—প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটি গ্রন্থাগার আছে শিক্ষকদের বসবার ঘরে প্রধান শিক্ষকের ঘরে কয়েক আলমারী বই যা পুরোন, তথ্যগত দিক থেকে অচল, এবং ছেলেদের পছন্দ অপছন্দের সাথে সম্পর্ক বিরহিত, মুদালিয়র কমিশনের ভাষায়—"The books are generally old, outdated, unsuitable, usually selected without reference to the student's tastes and interest." এই হচ্ছে 'স্কুল লাইব্রেরী'। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের জন্য স্থায়ী কোন পৃথক ঘর নেই। যেই স্কুলে আছে তাও অতি সাধারণ ঘর যেখানে কয়েকটি আলমারীতে কিছু বহুদিনেব পুরোন বই আর ততোধিক শোচনীয় কিছু আসবাবপত্র দিয়ে সাজান। লাইব্রেরীয়ান প্রায় স্কুলেই নেই। স্কুল কেরাণীকে কিছু অতিরিক্ত ভাতা দিয়ে বা কোন একজন শিক্ষককে কিছু পিরিয়ড কাজ কমিয়ে দিয়ে লাইব্রেরিয়ানের কাজ করিয়ে নেওয়া হয়। নিজের কাজের অতিরিক্ত কাজে তাদের উৎসাহ থাকবে না এ খুবই স্বাভাবিক। দায়সারা রকমে তারা তাদের উপরি কর্তব্য পালন করেন। প্রধান শিক্ষক কি স্কুল কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য খুব সচেষ্ট থাকেন না। সরকার থেকে কিছু টাকা পেলে নতুন বই কেনা হয়—(যেমন হালে সরকারী দাক্ষিণ্যে সব স্কুলেই কিছু বই কেনা হয়েছে শুনেছি)। এছাড়া নতুন নতুন প্রয়োজনীয় বই কিনে গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করবার চেষ্টা খুব বেশী স্কুলে হয় না। বই কেনবার সময়ও ছাত্রদের পছন্দ আগ্রহ বিচার করে সব সময় বই কেনা হয় না। সম্পাদক ও প্রধান শিক্ষকের খেয়াল খুশী ও পছন্দ অপছন্দ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বই কেনার পিছনে

কার্যকরী হয়। বিষয় শিক্ষকগণ ও প্রয়োজনীয় Reference বই অপেক্ষা তারা যদি কোন পরীক্ষা দেন তাহলে সেই পরীক্ষার উপযোগী বই কেনার দিকে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করেন। সব দিক থেকে বিচার করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক একথা বলা যেতে পারে।

গ্রন্থাগার কিরূপ হওয়া উচিত:—বিদ্যালয়ের দিক থেকে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করে গ্রন্থাগার যাতে শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের শোভা-বর্দ্ধন না করে সত্যিকারের শিক্ষাসহায়ক হয়ে ওঠে আমাদের সে চেষ্টা করতে হবে। বিদ্যালয়ের একটি প্রশস্ত কক্ষে গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হবে। দেখতে হবে কক্ষটি যেন রুচিসম্মত ভাবে সাজান হয়। ছেলেরা যেখানে বসে পড়বে সে ঘর যেন আলো হাওয়া যুক্ত হয়—না হলে ছেলেদের স্বাস্থ্যহানি ঘটবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। যদি সম্ভব হয় মূল্যবান আসবাবপত্র দিয়ে ঘরখানা সাজান হবে। গ্রন্থাগারের সাথে পড়বার ব্যবস্থা থাকবে। মুদালিয়র কমিশন তাদের দৃষ্টিতে গ্রন্থাগার কিরূপ হওয়া উচিত তার একটি মনোজ্ঞ চিত্র দিয়েছেন—"..... the library must be made the most attractive place in in the school so that students will be naturally drawn to it. It should be housed in a specious, well-lit hall (or room), with walls suitably coloured and the rooms decorated with flowers and artistically framed pictures and prints of famous paintings. The furniture--bookselves tables chairs, reading desks should be carefully designed with an eye to artistic effect as well as functional efficiency."

কমিশনের কল্পনাকে বিদ্যালয়ের আর্থিক সঙ্গতির সাথে সামঞ্জস্য করে নিয়ে ছেলেদের পড়বার জন্য লম্বা টেবিল ও দু'পাশে বেঞ্চের ব্যবস্থা করলে মনে হয় ছেলেদের খুব আপত্তি হবে না। পাঠকক্ষে (Reading room) ছেলেদের জন্য দৈনিক কাগজ ও তাদের উপযোগী সাময়িক পত্রিকা থাকবে। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের বই ভিন্ন ভিন্ন আলমারীতে থাকবে। সম্ভব হলে খোলা সেলফে বই রাখা হবে। ছেলেরা সেখান থেকে ইচ্ছামত বই নিয়ে পড়তে পারবে। বইয়ের জন্য স্লিপ দিয়ে অযথা সময় নষ্ট করতে হবে না। National Library ও British Council-এর গ্রন্থাগার থেকে যারা বই নিয়েছেন তারাই জানেন স্লিপ দিয়ে বই নেওয়া আর ইচ্ছামত দরকারী বই সেলফের থেকে বেছে নেবার সুবিধা কোথায়। বই খোয়া যাবার সম্ভাবনা আছে—কিন্তু ছেলেদের উপর

বিশ্বাস স্থাপন করে দায়িত্ব দিলে সব সময় ঠকতে হয় না। যদি স্বাধীনমত বই নেবার প্রথা চালু করা যায় তাহলে ছেলেদের দায়িত্ব বোধ বাড়বে। প্রধান শিক্ষক যদি একটু ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকেন তাঁহলে অল্প কিছু বই নিয়ে এ প্রথা চালু করে দেখতে পারেন।

গ্রন্থ নির্বাচন :—গ্রন্থাগারের জন্য বই বাছাই এক কঠিন কাজ। আজকাল নানারকম বইয়ে বাজারে ছেয়ে গিয়েছে। অপাঠ্য কুপাঠ্য বইয়ের গাদা-গাদা তালিকা প্রকাশকেরা স্কুলে পাঠাতে একটুও কার্পণ্য করেন না। তারপর চটকদার বিজ্ঞাপন তো আছেই। তাই বই বাছাই খুব সাবধান হয়ে করতে হবে। অসাবধানতার জন্য যদি দু'চার খানা কুপাঠ্য বই লাইব্রেরীতে স্থান পায় তার খারাপ প্রভাব ছেলেদের বিপথগামী করতে পারে।

ছেলেদের জন্য বই বাছাই করতে হলে বিভিন্ন শ্রেণীর ছেলেদের বয়স, রুচি ও উপযোগিতার কথা চিন্তা করে বই বাছাই করতে হবে। এছাড়া শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় Reference বই ও গ্রন্থাগারে রাখতে হবে। বই বাছাইয়ের জন্য শিক্ষকদের নিয়ে একটি ছোট কমিটি করে দেওয়া যায়—এই নির্বাচক কমিটিতে দু'একজন উপরের শ্রেণীর উৎসাহী ছাত্র থাকতে পারে। বই কেনার আগে ছেলেদের পছন্দমত বইয়ের নাম দিতে হবে। গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষে একখানা খাতা রাখলে ছেলেরা তাদের রুচিমত বইয়ের নাম দিতে পারে। গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সেই তালিকা থেকে ও গ্রন্থাগারের জন্য কি কি বই প্রয়োজন আছে তা বিচার করে একটি তালিকা করবেন। নির্বাচক সমিতির শিক্ষকেরা এই কাজে তাকে সাহায্য করবেন। বিষয় শিক্ষকগণ নিজ নিজ বিষয়ের প্রয়োজনীয় বইয়ের তালিকা দেবেন। প্রধান শিক্ষক পুস্তক নির্বাচন সমিতির সদস্যদের সহযোগিতায় অর্থের সংস্থান অনুসারে প্রাথমিক তালিকা থেকে চূড়ান্ত ভাবে নির্বাচন করবেন। শুধুমাত্র প্রধান শিক্ষকের চূড়ান্ত বাছাইয়ের দায়িত্ব নেওয়া উচিত নয়। যদি তিনি সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাহলে অনেক সময় দেখা যাবে তার যে দিকে ঝোঁক তিনি অধিকাংশ টাকা সেদিকে খরচ করে বসে আছেন।

পুস্তক নির্বাচন বইয়ের শ্রেণীবিভাগ করে নেওয়া উচিত—শিশুপাঠ্য, কিশোর পাঠ্য, জীবনী, ভ্রমণকাহিনী, বিভিন্ন দেশের ইতিহাস, অভিযান মূলক কাহিনী, ধর্মগ্রন্থ, বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ, রূপকথা, কিশোর উপন্যাস, ছাত্রদের উপযোগী অনুবাদগ্রন্থ, শিক্ষকদের সহায়ক গ্রন্থ প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের

বই নির্বাচন করতে হবে। এছাড়াও যদি দেখা যায় ছেলেদের ডিটেক্‌টিভ বা রোমাঞ্চের দিকে ঝোঁক আছে তাহলে সে বইও কিছু কেনা যেতে পারে। তবে দেখে নিতে হবে ছেলেদের উপযোগী করে লেখা হয়েছে কিনা! মুদালিয়র কমিশনের অভিমত হচ্ছে—The Guiding Principle in selection should be not the teachers own idea of what books the students must rdad but their natural and psychological interests. If they feel more attracted at a particular age, to stories of adventure or travel or biographies or even detection and crime, there is no justification for forcing them to read poetry or classics or belle-letters."

ছেলেদের মধ্যে যদি বই পড়ার অভ্যাস সৃষ্টি করতে হয় তাহলে ছেলেদের আগ্রহ অনুসারে সব রকম বই রাখতে হবে। গ্রন্থাগারে একগাদা ধর্মগ্রন্থ কি মহাপুরুষের জীবনী রাখলেই ছেলেরা নীতি বাগীশ হয়ে উঠবে এমন কথা ঠিক নয়। রুচিমত বই না থাকলে ছেলেদের বই পড়ার উৎসাহ কমে যায়। নানারকম বই দিয়ে যদি একবার পড়ার অভ্যাস সৃষ্টি করা যায় তাহলে নীতি-মূলক গ্রন্থ কি ধর্মগ্রন্থ পড়তে আপত্তি করবে না। কিন্তু সুরুতেই যদি তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করা যায় তাহলে গ্রন্থাগারের বই নিতে ছেলেদের মধ্যে আর আগ্রহ থাকবে না।

গ্রন্থাগারের বইয়ের সংখ্যা বাড়ানোর ও দরকারী বই কেনার পথে প্রধান অন্তরায় টাকার অভাব। সরকার থেকে ঠিকমত প্রয়োজনীয় টাকা পাওয়া না গেলেও লাইব্রেরী ফি বাবদ যে টাকা প্রতি বছর ছেলেদের কাছ থেকে আদায় করা হয় সে টাকা দিয়ে প্রত্যেক বছরই কিছু বই কেনা চলে।

পরিচালনা :— উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একজন গ্রন্থাগারিক থাকা উচিত। গ্রন্থাগারের পরিচালনার দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত থাকবে। গ্রন্থাগারিক লাইব্রেরিয়ানশিপ ডিপ্লোমাধারী হলেই ভাল হয়। তিনি বিদ্যালয়ের অন্যান্য বিষয় শিক্ষকদের মত সমান বেতন ও মর্যাদার অধিকারী হবেন। গ্রন্থাগার পরিচালনার আধুনিক পদ্ধতি সমূহ তার জানা থাকায় তার সুষ্ঠু পরিচালনায় ছেলেদের মধ্যে গ্রন্থাগার সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি হবে। শুধুমাত্র স্কুলের সময়ই যদি গ্রন্থাগার খোলা থাকে তাহলে ছেলেরা টিফিনের সময়ে বাইরের বই পড়ার সুযোগ পায় না। গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য স্কুলের সময়

তালিকায় কোন নির্দিষ্ট পিরিয়ডের ব্যবস্থা নেই। গ্রন্থাগার থেকে শুধু বই ধার নেওয়া ছাড়াও যাতে ছেলেরা স্কুলে বসে বই পড়তে পারে সেজন্য স্কুলের আগে ও পরে গ্রন্থাগার খোলা রাখবার ব্যবস্থা করতে হবে। স্কুলে সর্ব্বক্ষণের জন্য গ্রন্থাগারিক থাকলেই তা সম্ভব। গ্রন্থাগারিকের জন্য সময় তালিকা এমন ভাবে তৈরী করতে হবে যাতে তিনি স্কুলের আগে ও পরে থাকতে পারেন। গ্রন্থাগারিক ডিপ্লোমাধারী হইলেই হবে না পুস্তক পাঠে তার বিশেষ আগ্রহ থাকবে। যখন যে বই বের হচ্ছে তার খোঁজ তাকে রাখতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ে যে সব বই গ্রন্থাগারে আছে তার বিষয় বস্তুর সাথে তার মোটামুটি পরিচয় থাকবে যাতে তিনি প্রয়োজন মত ছেলেদের বইয়ের সন্ধান দিতে পারেন। ছেলেদের মধ্যে পাঠের অভ্যাস তৈরী, তাদের রুচি পরিবর্তন প্রভৃতি ব্যাপারে গ্রন্থাগারিক তৎপর হলে ছেলেদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন।

বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের সত্যিকারের প্রয়োজন সিদ্ধ করতে হলে সর্বক্ষণের জন্য গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করতে হবে যিনি তার সমস্ত সময় ও শক্তি গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্যই ব্যয় করবেন। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় সরকারী স্কুল ও কয়েকটি বড় বড় স্কুল ছাড়া সর্ব্বক্ষণের জন্য গ্রন্থাগারিক কোন স্কুলে নেই। এক্ষেত্রে কেরাণী বাবু বা একজন শিক্ষককে ভাতার বিনিময়ে কাজ করিয়ে নেওয়া হয়। তারা বই দেওয়া আর ফেরৎ নেওয়া ছাড়া কিছুই করেন না। যেখানে সর্বক্ষণের জন্য গ্রন্থাগারিক নেই সেখানে ছাত্ররা যাতে গ্রন্থাগার ব্যবহারের পূর্ণ সুযোগ পায় সে জন্য একটি সমিতি করে দিলে অবস্থার উন্নতি হতে পারে। সমিতিতে শিক্ষকও ছাত্র দুই ই থাকবে। তারা যদি নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে নেন তাহলে গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের কাজের ভার কিছু লাঘব হতে পারে।

গ্রন্থাগারের কার্য পরিচালনার জন্য কতগুলি খাতাপত্র রাখা দরকার। গ্রন্থাগারিকের অফিস সংক্রান্ত কাজের মধ্যে খাতাপত্রের রক্ষণাবেক্ষণ অন্যতম। যে সব খাতা রাখতে হবে তা হচ্ছে :—

পুস্তক জমা বই—(Stock Register) যে কোন বই কেনা হলে বা দান বা উপহার রূপে পাওয়া গেলে জমার খাতায় বইটির নাম, দাতার নাম মূল্য জমা হবার তারিখ ইত্যাদি লিখতে হবে।

শ্রেণী বিভাগ করা পুস্তকের তালিকা (Classified Catalogue) ছেলেদের বই বেছে নেবার সুবিধার জন্য বিষয়ানুসারী একটি পুস্তক তালিকা

তৈরী করতে হবে। এই তালিকায় বিভিন্ন বিষয়ের বই বর্ণানুক্রমিক লেখকের নাম অনুসারে হলে নিজেদের প্রয়োজন মত বই খুঁজে নিতে বেগ পেতে হয় না। বইয়ের পরিচয় সূচক বিষয়, নম্বর, পুস্তক সঙ্কেত এই খাতায় বইয়ের নামের সাথে থাকবে। বড় বড় লাইব্রেরীতে Index Card যে কাজ করে এই খাতা সেই কাজ করবে।

শ্রেণী পুস্তকাগারের পুস্তক তালিকা।—কেন্দ্রীয় পুস্তকাগার থেকে যে সব বই শ্রেণী পুস্তকাগারে দেওয়া হবে তার একটি তালিকা কেন্দ্রীয় পুস্তকাগারে থাকবে। শ্রেণীর জন্য তালিকায় বিষয়ানুসারে বই ভাগ করে দেখবার দরকার নেই।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পুস্তক ধার দেবার ক্ষমতা (Issue Register) ছেলেরা ও শিক্ষকেরা যে বই লাইব্রেরী থেকে ধার নেবে এই খাতায় লিখে তার সই নিয়ে বই দেওয়া হবে। যদি প্রত্যেক ছেলের জন্য Issue Register একটি করে পাতা থাকে তাহলে বুঝতে পারা যাবে কোন ছেলে বছরে কয়খানা বই নিল ও কে কি জাতীয় বই পড়তে ভালবাসে। একটি মোটা খাতা দরকার হলেও বই ধার দেবার ক্ষেত্রে এই রীতি মেনে চলাই ভাল। প্রতিটি পাতা ক্রমিক সংখ্যা যুক্ত হবে ছেলেদের নাম বর্ণানুক্রমিক সূচীতে থাকবে তাহলে আর পাতা খুঁজে বের করতে অসুবিধা হবে না।

জমা খরচের বই :—গ্রন্থাগার খাতে যে টাকা আদায় হল মূল জমা-খরচের বই থেকে হস্তান্তরিত করে গ্রন্থাগারের জমা-খরচের খাতায় দেখাতে হবে ও কোন খরচ হলে সেই খাতায় লিখে খরচ দেখাতে হবে। গ্রন্থাগারের জন্য ভিন্ন ভাবে Bank Account খুলতে হবে।

শ্রেণী পুস্তকাগার :—কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কাজ কমাবার জন্য প্রতি শ্রেণীতে একটি শ্রেণী পুস্তকাগার খোলা যেতে পারে। কেন্দ্রীয় পুস্তকাগারে সমস্ত বয়সের ও সমস্ত শ্রেণীর ছেলেদের উপযোগী বই থাকে তা থেকে প্রত্যেক শ্রেণীর উপযোগী বিভিন্ন বিষয়ের বই শ্রেণী পুস্তকাগারে দেওয়া হবে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে সব সময় বই নেবার সুবিধা নেই, শ্রেণী পুস্তকাগার থেকে ছেলেরা রোজ বই নিতে পারবে। শ্রেণী পুস্তকাগার পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে শ্রেণীর ছাত্রদের উপর। ছেলেরা একটি সমিতির সাহায্যে পুস্তকাগার পরিচালনা করবে শ্রেণী শিক্ষক প্রয়োজন হলে উপদেশ বা পরামর্শ দেবেন। শ্রেণীর উপযোগী বই কেনবার সময় তাদের অভিমত নেওয়া হবে যাতে তাদের পছন্দমত বই তারা পেতে পারে সেই সুযোগ তাদের দেওয়া

হবে, চূড়ান্ত নির্বাচনের পূর্বে। যেসব বইয়ের চাহিদা বেশী সেসব বই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অদল বদল করে নিতে হবে, তাহলে নতুন বই পড়বার অনেক বেশী সুযোগ তারা পাবে। প্রতি শ্রেণীতে একটি করে পুস্তকাগার থাকার ফলে সেখানে পড়ার পরিবেশের সৃষ্টি হবে। প্রথম অবস্থায় ছেলেরা যদি শুধু ছবি দেখে বা পাতা উলটিয়ে দেখেই বই ফিরিয়ে দেয় তবু তাদের বই দিতে হবে। পড়ার অভ্যাস সৃষ্টি করতে হলে ধীরে ধীরে বই সম্পর্কে তাকে কৌতূহলী করে তুলতে হবে। একবার পড়ার অভ্যাস তৈরী হলে নিজের তাগিদেই সে বই পড়বে। শ্রেণী পুস্তকাগারে বই দেবার খাতা দেখলেই বোঝা যাবে কে কতখানা বই নিয়েছে ও তাদের রুচি বা আগ্রহ কোন জাতীয় বইয়ের দিকে।

শ্রেণী পুস্তকাগার ছাড়া স্কুলে বিষয় গ্রন্থাগারও থাকতে পারে, যে স্কুলে বিভিন্ন বিষয়ের জন্য বিষয়কক্ষ আছে সেই বিষয় কক্ষে বিষয়ানুযায়ী সহায়ক পুস্তক (reference book) রাখতে পারা যায়। বিষয় শিক্ষক গ্রন্থাগারিকের সাথে পরামর্শ করে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে বই নিয়ে বা প্রয়োজন মত বই আনিয়ে বিষয় গ্রন্থাগার খোলবার ব্যবস্থা করবেন। শ্রেণীতে যতটুকু পড়া হয় তার বাইরে কিছু জানতে হলে শিক্ষকের নির্দেশে কৌতূহলী ছাত্র নানারকম বইয়ের সাহায্যে তার জ্ঞান পিপাসা মেটাতে পারে। বিষয় গ্রন্থাগারের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার দায়িত্ব বিষয় শিক্ষক গ্রহণ করবেন। ইচ্ছা করলে তিনি ছাত্রদের সাহায্য নিতে পারেন তার বিষয়ে যেসব নতুন বই বের হচ্ছে সে খোঁজ তিনি রাখবেন ও প্রয়োজনীয় আধুনিক বই সংগ্রহ করবেন।

অনেক সময় দেখা যায় আলমারী বোঝাই বই রয়েছে কিন্তু বই দেবার ব্যবস্থা নেই ছেলেদেব দিক থেকেও বই পড়বার আগ্রহ নেই; যদি ছাত্ররা বই পড়ার সুযোগ না পেল তাহলে বই রাখার সার্থকতা কি? ছেলেদের মধ্যে বই পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি একটা বড় কাজ। ছেলেবেলা থেকেই তাদের মধ্যে পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এজন্য ছেলেদের মন ভুলানো সুন্দর সুন্দর ছবির বই রাখতে হবে, আর যাতে সেই বই তারা পড়ে সেদিক লক্ষ্য রাখতে হবে। একটু বড় হলে যখন নানা বিষয়ে জানতে আগ্রহ হবে তখন বিষয় শিক্ষক তাদের উৎসাহ দেবেন কি বই কোন বয়সে ও কোন স্তরে পড়তে হবে সে সম্পর্কে পরামর্শ দেবেন। ছেলেদের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস সৃষ্টি হবে ও ছেলেরা গ্রন্থাগার থেকে বই নিয়ে পড়লেই বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার রাখার সার্থক হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রধানশিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকবৃন্দ

বিদ্যালয়ে অভিভাবকরা ছেলেদের পাঠান লেখাপড়া শিখতে। লেখাপড়া শেখাটাই বিদ্যালয়ে আসবার মূল্য, এছাড়াও তাদের অনেক কিছু জানবার, শিখবার আছে। বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য সমাজের উপযুক্ত নাগরিকরূপে গড়ে তোলা। বিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্য দিয়ে যদি ছেলেদের সব দিক থেকে উপযুক্ত করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার মত করে দিতে হয় তাহলে সেখানে আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন সুপরিচালনার। বিদ্যালয় যদি সুপরিচালিত না হয় তা হলে ভাল বিদ্যালয় গৃহ, মূল্যবান আসবাবপত্র উপযুক্ত শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা না থাকলে, কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে না, শিক্ষকদের কাজে উৎসাহ থাকবে না। যেখানে শৃঙ্খলার অভাব, সুপরিচালনার অভাব সেখানে সুশিক্ষার ব্যবস্থা হতেই পারে না। স্কুলে ছেলেরা সুশিক্ষা পাবে কি না এটা কারো ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা চেষ্টার ব্যাপার নয়—এটা শিক্ষকদের সমষ্টিগত চেষ্টার ফল। দলগতভাবে কাজ করে সাফল্য লাভ করতে হলে প্রয়োজন একজন উপযুক্ত দলনেতা। দলনেতার নির্দেশ ও পরামর্শে দলগত প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হবে। উপযুক্ত শিক্ষকদের সমষ্টিগত প্রচেষ্টা সফল হতে পারে যদি তাদের পশ্চাতে থাকেন একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন অভিজ্ঞ পরিচালক বা নেতা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকই এই নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন। বিদ্যালয় তরণীর তিনিই হচ্ছেন কর্ণধার। তিনি শুধু পরিচালকই হবেন না—তিনি তার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, উদ্যমশীলতা, কর্তব্যপরায়ণতা, নিরপেক্ষতা, সহানুভূতি, সংগঠনী শক্তি প্রভৃতি দ্বারা সহকারী শিক্ষকদের মনে অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করবেন।

আমরা জানি যেখানে নেতৃত্ব সেখানেই দায়িত্ব। স্কুল নেতা প্রধান শিক্ষকের একটা বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। প্রধান শিক্ষক যাদের পরিচালনা করবেন তারা বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, কর্মশক্তিতে কোন অংশেই ন্যূন নন্। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় দু'চার জন শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রধান শিক্ষকের সমকক্ষ বা অধিকতর শিক্ষিত। সেক্ষেত্রে তার দায়িত্ব আরো কঠিন। কারখানা ম্যানেজারের মনোভাব নিয়ে স্কুল পরিচালনা করা যায় না। বিদ্যালয়

পরিচালনার ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য নিন্দা তারই প্রাপ্য। প্রধান শিক্ষককে দিয়েই অনেক সময় স্কুলের বিচার করা হয়। তাই বলা হয় – As is the Head Master so is the school. কোন স্কুলে অনেক ভাল শিক্ষক থাকতে পারে কিন্তু প্রধান শিক্ষক যদি সুপরিচালক না হন তাহলে সে স্কুল সুনাম অর্জন করতে পারে না।

প্রধান শিক্ষক নেতা সেজন্য তার স্বৈরাচারী মনোভাব থাকবে না। ক্ষমতা আছে বলেই ক্ষমতার প্রয়োগ করে আনুগত্য আদায় করবেন একথা যদি কেউ মনে করেন তিনি তাহলে সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক হতে পারবেন না। সহকারী শিক্ষকদের স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতাই সর্বত্র কাম্য। প্রধান শিক্ষক কখনই মনে করবেন না স্কুল আমার এবং সহকারী শিক্ষকেরা আমার কর্মচারী। স্কুল আমাদের, স্কুলের সমস্যা আমাদের সমস্যা, এর সুনাম দুর্নাম সাফল্য ও ব্যর্থতার জন্য আমরা সমভাবে দায়ী শিক্ষকদের মধ্যে এই মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষকদের দায়িত্বের অংশীদার করে নিতে হবে। তাহলে প্রধান শিক্ষকের সাথে তারাও মনে করবেন স্কুলের কর্মনীতি নির্দ্ধারণে আমার একটা দায়িত্ব আছে। কার্যপদ্ধতি রূপায়ণে আমার একটা দায়িত্ব আছে। এই মনোভাব সৃষ্টি হলে শিক্ষকদের সহযোগিতা প্রধান শিক্ষকের পক্ষে সহজ লভ্য হবে। এমন পরিস্থিতিরও উদ্ভব হতে পারে যেখানে প্রধান শিক্ষকের সাথে সহকারী শিক্ষকদের মতবিরোধ হচ্ছে তিনি সে ক্ষেত্রকে সংকোচিত করে আনবার চেষ্টা করবেন। খোলাখুলি আলোচনার মাধ্যমে অনেক সময় মত বিরোধের অবসান ঘটে। প্রধান শিক্ষক মনে রাখবেন সংঘর্ষকে এড়িয়ে চলতে পারাটাই সর্বক্ষেত্রে কাম্য। এজন্য তাকে tactful হতে হবে। তবে যেখানে কোন মূলনীতির প্রশ্নে বিরোধ যেখানে জোড়াতালি চলে না সেক্ষেত্রে তিনি তার কর্তব্য কর্মে অবিচলিত থাকবেন।

স্কুল পরিচালনার বৃহত্তর স্বার্থে অনেক সময় অপ্রিয় কাজ প্রধান শিক্ষককে করতে হয়। তবে তিনি যেন কেবলমাত্র শিক্ষকদের দোষ অনুসন্ধান করে করে না বেড়ান, কারণ এরূপ কাজের জন্য সহকারীদের মধ্যে যদি সহযোগিতার অভাব ঘটে তাহলে তার প্রতিক্রিয়া স্কুলের কাজে প্রতিফলিত হতে বাধ্য। সহকারীদের সহযোগিতা, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস প্রধান শিক্ষকের সাফল্যের জন্য অত্যাবশ্যক। প্রধান শিক্ষক হবেন কর্তব্যপরায়ণ সহকারীর সহৃদয় বন্ধু ও পরামর্শদাতা। তিনি নিজে যদি পক্ষপাতশূন্য, ন্যায়পরায়ণ ও কর্তব্যনিষ্ঠ

হন তাহলে তার চরিত্র প্রভাবে শিক্ষক ও ছাত্ররা সমভাবে তাকে শ্রদ্ধা করবে ভালবাসবে, তার নেতৃত্ব বিনাদ্বিধায় স্বীকার করে নেবে।

প্রধান শিক্ষকের বহুবিধ কর্তব্য রয়েছে, স্কুলের সর্ববিধ কাজেই তার দৃষ্টি সজাগ থাকবে। তিনি যদি নিষ্ঠার সাথে কর্ত্তব্য পালন করেন তাহলেই তার স্কুল সুপরিচালিত হবে। যে সব কাজ প্রধান শিক্ষককে করতে হয়, তত্ত্বাবধান ও প্রশাসনিক (supervision and administration) দায়িত্ব পালন তার মধ্যে অন্যতম। এছাড়া শ্রেণীতে শিক্ষাদানও তাকে করতে হয়।

বিদ্যালয় পরিচালনা সংক্রান্ত বহু কাজে প্রধান শিক্ষক ব্যস্ত থাকেন এজন্য শ্রেণীতে শিক্ষাদানের জন্য তিনি খুব কম সময় পান, তবু তাকে শ্রেণীতে শিক্ষাদানের জন্য কিছু সময় রাখতে হবে। প্রধান শিক্ষক যেন ভুলে না যান তিনিও একজন শিক্ষক। প্রতিদিন ২।৩টি পিরিয়ড তিনি ক্লাস নেবেন। সম্ভব হলে নীচের দিকেও ক্লাস রাখার চেষ্টা করবেন। পারদর্শন ও প্রশাসনিক কাজ দেখতে গিয়ে যদি তিনি পড়ানোর কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখেন তাহলে তার পক্ষে মস্ত ভুল হবে। পড়ানোর মধ্য দিয়ে তিনি ছেলেদের সাথে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারবেন। শিক্ষক ছাত্রের প্রীতির সম্পর্ক শিক্ষা-কর্মের মধ্য দিয়ে যেভাবে গড়ে উঠবে অন্য কোনভাবে তা গড়ে ওঠবার সম্ভাবনা নেই। অফিসের কাজ সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করে আদর্শ প্রধান শিক্ষক হওয়া যায় না। শিক্ষাদান কার্যের মধ্য দিয়ে তিনি শিক্ষকদের আদর্শ স্থানীয় হবেন, ভাল পড়িয়ে ছেলেদের শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন হবেন। তিনি যদি শিক্ষাকার্য্য থেকে বিরত হন তাহলে পাঠদান পদ্ধতির সাথে যোগা-যোগ হারিয়ে ফেলবেন। শুধু বারান্দায় ঘুরে আর শিক্ষকদের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে স্কুলে কি পড়া হচ্ছে তার সঠিক হিসাব রাখতে পারবেন না। নিজের ক্লাস তিনি করবেন, এছাড়া মাঝে মাঝে অন্য শিক্ষকের ক্লাস তিনি নিবেন তাহলে বুঝতে পারবেন বিভিন্ন বিষয় কিরূপ পড়ান হচ্ছে। সাধারণভাবে শ্রেণীর প্রগতির ধারাকে বুঝতে হলে (supervision class) তাকে নিতে হবে। স্কুলের পাঠ প্রগতি ও শিক্ষার মানের যদি অবনতি লক্ষ্য করেন তাহলে শিক্ষকদের সাথে সে সম্পর্কে আলোচনা করবেন ও কি করে শিক্ষার মানের উন্নতি সাধন হয় সে বিষয়ে সচেষ্ট হবেন।

তত্ত্বাবধান (supervision) :—তত্ত্বাবধানের কাজ বলতে সব রকম কাজ বোঝায় কথাটা অত্যন্ত ব্যাপক, স্কুলের এমন একটি দিক নেই যে দিক সম্পর্কে প্রধান শিক্ষক অবহিত থাকবেন না। শিক্ষকদের কাজ, ছেলেদের লেখাপড়া,

ঘরের কাজ, খেলাধূলা, হোষ্টেল পরিদর্শন, ছেলেদের নৈতিক, দৈহিক, বৌদ্ধিক, মানসিক বিকাশের অগ্রগতির ধারা কোনটাই তার নজর এড়িয়ে যাবে না। অফিস সংক্রান্ত সমস্ত কাজ তিনি তত্বাবধান করবেন। প্রধান শিক্ষকের তত্বাবধানের কাজ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়—হিসাব ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাতাপত্রাদি ঠিক ভাবে রাখা হচ্ছে কিনা সেদিকে দৃষ্টি রাখা, শিক্ষকদের শিক্ষণ সম্পর্কীয় কাজের তদারকী ও স্কুলের সাধারণ উন্নতি।

খাতাপত্রাদি ও হিসাব ঃ—বিদ্যালয়ের কাজের জন্য বহু প্রকার খাতা ও ফাইল রাখতে হয়। সে সব যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব কেরাণীর প্রধান শিক্ষক দেখবেন কাজগুলি ঠিকমত হচ্ছে কিনা। প্রধান শিক্ষক মাসে একবার শ্রেণীর হাজিরা বই দেখবেন। ছেলেদের মধ্যে অনুপস্থিতির হার সম্পর্কে তাকে জানতে হবে—এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তিনি ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। বছরের সুরুতে যখন ভর্তি ও টান্সফার হচ্ছে সে সময় তিনি নিয়মিত খোঁজ রাখবেন। কোন শ্রেণীতে কতজন নতুন ছাত্র নেওয়া হবে, কোন শ্রেণীতে কয়টি বিভাগ থাকবে ইত্যাদি স্থির করে তিনি ভর্তি নিয়ন্ত্রণ করবেন।

ক্যাস বই যাতে রোজ লেখা হয় তা দেখবেন। মাইনে আদায়েব রসিদ বইয়ের গাথে জমার টাকা মাঝে মাঝে মিলিয়ে চেক করে নেবেন, Acquintance roll মাইনা দিবার দিনই দেখে সই করবেন। P.F.এব টাকা নিয়মিত জমারব্যবস্থা করবেন। Games Fund, Library Fund, Examination Fund, Building Fund প্রভৃতি সম্পর্কেও প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব বযেছে। বিভিন্ন ফাণ্ডে যে জন্য টাকা আদায় করা হচ্ছে সেই উদ্দেশ্যেই যাতে টাকা খরচ হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। প্রধান শিক্ষক নিজে টাকা জমা নিচ্ছেন না, হিসাব তিনি রাখছেন না, খরচ তার ইচ্ছায় সব সময় হচ্ছে না—তবু স্কুলের অর্থের যথাযথ হিসাব রাখা হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে তাকে দৃষ্টি রাখতে হবে। অর্থ সম্পর্কে সম্পাদকের সমান দায়িত্ব তারও রয়েছে।

যে স্কুলের সাথে ছেলেদের হোষ্টেল আছে তার পরিচালনার জন্য Hostel Superintendent থাকবে। হোষ্টেলের দৈনন্দিন ব্যাপারে প্রধান শিক্ষকের কিছু করণীয় নেই। কিন্তু তিনি মাঝে মাঝে হোষ্টেল পরিদর্শন করবেন। হোষ্টেলের শৃঙ্খলা সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখবেন প্রয়োজন হলে হঠাৎ গিয়ে (Surprise Visit) দেখবেন ছেলেরা রাতে ঠিকমত আছে কিনা পড়ছে কিনা? তাদের সুবিধা অসুবিধার কথা শুনে প্রতিকারের চেষ্টা করবেন। স্বাস্থ্যসম্মত খাবার ছেলেরা পাচ্ছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

শিক্ষাকার্যের তত্ত্বাবধানঃ—শ্রেণীর পাঠ পরিচালনার জন্য প্রথম প্রয়োজন সময় তালিকা প্রণয়ন। কাজটি জটিল কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোন শিক্ষক কোন বিষয় কোন শ্রেণীতে পড়াবার উপযুক্ত বিচার করে শিক্ষকদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দিতে হবে। প্রবীণ বিষয় শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে এবং সাধারণ ভাবে শিক্ষকদের সুবিধা অসুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখে সময় সময় তালিকা রচনা করলে অনেক অভিযোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সময় তালিকা অনুসারে কাজের প্রগতি কি ভাবে হচ্ছে সে সম্পর্কে খোঁজ নিতে হবে এবং প্রয়োজন হলে অবস্থার উন্নতির জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

প্রতিদিন প্রধান শিক্ষক স্কুলে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা ঘুরে দেখবেন। যা কিছু স্কুলে ঘটে তার দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের,তাই ক্লাস পরিদর্শনের কাজ তিনি নিয়মিত করবেন। এজন্য সব সময় ক্লাসে ঢুকতে হবে এমন কোন কথা নেই। বারান্দায় ঘুরে যদি কাজ হয়, কি বাইরে দাঁড়িয়ে যদি ক্লাসের কাজ লক্ষ্য করা যায় তাহলে সব সময় ক্লাসে ঢুকে শিক্ষকের কাজের অসুবিধা করা উচিত না। পরিদর্শন কালে কোন ত্রুটি লক্ষ্য করলে তা নোট করে রাখবেন পরে শিক্ষকের সাথে সে সম্পর্কে আলাপ করবেন তাকে উপদেশ দেবেন। কাজটি এমন ভাবে করতে হবে যাতে শিক্ষক মনে করেন এটা তার ভালর জন্যই করা হয়েছে। সহকারী শিক্ষকরা যেন মনে রাখেন প্রধান শিক্ষক যা করছেন তা স্কুলের সামগ্রিক উন্নতির জন্যই করছেন। সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব মূলক মনোভাব নিয়ে প্রধান শিক্ষক যদি সহকারী শিক্ষকদের ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধন করতে অগ্রসর হন তাহলে গঠন মূলক যে কোন পরামর্শ শিক্ষকেরা গ্রহণ করবেন বলে বিশ্বাস করি। তবে মনে রাখতে হবে কোন অবস্থায় শিক্ষককে ছাত্রদের সামনে এমন কিছু বলবেন না যাতে তিনি বিব্রত বোধ করতে পারেন। শিক্ষকের শিক্ষণ পদ্ধতি বা যেই বিষয়ই হোক তা তিনি পরে আলোচনা করবেন।

শিক্ষকদের সভায় শিক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে যদি সাধারণ ভাবে আলোচনা করা হয় তাহলে সমস্ত শিক্ষক একটা নির্দিষ্ট শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন। শিক্ষকরা পাঠটীকা রচনা করে পড়াচ্ছেন কিনা, কি ভাবে পড়ালে বছরের মধ্যে নির্দিষ্ট পাঠক্রম পড়ান সম্ভব হবে, বাড়ীর কাজ দেওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করে নিয়ে একটা নীতি নির্দ্ধারণ করে নিলে প্রধান শিক্ষকের কাজের সুবিধা হয়। প্রধান-শিক্ষক তার বক্তব্য বুঝিয়ে দেবেন তারপর লক্ষ্য রাখবেন পরিকল্পনা মত কাজ অগ্রসর হচ্ছে কিনা।

শ্রেণী পরীক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে প্রধান শিক্ষকের একটা গুরু দায়িত্ব রয়েছে। পরীক্ষা গ্রহণের যাবতীয় ব্যবস্থা তিনি করবেন। কোন শিক্ষক কোন বিষয়ের প্রশ্ন রচনা করবে কোন শিক্ষক কোন বিষয়ের উত্তরপত্র পরীক্ষা করবে তিনি সে সম্পর্কে নির্দেশ দেবেন। প্রশ্ন পত্রের গোপনীয়তা যাতে রক্ষিত হয় সে সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। যথা সম্ভব তিনি প্রশ্নপত্রগুলি দেখে দেবেন। প্রশ্নের মান রক্ষা অর্থাৎ অতি কঠিন বা অতি সহজ প্রশ্ন যাতে রচিত না হয় তা তিনি লক্ষ্য রাখবেন। গতানুগতিক প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন সাধনে প্রধান শিক্ষকের একটী ভূমিকা রয়েছে। প্রশ্ন পত্র রচনা সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে তিনি শ্রেণী পরীক্ষা পদ্ধতির কিছুটা পরিবর্তন করতে পারেন। তিনি পরীক্ষিত উত্তর পত্রের মধ্যে বেছে নিয়ে কিছু খাতা দেখতে পারেন। উত্তর পত্র পরীক্ষায় ঠিক মত নম্বর দেওয়া হচ্ছে কিনা মোটামুটি একই মান রক্ষিত হচ্ছে কিনা সেদিকে তিনি লক্ষ্য রাখবেন। ক্লাস প্রমোশন, প্রগতি পত্র প্রেরণ, ত্রৈমাসিক পরীক্ষার ফলা ফলের প্রতি অভিভাবকের দৃষ্টি আকর্ষণ প্রভৃতি ব্যাপারেও দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের।

প্রতি বছর শ্রেণীর ব্যবহারের জন্য পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন প্রধান শিক্ষকের আরেকটি দায়িত্ব পূর্ণ কাজ। এ সম্পর্কে তিনি প্রবীণ বিষয় শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করে তিনি কর্তব্য নির্দ্ধারণ করবেন। বছর শেষ হবার আগেই তিনি বিষয় শিক্ষকদের কাছ থেকে জেনে নেবেন কোন বই সম্পর্কে কোন অভিযোগ আছে কিনা। যদি কোন বিষয়ের কোন বই পরিবর্তন আবশ্যক বলে বিবেচিত হয় নমুনা কপি থেকে সে বিষয়ের বই পড়ে বিষয় শিক্ষককে তার মতামত জানাতে বলবেন। সম্ভব হলে প্রধান শিক্ষক নিজেও সেই পড়ে দেখবেন তারপর শিক্ষক সভায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে অবশ্য এই সিদ্ধান্ত স্কুল পরিচালক সমিতির অনুমোদন সাপেক্ষ। বই পরিবর্তনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে বই যেন ঘন ঘন পরিবর্তন না হয়। অভিভাবকের আর্থিক সঙ্গতি বিচার করে দেখতে হবে তাদের উপর যেন অযথা চাপ না পড়ে। অভিযোগ না থাকলে তিন বছরের আগে কোন বই পরিবর্তন করা উচিত নয়। বইয়ের লেখকের নাম দেখে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। সাধারণ স্তরের বইয়ের সাথে ও অনেক সময় বড় বড় নাম পাওয়া যায়। পুস্তক নির্বাচনের চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রধান শিক্ষকের তবে তিনি বিষয় শিক্ষকের মতামত নিয়েই চূড়ান্ত করবেন।

সাধারণ তত্ত্বাবধান :—শিক্ষা ও প্রশাসনিক কাজ ছাড়াও প্রধান

শিক্ষকের আরো অনেকগুলি কাজ রয়েছে যার উপর সাধারণ ভাবে তাকে নজর রাখতে হবে। যেমন খেলাধূলা, শরীর চর্চা, নৈতিক চরিত্র গঠন ইত্যাদি। শিক্ষায় সহ-পাঠক্রমিক কার্য্যাবলীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আজ আর দ্বিমতের অবকাশ নেই। শ্রেণী কক্ষের বাইরে শিক্ষার্থীর কাজের সন্ধান ও আমাদেব রাখতে হবে। মূল্যায়নে শুধু বিষয়গত কৃতিত্বের কথা বিচার করা হবে না। সাধারণ বইয়ের পড়ার বাইরে শিক্ষার্থী বিভিন্ন দিকে যে কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছে তাও বিচাব কবে দেখতে হবে। স্কুলের সময় তালিকায় সহপাঠক্রমিক কার্যবলীকে আজ স্থান দেওয়া হয়েছে। বৌদ্ধিক বিকাশের সাথে সাথে দেহের পুষ্টিব ব্যবস্থা যদি না থাকে তাহলে সামগ্রিক ভাবে জাতীয় স্বাস্থ্যেব অবনতি ঘটবে। খেলাধূলা ব্যায়াম, ড্রিল সব কিছুই ছেলেরা করবে। এজন্য ব্যায়াম শিক্ষক থাকবেন কিন্তু প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকেরা ও দূরে সরে থাকবেন না। প্রধান শিক্ষক খেলাধূলা সম্পর্কে ছেলেদেব উৎসাহ দেবেন এবং নিজে মাঝে মাঝে খেলাধূলার সময় উপস্থিত থাকবেন। ছেলেদের স্বাস্থ্যের দিকে তিনি দৃষ্টি রাখবেন। ছেলেদেব স্কুল থেকে বাৎসরিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। কোন ছেলের ক্রমাগত স্বাস্থ্যেব অবনতি হচ্ছে লক্ষ্য করলে সে সম্পর্কে অভিভাবকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন ও ডাক্তারের উপদেশ যথাযথ পালিত হচ্ছে কিনা তা দেখবেন।

ছাত্রদের সাথে সম্পর্ক:—স্কুলের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনায় স্কুলের সাথে জড়িত বহুলোক ও বিষয়ের সাথে প্রধান শিক্ষককে সম্পর্ক রাখতে হয়। সবার সাথে প্রীতির সম্পর্ক বজায় রেখে সব অবস্থায় নিজেকে মানিয়ে চলা কঠিন কাজ, কিন্তু এখানে ত্রুটি থাকলে প্রধান শিক্ষক দুর্নামের ভাগী হবেন।

প্রথমেই আসা থাকে ছাত্রদের সাথে প্রধান শিক্ষকের সম্পর্কের কথায়। শিক্ষা জীবনের সাফল্য নির্ভর করে ছাত্র শিক্ষকের প্রীতির সম্পর্কের উপর। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য গুরুশিষ্যের মধুর সম্পর্ক। আচার্যের সাথে শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ছিল পিতা পুত্রের পবিত্র সম্পর্ক। বৈশ্যযুগে শিক্ষকতাকে আমরা ব্রত বলে মনে করি না—এটা হচ্ছে আমাদের বৃত্তি। মানুষ গড়ার যে বৃত্তি শিক্ষকরা গ্রহণ করছেন সেই বৃত্তিতে স্নেহ ভালবাসায় ছাত্রকে একান্ত আপন করে নিতে হবে। প্রধান শিক্ষক যদি তার ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত থেকে ছাত্রদের দূরে সরিয়ে রাখেন, তাদের

কাছে নিজেকে ভীতির বা রহস্যের বস্তু করে তোলেন তা হলে তিনি ভুল করবেন। প্রধান শিক্ষক তার পদোচিত গাম্ভীর্য বা মর্যাদা রক্ষা করে চলবেন। কিন্তু তা ছাত্র সমাজ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে নয়। তিনি যথা সম্ভব ছেলেদের সাথে মিশবেন—প্রত্যেক ছেলেকে তিনি জানবার চেষ্টা করবেন। তিনি হবেন ছেলেদের Friend, philosopher and guide. ছোট স্কুলে ছেলেদের চিনে রাখতে কষ্ট হয় না। কিন্তু বড় স্কুলে যেখানে ছাত্র সংখ্যা অনেক সেখানে অসুবিধা একটু বেশী। প্রধান শিক্ষক যদি নীচের দিকে ক্লাস নেন তাহলে সুবিধা হয়। তিনি সুরুতে ছেলেদের চিনে রাখতে পারবেন। ছেলেরাও বুঝতে পারবে তাদের প্রধান শিক্ষক কি প্রকৃতির তিনি কি চান, কি পছন্দ করেন, তারাও সেই ভাবে চলতে পারবে। ছোট ছেলেদের জীবনে প্রধান শিক্ষকের প্রভাব বেশী কার্যকারী হবে। এই প্রভাব সৃষ্টি হবে ভীতির মধ্য দিয়ে নয় প্রীতির মধ্য দিয়ে—অবশ্য প্রীতির সাথে একটা শ্রদ্ধা মেশান থাকবে। ছেলেরা যেন বুঝতে শেখে স্কুলের নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চললেই তারা শিক্ষকদের প্রীতি ভাজন হবে নচেৎ নয়।

ছাত্রদের সাথে শিক্ষকদের সম্পর্ক শ্রেণীকক্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। শ্রেণীকক্ষের বাইরে খেলার মাঠে ও অন্যান্য গঠন মূলক কাজে প্রাধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকরা উৎসাহী হবেন। প্রধান শিক্ষক অনেক সময় প্রবীণ বা বৃদ্ধ হতে পারেন কিন্তু মনের দিক থেকে থাকবেন সতেজ, সদা প্রফুল্ল ও সর্ব ব্যাপারে উৎসাহী।

ছাত্র সমাজে ক্রমবর্দ্ধমান শৃঙ্খলাহীনতার কারণ স্বরূপ অনেকে নির্দেশ করেছেন ছাত্র শিক্ষকদের যোগাযোগ বর্তমানে অত্যন্ত ক্ষীণ—ছাত্রদের সাথে সম্পর্ক যাতে নিবিড় হয়, আরো মধুর হয় সেদিকে সচেষ্ট হওয়া দরকার। প্রধান শিক্ষকের চরিত্রের প্রভাব ও অন্যান্য শিক্ষকদের সাথে ঘনিষ্ঠতার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের আচার ব্যবহারে অনেক পরিবর্তন ঘটান সম্ভব। ছাত্রদের যদি মনের মত করে গড়ে তুলতে হয় তাহলে আদর্শবাদী শিক্ষক তাদের সাথে মিশবেন। ব্যক্তিগত ছাত্রের জীবনে যে সমস্যা তা জেনে তাকে উপদেশ দেবেন, শিক্ষায় তাকে সহায়তা করবেন সর্বভাবে তিনি হবেন তা সুহৃদ। মানুষ গড়ে তোলার দায়িত্ব যারা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন—যাদের গড়ে তুলবেন তাদের দূরে সরিয়ে রাখলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। প্রধান শিক্ষকের দ্বারাও শিক্ষকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যাতে সৃষ্টি হয় সেজন্য প্রধান শিক্ষক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে—"It should be borne in mind that every head teacher

worthy of the name is generally regarded by his scholars an ideal personality, possessing extraordinary knowledge and gifted too, beyond the run of ordinary mortals. Honour justice, truth are presumed to govern all his actions. This general and illimitable faith combined with the reality of his own powers, are forces which he can direct to perfect the organisation and control of his school. The greatest care and circumspection are of course necessary if scholars ideal is to remain unsullied and unshattered amidist the daily provocations to which he is subjected. Self watchfulness ought to be his constant sentinal (Bray :—School Organisation)

সহকারী শিক্ষকদের সাথে সম্পর্ক ও শিক্ষকসভা :—বিদ্যালয় সমাজের নেতা প্রধানশিক্ষক—তিনি তার স্কুলের শিক্ষকদেরও নেতা। একজন ভাল নেতার যে সব গুণ থাকা দরকার তিনি সেই সব গুণের অধিকারী হবেন। সহ-শিক্ষকদের সহযোগিতা ব্যতীত স্কুল চালান যায় না। প্রধান শিক্ষক ক্ষমতার মধ্য দিয়ে নয় তাদের সুখ সুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখে তাদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করতে হবে। প্রধান শিক্ষক যদি তার কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে পালন করেন তাহলে তার কাজের মধ্য দিয়ে সহকারীরা অনুপ্রাণিত হবেন। ধমক দিয়ে বা আইন দেখিয়ে আজকাল কাজ পাওয়া খুবই কঠিন। বিদ্যালয়ের সব ব্যাপারে শিক্ষকদের সমান আগ্রহ রয়েছে বলে মনে ক ়তে হবে। নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষা, সারা বছরের কাজের পরিকল্পনা ও স্কুলের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষকদের সাথে আলাপ আলোচনা করে স্থির করা সঙ্গত। কোন বিষয়ে মতের অমিল হলে যথাসম্ভব বুঝিয়ে শিক্ষকদের স্বমতে আনবার চেষ্টা করবেন। সবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটা কিছু চাপিয়ে দিলে তা কার্যকরী করবার পথে শিক্ষকেরা পরোক্ষভাবে অসহযোগিতা করবে। বুঝিয়ে যদি তাদের স্বমতে আনা যায় তাহলে কোন পরিকল্পনা রূপায়ণে অসুবিধা হবার কথা নয়।

প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের মধ্যে বর্তমানে কিছুটা সহযোগিতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। সর্বত্র এর কারণ একই রকম নয় তাই স্থানকাল পাত্রভেদে রোগের কারণ নির্ণয় করে প্রতিকারের চেষ্টা করতে হবে। অনেক সময় শিক্ষকদের এমন সব অভিযোগ থাকে যা প্রধান শিক্ষকের প্রতিকারের ক্ষমতার বাইরে। প্রধান শিক্ষক সেখানে খোলাখুলি ভাবে তার অসুবিধার কথা তাদের জানাবেন। স্কুল সংক্রান্ত কিছু কিছু গোপনীয় বিষয় আছে যা

তিনি গোপন রাখবেন এছাড়া স্কুল সম্পর্কীয় সব বিষয়ে অযথা গোপনীয়তা রক্ষা করবার কোন প্রয়োজনীতা আছে বলে মনে হয় না।

প্রধান শিক্ষক সহকারী শিক্ষকদের কাজে যথেষ্ট স্বাধীনতা ও সুযোগ দেবেন, সেই সাথে স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার হচ্ছে কিনা। সঙ্গতিশীল শিক্ষকেরা যথাযথ ভাবে দায়িত্ব পালন করবেন এই আশা করা উচিত কিন্তু তবু যদি কোথাও ভুল ত্রুটি থাকে প্রধান শিক্ষক তা দেখিয়ে দিয়ে কি করে ভুল সংশোধন করা যায় সে সম্পর্কে উপদেশ দেবেন। বাস্তব অবস্থা বিচার করে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে প্রধীন শিক্ষক অন্যান্য শিক্ষকদের সাথে শান্তি ও প্রীতিব সম্পর্ক বজায় রাখবেন। ✓

প্রত্যেক স্কুলেই শিক্ষকসভা (teachers council) রয়েছে। স্কুল পরিচালনায় শিক্ষকদের বক্তব্য ও মতামত প্রকাশ কববাব সুযোগ দেবার জন্য এই শিক্ষক সভা। প্রধান শিক্ষক শিক্ষকসভাব সভাপতি। তাঁব অনুপস্থিতিতে সহকারী প্রধান শিক্ষক সভার সভাপতিত্ব করবেন। সম্পাদক প্রধান শিক্ষক মনোনীত না করে শিক্ষকদের উপর নির্বাচনের দায়িত্ব দিলেই ভাল হয়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষক সভার সম্পাদক নির্বাচিত হবেন তাই বাঞ্ছনীয়। প্রধান শিক্ষক স্কুল পরিচালনার কাজে শিক্ষক সভাকে তার পরামর্শ সভা মনে কববেন। স্কুলের সমস্ত শিক্ষকই শিক্ষক সভার সভ্য, মাসে একবার প্রয়োজন হলে আরো ঘন ঘন শিক্ষক সভা আহ্বান করা হবে।

শিক্ষক সভায় প্রধান শিক্ষক স্কুলের বিভিন্ন সমস্যা শিক্ষকদের কাছে উপস্থিত করবেন—সেখানে আলোচনা করে যদি যুক্তভাবে নানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় তাহলে কাজের সুবিধা হবে। সহকারী শিক্ষকদের টাইম টেবিল আব পাঠক্রম জানিয়ে দিলেই স্কুলের কাজ এগিয়ে চলে না। সারা বছরের কাজ ঠিক করে নিয়ে সেই কাজ কি করে ভাগ করে নিলে ছেলেদের সুবিধা হয় পাঠেব অগ্রগতি পর্য্যালোচনা, পরীক্ষা ব্যবস্থা, পড়ার বাইরে খেলাধুলা, লাইব্রেরী পরীচালনা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অর্থাৎ স্কুলের যাবতীয় কাজ শিক্ষক সভায় আলোচনা করা যেতে পারে। খোলাখুলি আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে ও দায়িত্ব বণ্টন করে দেওয়া হলে শিক্ষকরা সর্ব বিষয়ে সহযোগিতা করবেন। প্রধান শিক্ষক একটি গণতান্ত্রিক সমাজের প্রধান। সেই সমাজের প্রত্যেক সদস্যের কিছু বলবার থাকতে পারে শিক্ষক সভায় সমস্ত শিক্ষক তাদের বক্তব্য বলবার সুযোগ দিতে হবে।

প্রধান শিক্ষক তার সহকারীদের উপর আস্থা রাখবেন। শিক্ষক সভায় তিনি তাদের নেতৃত্ব করবেন। সাধারণ অসুবিধা অভিযোগ শুনে কি করে তার প্রতিকার করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করবেন। তাদের ন্যায্য দাবী পরিচালক মণ্ডলীর সাহায্যে পূরণ করবার চেষ্টা করবেন। শিক্ষক সভায় ব্যক্তিগত অভাব অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করা উচিত নয়, এগুলি প্রধান শিক্ষকের সাথে পৃথকভাবে আলোচনা করে প্রতিকার করা উচিত। শিক্ষক সভায় যথা সম্ভব সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার চেষ্টা করা উচিত। ভোট না নিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ বা অগ্রাহ্য করা উচিত নয়। প্রধান শিক্ষক যদি মনে করেন কোন প্রস্তাব স্কুলের স্বার্থের বিরোধী তাহলে সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করবেন। সভার বিবরণ, যেসব প্রস্তাব সভায় আনীত ও গৃহীত হল তার স্বপক্ষে ও বিপক্ষের বক্তব্য সংক্ষেপে ঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে।

• অভিভাবকদের সহিত সম্পর্ক :— (পরবর্তী অধ্যায় দেখুন)

বিদ্যালয় পরিচালক সমিতির সহিত সম্পর্ক : —স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব পরিচালক বা কার্যকরী সমিতির কিন্তু কার্যতঃ স্কুল পরিচালনা করেন প্রধান শিক্ষক কার্যকরী সমিতি নীতি নির্দ্ধারণ করেন ও নানারূপ নির্দেশ দেন কিন্তু তাকে বাস্তব রূপ দেন পরিচালক সমিতি। পরিচালক সমিতির সহিত প্রধান শিক্ষকের সম্পর্ক হবে সহযোগিতামূলক। পরিচালক সমিতিকে নিরপেক্ষভাবে সঠিক তথ্য প্রধান শিক্ষক জানাবেন। তার প্রয়োজন সুবিধা অসুবিধা কার্যকরী সমিতির কাছে উপস্থাপন করবেন। প্রধান শিক্ষক ও কার্যকরী সমিতির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হলে তা সমগ্র স্কুলের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। প্রধান শিক্ষক। স্থানীয় রাজনীতি বা গ্রাম্য দলাদলির বাইরে থাকবার চেষ্টা করবেন। কার্যকর সমিতিতে মতভেদ হলে তিনি নিরপেক্ষভাবে তার মতামত দেবেন। দলাদলির মধ্যে জড়িয়ে পড়লে তা স্কুলের পক্ষে সমূহ ক্ষতির কারণ হবে।

সহকারী শিক্ষক :—

শিক্ষাবিদগণ শিক্ষার নীতি নির্দ্ধারণ করেন, শিক্ষার রূপ কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে নির্দেশ দেন। সেই আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেন শিক্ষক। বিদ্যালয়ে যে কার্যসূচী রচিত হয় তাকে বাস্তবে রূপায়িত করে তোলবার দায়িত্ব শিক্ষকদের। প্রধান শিক্ষক সমগ্রভাবে স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই দায়িত্ব তিনি যথাযথভাবে পালন করতে পারেন সহকারী শিক্ষকদের সহায়তায়। স্কুলের ভাল বাড়ী, প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র, সুচিন্তিত পাঠক্রম সবকিছু

থাকবার পরও যদি উপযুক্ত শিক্ষক না থাকে তাহলে সে স্কুলে শিক্ষার আয়োজন সার্থক হয়ে উঠবে না। শিক্ষকদের সম্পর্কে বলা হয় a maker of men কথাটা খুব সত্য। একটা জাতিকে গড়ে তুলতে বা ধ্বংস করতে শিক্ষকরা পারেন। শিক্ষার্থীর উপর শিক্ষকের প্রভাব সর্বাধিক। শিক্ষক নানাভাবে ছাত্রজীবনকে প্রভাবিতকরেন। ছাত্ররা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে শিক্ষককে অনুসরণ করেন। তাই Nunn বলেছেন.

The teacher can no more prevent himself from acting on his pupils by suggestion, imitation, sympathy or otherwise than he can himself invisible as he perambulates the class room.

যে শিক্ষকের উপর আগামী যুগের মানুষ গড়ে তোলবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেই শিক্ষকদের কি কি গুণ থাকা উচিত তা শিক্ষানীতি' (principle of Education) বিষয়ভুত। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে তার উল্লেখ করা হবে।

শিক্ষক হবেন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। তিনি হবেন সুস্থ, সবল, পরিশ্রমী কষ্টসহিষ্ণু। সমস্ত কাজে তিনি উৎসাহী ও উদ্যোগী হবেন। স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তির কাছ থেকে উদ্যমশীলতা আশা করা যায় না। তার নেতৃত্বে গহণ করবার ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে।

শিক্ষক হবেন অসীম ধৈর্যশীল। সমস্ত অবস্থায় তার মেজাজ ঠিক রাখতে হবে। যাদের নিয়ে তাকে চলতে হবে তারা অবোধ, অবুঝ, চঞ্চল, কোন সময়ে একগুয়ে। তাদের মানুষ করবাব কঠিন কাজে ধৈযের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। মেজাজ তাকে সব সময় প্রফুল্ল রাখতে হবে। তার মন হবে সহানুভূতিশীল—শিশুদের মন জয় করতে হলে তাদের ভাল বাসতে হবে। স্নেহ, ভালবাসা, সহানুভূতিতে তিনি হবেন পিতৃকল্প। তিনি সব কাজে নিরপেক্ষ হবেন। কোন সময় যেন ছেলেরা মনে করবার সুযোগ না পায় শিক্ষক পক্ষপাতিত্ব করছেন—তাহলে তিনি তাদের চোখে ছোট হয়ে যাবেন। সব রকম নীচতা বা হীনতার উর্দ্ধে থাকবেন শিক্ষক।

শিক্ষক হবেন কর্তব্যনিষ্ঠ। শিক্ষকতায় তার অনুরাগ থাকবে। যে কাজের দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয়েছে তা তিনি নিষ্ঠার সাথে পালন করবেন। যেখানে নিষ্ঠার বা অনুরাগের অভাব সেখানেই আগ্রহের অভাব। তিনি চাকুরী রক্ষার জন্যই চাকুরী করবেন। অন্যক্ষেত্রে তা সম্ভব কিন্তু শিক্ষক যদি তা করেন তাহলে তিনি আদর্শভ্রষ্ট হবেন। শিক্ষক হবেন বুদ্ধিমান, কিছু পরিমাণে

উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারী। শিক্ষক মাত্রেই জানেন ক্লাসে বসেই তাকে অনেক কঠিন সমস্যার সমাধান করতে হবে। নিজের বিষয়ে তার পূর্ণ অধিকার থাকবে। অন্য বিষয়েও তার জ্ঞান থাকবে—তা না হলে ছেলেদের কৌতূহল তিনি মেটাতে পারবেন না।

শিক্ষক হবেন সুদক্ষ কথাশিল্পী। বর্ণনার মধ্য দিয়ে বিষয়বস্তুকে জীবন্ত করে তুলবেন। তার কণ্ঠস্বর হবে জোরাল, উচ্চারণ হবে স্পষ্ট ও শুদ্ধ। তার রসবোধ থাকবে। নীরস পাঠকে সরস করে তুলতে মাঝে মাঝে হাসবার সুযোগ দিতে হবে—কি করে শিক্ষা দিতে হয় সে কৌশল জানতে হবে। সর্বোপরি শিক্ষক হবেন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও চরিত্রবান। তার নীতিবোধ থাকবে প্রখর। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও চরিত্রবান না হলে তিনি ছাত্রসমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারবেন না। 'আপনি আচরিধর্ম শিখাও অপরে,' এ কথাটি শিক্ষকের ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রযোজ্য। শিক্ষকতা একটা বৃত্তি, কিন্তু শুধু যে বৃত্তিরূপেই যে শিক্ষকতাকে গ্রহণ করবেন তিনি কোন দিনই আদর্শ শিক্ষক হতে পারবেন না। শিক্ষকতা শুধু বৃত্তি নয়—শিক্ষক তার কাজকে ব্রতরূপেই গ্রহণ করবেন। তাহলেই শিক্ষক জীবনের বহু দুঃখ দুর্দশার মধ্যে একটা সান্তনা খুজে পাওয়া যাবে।

আদর্শ শিক্ষকের যে সব গুণেব কথা বলা হল একজন মানুষের পক্ষে কি সে সব গুণের অধিকারী হওয়া সম্ভব। বাস্তব ক্ষেত্রে সর্বগুণ সমন্বিত শিক্ষক খুঁজে পাওয়া কঠিন, কিন্তু অর্জিত গুণগুলি ইচ্ছা করলে সমস্ত শিক্ষকই আয়ত্ত করতে পাবেন। আমাদের দেশের শিক্ষকের আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদার মান উচ্চ নয় তাই খুব কমলোকই শিক্ষকতাকে স্বেচ্ছায় বৃত্তিরূপে গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেন। শিক্ষকতা গ্রহণ করবার পর যেন আমরা আদর্শ শিক্ষক হবার চেষ্টা করি। সমাজে শিক্ষকের যে উচ্চ স্থান ছিল তাকে আদর্শ শিক্ষকেরাই ফিরিয়ে আনতে পারেন।

শিক্ষক নির্বাচন করেন বিদ্যালয়ের পরিচালক মণ্ডলী। প্রধান শিক্ষকের সাথে পরামর্শ করে শিক্ষক নির্বাচন করা উচিত। তিনি শিক্ষককে দিয়ে কাজ করবেন তার কি প্রয়োজন তা তিনিই সবচেয়ে ভাল জানেন। সহকারী শিক্ষকের সহায়তায় প্রধান শিক্ষক স্কুলের সর্ববিধ কাজ পরিচালনা করেন তাই সহকারী শিক্ষক নির্বাচনে প্রধান শিক্ষকের মতামত গ্রহণ করা উচিত।

সহকারী শিক্ষক সুশিক্ষক হবেন, শিক্ষকতার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলীর যদি অভাব থাকে সে গুণ তিনি অর্জন করার চেষ্টা করবেন। শ্রেণীতে শিক্ষা দেওয়া ও শ্রেণী শৃঙ্খলা রক্ষা করা তার প্রধান কাজ। তিনি যে বিষয়ে

শিক্ষা দেবেন সে বিষয় তার সম্পূর্ণ করায়ত্ত থাকবে। বিষয়· শিক্ষক হলে তার নিজের বিষয়ে নতুন তত্ত্ব ও তথ্য যা প্রকাশিত হচ্ছে তার সাথে তিনি সংযোগ রক্ষা করবেন। তিনি যাতে ছেলেদের সব রকম প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন সে ভাবে তৈরী হয়ে ক্লাসে যাবেন। শিক্ষাদানের আধুনিক পদ্ধতির সাথে তিনি পরিচিত থাকবেন। নিজের বিষয় আয়ত্ত থাকাই বড় কথা নয় কি পদ্ধতিতে শিক্ষা দিলে তার বক্তব্য ছেলেরা গ্রহণ করবে, তাদের কাছে সহজ বোধ্য করে বিষয়টি উপস্থাপন করবার কৌশল তিনি আয়ত্ত করবেন।

সময় তালিকা অনুসরণ করে পাঠক্রম অনুযায়ী শ্রেণীতে শিক্ষা দেওয়াই সহকারী শিক্ষকের একমাত্র কাজ নয়। স্কুল পরিচালনায় তিনি সর্বভাবে প্রধান শিক্ষককে সাহায্য করবেন। পড়ার বাইরে স্কুলের শৃঙ্খলা রক্ষা একটা বড় কথা, স্কুলের শৃঙ্খলা রক্ষা করা ছাত্র শিক্ষক সবারই কর্ত্তব্য। শিক্ষকরা দেখবেন ছাত্ররা শৃঙ্খলা রক্ষা করছে কি না। শিক্ষকদের জন্য ও কতকগুলি নিয়ম কানুন আছে সহকারী শিক্ষকরা তা মেনে চলবেন। প্রধান শিক্ষকের নির্দেশ তারা মেনে চলবেন। যদি তাদের কিছু বক্তব্য থাকে তা প্রধান শিক্ষককে জানাবেন। তাদের আচরণে যেন কোন অবস্থায় শৃঙ্খলা ভঙ্গের ইংগিত না থাকে। স্কুল পরিচালনায় ও শৃঙ্খলা রক্ষায় সহকারী শিক্ষকেরও একটি দায়িত্ব রয়েছে। তিনিও শিক্ষক সভার একজন দায়িত্বশীল সদস্য। প্রধান শিক্ষকের সাথে তার মালিক কর্মচারীর সম্পর্ক নয়, তিনি তার সহকারী। তাই সহযোগিতাব মনোভাব নিয়েই তিনি কাজ করবেন। সহপাঠ ক্রমিক কার্যবলী পরিচালনায় শিক্ষকদের অংশ গহণ করতে হবে। প্রধান শিক্ষক সহকারীদের সাথে পরামর্শ করে যে ভাবে কাজ ভাগ করে দেবেন তারা সেই ভাবে কাজ করবেন। প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক না থাকলে স্কুলের কাজে নানা রকম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে।

শিক্ষক ছাত্রদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা আজ অপরিহার্যরূপে দেখা দিয়েছে। প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক সবাব পক্ষে ছেলেদের জানার প্রয়োজন আছে। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান বলে যাকে শিক্ষা দেবে তাকে না জেনে শিক্ষা দেওয়া যায় না। ছাত্র জীবনে শিক্ষকের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। ছাত্ররা শিক্ষককে তাদের চলার পথে আদর্শ রূপেই দেখতে চায়। তাই তাদের সাথে মিশবার সময় অত্যন্ত সতর্ক হয়ে মিশতে হবে। শিক্ষকের আচারণে ও কথায় যেন এমন কিছু না থাকে

ছাত্রদের সামনে একটা খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হতে পারে। শিক্ষক সহানুভূতি ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে ছেলেদের সাথে মিশবেন। অনেকে মনে করেন ছাত্রদের সাথে মিশলে, তাদের সাথে খেলা ধূলায় অংশ গ্রহণ করলে মর্যাদার হানি হবে। এ ধারনা ঠিক নয়। শিক্ষক অবশ্যই তার মর্যাদা রক্ষা করে চলবেন; সে জন্য ছেলেদেব দূবে সরিয়ে রাখতে হবে কেন? শিক্ষক যদি মনে করেন শ্রেণীর বাইরে তার কিছু করবার নেই তাহলে তিনি ভুল করবেন। বর্তমান শিক্ষাবিজ্ঞান সাধারণ পাঠকক্ষের পাঠ ও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মধ্যে কোন সীমারেখা টানতে চায় না। ছেলেদের চরিত্র গঠনে যদি সাহায্য করতে হয় তাহলে ছেলেদের সাথে মিশতে হবে। শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন উন্নতি শুধুমাত্র শিক্ষকেব সহায়তাই হতে পারে। ভবিষ্যৎ ভারতের উপযুক্ত নাগরিক গঠনে শিক্ষকদের দায়িত্ব সর্বাধিক একথা চিন্তা করেই শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে যাতে আদর্শ সম্পর্ক স্থাপিত হয় সে চেষ্টা করতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

শিক্ষক ও অভিভাবক সম্পর্ক

অভিভাবক ছেলেকে বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখতে পাঠান, বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাকে মানুষ করে তোলবার সর্বপ্রকার চেষ্টা হয়, কিন্তু এ চেষ্টার সাফল্য নির্ভর করে অভিভাবক ও স্কুলের পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যে। কোন ছেলেব শিক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করতে হলে তার পারিবারিক অবস্থা জানতে হবে, তাব অভিভাবককে জানতে হবে। শিক্ষা বিজ্ঞানের ছাত্ররা জানেন মানুষের জীবনে পরিবেশের প্রভাব কত সুদূর প্রসারী। শিক্ষার্থীর জীবনে পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব তার শিক্ষাকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করে। অভিভাবক যদি ছেলের পড়া, চাল-চলন, আচার ব্যবহার সম্পর্কে খোঁজ না রাখেন তাহলে শুধু মাত্র স্কুলের চেষ্টায় শিক্ষার্থীকে ঠিক ভাবে পরিচালিত করা সম্ভব নয়। অভিভাবক স্কুলে আসেন ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করতে—আর ছেলে যদি পরীক্ষায় ফেল করে তাকে যাতে উপরের

ক্লাসে উঠিয়ে দেওয়া যায় সে জন্য অনুরোধ জানাতে। এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। ছেলের উন্নতি অবনতির সম্পর্কে অভিভাবকের একটা দায়িত্ব আছে সে সম্পর্কে তাকে সচেতন হতে হবে। এজন্য প্রধান শিক্ষক অভিভাবকের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন। স্কুল থেকে অভিভাবকের নিকট প্রগতি পত্র পাঠাবার রীতি আছে প্রয়োজন হলে প্রধান শিক্ষক অভিভাবকের নিকট পত্র দেবেন তারা এলে তাদের সাথে আলোচনা করবেন—কেন ছেলেটির উন্নতি হচ্ছে না। কি করে তার সংশোধন করা যায়। স্কুলে যে সময় একটি ছেলে থাকে তার চেয়ে অনেক বেশী সময় সে বাড়ীতে থাকে সেই সময় কি করছে তা জানতে হলে অভিভাবকের সাথে যোগ স্থাপন করতে হবে। ছেলের উন্নতির জন্য কি করা উচিত প্রধান শিক্ষক সে সম্পর্কে পরামর্শ দেবেন।

স্কুলের উন্নতি করতে হলে অভিভাবকরা স্কুল সম্পর্কে যাতে উৎসাহ নেয় সে চেষ্টা করতে হবে। স্কুল থেকে ছেলেদের উন্নতির জন্য কি করা হচ্ছে তার খবর অভিভাবকদের জানাতে হবে। স্কুলের ভাল মন্দের সাথে তাদের ছেলেদের ভালমন্দ জড়িত আছে এ বোধ সৃষ্টি করতে পারলেই অভিভাবকেরা স্কুল সম্পর্কে মনোযোগী হবেন। স্কুলের বৈষয়িক উন্নতির জন্যও অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ রাখা দরকার। বিত্তবান অভিভাবকদের কাছ থেকে অনেক সময় স্কুলের উন্নতির জন্য দান পাওয়া যায়। বাংলাদেশের শিক্ষা প্রসারে বেসরকারী আর্থিক সাহায্য অনেক খানি সাহায্য করেছে।

কোন অভিভাবক এলে প্রধান শিক্ষক তার সাথে ভদ্র ব্যবহার করবেন এটাই স্বাভাবিক। তবু কোন কোন সময় বিপরীত আচরণ করা হয়েছে এরূপ অভিযোগ শোনা যায়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জানি অনেক সময় ধৈর্যচ্যুতি ঘটে কিন্তু কোন অবস্থায় অভিভাবক ক্ষুব্ধ হতে পারেন এরূপ ব্যবহার করা চলবে না। গ্রামে অনেক দরিদ্র ছেলেরা পড়ে তাদের অভিভাবকরা অনেক সময় তাদের আর্থিক অসুবিধার কথা জানাতে আসেন। প্রধান শিক্ষক সহানুভূতির সাথে তাদের কথা শুনবেন ও অত্যন্ত সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করবেন। মর্যাদায় সকল অভিভাবকই প্রধান শিক্ষকের নিকট সমান। অভিভাবকের যে কোন রকম অভিযোগ থাকলে প্রধান শিক্ষক ধৈর্যসহকারে শুনবেন ও প্রতিকারের চেষ্টা করবেন।

শুধু মাত্র প্রধান শিক্ষকের চেষ্টায় অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার

ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। সহকারী শিক্ষকেরাও অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ রাখবেন। প্রত্যেক শ্রেণী শিক্ষকের উচিত শ্রেণীর সব ছেলের অভিভাবককে জানা ও পারিবারিক পরিবেশের খোঁজ খবর রাখা।

অভিভাবক ও বিদ্যালয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কি করে স্থাপিত হতে পারে সে উদ্দেশ্যে W. M. Ryburn বিদ্যালয় অভিভাবক দিবস (Parents' Day) প্রতিপালন ও অভিভাবক শিক্ষক সমিতি (Parent-Teacher Association) স্থাপনের কথা বলছেন।

অভিভাবক দিবস :—বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে সমস্ত ছাত্রের অভিভাবককে স্কুলে নিমন্ত্রণ করতে হবে। স্কুলে তাদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনার ব্যবস্থা হবে। গরীব বড়লোক ভেদে ব্যবহারের যেন তারতম্য না হয়। সেদিন সম্ভব হলে স্কুলে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে ছেলেদের যোগ্যতার নিদর্শন স্বচক ছেলেদের নানা রকম হাতের কাজ অভিভাবকদের সামনে উপস্থিত করা হবে। ছেলেদের আঁকা ছবি, ম্যাপ, গ্লোব, নানারকম মাটীর পুতুল, মডেল, প্রভৃতি দিয়ে প্রদর্শনীকে আকর্ষণ যোগ্য করে তোলার চেষ্টা হবে। এছাড়া চার্ট পোষ্টারও পরিসংখ্যান প্রভৃতির সাহায্যে স্কুলের ক্রমোন্নতি, শিক্ষণ পদ্ধতি, খেলাধূলার ব্যবস্থা, ছেলেরা যে সব সামাজিক কাজে অংশ গ্রহণ করেছে তার সাথে অভিভাবকদের পরিচিত করান যায়। ছেলেরা যে স্কুলে পড়ছে সেই স্কুলে কিভাবে পড়াশুনা পরিচালনা হচ্ছে, শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য ভবিষ্যতে কি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে সে সব জানতে অভিভাবকেরা স্বাভাবিক ভাবেই উৎসাহ বোধ করবেন। ঐ দিন বিকেলের দিকে খেলাধূলা বা অন্য কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে। ছেলেদের দিয়ে গান, আবৃত্তি, প্রবন্ধ পাঠ সম্ভব হলে থিয়েটার ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হবে। ছেলেরাই এতে অংশগ্রহণ করবে। অতিথিদের অভ্যর্থনার ভার তারাই গ্রহণ করবে, তাদের কোন রকম অস্থবিধা না হয় সেদিকে নজর রাখবে। অভিভাবক দিবসে স্কুল অভিভাবকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। ছেলেরা বিভিন্ন দিক ঘুরে দেখবে।

প্রধান শিক্ষক ও সহশিক্ষকেরা সর্বক্ষণের জন্য উপস্থিত থাকবেন। শিক্ষার সাফল্যের জন্য অভিভাবকদের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার কথা তাদের বোঝাতে চেষ্টা করবেন। প্রধান শিক্ষক স্কুলের বিভিন্ন সমস্যা ও শিক্ষার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। স্কুলের সাথে অভিভাবকদের সম্পর্ক যাতে ঘনিষ্ঠ হয় তার সব রকম ব্যবস্থা করা হবে। ছেলে স্কুলে যায় আর

আমি নিয়মিত মাইনে দিচ্ছি, এতেই আমার সব দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল অভিভাবক যেন এ ভাববার সুযোগ না পান। অভিভাবক দিবসে উপস্থিত থেকে সবাই স্কুলের কার্যধারার সাথে পরিচিত হবেন, স্কুলের উন্নতির কথা চিন্তা করবেন, সর্বোপরি ছেলের শিক্ষায় শিক্ষকের সাথে তারও একটা বিরাট দায়িত্ব আছে এ সম্পর্কে সচেতন হবেন তাহলেই অভিভাবক দিবস পালনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

অভিভাবক শিক্ষক সমিতি :—অভিভাবক দিবসে একদিনেব জন্য স্কুলে এসে অভিভাবকেরা আনন্দ উৎসবের ফাঁকে ফাঁকে শিক্ষকদের সাথে শিক্ষাও স্কুলের সমস্যা নিয়ে একটু আলোচনা কবেন, সেই স্বল্পস্থায়ী উপস্থিতিব মধ্যে কোন সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন একটি স্থায়ী সমিতির। অভিভাবকদের প্রতিনিধি ও শিক্ষকদের নিয়ে যদি স্থায়ীভাবে অভিভাবক শিক্ষক সমীতি স্থাপিত হয় তাহলে স্কুলের বহু সমস্যা সমাধানের সুবিধা হয়।

এরূপ সমিতিতে প্রধান শিক্ষক সহ সমস্ত শিক্ষক ও অভিভাবকদেব নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সভ্য হবেন। অভিভাবক প্রতিনিধিব সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকবে না। একজন অভিভাবক সমিতিব সভাপতি হবেন। প্রধান শিক্ষক হবেন সম্পাদক। প্রতি মাসে সমিতিব একটি করে সভা হবে। প্রতি বছরই সমিতি নতুন করে গঠিত হবে। সমিতিব আলোচ্য বিষয় নির্দ্ধারিত হবে স্থানীয় সমস্যা অনুযায়ী।· সাধারণ শিক্ষা বিষয়ক আলোচনাব সাথে স্কুলের দৈনন্দিন সমস্যা অনুযায়ী। সাধারণ শিক্ষা বিষয়ক আলোচনার সাথে স্কুলেব দৈনন্দিন সমস্যা নিয়েও আলোচনা হবে। স্কুলে শিক্ষক কি পরীক্ষণ পদ্ধতি বা অন্য কোন বিষয়ে কোন নতুন প্রথা বা নিয়ম প্রচলিত করবার আগে এই সমিতিতে আলোচনা করে নিলে অভিভাবকদের সহযোগিতা লাভ সহজ হবে। নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফল নিয়েও এখানে আলোচনা করা হবে। স্কুলে শৃঙ্খলা রক্ষার কোন অসুবিধা সৃষ্টি হলে অভিভাবক সমিতি সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতে পারেন।

স্কুল ও গৃহের সাক্ষা যোগাযোগ রক্ষায় অভিভাবক শিক্ষক সমিতি বিশেষ সহায়ক। শিক্ষার্থীর সম্পর্কের ও তার পরিবেশ জানতে অভিভাবকের সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। যেখানে অভিভাবক সমাজ শিক্ষিত ও সচেতন যেখানে এরূপ সমিতি শিক্ষক অভিভাবক উভয় পক্ষেরই উপকার সাধন সমর্থ। প্রধান শিক্ষক যতবেশী সংখ্যক সম্ভব অভিভাবকের সাথে

ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হতে চেষ্টা করবেন। শ্রেণী শিক্ষক শ্রেণীর প্রত্যেকটি ছেলের অভিভাবকের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন। অভিভাবক শিক্ষকের পারস্পরিক সহযোগিতার ফলে শিক্ষার্থী সম্পর্কীত বহু সমস্যার সহজ মীমাংসা সম্ভব হবে। স্কুলের সাথে প্রত্যক্ষ যোগ থাকায় স্কুলের কোন কাজ সম্পর্কে অভিভাবকদের মনে ভুল ধারণা সৃষ্টির অভিযোগ থাকবে না। শিক্ষার্থীর সম্পর্কে বিদ্যালয় ও অভিভাবকের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে তা সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হলে শিক্ষক অভিভাবক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়া দরকার, এতে উভয় পক্ষই উপকৃত হবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

সময়তালিকা

কোন একটা কাজ সুচারু রূপে সম্পন্ন করতে হলে তার জন্য চাই পূর্ব পরিকল্পনা। পূর্ব পরিকল্পনা থাকলেই একটা নির্দিষ্ট কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করা যায়। শ্রেণী শিক্ষায় আমরা অনেক শিক্ষার্থীকে এক সাথে পড়াই। তাদের কত বিষয় পড়াতে হয়। প্রত্যেক শ্রেণীর একটা নির্দিষ্ট পাঠক্রম রয়েছে। পাঠক্রম নির্দ্ধারিত বিষয় সমূহ পূর্ব নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হয়। পাঠক্রম রচনা, বিষয় নির্দ্ধারণ ও সময় নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে শিক্ষক বা বিদ্যালয়ের কোন হাত নেই। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই পাঠক্রম শেষ করে দিতে হবে বিদ্যালয়কে। স্কুলের কাজ করবার একটা বাঁধা সময় আছে সেই সময়ের মধ্যে উর্দ্ধতম কোন কেন্দ্রিয় প্রতিষ্ঠান (স্কুলবোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকারী শিক্ষা বিভাগ) রচিত পাঠক্রম কি করে পড়ান যায় তার জন্য একটা পূর্ব পরিকল্পনা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে কি ভাবে পড়ান হবে সেই পরিকল্পনাকে আমরা বিদ্যালয়ের সময়তালিকা বলতে পারি।

সময় তালিকায় একটি চার্টে বিদ্যালয়ের পড়াবার নির্দিষ্ট সময়কে কয়েকটি পিরিয়ডে ভাগ করে নিয়ে প্রত্যেক শ্রেণীতে প্রতি পিরিয়ডে একজন করে শিক্ষককে পড়াবার দায়িত্ব দেওয়া হয়। পূর্ব নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে কাজ ঘড়ির কাটার সাথে এগিয়ে চলে বলে এতে সময় ও শক্তির অপচয় হয় না ও স্কুলের কাজে কোন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় না। সময় বিষয় সুষ্ঠু বিভাগ হওয়ায়

একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি হয় না। কোন একটি বিষয়ের জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত সময় ব্যয়িত হয় না। শিক্ষকেরা এক সময়ে একটি বিষয়ে তাদের মন নিবিষ্ট রাখতে পারেন। এতে শৃঙ্খলা বোধ, নিয়মানুবর্তিতা, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিজ কর্তব্যে মনোযোগী হওয়া প্রভৃতি অভ্যাস গঠিত হয়। সময় তালিকা অনুসারে কাজ করার ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে একটা সুসংবদ্ধ পদ্ধতিকে মেনে চলবার মনোভাব গড়ে ওঠে।

সময় তালিকায় বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে তার উপর জোর দেওয়া হয়। কোন বিষয়ের জন্য কতটা সময় দেওয়া হবে, সময় তালিকার কোন জায়গায় তার স্থান নির্দিষ্ট হবে তা বিষয় কাঠিন্য বিচার করে স্থির করা হয়।

সময় তালিকাকে বলা হয় 'Second School clock.' সময় তালিকায় স্কুলের কাজের সময়কে কয়েকটি পিরিয়ডে ভাগ করে দেখান হয়। কোন পিরিয়ডে কোন শ্রেণীতে কি পড়ান হচ্ছে তা দেখান হয়। কোন রুমে কি কাজ হচ্ছে তার নির্দেশ থাকে ও কোন শিক্ষক কখন কোথায় কি পড়াচ্ছেন তার উল্লেখ থাকে। ঘড়ির কাটা ঘুরবার সাথে সাথে স্কুলের কাজ সময় তালিকা অনুসারে এগিয়ে চলে। সময় তালিকার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেই সমস্ত স্কুলের কোথায় কি হচ্ছে তার একটা পরিষ্কার ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সময় তালিকার এক কপি শিক্ষকদের কক্ষে থাকে, এক কপি নোটিশ বোর্ডে দেওয়া হয় আর এককপি প্রধান শিক্ষকের ঘরে থাকে। প্রধান শিক্ষক সময় তালিকা দেখে স্থির করেন কোন কোন শিক্ষক কি কাজ করছেন এবং কোন শিক্ষক বিশ্রাম উপভোগ করছেন। কোন শিক্ষক অনুপস্থিত হলে সময় তালিকা দেখে প্রধান শিক্ষক তার কাজ অন্য শিক্ষকদের মধ্যে ভাগ করে দেবেন।

একটা স্কুলের সময় তালিকা রচনা করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ কাজ, সময় তালিকা তৈরী করতে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। প্রধান শিক্ষক বা সহকারী প্রধান শিক্ষক যিনি সময় তালিকা করেন তাঁহাকে সমস্ত অসুবিধা দূর করে একটি সময় তালিকা তৈরী করতে প্রচুর বিচার বিবেচনা ও পরিশ্রম করতে হয়। বাঁধাধরা সময়, অপ্রচুর শিক্ষক, সরঞ্জামের অসুবিধা, ঘরের অভাব সব কিছুর মধ্যে সামঞ্জস্য করে যখন একটি সময় তালিকা করা হল তখনও দেখা যাবে প্রায় শিক্ষকের একটা না একটা অভিযোগ আছে।

সময় তালিকা তৈরী করবার প্রস্তুতি পর্বে দেখে নিতে হবে বছরে কয়টি (School Day) পাওয়া যাবে। মাধ্যমিক কি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কাজের সময় সমান। তারপর দেখতে হবে কতজন শিক্ষক আছে। সপ্তাহে স্কুলে

কতগুলি মোট পিরিয়ড হবে ও কোন ক্লাসে কত পিরিয়ড হবে সেটাও স্থির করে নিতে হবে। তারপর বিষয় গুরুত্ব বিচার করে বিভিন্ন বিষয়ের জন্য কতটা সময় দরকার ও কতটা দেওয়া যাবে তার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। কতকগুলি বিষয় আছে কঠিন বুঝতে বেশী সময় প্রয়োজন। কোন বিষয় বুঝতে সময় ও পরিশ্রম প্রয়োজন হয়। বিষয়কাঠিন্য ও গুরুত্ব বিচার করে বিভিন্ন বিষয়ের জন্য সময় নির্দ্ধারণ করতে হয়।

কোন বিষয় পড়াতে গিয়ে কতটা ক্লান্তি (Fatigue) উৎপাদিত হয় সময় তালিকায় সে কথাও বিচার করতে হবে। মনোবিজ্ঞানীরা ক্লান্তি উৎপাদনের ক্ষমতা অনুসারে বিষয়গুলির শ্রেণী বিভাগ করেছেন। শুধুমাত্র বিষয়েই ক্লান্তি উৎপাদন করে না। বছরের বিভিন্ন ঋতুতে ক্লান্তির তারতম্য হয়। গ্রীষ্মে যত সহজে ক্লান্তি আসে শীতের সময় তত সহজে ক্লান্তির সৃষ্টি হয় না। তাই শীতের পিরিয়ড দীর্ঘতর করা চলে। শিক্ষার্থীদের বয়স, শারীরিক শক্তি, প্রবণতা প্রভৃতির সাথে ক্লান্তির নিকট সম্পর্ক রয়েছে। ক্লান্তিকর বিষয়গুলি সময় তালিকায় যাতে পর পর না দেওয়া হয় সে সম্পর্কে দৃষ্টি রাখতে হবে।

যে বিষয়েব পাঠ গ্রহণ করতে অত্যধিক মনোযোগের প্রয়োজন সে বিষয়-গুলি এমন সময় স্থাপন করতে হবে যখন শিক্ষার্থীদেব মনোযোগ দেবার ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী থাকে। সেদিক থেকে বিচার কবে ক্লান্তিকর বিষয়গুলিকে স্কুলের সুরুতে দেওয়া যেতে পারে। স্কুলের প্রথম দু'টি পিরিয়ডেই ছেলেদের মনোযোগ সর্বাধিক পরিমাণে পাঠে নিবদ্ধ রাখা সম্ভব। প্রথম পিরিয়ডে সদ্য সদ্য ছেলেরা বাড়ী থেকে আসে তাই মন একটু চঞ্চল থাকে, ঃতীয় পিরিয়ডে পড়ায় সবচেয়ে বেশী মন বসে। শেষের দিকে শরীব ও মন ক্লান্ত থাকে তখন কঠিন বিষয়ে ছেলেরা মন দিতে পারে না। টিফিনের সময় খেলাধূলা করে মনের ক্লান্তি অনেকটা দূর হয় তাই বিরতির পর ছেলেদের মনোযোগ দেবার ক্ষমতা কিছুটা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু শেষের পিরিয়ডে অবসাদ এত বেশী করে দেখা দেয় যে তখন অতি সাধারণ বিষয়েও মন দেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

একটা দিনের পিরিয়ডগুলিতে যেমন মনোযোগ দেবার ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমতে থাকে সপ্তাহের দিনগুলিকেও ঠিক সেইভাবে ভাগ করা যায়। প্রথম ঘণ্টায় যেমন মন একটু চঞ্চল থাকে তেমনি রবিবারের বিশ্রামের পর সোমবার পাঠে সহজে মন চলতে চায় না। ছুটি আমেজ কাটিয়ে পড়ায় মন বসতে সময় লাগে। মঙ্গলবার পড়ায় খুব মন বসে। দ্বিতীয় পিরিয়ডের মন সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনে পড়ায় মন সংযোগ সবচেয়ে বেশী হয়। তারপর আস্তে আস্তে

ক্লান্তি জমতে থাকে। শনিবার দিন ছুটির জন্য মন উসখুস করতে থাকে পড়ায় আর মন বসতে চায় না। কখন ছুটির ঘণ্টা বাজবে সেজন্য মন উদগ্রীব হয়ে থাকে।

কঠিন বিষয়গুলি দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘণ্টার মধ্যে শেষ করে নিতে হয়। বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে অঙ্ক, ইংরাজী সংস্কৃত, বাংলা, বিজ্ঞান, ইতিহাস কি ভূগোল, হাতের কাজ, ড্রিল এইভাবে পরপর সময় তালিকায় সাজান চলে। সপ্তাহের প্রথম দিকে কঠিন বিষয়গুলি রাখা উচিত। শনিবার কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিরাখতে হবে। অংক ও ইংরেজীকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘণ্টায় স্থাপন করা সঙ্গত।

সময় তালিকায় বিষয় স্থাপনে যেন একঘেয়েমির সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বিষয় বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করতে না পারলে ছাত্রশিক্ষক উভয়ের মনেই ক্লান্তি দেখা দেবে। সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয় পরপর স্থাপন করলে পড়ার ব্যাঘাত হবে। আবার ইংরাজী ব্যাকরণের পর সংস্কৃত ব্যাকরণ বা পাটীগণিতের পর জ্যামিতি বাসয়ে দিলে অবসাদ দেখা দেয়। সহজ ও কঠিন বিষয় পর পর স্থাপন করলে ছেলেদের সুবিধা হয়। আবার একই বিষয়ের দুটি পাঠের (যেমন সোমবার দিন ইতিহাস পড়ান হল তারপর শুক্রবার আবার ইতিহাস) সময়ের ব্যবধান এত বেশী হওয়া উচিত নয় যাতে ছেলেরা পূর্ব পাঠের বিষয় ভুলে যেতে পারে। কোন বিষয়ের দুটি তিনটী শাখা থাকতে পারে পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি। সপ্তাহে পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেকটি বিষয় শেখাবার ব্যবস্থা করা যায় যেমন দু'দিন পাটীগণিত, দু'দিন বীজগণিত, দু'দিন জ্যামিতি—একে spiral পদ্ধতি বলে। আবার একটি শাখাকে কয়েকটি অংশে (unit) ভাগ করে এক শাখার এক অংশ (unit) শেষ হলে অপর শাখার একটি অংশ সুরু হবে। যেমন পাটীগণিতের সুদকষা সুরু হল, যতদিন সুদ কষা শেষ না হবে ততদিন পাটীগণিত চলবে তারপর বীজগণিতের একটা নিয়ম ধরা হবে এমনিভাবে পড়াবার পদ্ধতিকে Block system বলা হয়, উভয় পদ্ধতির পক্ষেই যুক্তি রয়েছে শিক্ষকদের এ সম্পর্কে স্বাধীনতা থাকবে, তাদের কাজের সুবিধা অনুসারে পদ্ধতি বেছে নেবেন।

সময় তালিকা এমন ভাবে তৈরী করতে হবে যাতে বাড়ীর কাজ সারা সপ্তাহ ছড়িয়ে থাকে, একই দিনে অঙ্ক, ইংরেজী অনুবাদ, বাংলা রচনা

লিখে নিয়ে আসতে হবে সময় তালিকায় যদি এরূপ ব্যবস্থা থাকে তাহলে ছেলেরা বাড়ীর কাজ করে অন্য বিষয় আর পড়বার সময় পাবে না।

একটি পিরিয়ড কতটা সময়ব্যাপী হবে সে বিষয়ও চিন্তা করতে হবে। কঠিন বিষয়ে ছেলেরা দীর্ঘ সময় মন সংযোগ করতে পারে না। ছোট ছেলেদের মন একই বিষয়ে দীর্ঘ সময় আটকে রাখা যায় না। গ্রীষ্মকালে সহজে কাজে ক্লান্তি আসে এরূপ নানা বিষয় বিচার করে একটা পিরিয়ড কতটা সময় ব্যাপী হবে তা স্থির করতে হবে।

যদি ছোট ছেলেদের দিকে দৃষ্টি রেখে পিরিয়ডের ব্যাপ্তি কাল নির্দেশ করা যায় তাহলে ৩০ মিঃ বেশী একটি পিরিয়ডের ব্যাপ্ত হওয়া উচিত নয়। একটু উঁচু ক্লাসের ছেলেরা ৪০।৫০ মিঃ একটি বিষয়ে মন নিবদ্ধ রাখতে পারে। উঁচু শ্রেণীতে কতকগুলো বিষয় আছে যা ৫০ মিঃ কমে বোঝান যায় না। প্রথম ঘণ্টায় নাম ডাকা ছেলেদের দরখাস্ত নেওয়া প্রভৃতিতে কিছুটা সময় যায় তাই এই পিরিয়ডটা একটু বেশী দীর্ঘ হওয়া দরকার। একই স্কুলে শ্রেণী ভেদে স্বল্প ও দীর্ঘ কাল ব্যাপী পিরিয়ড করা যায় না। তাই সব দিক বিবেচনা করে একই রকম পিরিয়ড হওয়া সঙ্গত। প্রথম পিরিয়ডের ব্যাপ্তিকাল একটু দীর্ঘ হওয়া দরকার কারণ নাম ডাকতে কিছুটা সময় যায়। তাই প্রথম পিরিয়ড হবে ৪৫ মিনিট। তারপর টিফিনের বিরতি পর্যন্ত ৪০ মিঃ পিরিয়ড করা যেতে পারে। টিফিনের বিরতির পর শেষের দিকে ছেলেরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে তাই পরের পিরিয়ডগুলি ৪০ মিঃ করা হবে। নীচের ক্লাসে ৩০ মিঃ বাদে যদি দেখা যায় ছেলেরা ক্লান্ত হয়ে উঠেছে পড়ায় মন দিতে পারছে না ক্লান্তি বোধ করছে তাহলে শিক্ষক বৈচিত্র্য সৃষ্টির চেষ্টা করবেন, প্রসঙ্গ বদলে নতুনত্ব সৃষ্টি করবেন।

সময় তালিকায় বিরতির ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয় পিরিয়ড পার হবার পর একটু একটু করে অবসাদ জমতে থাকে। একটানা তিন ঘণ্টা অর্থাৎ চার-পিরিয়ড করবার পর ছেলেরা আর পড়ায় মন দিতে পারে না। তখন দরকার বিশ্রামের। তাই চতুর্থ পিরিয়ডের পর ২০ মিঃ বিরতির ব্যবস্থা রাখতে হবে। খেলা ধুলার মধ্য দিয়ে এ সময়ে মনের ক্লান্তি দূর হয়। বির-তির পর মনোনিবেশ করবার ক্ষমতা একটু বেড়ে যায়, তবে দ্বিতীয় পিরি-য়ডের সমান হয় না। দ্বিতীয় পিরিয়ডের পর যাতে ক্লান্তি জমতে না পাবে সে জন্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় পিরিয়ডের মাঝে ১০ মিঃ জন্য স্বল্প কালীন বির-তির ব্যবস্থা করলে তৃতীয় পিরিয়ডে মনোনিবেশ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

সময় তালিকা রচনার আর একটি অসুবিধা হচ্ছে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাব। হয়ত একটি স্কুলে দু'জন মাত্র অংকের শিক্ষক রয়েছেন অথচ ক্লাসে ইউনিটের সংখ্যা ১০টি সেখানে প্রত্যেক ক্লাসের জন্য দ্বিতীয় কি তৃতীয় পিরিয়ডে অংকের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। শিক্ষকদেরও পর পর অংক করাতে ভাল লাগবে না। সাধারণ স্কুলের সাজ সরঞ্জামের অভাবের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। সময় তালিকার সময় খেয়াল রাখতে হয়। একই সাথে দু'টি ক্লাসে যেন একই সরঞ্জামের প্রয়োজন না হয়। হয়ত ইতিহাসের উপযুক্ত শিক্ষক একজন, পর পর তাকে বর্ণনা মূলক পাঠ দিতে হলে তিনি সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। সময় তালিকা রচনার সময় শিক্ষকের দৈহিক ও মানসিক ক্লান্তির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষকের জন্য দুটি পিরিয়ড বিশ্রামের ব্যবস্থা থাকা দরকার। বিশ্রামের সময় তিনি বাড়ীর কাজ দেখতে পারেন। পরের পিরিয়ডের জন্য প্রস্তুত হতে পারেন। বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারেন। সময় তালিকায় বিষয় বণ্টনে যতটা সম্ভব বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা দরকার। একই বিষয় পর পর পড়াতে হলে বিরক্তির সঞ্চার হয়; মানসিক অবসাদ দেখা দেয়। যেখানে শিক্ষকের সংখ্যা কম, বা বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের ক্ষেত্রে বিষয় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা কষ্ট সাধ্য। আর একটি জিনিষ লক্ষ্য রাখতে হবে প্রত্যেক শিক্ষকের কাজের সময় যেন যতটা সম্ভব সমান হয়। বাস্তবে দেখা যায় কোন শিক্ষকের একটি পিরিয়ড বেশী হয়ে গেল সেখানে তাকে অসুবিধা বুঝিয়ে দিলে তিনি ব্যাপারটা সহজ ভাবে গ্রহণ করবেন।

সময় তালিকা দু'রকমের রাখতে হয়—শিক্ষকের সময় পত্রিকা ও শ্রেণীর সময় পত্রিকা।

শিক্ষকের সময় পত্রিকায় তিনি কখন কোথায় কি পড়াচ্ছেন, তার বিশ্রামের সময় ইত্যাদির উল্লেখ থাকে। কোন শিক্ষক অনুপস্থিত থাকলে এই সময় তালিকা দেখে সেই দিনের জন্য বিশেষ সময় তালিকা তৈরী করতে হয়।

শ্রেণীর সময় পত্রিকায় কোন শ্রেণীতে কখন কি বিষয় পড়ান হবে তা দেওয়া থাকে।

বিদ্যালয় পরিচালনায় সময় তালিকা একটি অপরিহার্য অঙ্গ। সময় তালিকাকে স্কুলের দ্বিতীয় ঘড়ি বলা হয় তা ঠিক। সময় তালিকা অনুসারে স্কুলের কাজ নিয়ন্ত্রিত হয়। অনেক বিচার বিবেচনা করে, বহু বার ছক কেটে

যতটা সম্ভব শিক্ষাবিজ্ঞানের নীতি অনুসরণ করে সময় তালিকা তৈরীর পরও অভিযোগ শোনা যায়। প্রধান শিক্ষক মাত্রেই জানেন প্রতি বার সময় তালিকা প্রকাশ হবার পর বহু শিক্ষক তার অসুবিধা বা তার উপর অবিচার করা হয়েছে এ অভিযোগ জানাতে আসেন। সবাইকে সন্তুষ্ট করে সময় তালিকা তৈরী করতে হলে যে পরিমাণ শিক্ষক ও শিক্ষা সরঞ্জামের প্রয়োজন অধিকাংশ স্কুলের তা নেই। যথা সম্ভব চেষ্টা করেও কাজের ভার (Work load) সমান ভাবে ভাগ করে দেওয়া সম্ভব নয়। অপ্রধান বিষয় কেউ পড়াতে চান না। নীচের ক্লাসে বেশী পিরিয়ড দিলে সম্মান হানি হয় বলে অনেকে মনে করেন। প্রধান শিক্ষক যথা সম্ভব অভিযোগ প্রতিকারের চেষ্টা করবেন। যেখানে সম্ভব নয় সেখানে সময় তালিকার রচনার বাস্তব অসুবিধার দিকটা বোঝালে শিক্ষকরা নিশ্চয়ই বুঝবেন। নীচের ক্লাসে পড়াতে সব শিক্ষকেরই প্রস্তুত থাকা উচিত। বিশেষ করে যারা ভাল শিক্ষক তাদের নীচের ক্লাসে ও সঙ্গে উঁচু ক্লাসে দেওয়া সঙ্গত। প্রধান শিক্ষক সর্বনিম্ন শ্রেণীতে কয়েকটি ক্লাস রাখবেন। যেখানে প্রধান শিক্ষক নীচের ক্লাসে পড়াচ্ছেন সেখানে অন্য শিক্ষকদের অভিযোগ করবার কিছু থাকবে না। সময় তালিকা অনুসারে শিক্ষকরা কাজ করবেন তাই তাদের অসুবিধা বিচার করে যেখানে আবশ্যক সেখানে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে নেওয়া উচিত।

অসুবিধা ও প্রতিকার :—স্কুলের পক্ষে সময় তালিকা না হলে চলে না। একদিকে বিস্তৃত পাঠক্রম, আরেকদিকে সীমাবদ্ধ সময়, অপর্যাপ্ত শিক্ষক, সামান্য সাজ সরঞ্জাম। সবদিকের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টায় ' ন কাজ চালানো রকমের একটি সময় তালিকা। যতই বিজ্ঞান সম্মত ভাবে সময় তালিকা রচনা করা হোক না কেন বর্তমান প্রচলিত সময় তালিকা অনুসারে কাজ করবার ফলে শ্রেণী পাঠ কিছুটা যান্ত্রিক হয়ে ওঠে। সময় তালিকায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী কারো আর ইচ্ছা মত কাজ করবার স্বাধীনতা থাকে না। শিক্ষার্থী কাজের ব্যাপারে রুচি, ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রভৃতি যে সব কথা বলা হয় সময় তালিকা ঠিক ভাবে অনুসরণ করতে হলে তার অনেক খানি বিসর্জন দিতে হয়। ঘড়ির কাটার সাথে সময় তালিকার চাকা ঘুরতে থাকে তার সাথে আবর্তিত হয় একটির পর একটি বিষয়। সময় তালিকা অনুসারে ইচ্ছা না থাকলেও পূর্ব নির্দিষ্ট বিষয় শিক্ষার্থীকে পড়তে হয়। মন অবসাদ গ্রস্ত হলে, বিরতির পূর্ব পর্যন্ত মনকে অবসর দেওয়া যাবে না। অংকের পর ইংরেজী তারপর বাংলা কি সংস্কৃত ব্যাকরণ এই চক্র থেকে মুক্তি নেই কারণ স্কুলের

দ্বিতীয় ঘড়িটির সাথে এগিয়ে চলতে না পারলে শেখার প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে থাকতে হবে। আবার ইংরেজী শিক্ষক একটি বিষয় পড়াচ্ছেন ছেলেরা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছে একটি বিশেষ কৌতূহল উদ্দীপক মুহূর্তে হয়ত নাটকীয় ভাবে স্কুলের ঘণ্টা বেজে উঠল। ছেলেদের মন যখন সেই বিষয়টিকে পরিত্যাগ করতে চাইছে না তখন ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করতে হয়।

তারপর আগ্রহের কথা। চল্লিশ মিনিটের একটি পিরিয়ডে সব ছেলেই সমান ভাবে একই বিষয়ে মন নিবদ্ধ থাকে এ আশা করা যায় না। অনেক সময় আগের ঘণ্টার জের পরের ঘণ্টায় চলতে থাকে। জোর করে আগ্রহ সৃষ্টি করা যায়। একটি বিষয় শেষ হবার তিন চার মিনিটের মধ্যে আর একটি বিষয়ে মন দেওয়া যায় কিনা তাও বিচার করে দেখা দরকার। পরবর্তী বিষয়ের জন্য মন প্রস্তুত করতে যে সময়ের দরকার সময় তালিকা সে ভাবে তৈরী করা যায় না। কখনও দেখা যায় ৪০ মিঃ পিরিয়ডে যে পাঠটি দেওয়া হচ্ছে সাধারণ ছেলেদের বোঝবার পক্ষে সে সময় পর্যাপ্ত নয়। আরো কিছু বেশী সময় হলে বিষয়টি তারা ভাল করে বুঝতে পারত। কিন্তু স্কুলের ঘণ্টা ঠিক সময়ে বেজে উঠবে। বাঁধাধরা ছক মাফিক আমাদের এগিয়ে চলতে হবে। এই যান্ত্রিক পদ্ধতির হাত থেকে ছেলেদের মুক্তি দেবার জন্য মণ্টেসারী, ডিউই তাঁদের শিক্ষা পদ্ধতিতে সময় তালিকা বলে কিছু রাখেননি। ডাল্টন পদ্ধতিতে শ্রেণী পাঠ বলে কিছু নেই, তাই সময় তালিকাও নেই। ছেলেরা যার যে বিষয়ে যতক্ষণ খুশী পড়তে পারে। শ্রেণী কক্ষের বদ্ধ আবহাওয়ায় মন যেখানে সহজেই ক্লান্ত হয়ে ওঠে সে আবহাওয়া থেকে মুক্তি পেয়ে ছেলেরা স্বাধীন ভাবে যার যার পাঠ নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে।

যেখানে ব্যক্তি কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা সেখানে সময় তালিকাকে বাদ দেবার কোন অসুবিধা নেই। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শ্রেণী-শিক্ষার বিলোপ সাধন করা সম্ভব নয়। তাই সময় তালিকা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অপরিহায অঙ্গরূপে থাকবেই। যতটা সম্ভব এর ত্রুটিগুলিকে আমরা দূর করতে চেষ্টা করব।

সময় তালিকাকে অচল অনড় বলে মনে করা উচিত নয়। প্রয়োজনে একে পরিবর্তন করতে হবে। সারা বছরের জন্য একটি সময় তালিকা রচিত হবে না। গ্রীষ্ম ও শীতের জন্য দু'টি পৃথক সময় পত্রিকা রচনা করা যেতে পারে। শিক্ষকদের বিষয় স্বাধীনতা থাকা উচিত। বাংলার শিক্ষককে নির্দেশ

দেওয়া হল তিনি কোন একটি ক্লাসে বাংলা পড়াবেন। তিনি কোন দিন কবিতা, কোন দিন গদ্য বা ব্যাকরণ পড়াবেন এ সম্পর্কে কোন নির্দেশ দেওয়া হবে না। তিনি যদি Block systen অনুসারে একটি কবিতা শেষ করে একটি গদ্য পড়াতে চান বা spiral systen অনুসারে পর্যায়ক্রমে পদ্য-গদ্য পড়াতে চান তাহলে আপত্তির কোন কারণ থাকা উচিত নয়। সময় তালিকা রচনার পূর্ব্বে শিক্ষকদের সাথে আলাপ আলোচনা করে নিলে কিছুটা অভিযোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

অনিয়ন্ত্রিত পাঠ বা ইচ্ছামত পাঠের সুযোগ সময় তালিকা দেওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে প্রধান শিক্ষক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে পারেন। সপ্তাহে প্রতি শ্রেণীর জন্য যদি ২।৩টি পিরিয়ড আলাদা করে রাখা যায় তাহলে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ছেলেরা ইচ্ছামত বিষয় পড়তে পারে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘণ্টার মাঝে ১০ মিঃ জন্য বিরতির ব্যবস্থা করা যায়। ছেলেরা শ্রেণী কক্ষের বদ্ধ আবহাওয়া থেকে বাইরে এসে কিছুটা ছুটাছুটি করবার সুযোগ পেলে এক ঘেয়েমির হাত থেকে কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি পায়। এতে অবসাদ জমতে পারে না ও পরবর্তী ঘণ্টায় পড়ায় মনোযোগ বাড়ে। এই স্বল্পকালীন বিরতি শিক্ষকদের পরবর্তী পিরিয়ডের প্রস্তুতির পক্ষে সহায়ক। সময় তালিকা ছাত্রদের সুবিধার জন্য। প্রধান শিক্ষক সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করে যদি মনে করেন কোন নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করলে কাজের সুবিধা হবে তাহলে চিরাচরিত প্রথাকে পরিহার করে তিনি পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিদ্যালয় পরিদর্শন

শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থা একটা প্রয়োজনীয় অঙ্গ। বিদ্যালয়ের উপর শিক্ষার্থীদের শিক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, ভবিষ্যৎ সমাজকে গড়ে তোলবার দায়িত্ব নিয়েছে শিক্ষক সমাজ। বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে তারা সে কাজ করেন। রাষ্ট্র থেকে দেশের শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করা হয়। শিক্ষা-বিভাগ থেকে সাধারণ ভাবে শিক্ষার নীতি নির্দ্ধারিত করে দেওয়া হয়। সেই নীতি কার্যকরী করে তোলবার দায়িত্ব বিদ্যালয়ের। বিদ্যালয়গুলিতে ঠিকমত

কাজ হচ্ছে কিনা অনুসন্ধান করবার একটা নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে সরকারের। সরকারী শিক্ষাবিভাগ এই দায়িত্ব বিদ্যালয় পরিদর্শনের সাহায্যে পালন করেন। দেশের শিক্ষার মান উন্নতিতে বিদ্যালয় পরিদর্শকদের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষাবিভাগ পরিদর্শকদের সহায়তায় বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহ করে শিক্ষার মনোন্নয়ন ব্যবস্থা কার্যকরী করবার চেষ্টা করে। পরিদর্শকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে M. S. Mohiyuddin and M. Siddalingaiya মন্তব্য করেছেন—"An Inspector may be thought of as the main co-ordinating authority in any school system. Hence, he has to take a large view of the education and bring the schools under his jurisdiction up to a certain level. He has to make changes in organisation and administration so as to facilitate the aims he has in view. He must enable the schools to understand him, his aims and to work towards their attainment."

সরকার থেকে বিদ্যালয়ে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। স্কুল পরিচালনা কার্যাদিতে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি আছে কিনা জানতে আসেন স্কুল পরিদর্শক। তিনি বিদ্যালয়ের দোষ ত্রুটিগুলি অনুসন্ধান করেন। তার রিপোর্টের উপর একটা স্কুলের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। তাই স্কুল পরিদর্শকের আগমন প্রধান শিক্ষক বা স্কুল কর্তৃপক্ষ কখনও প্রীতির চোখে দেখেন না। স্কুল পরিদর্শক আসবেন শুনলে একটা ত্রাসের সঞ্চার হত। যেদিন সরকারী পরিদর্শক এলেন সেদিন স্কুলে একটা ত্রাসের রাজত্ব বিরাজ করত। প্রধান শিক্ষক তটস্থ এই বুঝি একটা সর্বনাশ ঘটে গেল। কোন রকমে জোড়াতালি দিয়ে স্কুলের দোষ-ত্রুটি সব পরিদর্শকের চোখের আড়ালে রেখে তাকে বিদায় করতে পারাটাই ছিল প্রধান শিক্ষকের অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব। যার একটি কলমের আচড়ে স্কুলের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এবং যিনি দোষ ত্রুটি ধরতেই এসেছেন তার কাছ থেকে দোষ আড়াল করে রাখা ছাড়া আর উপায় কি।

বর্তমানে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। বিদ্যালয় পরিদর্শক তার এলাকার শিক্ষার উন্নতির জন্য অনেকখানি দায়ী। চিরাচরিত ভাবে স্কুলগৃহ, আসবাব-পত্র স্কুলের খাতাপত্র আর সাধারণভাবে স্কুলের পঠন-পাঠন সম্পর্কে দু'টি একটি মন্তব্যের মধ্যেই তার কাজ সীমাবদ্ধ নয়। তিনি বিদ্যালয়ের ত্রুটি সন্ধান করতে যাবেন না। বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে যে সব ত্রুটি বিচ্যুতি তার

নজরে পড়বে সে সম্পর্কে তিনি প্রধান শিক্ষকের সাথে আলাপ করবেন। প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে তাদের অসুবিধা কি জেনে কি করে স্কুলের উন্নতি হতে পারে স্কুলের ত্রুটি দূর করা যেতে পারে সে সম্পর্কে নির্দেশ দেবেন। পরিদর্শক হবেন বন্ধু ও সহায়ক। যদি বিদ্যালয় পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি করতে হয় তাহলে পরিদর্শকের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করতে হবে শিক্ষা বিভাগ পরিদর্শক পাঠাচ্ছেন কি করে শিক্ষার উন্নতি হয় বিদ্যালয়কে সাহায্য করা যায় সে উদ্দেশ্য নিয়ে। দোষত্রুটি খুঁজে অনুমোদন বাতিল করা সরকারী সাহায্য থেকে বঞ্চিত করা পরিদর্শকের উদ্দেশ্য নয়। এই মনোভাব সৃষ্টি হলে পরিদর্শক সম্পর্কে যে একটা বিরাগ বা ত্রাসের মনোভাব রয়েছে তার পরিবর্তন হবে। পবিদর্শকের আগমন ভীতির না হয়ে প্রীতির কারণ হয়ে উঠবে। পরিদর্শকের কাজ হবে "Encouragement to good work and removal of defects."

দেশের শিক্ষাব্যবস্থার তদারকীর দায়িত্ব যাদের উপর দেওয়া হবে তাদের নিয়োগের সময় বিশেষ বিচার বিবেচনা করে করতে হবে। শিক্ষাগত ও শাসনগত দুই দিকেই তার সমান দক্ষতা থাকবে। পরিদর্শক হবেন উচ্চশিক্ষিত শিক্ষা বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ হবেন। আধুনিক শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে তার জ্ঞান থাকবে। স্কুলের পরীক্ষার ফল দেখেই তিনি দোষ-গুণ বিচার করবেন না। প্রগতিশীল শিক্ষা চিন্তাকে যাতে বাস্তবে রূপ দেওয়া যায় সে সম্পর্কে তার উৎসাহ থাকবে। তার দৃষ্টি হবে উদার তিনি থাকবেন সর্বপ্রকার সংকীর্ণতার উর্দ্ধে। ক্ষমতা আছে বলেই ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহার তিনি করবেন না। যাই করবেন তার একটি মাত্র লক্ষ্য থাকবে তা হচ্ছে শিক্ষার উন্নতি বিধান। কোন স্কুলের কাজের মধ্যে যদি নতুনত্বের সন্ধান পান তাহলে সে বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যেতে তিনি সুযোগ দেবেন। কোন বিদ্যালয়ে কোন নতুন শিক্ষা পদ্ধতি অবলম্বন করে যদি সুফল পেতে থাকে সেই পদ্ধতি অন্য স্কুলে গ্রহণ করা যায় কিনা সে সম্পর্কে তিনি ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। তার এলাকার সমস্ত স্কুলের কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা তিনি করবেন।

বিদ্যালয় পরিদর্শকের সমালোচনা একটা কাজ। এই সমালোচনা হবে গঠনমূলক (constructive)। কোন পরিদর্শক যদি ধ্বংসাত্মক (destructive) দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমালোচনা করেন তাহলে তার সমালোচনায় স্কুলের কোন উপকারই হবে না। পরিদর্শক যদি পাঠ পদ্ধতির মধ্যে কোন ত্রুটি

দেখতে পান তাহলে আদর্শ পাঠ পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্পর্কে শ্রেণীতে পাঠ দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারেন। তিনি শিক্ষকদের কাছে কি চান শিক্ষকরা তা বুঝে সেভাবে চলতে পারে। দু'মিনিট দেখেই শিক্ষকের পাঠ দেবার ক্ষমতা আছে কিনা বিচার করা কষ্টসাধ্য।

পরিদর্শক সহানুভূতিশীল মনোভাব নিয়ে যদি স্কুল পরিদর্শন করেন তাহলে ত্রুটি বের করে সেই সাথে ত্রুটি দূর করবার পথের নির্দেশ তিনি দিতে পারেন। পরিদর্শকের সহানুভূতিশীল মনোভাবের পরিচয় পেলে প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকরা তাদের অসুবিধার কথা জানাতে দ্বিধা করবেন না। পরিদর্শক শিক্ষকদের সাথে সদয় ব্যবহার করবেন। যদি সতর্ক করে দিতে হয় বা অপ্রীতিকর কিছু বলতে হয় তা তিনি শিক্ষককে ব্যক্তিগত ভাবে বলবেন। শিক্ষক যেন মনে করেন তাকে যা বলা হল তার ভালর জন্যই বলা হল।

মুদালিয়র কমিশনের মন্তব্য :—পরিদর্শক নির্বাচন ও পরিদর্শকের কর্তব্য সম্পর্কে মুদালিয়র কমিশন কয়েকটি মূল্যবান নির্দেশ দিয়েছেন। কমিশন বলেছেন, পরিদর্শক নির্ব্বাচনে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন নীতি অনুসরণ করা হয়। কোন কোন জায়গায় সরাসরি ভাবে পরিদর্শক নিয়োগ করা হয়। তাদেব শিক্ষাগত যোগ্যতার উপর যতটা জোর দেওয়া হয় অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য গুণ সম্পর্কে সে পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করা হয় না।

কমিশন সুপারিশ করেছেন, যারা পরিদর্শকরূপে নির্বাচিত হবেন তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার মাপকাঠি হবে অনার্স ডিগ্রী বা এম. এ. ডিগ্রী। অভিজ্ঞতার দিক থেকে স্কুলে দশবছর শিক্ষকতা বা প্রধান শিক্ষকরূপে কমপক্ষে তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকবে। এইভাবে সরাসরি পরিদর্শক নিয়োগ ব্যবস্থা ছাড়াও দশ বছরের অভিজ্ঞ শিক্ষক, অভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষক, ও ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপকদের মধ্য থেকে পরিদর্শক নিয়োগ করা যেতে পারে। স্থায়ীভাবে এদের নিয়োগ করা হবে না। তিন বছর থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত তাঁরা একাজ করবেন তারপর যার যার স্থায়ী পদে ফিরে যাবেন। পরিদর্শকদের কর্তব্য সম্পর্কে কমিশন বলেছেন—পরিদর্শকদের কাজের দুটি ভাগ থাকবে একটি প্রশাসনগত অপরটি শিক্ষাগত।

প্রশাসনিক দিক হচ্ছে স্কুলের সারা বছরের হিসাব, প্রয়োজনীয় খাতাপত্র অফিসের বিভিন্ন কাজ প্রভৃতি দেখা। এজন্য পরিদর্শকের সাহায্যের জন্য উপযুক্ত কর্মী থাকবে। স্কুলের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে ও প্রশাসনিক কাজে এত সময় যায় যে শিক্ষাগত কাজের দিকে পরিদর্শকের যতটা মনোযোগ

দেওয়া উচিত তার পক্ষে সে পরিমাণ সময় দেওয়া সম্ভব হয় না। শিক্ষাগত কাজ বর্তমানে এত জটিল হয়ে উঠেছে যে পরিদর্শকের পক্ষে শিক্ষার সবদিক দেখে বিচার করা সম্ভব নয়। একজন পরিদর্শক যত বিদ্বানই হউন না কেন তিনি সমস্ত বিষয় সম্পর্কে মতামত বা উপদেশ দিতে পারেন না। এজন্য কমিশন প্রস্তাব করেছেন—বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি প্যানেল গঠিত হবে, পরিদর্শক হবেন এই বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সভাপতি। এই প্যানেল থেকে সভ্যরা তিন বছরে একবার স্কুলেব শিক্ষাগত দিক পরিদর্শন করবেন। এই প্যানেলের সদস্যরা যখন কোন স্কুলে যাবেন (এদের মধ্যে তিনজন সদস্য অভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষক হবেন) তখন সে সেখানে তারা ২।৩ দিন থাকবেন। সেখানে স্কুলের শিক্ষকদের সাথে আলাপ আলোচনা করবেন। তাদের সাথে থাকার ফলে স্কুলের সবদিক থেকে স্কুলের কাযপদ্ধতি দেখবার ও জানবার সুযোগ পাবেন। এইভাবে দেখা ও খোলাখুলিভাবে আলোচনার মধ্য দিয়ে স্কুলের উন্নতি বিষয়ে পরিদর্শক কার্য্যকরীভাবে সাহায্য করতে পারবেন।

সপ্তম অধ্যায়

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী

সহপাঠ্যক্রম কেন :—ছেলেদেব অধ্যয়নই তপস্যা—এ শিক্ষাই আমরা ছেলেদের দিয়ে এসেছি। লেখাপড়ার বাইরে যা কিছু-খেলাধূলা, ব্যায়াম, সমাজ সেবামূলক কাজ, গান-অভিনয়, সাহিত্যবিষয়ক কাজ প্রভৃতি ছাত্র-দের পক্ষে বর্জনীয় বলেই বিধান দেওয়া হয়েছিল। খেলাধূলায় সময় নষ্ট করবে খারাপ ছেলেরা। সুবোধ বালকদের উপদেশ দেওয়া হত সে সব ছেলেদের মন্দ স্বভাব পরিহার করতে। পুঁথি কেন্দ্রিক শিক্ষায় বইয়ের বাইরে যে জগৎ সেই জগতের সম্পর্কে কেউ উৎসাহ দেখালে অভিভাবক কি শিক্ষক সেই ছেলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে পড়তেন।

পাঠ্যসূচীতে বৌদ্ধিক বিকাশের উপযোগী বিষয় বস্তুর বাইরে কোন বিষয়ের সমাবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। দৈহিক বিকাশ, সমাজ সেবামূলক কাজ ও সামাজিক মনোভাব গড়ে তুবার মত শিক্ষা, বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মত শিক্ষা, একঘেয়ে নিরস পুঁথির জগতের বাইরের জগতের সাথে পরিচিত হবার মত ও শুধু মাত্র আনন্দের কোন ব্যবস্থার কথাই চিন্তা করা হত না।

শিক্ষা সম্পর্কে চিরাচরিত ধারণার পরিবর্তন সুরু হবার পর শিক্ষা মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে আমরা বুঝতে শিখলাম শুধুমাত্র কয়েক খানা বই পড়ার মধ্যে শিক্ষা সীমাবদ্ধ নয়। প্রচলিত পাঠক্রমের বাইরেও আমাদের অনেক কিছু জানবার আছে, করবার আছে, শেখবার আছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি হয় শিশুর ব্যক্তি সত্তা ও সমাজ সত্তার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ, যদি শিশুকে সমাজের উপযুক্ত নাগরিক করে তুলতে হয় তাহলে তাকে সুযোগ দিতে হবে তার সামগ্রিক বিকাশের। তার সামগ্রিক বিকাশ শুধুমাত্র কয়েকখানা পুঁথি পড়েই হবে না। তার জন্য খেলাধূলা, সামাজিক কাজ, সংগঠন মূলক কাজ, বিতর্ক, গান, অভিনয়, শিক্ষামূলক ভ্রমণ প্রভৃতি বহুকিছুর আয়োজন করতে হবে যার মধ্য দিয়ে তার বৌদ্ধিক, দৈহিক, মানসিক, সামাজিক প্রভৃতি সব দিকের সমান বিকাশ লাভ ঘটে। জীবন যুদ্ধে জয়ী হতে হলে, জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে যেভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা দরকার পাঠক্রমে তার সব ব্যবস্থা রাখতে হবে।

এক সময় ছিল যখন শিক্ষার্থীর জীবনের প্রয়োজনীয় এই বিষয়গুলিকে পাঠক্রম বহির্ভূত বিষয় (extra-curricular activities) বলে গণ্য করা হত। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাবিদদের চেষ্টায় আমাদের দৃষ্টি ভঙ্গীর পরিবর্ত্তন হয়েছে। শিক্ষার সীমিত রূপ আজ বহু ব্যাপক হয়েছে। শিশুকে গ্রন্থকীট তৈরী করাই বর্ত্তমান শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। তার দেহ ও মনকে গড়ে তুলতে হলে, তাকে বাস্তব জীবনের উপযোগী শিক্ষা দিতে হলে পাঠক্রমে বহু বিচিত্র বিষয়েব সমাবেশের প্রয়োজনীয়তার আজ আর কেহ অস্বীকার করতে পারেন না। তাই খেলাধূলা, সাহিত্যকর্ম প্রভৃতিকে আজ আর পাঠক্রমবহির্ভূত বিষয় না বলে সহপাঠক্রমিক বিষয় বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার এ সব কার্য্যবলীকে আর অতিরিক্ত বলে মনে করা হয় না। স্কুলের কার্য তালিকার অত্যাবশ্যক অঙ্গ বলে এই কাজ স্বীকৃত হয়েছে—These activities are nolonger looked upon as mere extras but as an integral part of the school programme."

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সহপাঠক্রমিক পাঠ্যসূচির গুরুত্ব উপলব্ধি করে মুদালিয়র কমিশন শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন ব্যক্তিত্ব বিকাশ (to the development of their children's entire personality") সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীকে স্কুল পাঠ্য সূচীর বাইরে সরিয়ে না রেখে বিদ্যালয়ের

অত্যাবশ্যক অঙ্গ বলে বিবেচনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন ('as integral a part of activities of school as its curricular work") সহ পাঠক্রমিক বিভিন্ন কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে শিশুর শক্তির অপচয় হয় না, তাদের বৌদ্ধিক বিকাশের সাথে সাথে অন্যান্য বহু সদ্‌গুণাবলীর বিকাশ ঘটে। (··"by planning a coherent programme of different activities, rich in stimuli, the school will not frittering away either the time or the energy of the pupils but will be heightening thair intellectual powers also side by side with training them in other fine qualities--Reports of Mudaliar Commission).

সহপাঠক্রমের প্রয়োজনীয়তা :—শিক্ষার্থীর জীবনকে গড়ে তুলতে সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীর বহুদিক থেকে উপযোগিতা রয়েছে। শিক্ষার্থী যখন কৈশোরে উপনীত হয় তার মনোজগতে কতগুলি পরিবর্তন দেখা দেয়। কিশোর বয়সে যূথবদ্ধতা সংস্কার অত্যন্ত তীব্র ভাবে দেখা দেয়। এই সংস্কারের বশে বার বছর বয়স থেকে ছেলেরা তাদের মধ্যে যে শক্তিশালী তার নেতৃত্বে দলবদ্ধ হয়। দলগতভাবে আজ আত্মপ্রকাশ করতে চায়, দলনেতা নির্দ্দেশে তাদের চিন্তা ও কার্য সঙ্ঘবদ্ধরূপে প্রকাশ পায়। তাদের অনিয়ন্ত্রিত কার্য অনেক সময় কার্যরূপে প্রকাশ পেতে পারে। কিশোর বয়সের সঙ্ঘ-চেতনা যাতে ব্যক্তির দিক কল্যাণে ও তাদের ব্যক্তিগত উন্নতির পথে পরিচালিত হয় সে চেষ্টা করতে হবে। তাদের এমন সব কাজে নিয়োগ করতে হবে যার মধ্য দিয়ে তাদের নিজেদের শক্তির প্রকাশই হবে না, তাদের সঙ্ঘশক্তি সামাজিক কল্যাণে নিয়োজিত হবে। স্কুলের বহু সাংগঠনিক কাজ ও সভা সমিতির মাধ্যমে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করে কিশোর বয়সের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ হবে। এই সব সংগঠনেরও নানাবিধ নিয়ন্ত্রিত কাজের মধ্য দিয়ে তাদের সামাজিক জীবন ও নৈতিক জীবন সুন্দরভাবে গড়ে উঠবে।

সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে সামাজিক কাজের মধ্য দিয়ে কিশোর বয়সে সামাজিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটবে। সামাজিক কাজের জন্য বিদ্যালয়ের বাইরে যে বিস্তৃত ক্ষেত্র রয়েছে তাই বেছে নিতে হবে। বাস্তব ক্ষেত্রে কাজ করে সে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে তাকে তার পরবর্তী জীবনের প্রস্তুতি পর্ব বলা যেতে পারে। বিদ্যালয়ের কাজের একটা সামাজিক দিক রয়েছে। স্কুল থেকে বিভিন্ন

সমাজ উন্নয়নমূলক ও সেবামূলক কাজের ব্যবস্থায় ছেলেরা মূল্যবান শিক্ষালাভ করতে পারে। তাদের মধ্যে সামাজিক বোধসৃষ্টি ও সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করবার ফলে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়। ব্যক্তির সাথে সমাজের ও সমাজের সাথে ব্যক্তির কি সম্পর্ক—বিভিন্ন সামাজিক কর্মের মধ্য দিয়া সে শিক্ষালাভ হয়। সঙ্ঘবদ্ধ কাজের ফলে একই রকম মনোভাব (like mindedness) সৃষ্টি হয়। চিন্তায়, বাক্যে, কর্মে ও ভাবে তাদের মধ্যে একাত্মবোধের সৃষ্টি হয়। একের জন্য অপরের ত্যাগ স্বীকার করার মনোবৃত্তি দেখা দেয়। ব্যক্তিগত রুচি ও প্রবণতা অনুসারে তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বিতর্ক সভা, অভিনয়ের জন্য সমিতি, ফুটবলের দল, স্কুল পত্রিকার জন্য সমিতি প্রভৃতি গঠন করে সে আর ব্যক্তিগত ভাবে চিন্তা করে না—নিজেকে সমাজের একজন রূপে ভাবতে শেখে। সে সর্বভাবে দলের স্বার্থের কথাই চিন্তা করে ও সমষ্টির স্বার্থকে ব্যক্তি স্বার্থের উপরে স্থাপনের শিক্ষা পায়। সহপাঠক্রমিক কাজের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করবার যে সামাজিক দিক রয়েছে তার ফলে শিক্ষার্থীরা এখানেই সুনাগরিক হবার শিক্ষালাভ করে।

সহপাঠক্রমিক কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর নৈতিক শিক্ষালাভ হয়। তার চরিত্র গঠিত হয়। যে সমাজে সে বাস করবে সমাজ আশা করে সেই সমাজের রীতিনীতিকে সে মেনে চলবে। সমাজের অপর দশজনের হিতাহিত ে'ব চিন্তা করবে। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করবার ফলে সে দলের নেতৃত্ব ও ইচ্ছাকে মেনে চলতে শেখে। এই শিক্ষাই তাকে নিয়ম শৃঙ্খলা ও আইনকানুন মেনে চলতে অনুপ্রাণিত করে। এই সামাজিক নীতিবোধ থেকেই তার চরিত্র গঠিত হয়।

সহপাঠক্রমিক কাজের আরেকটি দিক হচ্ছে শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত রুচি ও সামর্থ্য অনুসারে কাজের মধ্য দিয়ে নিজেকে গড়ে তোলার সুযোগ পায়, বহু রকমের সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী রয়েছে। সবাই সব রকম কাজ পছন্দ করে না। সবার শারীরিক শক্তি বা মনের চাহিদা এক রকম নয়। একজন খেলাধূলা পছন্দ করবে, আরেকজন অভিনয় করতে ভালবাসে। আরেকজন আঁকা বা লেখার দিকে আকৃষ্ট হবে। কোন ছেলের মধ্যে কি শক্তি রয়েছে সে কথা কেউ বলতে পারে না। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য (individual difference) রয়েছে তাই যেখানে বহু রকম কাজের সুযোগ আছে সেখানে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ রুচি ও আগ্রহ অনুসারে পছন্দ মত কাজ বেছে নিতে পারে। যার মধ্যে যে ক্ষমতা রয়েছে তাকে সর্বাধিক পরিমাণে সে শক্তি

বিকাশের সুযোগ দিলে সে তার নিজের সুপ্ত প্রতিভার সন্ধান পাবে। ছেলেরা মনের মত কাজ করবার সুযোগ পেলে কাজকে আর কাজ মনে করবে না এর মধ্যেই খেলার আনন্দ উপভোগ করবে।

সহপাঠ্যসূচীর অন্তর্গত বিভিন্ন ধরণের সৃজনধর্মী গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে ছেলেরা অবসর বিনোদনের যে শিক্ষা পায় তার সুফল বিদ্যালয় ছেড়ে যাবার পরও অনুভূত হয়। সামাজিক দিক থেকে বিচার করলে অবসর বিনোদনের শিক্ষা স্কুল পরবর্ত্তী জীবনে আরো মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়। বিজ্ঞানের যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে উৎপাদন আজ সহজতর হয়েছে। পূর্বে যে কাজে মানুষ যে সময় ব্যয় করত আজ আর সে সময় ব্যয় করতে হয় না। তার কাজের সময় কমেছে কিন্তু যন্ত্র যুগে মানুষ কাজের আনন্দ হারিয়ে ফেলেছে। যন্ত্রের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা মানুষ যেন যন্ত্রেরই একটা অংশ। সেখানে তার কর্মশক্তি বা সৃজনী শক্তির প্রকাশের কোন সুযোগ নেই। একঘেয়ে নীরস কাজের মধ্যে সে যতটুকু অবসব পায় তা সে হাল্কা আমোদ প্রমোদেই ব্যয় করে।

আলস্যে সময় কাটান অপেক্ষা ক্ষণিকের চটুল আনন্দে জীবনের শূন্যতাকে ভরে তোলবার চেষ্টা হয়ত ভাল, কিন্তু সামাজিক দিক থেকে কি ব্যক্তির দিক থেকেও এর বিশেষ কোন মূল্য নেই। অবসরের প্রয়োজন আছে আর সেই সাথে প্রয়োজন আছে কি করে অবসর সময়কে সুন্দরভাবে ব্যয় করা যায় তার শিক্ষার। আর্থিক প্রয়োজনে যেমন বৃত্তি শিক্ষার প্রয়োজন মনের খোরাক যোগাতে তেমনি অবসর বিনোদনের শিক্ষার প্র জন। অবসর ক্ষণকে আনন্দমুখর করে তুলতে মানুষ খেয়ালের বসে অনেক কাজ করে। স্কুল জীবনে সৃজন ধর্মী গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে খেয়াল (hobby) চরিতার্থ করবার শিক্ষা পেলে কর্মজীবনে সেই সব কাজের মধ্য দিয়েই সুন্দরভাবে সে অবসর বিনোদন করতে পারে।

সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি চলতে থাকে। সে বাস্তবের সাথে পরিচিত হয়। বৃহত্তর সমাজ জীবনের সংস্পর্শে আসে। শিক্ষার গতানুগতিকতার মধ্যে আনন্দের সৃষ্টি করতে হলে শ্রেণীকক্ষের বদ্ধ পরিবেশ থেকে শিক্ষার্থীকে মুক্তি দিতে হবে। শিক্ষাকে আনন্দময় করে শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টি করতে সহপাঠক্রমিক কাজের গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেখানে স্কুলের সময় তালিকায় সহপাঠ্যক্রমে অপাংক্তেয় করে রাখা হয় না। কি করে সুষ্ঠুভাবে নানারূপ কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর

দেহ ও মনের উৎকর্ষ সাধন ও ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশে সহায়তা করা যায় আধুনিক শিক্ষকদের তাই প্রধান লক্ষ্য।

সম্ভাবনা বহুল সহপাঠক্রমিক কার্যবলীর গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হবার পর ও আমাদের বিদ্যালয় সমূহে লেখাপড়ার বাইরে কোন কাজে ছেলেদের খুব বেশী উৎসাহ দেওয়া হয় না। এজন্য প্রথম প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন। অর্থ ও সময় সম্পর্কে অসুবিধার কথা তুলে একে প্রায়ই সরিয়ে রাখতে হয়। যেখানে কিছু ব্যবস্থা আছে সেখানে স্কুলের দৈনিক কাজ শেষ হবার পর সময় তালিকার সহপাঠক্রমিক কার্যসূচীকে নিয়মিত সময় তালিকা স্থান দিতে হবে। অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ের সাথে সম পর্যায় ভুক্ত না করলে এর শিক্ষামূল্য সম্পর্কে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সচেতন হবে না। শুধু সময় তালিকায় স্থান দিলেই হবে না-রুচি, আগ্রহ শক্তি অনুযায়ী যাতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের পছন্দ মত বিষয় বেছে নিয়ে সে কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে তাই কাজের বহু রকম সুযোগ রাখতে হবে।

নানারূপ কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে যেমন শিক্ষার্থীদের এসব কাজ অংশ গ্রহণ করতে উৎসাহ দেওয়া হবে তারপরও দেখতে হবে সব ছেলেমেয়েই যেন সহপাঠক্রমিক পাঠ্য সূচীতে অংশ গ্রহণ করে। ছেলেদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করবার জন্য সহপাঠক্রমিক কাজে একটা নম্বর দেবার ব্যবস্থা থাকা উচিত। সহপাঠক্রমিক বিষয়ে শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব সামগ্রিক মূল্যায়নের সময় বিচার করা হবে। সর্বাত্মক পরিচয় পত্রে (Cumuliative record card) পাঠ্য বিষয়ের বাইরে সহপাঠক্রমিক বিষয়ে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ও কৃতিত্বের কথা উল্লেখ থাকে কিন্তু বার্ষিক পরীক্ষার সময় শ্রেণীতে যে কয়টি বিষয় পড়ান হয় তার বাইরে সর্বাত্মক পরিচয় লিপিতে উল্লেখিত বিষয় সমূহকে বিচারের মধ্যে আনা হয় না। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীতে একটা নির্দিষ্ট নম্বর দেবার ব্যবস্থা থাকলে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক মূল্যায়ন যথাযথ রূপ হয়, ছেলেমেয়েরা উৎসাহও পায়।

অসুবিধা :—সহপাঠক্রমিক বিষয় সমূহ স্কুলের সময় তালিকায় প্রবর্তন করবার সাথে একটু সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজন আছে। অভিভাবক ও প্রাচীন পন্থী শিক্ষকেরা প্রথমেই অভিযোগ করবেন ছেলেরা খেলায় মেতে উঠেছে লেখা পড়ায় আর তাদের মন নেই। খেলাধূলা যে পড়ার অঙ্গ হতে পারে একথা তাঁদের বোঝান শক্ত। দৈনন্দিন পড়াকে ছেলেরা অবহেলা

করুক সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী প্রবর্তনের সে উদ্দেশ্য নয়। বইয়ের পড়ায় তাদের উৎসাহ ও আগ্রহ বাড়বে এই উদ্দেশ্য নিয়েই নানা রকম কাজ ছেলেদের দেওয়া হয়। আমেরিকায় সমীক্ষার ফলে দেখা গিয়েছে সেখানের বিদ্যালয়ে বহুবিধ সহপাঠক্রমিক কাজ প্রবর্তনের ফলে সাধারণ পাঠ্য বিষয় সমূহ আয়ত্ত করবার যোগ্যতা একটু ও হ্রাস পায়নি। যদি দেখা যায় অতি উৎসাহের বশে ছেলেরা খেলাধূলায় বা বাইরের কাজে খুব বেশী সময় নিয়োগ করছে সে সময় তাদের সতর্ক করে দিতে হবে। সময় তালিকায় সময় নির্দিষ্ট করে দিলে তারা দুই দিকেই পরিমিত সময় ব্যয় করিতে পারবে, কোন দিক থেকে কোন অভিযোগ উঠবার আর সুযোগ থাকবে না।

সময় তালিকায় সহপাঠ্যসূচীকে স্থান দিলে আর একটি অসুবিধা হচ্ছে শিক্ষকদের কাজের সময় বেড়ে যায়। নানারূপ সহপাঠক্রমিক বিষয় সংযোজনের ফলে স্কুলের কাজের সময় দীর্ঘতর হবে শিক্ষকদের বেশী সময় স্কুলে থাকতে হবে। অতিরিক্ত পরিশ্রম শিক্ষকেরা স্বেচ্ছায় করতে রাজী হবেন না। অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ করে এ অসুবিধা দূর করবার চেষ্টা করা যেতে পারে। অর্থের সংস্থান করা সব স্কুলের পক্ষে সম্ভব হবে না বলে এ ব্যবস্থায় আপত্তি উঠবে। মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্টে সহপাঠক্রমিক কার্যসূচীকে যেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সে কথা বিচার করে শিক্ষা বিভাগ স্কুলগুলিকে কি করে সাহায্য করা যায় সে কথা চিন্তা করে পথ নির্দেশ করবেন।

আর একটি ভয় হচ্ছে লক্ষ্যচ্যুতি। গতানুগতিকতার বাইরে একটা শুভ উদ্দেশ্য নিয়ে যে সব কাজ সুরু করা যায় প্রথমেই সে সম্ব র্ নানাদিক থেকে আপত্তি সুরু হয়। তারপরও যদি কাজটি সুরু করা যায় কিছু দিন বাদে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে উদ্দেশ্য নিয়ে কাজটি সুরু হয়ে ছিল সে উদ্দেশ্য গৌণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজটির শিক্ষা মূল্যের কথা ভুলে গিয়ে আনুষঙ্গিক বহিরঙ্গ দিকটাই প্রাধান্য লাভ করেছে। সহপাঠক্রমিক কাজ গুলির পিছনে যেন একটা পূর্বপরিকল্পনা থাকে। কাজের পিছনে একটা পরিকল্পনা থাকলে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা কম।

নানারূপ সহপাঠ্যক্রমিক কাজ ঃ—বিদ্যালয়ে বিভিন্ন রকমের কাজের আয়োজন করা হবে যার মধ্য থেকে ছেলেরা তাদের পছন্দ মত কাজ বেছে নেবে। কোন সময়ই স্কুল নির্দ্ধারিত কাজ ছেলেদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে না। সাধারণ ভাবে ছেলেদের আগ্রহ ও প্রবণতা বিচার করে প্রত্যেক একাধিক সহপাঠক্রমিক কাজের আয়োজন করা হবে। কাজগুলি যত সম্ভব

বৈচিত্র্য পূর্ণ হবে। স্কুলের সামর্থ্য ও স্থানীয় অবস্থা বিচার করে নানারূপ কাজের ব্যবস্থা করা হবে—এজন্য কোন নীতি নির্দেশ করা সম্ভব নয়। যে সব কাজে ছেলেদের আগ্রহ কম বা বেশী ছেলে যে কাজে অংশ গ্রহণ করতে রাজী নয় সে সব কাজের ব্যবস্থা করতে নেই। সব ছেলেমেয়েই কোন একটা কাজে অংশ গ্রহণ করবে কিন্তু একাধিক কাজে অংশ গ্রহণ করতে কোন ছেলেমেয়েকে বাধ্য করা হবে না। অতিরিক্ত উৎসাহের বশে কেউ যদি সাধ্যের অতিরিক্ত কাজে অংশ নিতে চায় তাকে বুঝিয়ে বিরত করতে হবে।

ছেলেদের জন্য যে সব কাজের ব্যবস্থা করা হবে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে ছেলেদের ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে। কাজ সম্পর্কে যেন ছেলেদের মনে সত্যিকারের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। যে কোন কাজের পিছনে পূর্বপরিকল্পনা থাকবে। পরিকল্পনা আগেই শিক্ষকেরা করে রাখবেন না। ছেলেরাই নিজেদের কাজের পরিকল্পনা নিজেরা করবে। ভুল যদি হয় নিজেদের ভুল নিজেরাই শুধরে নেবে। শিক্ষকের পরামর্শ বা সাহায্য চাইলে তিনি তাদের সাহায্য করবেন।

সহপাঠক্রমিক বিষয় নির্বাচনে যে সব কাজে ছেলেদের স্বাভাবিক আগ্রহ আছে ও যে কাজের মধ্য দিয়ে সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষা লাভ হয় সে সব বিষয়কে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কোন স্কুল কি কাজের আয়োজন করবে তা স্কুল কর্তৃপক্ষ স্থির করবেন। সহপাঠ্যসূচী পরিচালনায় ও ছেলেদের পরামর্শ দেবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন রয়েছে। স্কুল যে কাজের ব্যবস্থাই করুক না কেন দেখতে হবে সে কাজ পরিচালনার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক আছে কিনা। যে সব সহপাঠক্রমিক কাজের আয়োজন স্কুল থেকে করা যেতে পারে তাকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে যেমন— : (ক) সাহিত্য বিষয়ক কর্ম (literary activities) সাহিত্য সভা, বিতর্ক সভা, বিদ্যালয় পত্রিকা, দেওয়াল পত্রিকা ইত্যাদি। সাহিত্য বিষয়ক কর্ম সব স্কুলে কম বেশী হয়ে থাকে। আলোচনা চক্র বা বিতর্ক সভার আয়োজন করা খুব কঠিন কিছু নয়। প্রত্যেক স্কুলেই সাহিত্য বা অন্যান্য বিষয়ে আলোচনার জন্য একটি সমিতি থাকবে। ছাত্রদের নিয়ে এই সমিতি গঠিত হবে। একজন শিক্ষক থাকবেন উপদেষ্টা রূপে। যে বিষয় নিয়ে বিতর্ক হবে বা আলোচনা হবে তা পূর্বেই জানিয়ে দেওয়া হবে। আলোচনা বা বিতর্কে অংশ গ্রহণকারী বা ছাত্র সম্পাদক বা শ্রেণী সদস্যের কাছে নাম দিবে। নির্দ্ধারিত দিনে সব ছেলেই আলোচনায় উপস্থিত থাকবে। শিক্ষকদের

একজন বিচারক বা সভাপতির আসন গ্রহণ করবেন। বক্তারা বিষয়টির পক্ষে বা বিপক্ষে তাদের সুচিন্তিত বক্তব্য উপস্থিত করবে। বিতর্ক সভার মধ্য দিয়ে ছেলেরা সুশৃঙ্খল ও ধারাবাহিকভাবে নিজেদের কথা যুক্তিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করতে শেখে। ধীর ভাবে চিন্তা করে অপরের যুক্তি খণ্ডন ও বিতর্কের মধ্য দিয়ে শোনা যায়। বক্তৃতা দেবার অভ্যাস গঠিত হয়। পার্লামেন্টারী রীতি নীতির সাথে পরিচিত হবার সুযোগ ঘটে।

বিদ্যালয় পত্রিকা বা স্কুল ম্যাগাজিন অনেক স্কুলে আছে। ছেলেদের মধ্যে কোন কোন ছেলের লেখার আগ্রহ থাকে। প্রকাশের সুযোগ না থাকায় শক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা লিখতে উৎসাহ বোধ করে না। স্কুল ম্যাগাজিনের মাধ্যমে তাদের ভাব কল্পনা সুন্দর ভাবে প্রকাশ করবার সুযোগ পায়। লেখক জীবনের হাতে খড়ি বহু স্কুল ম্যাগাজিনের মধ্য দিয়েই সুরু হতে পারে। বিভিন্ন বিষয়ে লেখার মধ্য দিয়ে তাদের রচনা শক্তির বিকাশ লাভ ঘটবে। স্কুল ম্যাগাজিন পরিচালনার দায়িত্ব ছাত্রদের হাতেই থাকা উচিত। উপদেষ্টা রূপে একজন শিক্ষক থাকবেন। আজকের স্কুল পত্রিকার সম্পাদক হয়ত একদিন কোন কাগজের সম্পাদক রূপে আত্ম প্রকাশ করবে।

সাহিত্য সভার আয়োজন হলে ছেলেরা বিভিন্ন বিষয়ে স্বরচিত প্রবন্ধ কবিতা, গল্প পাঠ করে শোনাবার সুযোগ পাবে। স্কুলের সাহিত্য সভায় বাইরের কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করে আনা যায়। তাঁদের কাছ থেকে ছেলেরা অনেক কিছু জানতে ও শিখতে পারে।

(খ) খেলাধূলা (Games and Sports) কিশোর বয়সে দৈহিক গঠনে খেলাধূলার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। ১১।১২ বছরে বয়সে যখন ছেলেদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজের একটা বিশেষ প্রবণতা দেখা যায় তখন তাদের উৎসাহ ও শক্তিকে খেলাধূলার পথে পরিচালিত করলে কিশোর বাহিনী বিপথে যাবার পথ থেকে রক্ষা পেতে পারে। খেলাধূলা ছেলেরা সবচেয়ে বেশী ভাল বাসে—এতে ছেলেরা স্বেচ্ছায় অংশ গ্রহণ করে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সহজ মিলন ক্ষেত্র খেলার মাঠ। খেলার মধ্যে দিয়ে ছেলেদের দলগত মনোভাবের সৃষ্টি হয়, সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ও নেতৃত্ব গ্রহণের ক্ষমতা জন্মায়। সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করতে হলে দলনেতার নির্দেশ মানবার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে। ছেলেরা

খেলার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ ও অর্থ প্রতিষ্ঠার সুযোগ পায়। সর্বোপরি সঙ্ঘ চেতনা (espirit de corps) গড়ে ওঠে।

খেলায় শুধু দৈহিক উৎকর্ষ সাধন হয় না খেলাধূলার মধ্য দিয়ে শারীরিক মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক সব রকম শিক্ষাই হতে পারে। একজন খেলোয়ার বা এ্যাথলেট চিন্তা করে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সর্ব্বদা সতর্ক থাকা নানা রূপ কৌশল আয়ত্ব করা, কিছু সময়ের জন্য একটি মাত্র বিষয়ে সমগ্র মন নিবদ্ধ রাখার শক্তি অর্জন করা প্রভৃতি গুণের অধিকারী হতে হবে। এ সবের মধ্য দিয়ে মানসিক শক্তির যথেষ্ট উৎকর্ষ ঘটে। দৈহিক ও মানসিক শক্তির উৎকর্ষ সাধন পরোক্ষে চরিত্রও গঠিত হয়। শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়-স্বাধীন ভাবে যে কোন কাজে এগিয়ে যেতে সে আর দ্বিধা বোধ করে না।

খেলাধূলার বহুবিধ ব্যবস্থা স্কুল থেকে করা সম্ভব। ফুটবল প্রায় আমাদের জাতীয় খেলায় পরিণত হয়েছে ফুটবল খেলা খুব ব্যয় সাধ্য নয়—অনেক ছেলে এক সাথে খেলতে পারে। অল্প ব্যয়ে ও অল্প জায়গায় খেলাব মধ্যে ভলি বল একটি। এই খেলায় ও ছেলেরা যথেষ্ট উৎসাহ বোধ করে। ব্যয় সাধ্য খেলার মধ্যে হকি, ক্রিকেট, ব্যাডমিণ্টন ও বহু স্থলে খেলার ব্যবস্থ আছে। আমাদের দেশীয় খেলায় কোন রূপ খরচ নেই—গ্রামেব ছেলেদেব মধ্যে দেশীয় খেলায় উৎসাহ দেখা যায়। স্কুল থেকে দেশীয় খেলাব ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

বর্হিবিদ্যালয় খেলাধূলার (outdoor games) ব্যবস্থা ছাড়া ক্যারম, টেবিল টেনিস প্রভৃতি অন্তর্বিদ্যালয় খেলার (indoor games) ব্যবস্থাও স্কুলে করা যায়। এ ছাড়া স্কুল থেকে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতার ব্যবস্থা হলে ছেলেরা আনন্দের সাথে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে।

(গ) **সঙ্গীত ও অভিনয়ের আয়োজন** (Dramatic activities) :—

ছেলেদের আনন্দ বিধানের জন্য মাঝে মাঝে গান, হাস্য কৌতুক কি নাটক অভিনয়ের আযোজন করা যেতে পারে। স্কুল দিবস উপলক্ষে বিশেষ করে রবীন্দ্র উৎসব উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন করা হয়। এতে ছেলেদের উপযোগী কবিগুরুর যে সব নাটক আছে তার অভিনয় হতে পারে। স্কুলের পুরস্কার বিতরণী-উৎসবেও নাটক, গান ইত্যাদির ব্যবস্থা হলে ছেলেরা আনন্দের সাথে এতে অংশ গ্রহণ করবে। এ কাজের ভার ছেলেদের উপর ছেড়ে দিলে হৈজ বাঁধা থেকে সব রকম কাজ অত্যন্ত উৎসাহের সাথে করবে। সৃষ্টি-

ধর্মী কিশোর মনের খোরাক যোগাতে এসব কাজের যথেষ্ট মূল্য আছে। অভিনয় সম্পর্কে ছেলেদের একটা স্বাভাবিক আগ্রহ থাকে। একে শিক্ষার কাজে লাগান যেতে পারে। ইতিহাসের বিষয় বস্তু নিয়ে নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা হলে বিষয় বস্তু তাদের কাছে সজীব হয়ে দেখা দেয়। শ্রেণী-শিক্ষায় ও অভিনয় পদ্ধতির সাহায্যে নেওয়া চলে। যেখানে দু'তিন জনের কথা বার্তার মধ্য দিয়ে কোন ঘটনার কথা বিবৃত করা হয়েছে সেখানে শিক্ষক অভিনয় পদ্ধতির সাহায্যে পড়াতে পারেন।

কিশোর বয়স মানসিক বিপর্যয়ের ফলে বয়ঃসন্ধিক্ষণেই কিশোরের মনে স্বাভাবিক যৌনবোধের সূত্রপাত হয়। খেলাধুলা, সাহিত্য চর্চা ও অভিনয় ইত্যাদির মধ্যে শিক্ষার্থীর মন নানা ভাবে নিয়োজিত থাকায় তারা এ সব সৃজনী শক্তিমূলক কাজে নিজেদের প্রকাশ করতে পারে। আনন্দময় পরিবেশে গঠনমূলক কাজে ও নতুন সৃষ্টির আনন্দে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তৃপ্ত হয় ও সমাজের কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত হয়।

নানাবিধ সমাজ সেবামূলক ও সংগঠনমূলক কাজ :—

জুনিয়ার রেডক্রশ সমিতির মধ্য দিয়ে ছেলেরা নানা রূপ সেবামূলক কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারে। স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম পালন ও প্রচার করলে ব্যক্তিস্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য দুই রক্ষা হয়। অসুস্থ ও দুস্থ জনের সেবা একটা মহৎ কাজ এই কাজের মধ্য দিয়ে জনসেবার মহৎ আদর্শে ছেলেদের অনুপ্রাণিত করা যায়। স্কুলে—বুক ব্যাঙ্ক, দরিদ্র সাহায্য ভাণ্ডার স্থাপন করে স্বেচ্ছাদানের ভিত্তিতে একটি তহবিল সৃষ্টি করে গরীব ছেলেদের বই দিয়ে বা অন্য ভাবে সাহায্য করা যায়।

স্কুল সমবায় সমিতি ঃ—ছেলেরা সমবায়ের ভিত্তিতে কাগজ, খাতা পেন্সিল প্রভৃতি স্কুলে এনে রাখবে। ছেলেরা ক্রেতা, ছেলেরাই বিক্রেতা, তারাই হিসাব রক্ষক। সমবায় দোকান পরিচালনার মধ্য দিয়ে সমবায়-সমিতির প্রয়োজনীয়তা ও গঠন সম্পর্কে ছেলেরা শিক্ষালাভ করবে।

স্কুল স্বায়ত্তশাসন (School self Government) ঃ—বিদ্যালয় একটি গণতান্ত্রিক সমাজ। সেই সমাজের শিক্ষার্থীরাও একটা অংশ। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে ছেলেদের অংশ গ্রহণ করবার সুযোগ দিলে তাদের মধ্যে দায়িত্ব বোধ সৃষ্টি হবে। বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা, প্রভৃতি কাজের দায়িত্ব ছেলেদের দিলে তারা নিষ্ঠার সাথেই তাদের কর্তব্য পালন করবে বলে মনে হয়। প্রথম অবস্থায় ভুল ত্রুটি হতে পারে

তবু ছাত্র সমাজের মনোনীত প্রতিনিধি নিয়ে যদি তাদের উপর স্কুলের নানা কাজের দায়িত্ব দেওয়া যায় ও শিক্ষকেরা দৃষ্টি রাখেন তাহলে সুফল পাওয়া যেতে পারে। দায়িত্বশীল নাগরিক গড়ে তোলবার প্রথম প্রচেষ্টা রূপে স্কুল স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে।

এ ছাড়াও স্কুল থেকে শিক্ষামূলক ভ্রমণ (শিক্ষাসহায়ক উপকরণ অধ্যায় দেখুন) স্কুল প্রদর্শনী, পিকনিক প্রভৃতি নানা রকম ব্যবস্থা করে ছেলেদের শিক্ষার সাথে, আনন্দের ব্যবস্থা করা সম্ভব।

শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ

স্বাস্থ্যতত্ত্ব

স্বাস্থ্য কি ? আমরা ছেলেবেলা থেকেই শিক্ষা পেয়েছি স্বাস্থ্যই সম্পদ। কথাটা আমরা মুখস্থ করি কিন্তু যথোচিত গুরুত্ব সহকারে এই সম্পদ রক্ষা করবার চেষ্টা আমাদের মধ্যে দেখা যায় না। স্বাস্থ্য বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কেও আমাদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা নেই। কোন একটি লোক নীরোগ অবস্থায় থাকলেই তাকে স্বাস্থ্যবান বলা যায় না। স্বাস্থ্য হচ্ছে আমাদের দেহ ও মনের এক অমূল্য স্থায়ী সম্পদ। চেষ্টা ও নিয়মিত অভ্যাস করে এই সম্পদ লাভ করতে হয়। কোন লোককে স্বাস্থ্যবান বলতে হলে আমাদের দেখতে হবে সে সম্পদ তার আছে কিনা। স্বাস্থ্যের বিচারে প্রথমেই দেখতে হবে যে প্রকৃত স্বাস্থ্যবান তার দেহ ও মন সম্পূর্ণ সুস্থ ও নীরোগ কিনা। দেহকে সুস্থ রাখলেই চলবে না, মন অসুস্থ থাকলে কখনও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যায় না। স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির দেহ হবে সবল, সক্ষম ও কষ্টসহিষ্ণু। দেহে রোগ প্রতিরোধের একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকবে। সহজেই সে রোগাক্রান্ত হবে না। কিছুটা অনিয়ম সহ্য করবার মত শক্তি তার থাকবে। একরাত জাগলে, একটু জলে ভিজলে, একটু বেশী খেলে যে অসুস্থ হয়ে পড়ে তাকে স্বাস্থ্যবান বলা যায় না। তার জীবনে সবদিক থেকেই একটা আনন্দ বোধ থাকবে। দেহে, মনে সুস্থ হলে সে স্বাভাবিক ভাবেই দীর্ঘ জীবন লাভ করবে। যার মধ্যে এসব লক্ষণ রয়েছে আমরা তাকেই স্বাস্থ্যবান বলতে পারি। স্বাস্থ্যের কোন সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায় না। মানুষের দেহের কতগুলি লক্ষণ হিসাব করে আমরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী নির্দেশ করতে পারি। দেহে ও মনে সুস্থ সবল, নীরোগ, কর্মক্ষম থেকে দীর্ঘ জীবন লাভ করাকেই আমরা সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ বলে গ্রহণ করতে পারি।

নিজেকে ও সমাজের অপর সকলকে সুস্থ ও রোগমুক্ত রাখবার উপায় সমূহ নিয়ে যে বিজ্ঞান আমরা অধ্যয়ন করি তাকেই স্বাস্থ্যতত্ত্ব বলে থাকি। সুস্থ সবল

নীরোগ দেহকি করে লাভ করা যায়, কি করে কর্মক্ষম দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায়, কি করে প্রত্যেক মানুষ সমাজের সম্পদ হয়ে উঠতে পারে স্বাস্থ্যতত্ত্বে আমরা সেই শিক্ষালাভ করি। স্বাস্থ্যতত্ত্ব একটি ব্যবহারিক জ্ঞান। অন্য সব বিষয়ের মত শুধু জানার মধ্যেই এর কোন স্বার্থকতা নেই। বাস্তব জীবনে কাজে লাগাবার জন্য এই বিদ্যা শেখার প্রয়োজন।

একটা সুস্থ সবল প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর জাতি গড়ে তুলতে হলে জাতীয় স্বাস্থ্যের উন্নতি সম্পর্কে সমাজ ও রাষ্ট্রকে সচেতন হতে হবে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী না হলে অকালমৃত্যু, মহামারী, সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব সমাজে দেখা দেবে। জাতীয় সংকট যুদ্ধ বিগ্রহের মাঝে সুস্থ সবল মানুষই দেশকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে। ব্যক্তিস্বাস্থ্য রক্ষায় ও জনস্বাস্থ্য-রক্ষায় রাষ্ট্রের ও ব্যক্তির একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে। এই দায়িত্ববোধ থেকেই নিজেকে সুস্থ রাখা ও নীরোগ রাখার চেষ্টা করা উচিত। ব্যক্তিস্বাস্থ্য সম্পর্কে মনোযোগী হবার সাথে আমাদের দেখতে হবে আমাদের চার পাশের পরিবেশ যে সমাজে আমরা বাস করি সেখানেও স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

ব্যক্তিস্বাস্থ্য :—প্রত্যেকটি লোক যাতে নিজ নিজ দেহ সম্পর্কে যত্নবান হয় ও আপন চেষ্টায় স্বাস্থ্য সম্পদ অর্জন ও রক্ষা করতে পারে তাকেই বলা যায় ব্যক্তিস্বাস্থ্য। প্রতিটি লোক একটা নির্দিষ্ট নিয়ম ধরে জীবনকে পরিচালিত করবে। ব্যক্তি স্বাস্থ্যরক্ষার গোড়ার কথাই হচ্ছে নিয়ম মেনে চলা। নিয়মিত পরিশ্রম, বিশ্রাম ও পুষ্টিকর খাদ্য পেতে হবে। খাওয়ার একটা নির্দিষ্ট সময় থাকবে। ঘুম সম্পর্কেও একটা নিয়ম মেনে চলতে হবে। খাওয়া ও ঘুমান সম্পর্কে অনিয়ম স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে। ব্যক্তিস্বাস্থ্য রক্ষা করতে হলে কতগুলি সাধারণ নিয়ম আমাদের মেনে চলতে হবে। রোজ ঘুম থেকে উঠে পায়খানা যাওয়া, দাঁত মাজা, মুখ ধোওয়া প্রভৃতি অভ্যাস করতে হবে। গরমের দেশে নিত্য স্নান করা অবশ্য কর্তব্য। চুল কাটা, চুল পরিষ্কার রাখা, নখ কাটা, নখ পরিষ্কার রাখা, চামড়ার যত্ন করা, কাপড় চোপড় পরিষ্কার রাখা এসব সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। নিয়মিত ব্যায়াম অভ্যাস করলে দেহ সুস্থ ও সবল থাকে। পরিশ্রম ও বিশ্রাম দুই দেহের জন্য সমান প্রয়োজনীয়। সব সময় ঘরের মধ্যে বসে না থেকে কিছুক্ষণের জন্য বাইরের মুক্ত বাতাস গ্রহণ করা উচিত। স্বাস্থ্য সম্পর্কে এই সাধারণ নিয়মগুলি মেনে চললে সুস্থ শরীরের অধিকারী হওয়া সম্ভব।

জনস্বাস্থ্য :—জনসাধারণকে সমষ্টিগত অসুস্থতার হাত থেকে মুক্ত রাখা,

রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা জনস্বাস্থ্যের অন্তর্গত। ব্যক্তিগত ভাবে ছাড়াও সমবেত ভাবে সমাজের সবাই যাতে সুস্থ থাকে জনস্বাস্থ্যের তাই আলোচিত বিষয়। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য পরস্পর নির্ভরশীল। ব্যক্তিস্বাস্থ্য ভাল হলেই সমষ্টিগত স্বাস্থ্য ভাল হবে। একটি দেশের জনস্বাস্থ্য কিরূপ তার বিচার হবে সেখানের ব্যক্তিস্বাস্থ্য কিরূপ তা বিচার করে। ব্যক্তিস্বাস্থ্য খারাপ হলে গণস্বাস্থ্য খারাপ হতে বাধ্য।

জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ও ব্যক্তিস্বাস্থ্যের স্বার্থে স্বাস্থ্যকর পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। বস্তীর দূষিত পরিবেশে চেষ্টা করেও ব্যক্তিস্বাস্থ্য রক্ষা করা সম্ভব নয়। ব্যক্তিরস্বাস্থ্যকে রক্ষা করতে হলে কেবল নিজের দেহকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলেই চলবে না, তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতির কথাও ভাবতে হবে।

স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রচনার জন্য বাসগৃহ নির্মাণ করতে হবে: নির্দোষ, ভেজালহীন নিরাপদ খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। মলমূত্রাদি ও আবর্জনা পরিষ্কারের ব্যবস্থা থাকবে। সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকবে। ব্যক্তিস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পরিচ্ছন্ন পরিবেশ রচনা করতে হবে। সমাজের প্রতিটি লোক যদি পারিবারিক জীবনে স্বাস্থ্যের নিয়মগুলি মেনে চলার সাথে অপরের সুবিধা অসুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখে তাহলেই গণস্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে গণস্বাস্থ্যের সাফল্য ব্যক্তির নিজ নিজ স্বাস্থ্য রক্ষার চেষ্টার উপর নির্ভরশীল। পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতি ও জনসাধারণ সবার পক্ষে গ্রহণযোগ্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সম্ভব নয়। জনস্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। প্রত্যেক রাষ্ট্রে সরকারের জনস্বাস্থ্যবিভাগ থেকে সর্বসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য নানারূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বড় বড় সহরে কর্পোরেশনের ও ছোট সহরে মিউনিসিপ্যালিটির স্বাস্থ্য বিভাগ পৌর-স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে। রাস্তাঘাট, ড্রেন, পরিষ্কার রাখা ও সংস্কার করা, মলমূত্রাদি ও আবর্জনা অপসারণের ব্যবস্থা করা, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা, ভেজালহীন তাজা খাদ্য বিক্রয় হচ্ছে কিনা দেখা, রোগ প্রতিরোধের জন্য টীকা ও ইন্‌জেকসনের ব্যবস্থা করা, চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের ব্যবস্থা করা, বস্তি-অঞ্চলে স্বাস্থ্যের পরিবেশ যাতে সৃষ্টি হয় সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সরকারের জনস্বাস্থ্যবিভাগ ও পৌরকর্তৃপক্ষ করে থাকে।

জনস্বাস্থ্যবিভাগের আর একটি কাজ হচ্ছে জনসাধারণকে স্বাস্থ্যরক্ষার

নিয়ম সম্পর্কে শিক্ষাদান ও প্রচার। জনস্বাস্থ্য রক্ষায় জনসাধারণের স্বেচ্ছা-মূলক সহযোগিতা অপরিহার্য, শুধুমাত্র আইন করে জনস্বাস্থ্যরক্ষা করা সম্ভব নয়, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের জন্য টীকা ও ইন্‌জেকসনের ব্যবস্থা আছে, তবু সাধারণ লোক অনেক সময় টীকা নেয় না। মহামারী দেখা দিলে আইন করে টীকা নিতে বাধ্য করা হয় তবু লোক এড়িয়ে চলে, প্রচার করে যদি এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া যায় তাহলে আর আইনের দরকার হয় না। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত। আধুনিক বিজ্ঞান অপেক্ষা চিরাচরিত সংস্কারের প্রতি তাদের আস্থা অনেক বেশী। গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে যদি লোকদের আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের নিয়ম পালন সম্পর্কে রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা অবলম্বনের শিক্ষা দেওয়া যায় তাহলে সরকারের পক্ষে জনস্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব পালন করা সহজতর হবে।

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা :—

সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা রাষ্ট্রের একটা বিরাট দায়িত্ব। বিদ্যালয় সমাজের একটা অংশ। এখানে যারা শিক্ষালাভ করছে তারাই দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক। তারাই জাতির মেরুদণ্ড। পাশ্চাত্য দেশসমূহ বুঝতে পেরেছে সুস্থ সবল জাতি গড়ে তুলতে হলে শিশুর দেহ ও মনের স্বাস্থ্যের উন্নতির প্রয়োজন সর্বাধিক। তাই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যের উন্নতির প্রয়োজন সর্বাধিক। তাই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য তারা নানাভাবে চেষ্টা করছে। বয়স্ক ব্যক্তির স্বাস্থ্যকে নতুন করে গড়ে তোলা যায় না, কিন্তু চেষ্টা করলে শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে পারে। স্কুল থেকেই যদি ছেলেদের স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন অভ্যাস করবার শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে পরবর্তী জীবনে স্বাস্থ্যরক্ষা করা তার পক্ষে কোন সমস্যার কারণ হয়ে উঠবে না। স্কুলের শিক্ষায় ছেলেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় সাধারণ নিয়মগুলি পালন করতে শেখান হবে। কি কি কারণে দৈহিক ত্রুটি সৃষ্টি হতে পারে সে সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে হবে। রোগ হলে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা কি করে করা সম্ভব সে বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে। ছেলেবেলায় সাধারণ অসুখ বিসুখ থাকবেই এ ধারণা থেকে অনেক অভিভাবক ছেলেমেয়ের স্বাস্থ্য সম্পর্কে পিতামাতার কি কর্তব্য সে সম্পর্কে তাদের সচেতন করে তোলাও স্কুলের স্বাস্থ্য শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্যে থাকবে।

ছেলেদের স্বাস্থ্যশিক্ষায় আমাদের মনে রাখতে হবে ছেলেদের স্বাস্থ্যশিক্ষার

লক্ষ্য হচ্ছে তারা এ শিক্ষালাভ করে দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান ও স্বাস্থ্য রক্ষা করতে পারবে। স্কুলের শিক্ষার মধ্য দিয়ে তারা এমন কতকগুলি নিয়ম অভ্যাস করবে যা তাদের পরবর্তী জীবনেও প্রচুর শক্তি ও সামর্থ্য যোগাবে। ছেলেদের ও স্বাস্থ্যরক্ষা স্বাস্থ্যকর অভ্যাস শেখাবার বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে অভিভাবকদের মনে স্বাস্থ্যরক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে প্রভাব বিস্তার করতে হবে। ব্যক্তি স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্যের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ প্রশস্ত হবে। স্কুলে যারা শিক্ষা পাবে তারাই পরবর্তীকালে একটা সুস্থ সবল শক্তিমান জাতি গঠনে সহায়তা করবে।

আমাদের দেশে ধর্ম সাধনার উপরে স্বাস্থ্য সাধনার স্থান দেওয়া হয়েছে। যার স্বাস্থ্য নেই তার জীবনে কোন সাধনাই নেই। দেহ ও মনে যে সুস্থ নয় তার জীবন বিষাদময়। স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তির জীবন তার কাছে ও সমাজের কাছে একটা বোঝার মত। দেহ সুস্থ না থাকলে মানসিক শান্তিও থাকে না, সুস্থ দেহ হচ্ছে মনের আধার। যে স্বাস্থ্যহীন, চির রুগ্ন তার মনে শান্তি কোথায়? সবল সুস্থ যার দেহ প্রাণের প্রাচুর্য্যে সে সদা প্রফুল্ল। তার জীবনে নিরানন্দের স্থান নেই। স্বাস্থ্যের দিক থেকে দেহ ও মন পরস্পর নির্ভরশীল। ছেলেদের স্বাস্থ্যের শিক্ষায় শুধু সুস্থ সবল দেহের কথা ভাবলেই চলবে না। স্বাস্থ্যতত্ত্বের আলোচনায় মানসিক স্বাস্থ্যের কথাও আমাদের বিবেচনা করতে হবে।

Mental Health

মানসিক স্বাস্থ্য :—স্বাস্থ্য বলতে সাধারণভাবে আমরা দৈহিক স্বাস্থ্যের কথাই বুঝি। শিক্ষা প্রচেষ্টা হচ্ছে বৌদ্ধিক দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের প্রয়াস। তাই স্বাস্থ্যতত্ত্ব জানতে হলে মনের কথা বাদ দিয়ে শুধু দেহের স্বাস্থ্য নিয়ে থাকলে সে জানা হবে আমাদের পূর্ণকে বাদ দিয়ে খণ্ডকে জানা। দেহের স্বাস্থ্য রক্ষা করতে হলে মানসিক স্বাস্থ্য ও রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। মানসিক দিক থেকে সুস্থ না হলে শিশুর জীবনে বহু বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। তাই মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে ও শিক্ষাবিজ্ঞানের ছাত্রদের জানতে হবে। দেহের ব্যাধি দেহকে কিছুক্ষণের জন্য অসুস্থ করে তোলে। কিন্তু মানসিক অসুস্থতার ফল জীবনে সুদূর প্রসারী। মানসিক স্বাস্থ্যতত্ত্ব (Mental Hygiene) শিক্ষক-শিক্ষণের একটি স্বতন্ত্র পত্র তাই এখানে আমরা দু'চারটি কথায় দৈহিক স্বাস্থ্য রক্ষায় মানসিক স্বাস্থ্যের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করব।

আমরা জানি সুস্থ দেহই হচ্ছে সুস্থ মনের আধার। আবার মন খারাপ

হলে তার প্রতিক্রিয়ায় দেহও অসুস্থ হয়ে পড়ে। মনে যদি দুঃশ্চিন্তা থাকে, কোন কারণে ত্রাসের সৃষ্টি হয় তাহলে ক্ষুধা, নিদ্রা সব কিছু লোপ পেয়ে যায়। খুব ক্ষুধার মুখে যদি কোন দুঃসংবাদ আসে তাহলে মুহূর্ত মধ্যে ক্ষুধা লোপ পেয়ে যায়। পরীক্ষার সময় দেখা যায় পরীক্ষার্থীদের আহারে রুচি থাকে না এটা সম্পূর্ণ মানসিক কারণে হয়। ভয় মানসিক ব্যাপার কিন্তু হঠাৎ ভয় পেলে মানুষ হার্টফেল পর্যন্ত করতে পারে। তাই দেহ ও মনের অতি নিকট সম্পর্ক রয়েছে। দেহকে সুস্থ রাখতে হলে মানসিক স্থৈর্য্য বজায় রাখতে হবে। জীবনে সুখী হতে হলে যেমন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে, তেমনি জীবন যাতে বিড়ম্বনা পূর্ণ না হয়ে ওঠে সেজন্য সুস্থ ও সবল মনের অধিকারী হতে হবে।

শিশুর মানসিক বিকাশের পথে যদি কোন বাধার সৃষ্টি হয় তাহলে তার মানসিক শক্তিগুলির বিকাশ স্বাভাবিক পথ না ধরে অবদমিত হয়ে বিকৃত ভাবে প্রকাশ পায়। ছেলেদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাদের আবেগ ও প্রক্ষোভ সমূহ যাতে ঠিক পথে প্রকাশিত হয়ে জীবনের ধারাকে সুস্থ পথে পরিচালিত করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যদি কোন কারণে তার মনের ভার সাম্য নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সে মানসিক দিক থেকে অসুস্থ হয়ে পড়বে। শিক্ষা আজ শিশু মনোবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। যাকে শিক্ষা দেওয়া হবে সবচেয়ে আগে তাকে জানতে হবে, তার মনের গতি প্রকৃতিকে সঠিক ভাবে মেনে নিলেই তার জন্য সুষ্ঠু শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব। শিশুর মনের খোঁজ করতে হলে তার মন সুস্থ কি অসুস্থ দুই জানা দরকার। শিশুর বহু অসামাজিক আচরণের পিছনে রয়েছে তার অসুস্থ মনের প্রতিক্রিয়া। শিশুকাল থেকেই বাপমায়ের উচিত ছেলেমেয়ের মানসিক সুস্থতার দিকে লক্ষ্য রাখা। শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ হতে পারে এমন কিছু কখনও করা হবে না। শিশুকে খেলতে না দিয়ে ঘর কুনো করে রাখা, সব বিষয়ে ভয় দেখান বা সাবধান করা শিশুর চরিত্র গঠনে ও মানসিক স্বাস্থ্যের দিক থেকে ক্ষতিকর।

শিশুকে কখন ও অতিরিক্ত আদর দেওয়া হবে না বা অতিরিক্ত শাসন করাও উচিত নয়। ছেলেমেয়েরা বাপ মায়ের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখে, বাপ মায়ের-আচরণ ছেলের মনে গভীর রেখাপাত করে। তাই ছেলে মেয়েদের সামনে মিথ্যাকথা বলা, ঝগড়া করা, ভীরুতা প্রকাশ করা, ভাই বোনের মধ্যে হিংসার ভাব জাগাতে পারে এমন কথা বলা বা কাজ করা উচিত নয়। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সামঞ্জস্য বিধানের শিক্ষা

তাকে দিতে হবে। যদি সে সামঞ্জস্য বিধানে ব্যর্থ হয় তাহলে মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে তার জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার সমস্ত সম্ভাবনা লোপ পেয়ে যাবে।

বাল্যে যেমন পারিবারিক জীবনে বাপমায়ের প্রভাব তেমনি শিক্ষাকালে শিক্ষকের প্রভাবে শিশুর জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। স্কুলে গিয়েই ছেলে মেয়েরা পাঁচজনের সাথে মিশে এবং এর মধ্য দিয়েই সামাজিক জীবরূপে গড়ে ওঠবার সুযোগ পায়। পাঁচ জনের সাথে মিলে মিশে যে শিক্ষা মানসিক সুস্থতার জন্য সেই হচ্ছে প্রথম শিক্ষা।

ছেলেদের শিক্ষা দেবার সময় মনে রাখতে হবে ছেলেদের কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। শিশুর আশা আকাঙ্খা, ইচ্ছা অনিচ্ছা রুচি প্রবণতা সব কিছু জানা শিক্ষকের দিক থেকে প্রয়োজনীয়। ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও মানসিক বিকাশের সাথে জড়িত। মানসিক সুস্থতা ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য সর্বাধিক প্রয়োজনীয়। ছেলেদের স্বাস্থ্যরক্ষা বলতে দেহের স্বাস্থ্যের সাথে মনের স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা শিক্ষকের মনে রাখতে হবে। জীবনে সাফল্য লাভ করতে হলে ব্যক্তির নিজের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে পারিপার্শ্বিকের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে হবে। পরিবেশের সাথে মানসিক সামঞ্জস্য বিধান কিছুটা চেষ্টা ও অভ্যাসের উপর নির্ভরশীল। জীবনের প্রয়োজনের তাগিদে শিশুকাল থেকেই কতকগুলি প্রবণতা শিশুর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে—যেমন স্বীকৃতি লাভের চেষ্টা (desire for recognition) পরিবারের ছোট সীমার মধ্যে নিজেকে জাহির করতে চায়। পরিবারের সীমাবদ্ধ গণ্ডি পার হয়ে যখন সে স্কুলে ' 'স তখন সে প্রথম সংঘাতের সম্মুখীন হয়। নিজেকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টার সাথে সামাজিক বোধের সামঞ্জস্য বিধান করতে না পারলেই এর প্রতিক্রিয়ায় সে হতাশ হয়ে পড়বে। নিজেকে প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ প্রয়াসে আশাভঙ্গজনিত ক্ষোভে তার মনকে পীড়িত করে তুলবে। কখন কখন এই ব্যর্থতার ফলে ছেলেদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা দেখা দেয় আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গের মধ্য দিয়ে তার অবচেতন মনের ক্ষোভ প্রকাশ করে। কখনও ছেলেরা অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রীক হয়ে ওঠে। দুই ক্ষেত্রেই তার স্বাভাবিক বিকাশ বাধা পাওয়ায় তার মধ্যে সমাজ-বিরোধী কাজের আগ্রহ দেখা দেবে ছেলেদের মধ্যে দেখা যায় কোন ছেলে অতি বিমর্ষ কারো সাথে মিশতে চায় না। কারো মধ্যে ভাঙ্গাচুরার অভ্যাস দেখা যায়, কোন ছেলের মধ্যে চুরি করার প্রবণতা দেখা যায়, কেউ অপ্রয়োজনেও মিথ্যা বলে, কোন কোন ছেলে সমস্ত অন্যায় কাজের পিছনে

একটা যুক্তি সৃষ্টি করে অন্যায়ের সমর্থনের চেষ্টা করে। শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য যদি হয় চরিত্র গঠন তাহলে যে কোন রকম মানসিক অসুস্থতার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে। দেহের অসুস্থতা অল্প চেষ্টায় সারিয়ে তোলা যায় কিন্তু মনের অসুখের সব সময় সহজে প্রতিকার করা সম্ভব নয়। এ জন্য প্রয়োজন হলে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। মনের কোণে যদি একটি ব্যাধি বাসা বাঁধতে থাকে তাহলে তার বিষময় ফল সমস্ত জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলতে পারে। আমাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে শিক্ষা শুধু মাত্র দৈহিক স্বাস্থ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না সে যাতে সুস্থ সুন্দর মনের অধিকারী হতে পারে আমাদের বিদ্যালয়সমূহে সেদিকও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

(৩) **দৈহিক স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় শিক্ষা** :—বিদ্যালয়ে আমরা নানা বিষয়ে শিক্ষা দেই, কিন্তু সাধারণ বিষয়সমূহ শেখার সাথে স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় শিক্ষার একটা পার্থক্য আছে। স্বাস্থ্য শিক্ষায় শুধু শিক্ষা দিলেই চলবে না, ছেলেরা যাতে সে শিক্ষা তাদের জীবনে কার্যে রূপ দেয় তা দেখতে হবে। স্বাস্থ্য শিক্ষা কতকগুলি নিয়ম মুখস্থ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সেই নিয়মকে অভ্যাসে পরিণত করাই হচ্ছে এই শিক্ষার লক্ষ্য। তাই বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যের মূল নীতিগুলি শেখান হবে সাথে সাথে ব্যবহারিক জীবনে ছেলেরা সে নীতি যাতে মেনে চলে সে ব্যবস্থাও করতে হবে।

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা দেবার সাথে শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্য শিক্ষার মূল্য বোধ সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষায় ছেলেদের কার্যকরী সহযোগিতার প্রয়োজন। ছেলেরা বিদ্যালয় পরবর্তী জীবনে যাতে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে সেজন্য তাদের স্বাস্থ্য শিক্ষা দেওয়াও স্বাস্থ্যনীতি পালনে অভ্যস্ত করা। ছেলেরা যদি স্বেচ্ছায় স্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক নিয়মকানুন মেনে না চলে ও দেহ চর্চায় অংশ গ্রহণ না করে তাহলে স্বাস্থ্য শিক্ষার সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ হতে বাধ্য।

পাঠক্রম নির্দ্ধারিত বিষয় সমূহের মধ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা দেওয়া সহজ কারণ স্বাস্থ্যতত্ত্বের নীতি সমূহ শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিধির মধ্যে এনে তাকে বুঝতে পারে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্য দিয়ে ছেলেদের মধ্যে স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধ জন্মিলেই তারা স্বেচ্ছায় স্বাস্থ্য রক্ষায় সচেষ্ট হবে। ছাত্রদের বোঝাতে হবে সমাজের একজন সভ্যরূপে সমাজে স্বাস্থ্য রক্ষার একটা নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। জনস্বাস্থ্যের প্রয়োজনে, তার পারিবারিক কল্যাণে

তাকে স্বাস্থ্যের নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে এ বোধ তার মনে বদ্ধমূল করে দিতে হবে।

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষার মধ্য দিয়ে ছেলেরা কতকগুলি অভ্যাস আয়ত্ব করবে। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম সম্পর্কে যে কথাগুলি ক্লাসে বলা হল শিক্ষার্থীরা আপন আপন ব্যক্তিগত জীবনে তাকে কাজে পরিণত করলেই স্বাস্থ্য শিক্ষার উদ্দেশ্য সার্থক হবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে আমরা শিক্ষা দেই দেখতে হবে ছেলেরা অপরিষ্কার হয়ে স্নান না করে স্কুলে আসছে কি না। ছোট থাকতেই ছেলেদের নানারকম অভ্যাস গঠন করা সহজ। বাপ-মাও শিক্ষকের কর্ত্তব্য ছেলেবেলায় কতগুলি প্রয়োজনীয় অভ্যাস আয়ত্ব করতে ছেলেদের উৎসাহ দেওয়াও কু-অভ্যাসগুলি থেকে বিরত রাখা। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঘুম থেকে উঠে পায়খানায় যাওয়া, রোজ দাঁত মুখ পরিষ্কার করা, স্নান করা, চুল পরিষ্কার রাখা, নখ কাটা ও নখ পরিষ্কার রাখা, নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়া, জামা কাপড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি সাধারণ অভ্যাসগুলি হয়ত একদিনে আয়ত্ব করতে চাইবে না। কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের এই অভ্যাসগুলি আয়ত্ব করিয়ে নিতে হবে। মুক্ত বায়ু ও আলোর উপকারিতা সম্পর্কেও দেহের পক্ষে কাজ ও বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাদের বুঝিয়ে বলতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের রোজ ব্যায়ামের অভ্যাস করান দরকার। ড্রিল করা তাদের একটা ভাল ব্যায়াম এছাড়া নানারকম খেলায় তাদের উৎসাহ দিতে হবে। দেহের অঙ্গসমূহ নিয়মিত চালনার সাথে খেলাধূলাও ড্রিলের মধ্য দিয়ে চরিত্র গঠনের উপযোগী শিক্ষা দেওয়া যায়।

ছেলেরা স্কুলে কিভাবে বসবে, কিভাবে লিখবে, ক্লাসের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার রক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও তাদের কর্তব্য সম্পকে শিক্ষা দিতে হবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্য দিয়ে প্রাত্যহিক জীবনের যে অভ্যাসগুলি তারা আয়ত্ব করবে কতকটা অভ্যাসের বশে কিছুটা প্রয়োজন বোধে সেই অভ্যাসগুলি শিক্ষান্তোর জীবনেও তারা ত্যাগ করবে না।

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষায় ছেলেদের নিজেদের দেহের যত্ন নেবার অভ্যাস আয়ত্ব করবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করে তোলার সাথে রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার উপায়, কি করে রোগ হয় ইত্যাদি সম্পর্কেও শিক্ষা দিতে হবে। একজন থেকে কি করে আরেকজনের মধ্যে রোগ সংক্রামিত হয় এবং সংক্রামিত রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছেলেদের জানা দরকার। প্রত্যেক রোগের কারণ বিভিন্ন জীবাণু, তাদের রোগ সঞ্চার প্রণালী বিভিন্ন।

কি ভাবে চললে কলেরা, বসন্ত, হাম প্রভৃতি রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পারে ও রোগ হলে সংক্রামক রোগ দেখা দিলে কি কি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত এগুলি প্রত্যেক ছাত্রের জানা দরকার।

ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার আসল উদ্দেশ্য হল যাতে তারা তাদের জীবন ও পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী স্বাস্থ্য সম্মতভাবে গড়ে তুলতে পারে। ছেলেদের স্বাস্থ্য বিজ্ঞান পড়াবার সময় শুধু কতগুলি নিয়ম মুখস্থ না করিয়ে প্রত্যেকটি স্বাস্থ্যের নিয়ম মানার প্রয়োজনীয়তা উদাহরণ দিয়ে দেখাতে হবে। কি ভাবে চললে ভাল ফল পাওয়া যায় হাতে কলমে তা দেখাতে হবে। ছায়াচিত্র ও Magic lantern-এর সাহায্যে চিত্তাকর্ষক ভাবে ছেলেদের স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে বিষয়টিকে মনোজ্ঞ করে তুলতে পারলে বিষয় সম্বন্ধে ছেলেদের একটা স্বাভাবিক আগ্রহের সৃষ্টি হবে ও ব্যবহারিক জীবনে স্বাস্থ্যের নিয়ম সমূহ মেনে চলার উৎসাহ দেখা দেবে।

খাদ্য :—আমাদের জীবন ধারণের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। আমাদের জীবন ধারণের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন, যা আমাদের শরীর রক্ষার প্রয়োজনে লাগবে, যা থেকে আমাদের শরীরের শক্তি ও উত্তাপ জন্মাবে, শরীর গড়ে উঠবে তাকেই আমরা বলব খাদ্য। যথেষ্ট খাদ্যের অভাবে আমাদের দেহ দুর্বল রুগ্ন ও রোগপ্রবণ হয়। মানসিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয় ও শক্তির অভাব ঘটে। কোন খাদ্য গ্রহণ না করে আমরা কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারি। কিন্তু বেঁচে থাকতে হলে খাদ্য আমাদের দেহের যে সব অভাব পূরণ করে তা হচ্ছে :—

১। দেহের পুষ্টি ও বর্দ্ধন,
২। দৈহিক ক্ষয় পূরণ,
৩। দেহের তাপ রক্ষা,
৪। কর্মশক্তির যোগান
৫। দেহের রোগ প্রতিরোধ শক্তি সৃষ্টি।

সমস্ত খাদ্যের দ্বারাই দেহের সর্ববিধ প্রয়োজন মেটান যায় না। বিভিন্ন রূপ খাদ্যে বিভিন্ন গুণ থাকে। আমাদের দেহের প্রয়োজন মেটাতে কোন একটি খাদ্য যথেষ্ট নয়। দেহের সর্ববিধ প্রয়োজন মেটাতে আমরা নানাবিধ খাদ্য গ্রহণ করে থাকি। যে সব খাদ্য পরিমিতভাবে গ্রহণ করলে দেহের সব প্রয়োজন মেটান সম্ভব আমরা তাকে সুষম খাদ্য (balanced diet) বলে থাকি।

দেহের পুষ্টির জন্য সবদিকের সামঞ্জস্য রক্ষা করে খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হলে তাহা খাদ্যের পুষ্টিমূল্য অনুসারে করা হয়, অর্থাৎ কোন খাদ্যের কতটা ইন্ধনশক্তি আছে তা দেখতে হয়। খাদ্যের এই ইন্ধনশক্তি বা মূল্যকে বলা হয় ক্যালোরি (calorie)। নির্দিষ্ট পরিমাণে কোন খাদ্য কি পরিমাণ তাপ উৎপাদন করতে পারে তা থেকে ক্যালোরির পরিমাণ স্থির করতে হয়। একগ্রাম প্রোটিন ৪'১ ক্যালোরি উৎপাদন করে, ১ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট থেকেও সমপরিমাণ ক্যালোরি পাওয়া যায়। ১ গ্রাম চর্বি থেকে ৯'৩ ক্যালোরি পাওয়া যায়। আমাদের দেহে রোজ প্রায় ৩০০০ ক্যালোরি প্রয়োজন হয়। আমাদের এমন ভাবে খাদ্য গ্রহণ করতে হবে যাতে দৈনিক ৩০০০ ক্যালোরির প্রয়োজন মেটান যায়।

যে সব খাদ্য আমরা খাই সেগুলির গুণ অনুসারে তাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—জৈব খাদ্য ও অজৈব খাদ্য। জৈব খাদ্য দেহের পরিপুষ্টি সাধন ও তাপ উৎপাদনে সাহায্য করে। অজৈব খাদ্য জীবনীশক্তিদানে ও সংরক্ষণের শক্তি জোগায়।

খাদ্যের ক্রিয়ার প্রাধান্য অনুসারে সমস্ত খাদ্যকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

(ক) দেহের পরিপোষক খাদ্য (১) প্রোটিন বা আমিষ জাতীয় খাদ্য (২) শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয় খাদ্য (৩) চর্বি বা স্নেহ জাতীয় খাদ্য।

(খ) জীবনীশক্তিদায়ক ও সংরক্ষক খাদ্য (i) জল (ii) খনিজ লবণ (iii) ভিটামিন।

প্রোটিন :—প্রোটিনের কাজ হচ্ছে দেহের ক্ষয়পূরণ, দেহের বৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধন, দেহের যাবতীয় রস উৎপাদন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রোটিন কর্ম-শক্তি বৃদ্ধি করে ও কর্মে প্রবৃত্তি দেয় দৈহিক উত্তাপ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। মাছ, মাংস, ডিম, ছানা প্রভৃতি যাবতীয় জান্তব পদার্থ এবং সয়াবিন, শুটি, বরবটি, মটর ডাল প্রভৃতি বিশেষ উদ্ভিজ্জ পদার্থগুলি প্রোটিন পর্যায়-ভুক্ত। যব, গম, শাক সব্জী প্রভৃতিতে অতি সামান্য পরিমাণ প্রোটিন আছে, কিন্তু এগুলিকে প্রোটিন জাতীয় খাদ্য বলা হয় না। দৈনিক আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি সেই মোট খাদ্যের শতকরা দশভাগ প্রোটিন। যতদিন আমাদের শরীরে বৃদ্ধি হতে থাকে ততদিন দেহ গঠনের মূল উপাদানরূপে প্রোটিনের প্রয়োজন খুব বেশী। শরীর সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হলে প্রোটিনের প্রয়োজন কমে

যায়। পরিণত বয়সের লোকের যে পরিমাণ প্রোটিন দরকার ছেলেদের কিশোরদের ও যুবকদের তার চেয়ে বেশী প্রোটিন প্রয়োজন।

শর্করা বা শ্বেতসার (কার্বহাইড্রেট)—জমি থেকে আমরা যতরকম শস্য বা শস্যবীজ পেয়ে থাকি সমস্ত এ জাতীয় খাদ্য। ভাত, রুটি, খই, মুড়ি, সাগু বার্লি, এরারুক, আলু, চিনি, গুড় মিষ্টি দ্রব্য সবই শর্করা জাতীয় খাদ্যের অন্তর্গত। এই জাতীয় খাদ্য থেকে আমরা শক্তি ও তাপ লাভ করি। যে যত বেশী পরিশ্রম করে তার তত বেশী শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন। এজন্য শ্রমিক ও চাষীদের শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য ভাত, রুটি ইত্যাদি বেশী গ্রহণ করা উচিত। দেহের পূরণ করে শ্বেতসার যতটুকু অবশিষ্ট থাকে তা দেহের চর্বিরূপে জমে থাকে।

চর্বি বা স্নেহ জাতীয় খাদ্য :—ঘি, মাখন, তেল প্রভৃতি এ পর্যায়ভুক্ত। ইহা দেহে শক্তি ও তাপ জোগায়, প্রোটিনের সাথে এ জাতীয় খাদ্য থাকলে কম প্রোটিন খেলে কাজ হয়। অতিরিক্ত স্নেহজাতীয় খাদ্য খেলে দেহে মেদ বৃদ্ধি হয়। এ জাতীয় খাদ্যে শ্বেতসার অপেক্ষা দ্বিগুণ মাত্রায় তাপ জন্মাবার ক্ষমতা আছে বলে শীতপ্রধান দেশের লোকেরা প্রচুর পরিমাণে এ জাতীয় খাদ্য খেয়ে থাকে।

জল :—আমাদের দেহ থেকে নানাভাবে দৈনিক ১০০ আউন্স জল বের হয়ে যায়। এই ক্ষয়পূরণ ও দেহের ক্লেদ বের করে দেবার জন্য আমাদের প্রচুর পরিমাণে জল পান করা দরকার। অপ্রচুর জল পানে দেহ অসুস্থ হয়। খাদ্য গ্রহণ ও জলপান ভিন্ন ভিন্ন সময় হওয়া উচিত। ভাতের প্রতি গ্রাসে জল খাওয়া একটি খারাপ অভ্যাস। শ্রান্ত দেহে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা জল খাওয়া উচিত নয়—এতে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

ধাতব লবণ :—সাধারণ লবণ ছাড়া আরো কয়েক প্রকার ধাতব পদার্থ আমাদের দেহে প্রয়োজন হয়। আমাদেব দেহের প্রায় ছয় ভাগ ধাতব লবণ। প্রায় পনের রকমের ধাতব লবণ আমাদের দেহে দ্রবীভূত হয়ে আছে। মল, মূত্র, ঘাম প্রভৃতির মধ্য দিয়ে রোজ ২।৩ আউন্স লবণ আমাদের শরীর থেকে বের হয়ে যায়। এ ক্ষয় পূরণের জন্য খাদ্যের মধ্য দিয়ে আমাদের ধাতব লবণ গ্রহণ করতে হয়। ক্যালসিয়াম লবণের অভাবে হাড়, দাঁত ও নার্ভের ক্ষতি হয়, পটাসিয়ামের ও সোডিয়ামের অভাবে হৃৎপিণ্ডের কাজের ব্যাঘাত হয় ও পেশী সমূহের দৌর্বল্য, পরিপাক শক্তি হ্রাস ও চর্মরোগের সম্ভাবনা থাকে, লৌহ, তাম্র ও ম্যাঙ্গানিজের অভাব ঘটলে রক্তাল্পতা দেখা দেয়। ফসফরাস দেহের সর্বাঙ্গীন পুষ্টির জন্য প্রয়োজন।

খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন :—ইহা খাদ্যের মধ্যে এক বিশেষ প্রকারের সূক্ষ্মজাতীয় উপাদান। জীবন ধারণের পক্ষে ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। খাদ্যের সাথে যদি ভিটামিন না থাকে তাহলে তার অভাবে নানা প্রকার রোগ জন্মাবে। যদি দেখা যায় উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করেও কোন লোক দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে তাহলে পরীক্ষা করে দেখা যাবে সে যে খাদ্য গ্রহণ করছে তার মধ্যে খাদ্যপ্রাণের অভাব ঘটেছে। খাদ্যপ্রাণের অভাবে বেরি বেরি : রক্ত তারল্য, নার্ভের দোষ, অন্ধতা, স্কার্ভিনামে চর্মরোগ প্রভৃতি হতে পারে। নীরোগ থাকতে হলে আমাদের খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন চাই। টাট্‌কা খাদ্যেই বেশী খাদ্যপ্রাণ থাকে। ভিটামিন এক প্রকারের নয়। বহু প্রকারের ভিটামিন আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে ছয় প্রকারের ভিটামিন আমাদের নিত্য আবশ্যক। ভিটামিন গুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—ভিটামিন বি, বি কমপ্লেক্স, সি—এরা জলে দ্রবীভূত হয়। ভিটামিন এ, ডি, ই এবং কে এরা জলে দ্রবীভূত হয় না।

ভিটামিন 'এ'—দুধ, মাখন, ডিম, মেটেলি কড্‌লিভার অয়েল প্রভৃতির মধ্যে প্রচুর পাওয়া যায়। শৈশবে ও কৈশোরে দেহের পুষ্টি সাধনে এবং দৃষ্টি শক্তি সতেজ রাখতে এর আবশ্যকতা অত্যন্ত বেশী।

ভিটামিন বি$_1$, বি$_2$, বি$_3$—বেরিবেরি ও চর্মরোগের নিবারণ করে ও স্নায়ু সমূহের পুষ্টি সাধন করে। চাল, ডালের খোসার সাথে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এছাড়া পালং শাক, বাঁধা ও ফুল কপি, মুগ, মটর, অঙ্কুরিত ছোলা ডিমের কুসুম প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

ভিটামিন 'সি'—স্কার্ভি নামক রোগ, শরীর থেকে বা দাঁতের গোড়া থেকে রক্ত পড়া বন্ধ করে। ইহা আগুনের তাপে নষ্ট হয়ে যায়। সব রকম টাট্‌কা শাক, লেবু, কমলা, আম, কলা টমেটোতে এই ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে থাকে। টাটকা দুধে সি ভিটামিন আছে কিন্তু আগুনের উত্তাপে নষ্ট হয়ে যায়।

ভিটামিন 'ডি'—হাড় ও দাঁত গঠনে সাহায্য করে. শিশুদের রিকেট রোগ নিবারণ করে। কড্‌লিভার তেলে, মুরগীর ডিমের কুসুমে প্রচুর আছে। গায়ে রোদ লাগালে এই ভিটামিন শরীরে আপনা থেকেই সৃষ্টি হয়। এই ভিটামিন শিশুদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

ভিটামিন 'ই'—মেয়েদের সন্তান ধারণের শক্তি বাড়ায়। ডিমের কুসুম, কড্‌লিভার তেল, বাদাম, লেটুস প্রভৃতিতে পাওয়া যায়।

টাটকা সব রকম খাদ্যেই কিছু না কিছু ভিটামিন আছে। খাদ্যের টাটকা অবস্থায় ভিটামিন নষ্ট হয় না। কিন্তু বাসি হলে বা বেশী দিন রাখলে ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়। বর্তমানে কৃত্রিম ভাবে ভিটামিন তৈরী হচ্ছে এবং নানা রোগ প্রতিরোধে ভিটামিনের ব্যবহার হচ্ছে।

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও স্কুলক্লিনিক

শিশুরা জাতির সম্পদ। সুস্থ সবল জাতি গড়ে তুলতে হলে শিশু যখন প্রথম বিদ্যালয়ে পদার্পণ করে তখন থেকেই স্বাস্থ্যের সাধারণ অভ্যাসগুলি যাতে তার মধ্যে গড়ে ওঠে সে সম্বন্ধে সতর্ক হতে হবে। যে কোন দেশের ছাত্র সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যের উন্নতির ব্যবস্থা রাষ্ট্রের একটা অন্যতম প্রধান কর্তব্য। ছাত্র বয়সে যদি স্বাস্থ্যহানি ঘটে তাহলে সে ব্যাধিগ্রস্থ হবে না হয় যে কোন ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকবে। স্কুলের ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে যত্ন নিতে হলে স্কুল থেকে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা হলে শুধু তার দৈহিক স্বাস্থ্য নয় মানসিক স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হবে। ব্যাপক ভাবে স্কুলের ছাত্রদের যদি রোগমুক্ত ও সুস্থ সবল যাতে হতে পারে সে ব্যবস্থা করা হলে দেখা যাবে অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র জাতির স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে।

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা ইউরোপ ও আমেরিকার বহু দেশে উনবিংশ শতকে প্রবর্তিত হয়েছিল। ইংলণ্ডের বিদ্যালয়ে ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় বিংশ শতকের প্রথম দশকে। দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়র যুদ্ধে যে সব তরুণ সেনাদলে ভর্তি হয়ে যুদ্ধে গিয়েছিলেন তাদের একটি বিরাট অংশকে ফিরে আসতে হয়েছিল অসুস্থতা ও হীন স্বাস্থ্যের জন্য। এর কারণ অনুসন্ধানের জন্য ১৯০৩ খৃঃ এক রয়েল কমিশন বসে। কমিশন অনুসন্ধান করে দেখেন ছেলেদের মধ্যে ব্যাপক-ভাবে নানা প্রকার রোগ রয়েছে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, স্কুল ক্লিনিক, মিডডে টিফিন প্রভৃতি ব্যবস্থা করবার সুপারিশ করা হয়। ১৯০৭ খৃঃ শিক্ষা আইন অনুসারে ইংলণ্ডের স্কুল বোর্ড বিদ্যালয়ের ছেলেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ডাক্তার নিযুক্ত করতে থাকে।

বিগত দুটি মহাসমরের সময় বিভিন্ন দেশে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করবার

জন্য যুবকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। ডাক্তারী পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যুবকদের একটা বড় অংশ সৈন্যদলের ভর্তি হবার যোগ্য নয়। ভারতে যুদ্ধে যোগ দেবার জন্য যারা এগিয়ে এসেছিল তাদের পরীক্ষা করে দেখা গিয়াছে যুবকদলের অধিকাংশের সেনাবাহিনিতে যোগ দেবার মত দৈহিক যোগ্যতা নেই। ভবিষ্যতে জাতীয় সংকটে যাতে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি না হয় সেজন্য পূর্ব থেকেই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। দেশের সার্মাগ্রক স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে হলে নীচের দিক থেকেই সুরু করতে হবে। আজ যারা স্কুলে তাদের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থাই জাতীয় স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য প্রথম প্রয়োজন। স্বাস্থ্যবিধি ছেলেদের বই থেকে মুখস্থ করালেই একটা জাতি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে উঠবে না। প্রতিটি ছেলে যাতে বাড়ীতে স্কুলে শেখা স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মগুলি মেনে চলে ও সবল স্বাস্থ্যের অধিকারী হবার জন্য চেষ্টা করে সে সম্পর্কে অবহিত হবে। আমরা পূর্বেই বলেছি ছেলেদের লেখা পড়ার সাথে স্বাস্থ্যের একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। যে ছেলের দেহে নানা রকম রোগ বাসা বেঁধেছে, যে ছেলে অসুস্থ তাকে কি করে লেখাপড়া শেখান হবে। কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান যদি উন্নত করতে হয় তাহলে সেখানে ছেলেদের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা আগে করতে হবে। যেখানে ছেলেদের মধ্যে আনন্দ নেই, প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ নেই, দৈহিক অসুস্থতা বা অসুস্থতা জনিত একটা বিমর্ষ ভাব সেখানে লেখাপড়া ভাল হতে পারে না।

ভবিষ্যৎ নাগরিকরা যাতে স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবনের অধিকারী হতে পারে সে ব্যবস্থা করা প্রতিটি রাষ্ট্রের কর্তব্য। আজ যারা স্কুলে পড়ছে কাল তারাই হবে নাগরিক। দেহের দিক থেকে অপটু নাগরিক রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালনে অক্ষম। তাই বিদ্যালয় জীবন থেকেই চেষ্টা করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে রোগ মুক্ত থাকে। বিদ্যালয়ে নিয়মিত ভাবে ছেলেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকলে সে উদ্দেশ্য অনেকখানি সিদ্ধ হতে পারে।

ডাক্তারী পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা :—

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিভিন্ন দিক রয়েছে। ছেলেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা যেমন প্রয়োজন তেমনি দেখা প্রয়োজন বিদ্যালয়ের পরিবেশ স্বাস্থ্য সম্মত কি না। তারপর বিদ্যালয়ের গৃহ পরিকল্পনায় শ্রেণী কক্ষে প্রচুর আলো বাতাস পাবার ব্যবস্থা আছে কি না। ছেলেদের বসবার জন্য শ্রেণী কক্ষে প্রচুর জায়গা আছে কি না। পায়খানা প্রস্রাবের

জন্য স্বাস্থ্যপ্রদ ব্যবস্থা আছে কি না। স্কুলের সাধারণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মাণ রক্ষিত হচ্ছে কি না। যদি দেখা যায় বিদ্যালয় পরিকল্পনা স্বাস্থ্য নীতি সম্মত হয়নি তাহলে অভিজ্ঞ স্বাস্থ্য পরিদর্শকের পরামর্শ অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে। পরিবেশ যদি স্বাস্থ্যকর না হয় তাহলে শুধু ছেলেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে কোন সুফল পাওয়া যাবে না।

স্কুলের ছেলেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রাথমিক ব্যবস্থা কোন ছেলে স্কুলে ভর্তি হবার সময়ই করতে হবে। সুরুতেই যদি কোন রোগ বা অস্বাস্থ্যের লক্ষণ ধরা পড়ে তাহলে সহজেই চিকিৎসা করে ছেলেদের রোগ মুক্ত করা সম্ভব। আমাদের দেশের বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীরা সাধারণ স্বাস্থ্য নীতি সম্পর্কে অজ্ঞ। ছোটখাট রোগ সম্পর্কে যে সতর্কতা বা ডাক্তারের পরামর্শ নেবার প্রয়োজন আছে একথা তারা মনে করেন।। স্কুলে ডাক্তারী পরীক্ষার ব্যবস্থা হলে কতকগুলি সাধারণ রোগ যেমন দাঁতের রোগ, চোখের দোষ, কানপাকা, নানারকম চর্মরোগ প্রভৃতি অর্থাৎ যেসব রোগেব প্রতিরোধেব ব্যবস্থা অতি সহজ কিন্তু প্রায় সকল ছেলেই এর যে কোন একটা রোগে ভুগছে তার প্রতিরোধ করা যায়।

স্কুলের ডাক্তারের পরীক্ষার ফলাফল অভিভাবককে জানাতে হবে। ছেলেকে নীরোগ রাখা সম্পর্কে তার একটা কর্তব্য ও দায়িত্ব রয়েছে। অভিভাবকের সক্রিয় সহযোগিতা না থাকলে ছেলেদের জন্য কোন স্বাস্থ্য পবিকল্পনাই সার্থক হবে না। স্কুলের ডাক্তার ছেলেদের পরীক্ষা করে অভিভাবকের কি করণীয় তা জানাবেন। চিকিৎসার প্রয়োজন হলে সে সম্পর্কে উপদেশ দেবেন।

ছেলেদের মধ্যে কোন সংক্রামক রোগ দেখা দিলে ডাক্তারী পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকলে তা প্রথম অবস্থায় ধবা পড়বে। যদি কারো কোন ছোঁয়াচে রোগ থাকে তাহলে তার সংস্পর্শে যারা আসবে তাদের মধ্যে সে রোগ সংক্রামিত হবে। সময় মত রোগ ধরা পড়লে তাকে পৃথক করে রাখা সম্ভব এবং এর ফলে রোগ আর ছড়িয়ে পড়তে পারে না। ডাক্তারী পরীক্ষার নিয়মিত ব্যবস্থায় ছেলেরা যদি সুস্থ থাকে তাহলে স্কুলে ছেলেদের উপস্থিতির সংখ্যা বাড়বে ও এ ব্যবস্থা শিক্ষার যথেষ্ট সহায়ক হবে। আমাদের সহজ বুদ্ধিতে আমরা বুঝতে পারি যদি কোন অসুস্থ ছেলে কোনরকমে স্কুলে আসেও তাহলে পড়ায় সে মন দিতে পারবে না।

কোন ছেলের মধ্যে যদি মানসিক রোগের লক্ষণ দেখা দেয় ডাক্তারী পরীক্ষায় তাও ধরা পড়বে। মানসিক রোগের প্রথম অবস্থায় সতর্ক হলে

তাকে সহজেই রোগমুক্ত করা সম্ভব। যদি স্কুলের ডাক্তার মনে করেন রোগের অবস্থা জটিল তাহলে মানসিক ব্যাধি বিশেষজ্ঞ দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে। ছাত্রদের দৈহিক ও মানসিক উভয়বিধ স্বাস্থ্যের জন্যই ডাক্তারী পরীক্ষার প্রয়োজন আছে।

ডাক্তার বা স্বাস্থ্যপরিদর্শকের কাজ :—

স্কুলে কোন একটি ছেলে ভর্তি হলেই তার ডাক্তারী পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রথম পরীক্ষা অভিভাবকের সামনে হলেই ভাল হয়। প্রাথমিক পরীক্ষায় স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় কোন ত্রুটি ধরা পড়লে তৎক্ষণাৎ অভিভাবকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে রোগটিকে গোড়াতেই নির্মূল করবার ব্যবস্থা করতে হবে। এরপর নিয়মিত ডাক্তারী পরীক্ষায় জন্য তাকে হাজির হতে হবে। এ সময় অভিভাবকের উপস্থিতির কোন প্রয়োজন নেই।

স্কুলের ডাক্তারী পরীক্ষায় নিয়মিত দেহের ওজন নেওয়া, উচ্চতার মাপ নেওয়া, শরীরের সর্বাঙ্গীন পুষ্টি হচ্ছে কিনা, দৈহিক উচ্চতার সাথে ওজনের সামঞ্জস্য আছে কিনা, প্রভৃতি দেখা হয়। ছেলেদের স্বাস্থ্য ভাল আছে কিনা ওজন দেখেই তা প্রথম খোঁজ পাওয়া যায়। ছেলেরা অল্প বয়সে খুব বাড়তে থাকে তাই দেহের উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে ওজনও বাড়বে। ওজন বৃদ্ধি হচ্ছে দেখলেই বোঝা যাবে ছেলেটি সুস্থ আছে। শরীরের ওজন কমে গেলে বা স্থির হয়ে থাকলে বুঝতে হবে কোন অসুখ ভিতরে বাসা বেঁধেছে বা কোন অসুখ হবার সম্ভাবনা আছে। তাই ডাক্তার সময় মত সতর্ক হয়ে ভালভাবে পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন।

সাধারণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বোধ আছে কিনা ডাক্তারী পরীক্ষার সময় তা দেখা হয়। কাপড় চোপড় পরিষ্কার আছে কিনা, দাঁত মাজা, স্নান করা, চুল পরিষ্কার রাখা, নখ কাটা প্রভৃতি অভ্যাসগুলি সম্পর্কে ডাক্তারী পরীক্ষার সময় খোঁজ নিতে হবে। সে সম্পর্কে তাদের অভ্যাস করাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

বসন্তের প্রতিষেধক টীকা ও কলেরার ইনজেকশন নিয়েছে কিনা তার খোঁজ রাখতে হবে। ছেলেদের দাঁত, নাক, কান, চোখ গলা প্রভৃতি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। সেই সাথে দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, প্লীহা, যকৃত প্রভৃতি শরীরের সব যন্ত্র পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

ছেলেদের দেহে প্রায়ই চর্ম রোগ থাকে খুব ভাল করে লক্ষ্য করতে হবে এই রোগটি আছে কিনা, যেহেতু চর্মরোগ সহজে সংক্রামিত হয় তাই প্রথম থেকেই সতর্কতা প্রয়োজন।

ডাক্তারী পরীক্ষার রিপোর্ট অভিভাবকের কাছে পাঠাতে হবে। সাধারণ যেসব ত্রুটি অল্প চেষ্টায় সারতে পারে সে সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত স্কুল স্বাস্থ্যপরিদর্শক তা অভিভাবদের জানাবেন। যদি কোন রোগ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের সাহায্য দরকার হয় তাহলে সে বিষয়েও অভিভাবকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করবেন। কোন ছেলের সংক্রামক রোগ থাকলে যতদিন অসুখ না সারে ততদিন তাকে স্কুলে আসতে দেওয়া হবে না। স্কুল থেকে টিফিন দেবার ব্যবস্থা থাকলে ছেলেদের যে খাবার দেওয়া হবে তা পুষ্টিকর ও ভেজালহীন কিনা দেখবেন। স্কুলে খাবার তৈরী হলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে দৃষ্টি রাখবেন।

শিক্ষা বিষয়ক কয়েকটি ব্যাপারেও ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। সময় তালিকা রচনায় ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। স্কুলের কাজের সময়ের মধ্যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য কতটা মানসিক শ্রম, কতটা খেলা ও কতটা সময় বিশ্রাম প্রয়োজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করে তা স্থির করে নিয়ে সে ভাবে সময় তালিকা রচনা করবেন।

স্কুলের ছেলেদের যাতে সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় সে বিষয়ে যত্ন নেওয়া স্কুল ডাক্তারের কর্তব্য। কিভাবে শরীরের যত্ন নিতে হয় সে সম্পর্কে তিনি উপদেশ দেবেন। দাঁত মাজা, প্রতিদিন স্নান করে স্কুলে আসা, পরিষ্কার জামাকাপড় পরিধান করা, নখ কাটা, যেখানে সেখানে থুথু ফেলার অপকারিতা প্রভৃতি সম্পর্কে ছেলেদের বুঝিয়ে দেবেন। শিক্ষকরা যাতে এদিকে দৃষ্টি রাখেন সে বিষয়ে শিক্ষকদের বলবেন, ও অভিভাবকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবেন। স্কুল-ডাক্তার, শিক্ষক ও অভিভাবক সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ছেলেদের স্বাস্থ্যকর অভ্যাস সমূহ শেখান ও তাদের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য অটুট রাখা নিশ্চয়ই সম্ভব হবে।

স্কুলক্লিনিক ঃ—ছেলেদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য স্কুল থেকে ডাক্তারী পরীক্ষার ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। ভবিষ্যত সমাজের নাগরিকদের সম্পর্কে যদি আমরা যথাযথ কর্তব্য পালন করতে চাই তাহলে প্রতি স্কুলের ছেলেদের ডাক্তারী পরীক্ষার ব্যবস্থা আইন করে আবশ্যিক করা উচিত। ছেলেদের পরীক্ষা করে ডাক্তারের রিপোর্ট অভিভাবকের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বা

আনুসঙ্গিক উপদেশ দিয়েই স্কুলের কর্তব্য শেষ হলো বলে মনে করা উচিত নয়। কারণ অভিভাবক যদি ডাক্তারের নির্দেশ মত ছেলের চিকিৎসার জন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন তাহলে স্কুলের ডাক্তারের স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা চিকিৎসা সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে। স্কুল থেকে দেখা উচিত কোন ছেলের কোন রকম অসুখ থাকলে বা দেহগত কোন ত্রুটি থাকলে তা যেন চিকিৎসা করে ভাল করবার ব্যবস্থা করা হয়। কোন ছেলের সংক্রামক ব্যাধি থাকলে সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাকে স্কুলে আসতে দেওয়া হবে না এবং কি ভাবে তার চিকিৎসা করা দরকার স্কুল ডাক্তার সে সম্পর্কে উপদেশ দেবেন। সংক্রামক ব্যাধি ছাড়াও চোখের দোষ, দাঁতের পোকা, কান পাকা প্রভৃতি যে কোন রোগ থাকলে স্কুল ডাক্তার সে সম্পর্কে অভিভাবককে জানাবেন। অভিভাবক ডাক্তারের উপদেশ পেয়ে কোন ভাল ডাক্তার দেখিয়ে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন বা হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করাতে পারেন। আমাদের গরীব দেশের অভিভাবকরা সহজে প্রাইভেট ডাক্তারের কাছে যেতে চান না কারণ অর্থাভাব। আবার সব জায়গায় হাসপাতালের সুবিধা নেই, থাকলেও স্থানাভাব ও অসম্ভব ভীড়। সুচিকিৎসার ভরসা সেখানে খুব কম। এ অসুবিধা দূর হতে পারে যদি স্কুলে স্কুলক্লিনিক খোলা যায়। ইউরোপ আমেরিকায় ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয় তাই সাধারণ অসুখের চিকিৎসা যাতে স্কুলেই করা সম্ভব হয় সেজন্য স্কুল-ক্লিনিক আছে। আমাদের দেশের সহরাঞ্চলে যেথানে একাধিক স্কুল আছে সেখানে কয়েকটি স্কুল মিলে একটি স্কুলক্লিনিক খোলা যেতে পারে। গ্রামাঞ্চলে প্রতি থানায় একটি করে স্কুল ক্লিনিক খোলা হলে থানার মধ্যে যতগুলি স্কুল আছে সেই স্কুলগুলির ছেলেরা এই ক্লিনিকে চিকিৎসার সুযোগ পাবে।

স্কুলের ডাক্তার পরীক্ষা করে যদি কোন ছেলের চিকিৎসার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন তাহলে চিঠি দিয়ে তাকে স্কুলক্লিনিকে পাঠান হবে। ক্লিনিকে সাধারণ চিকিৎসা ছাড়াও চোখ, দাঁত, গলা, নাক, কান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অসুখের চিকিৎসার জন্য অভিজ্ঞের ব্যবস্থা থাকবে। কঠিন অস্ত্রোপচার বা জটিল রোগের চিকিৎসায় যাতে হাসপাতালের সাহায্য পাওয়া যায় সে ব্যবস্থা করা হবে। দরকার হলে ছেলেদের সেখানে চিকিৎসার জন্য পাঠান হবে।

মুদালিয়র কমিশনের মন্তব্য :—

ছেলেদের স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও স্কুলে ডাক্তারী পরীক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে বলেছেন। কমিশন সুপারিশ করেছেন, ছেলেদের

স্বাস্থ্য স্বাভাবিক আছে কিনা, দৈহিক পুষ্টি ঠিকমত হচ্ছে কিনা দেখবার জন্য প্রত্যেক ছেলের ডাক্তারী পরীক্ষা করতে হবে। কমিশনের অভিমত হচ্ছে— যদিও স্কুলে ডাক্তারী পরীক্ষার একটা ব্যবস্থা আছে, তবে সে ব্যবস্থা নামে মাত্র চালু আছে সেখানে সন্তোষজনক কাজ হচ্ছে না। কোন কোন স্কুলে নামে মাত্র ব্যবস্থাও নেই। স্কুলের কমিটিতে একজন ডাক্তার রাখবার ব্যবস্থা আছে তিনি কমিটির সভায় উপস্থিত থাকা ছাড়া ছেলেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজ করবার কোন সময় পান না। মুদালিয়র কমিশন বর্তমান স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থার ত্রুটি ও স্কুলের ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য যে সব সুপারিশ করেছেন এখানে তার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

"It is necessary ·· to subject all students to a medical examination, to ascertain whether they are normal in health and standards of physical development. Although the system of school medical inspection has been in existence for a number of years in many states, we are of opinion the results have not been satisfactory for the following reasons.:—

(i) The medical inspection has been done in a perfunctory manner.

(ii) The defects that have been brought out even by this type of examination have not been remedied because the remedial measures suggested are often not carried out.

(iii) There is no follow-up, not even in the case of those who have been declared as defective.

(iv) Effective cooperation has not been established between the school authorities and the parents, and either through ignorance or through lack of financial resources or both, the parents have taken little interest in the reports of the school medical officer.

We feel therefore that unless the present system is improved cosiderably, it would be a mere waste of time and money to continue it. To bring about necessary improvements, we recommend that :—

(i) Health examination should be thorough and complete. If a choice is to be made between frequent and cursory examinations and more thorough examinations at longer intervals, the latter are greatly to

be prefered. Every pupil in the school should undergo at least one examinations every year while in school and one just prior to leaving the school.

(ii) Pupils with serious defects and those who suffer from severe illness should be examined more frequently.

(iii) Much more should be done to assure prompt and effective or follow-up whenever examination reveal the need for corrective or remedial measures.

(iv) One copy of the health report should be kept by the school medical officer, another copy should go to the parent, and a third copy to the teacher incharge of particular group the health and safety of students will become an important concern of the entire school and activities for promoting and safeguarding health will find a place throughout the school programme.

বিদ্যালয়ের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা :—

বিদ্যালয়ের ছেলেদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রথম প্রয়োজন বিদ্যালয়ে একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করা। বাইরের পরিবেশ যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় তাহলে সেখানে যারা থাকবে তারাও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবার চেষ্টা করবে। নোংরা পরিবেশে বাস করলে দেহ মন দুই নোংরা হয়। শিশুর মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বোধ জাগাতে হলে তাকে ছেলে বেলা থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে রাখতে হবে। স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মগুলিতে যাতে অভ্যস্ত হয় সে চেষ্টা করতে হবে। স্কুলে স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যবস্থা আছে কিন্তু স্বাস্থ্য রক্ষার বিধি বই পড়ে মুখস্থ করলেই কারো স্বাস্থ্য রক্ষা হবে না। শিশু নিয়মগুলি পালন করছে কিনা দেখতে হবে। সেই সাথে দেখতে হবে স্কুলের পরিবেশটি যাতে স্বাস্থ্য সম্মত হয়। স্কুলের মধ্যে যদি আলো বাতাসের ব্যবস্থা না থাকে, স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার ঘরে ছেলেদের বসতে দেওয়া হয়, স্কুল যদি নোংরা বস্তি এলাকায় হয়, ছেলেদের জন্য খেলাধূলার ব্যবস্থা না থাকে এবং যদি উপযুক্ত পরিবেশে তাদের স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মপালনের অভ্যাস না করান হয়, তাহলে শুধু স্বাস্থ্য বই পড়িয়ে কি লাভ হবে। বিদ্যালয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ও প্রত্যেকটি ছেলে যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে প্রধান শিক্ষক

ও অন্যান্য শিক্ষকেরা এদিকে লক্ষ্য রাখবেন। স্কুলের ঘর দুয়ার মেঝে যদি সর্বদা পরিষ্কার ও আবর্জনা শূন্য থাকে, টেবিল, বেঞ্চ, চেয়ার প্রভৃতি কোথাও ধুলা জমতে দেওয়া না হয় তাহলে সেই পরিচ্ছন্ন পরিবেশে বাস করে ছেলেরা ও বুঝবে তাদের পরিচ্ছন্ন থাকা কর্তব্য। অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন থাকা লজ্জার বিষয়। পরিচ্ছন্ন বিদ্যালয় পরিবেশে ছেলেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য রক্ষার কাজ অত্যন্ত সহজ হয়ে যাবে।

ছেলেদের দৈহিক মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য স্কুল পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখতে হলে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে আলো হাওয়া যুক্ত খোলা জায়গায় বিদ্যালয় গৃহ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিদ্যালয়ের প্রতিটি কক্ষে যাতে প্রচুর আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে সেজন্য বড় বড় দরজা জানালা থাকবে। ঘরগুলি যাতে সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে সেজন্য রোজ ভাল করে সাফ করতে হবে। কোথায় ও কোনরূপ ময়লা বা আবর্জনা জমতে দেওয়া হবে না। দেয়ালে পেন্সিল দিয়ে কিছু লেখা বা কালির দাগ দিয়ে যাতে নোংরা না করে তা দেখতে হবে। প্রত্যেক বছর বিদ্যালয়েব ঘবগুলি চুনকাম করা দরকাব। ছেলেরা যেখানে সেখানে ছেড়া কাগজ, খাবারের ঠোঙ্গা এসব ফেলবে না— এজন্য নির্দিষ্ট জায়গায় বাজে কাগজ ফেলবার ঝুড়ি থাকবে। যেখানে সেখানে থুথু ফেলা আব একটি বদ অভ্যাস এই অভ্যাসটি যাতে ছেলেরা ত্যাগ করে সে বিষয়ে চেষ্টা করতে হবে। স্কুলের কয়েকটি নির্দিষ্ট জায়গায় থুথু ফেলবার পাত্র রাখা হবে ছেলেবা সেখানে থুথু ফেলবে। স্কুলে উপযুক্ত সংখ্যক পায়খানা ও প্রস্রাবাগার থাকবে। প্রতিদিন ঐগুলি পরিষ্কার করা হবে। অনেক সময় কোন কোন ছেলের মধ্যে বদ অভ্যাস দেখা যায়। তারা পায়খানা ও প্রস্রাব খানার দেয়ালে নোংরা কথা লিখে রাখে। এটা কিশোরদের অবদমিত যৌন চেতনার বিকৃত প্রকাশ। এ সম্পর্কে খোলাখুলি ভাবে স্কুল জমায়েতে বলা যেতে পারে "এ অভ্যাসটি খারাপ। বাইরের লোকেরা কেউ এলে দু'একটি ছেলের জন্য সমস্ত স্কুলের সম্পর্কে তারা একটা খারাপ ধারণা নিয়ে ফিরবেন। আশা করি তোমরা নিজেরাই এর প্রতি-বিধান করবে।" এ কথায় সুফল ফলবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

ছেলেদের পানীয় জলের ব্যবস্থা যাতে নির্দোষ হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। পল্লী অঞ্চলে স্কুলে একটি কুয়া বা নলকূপ থাকা উচিত। জল রাখবার পাত্র রোজ পরিষ্কার করা হবে ও ঢেকে রাখবার ব্যবস্থা থাকবে। ড্রামে জল রাখবার ব্যবস্থা হলে অনেক সময় ছেলেরা তার মধ্যে হাত ডুবিয়ে

জল নেয় বা গ্লাস ভাল করে না ধুয়ে ডুবিয়ে দেয়—এ অভ্যাসটি খারাপ। গ্লাসে জল খাবার ব্যবস্থা না থাকাই ভাল। সারা স্কুলের ছেলেদের জল খাবার জন্য দু'টি মাত্র গ্লাস থাকবে আর সবাই এসে মুখ লাগিয়ে জল খাবে, প্রায়ই দেখা যাবে ব্যবহারের আগে গ্লাসটি ভাল করে ধুয়ে নিচ্ছে না বা গ্লাসটি কয়দিন মাজা হয়নি। এর চেয়ে ট্যাপ (Tap) লাগান জলের পাত্র থাকাই ভাল। ছেলেরা হাত ধুয়ে হাত পেতে সেখান থেকে জল খেতে পারবে।

ছেলেদের যদি স্কুল থেকে টিফিন দেবার ব্যবস্থা থাকে তাহলে যেখানে খাবার তৈরী হবে সে ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে। মাছির উপদ্রব যাতে না থাকে সে দিকে দৃষ্টি রাখা হবে। খাবার তৈরী হয়ে গেলে ধূলি ও মাছির হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য খাবার ঢাকবার ব্যবস্থা থাকবে বা খাবার রাখবার আলমারী থাকবে।

ছেলেদের বসবার বেঞ্চ ও সামনের ডেস্ক বা হাই বেঞ্চ এমনভাবে তৈরী হবে যাতে ছেলেদের বসে লিখতে অসুবিধা না হয়। বেঞ্চগুলি মজবুত হবে। সামনের বেঞ্চের নীচে স্বতন্ত্র কাঠ লাগানো থাকবে যাতে ছেলেরা পা রাখতে পারে। বেঞ্চগুলিতে ছেলেরা ছুরি দিয়ে বসে খোদাই করে যাতে নষ্ট না করে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। এই খারাপ অভ্যাসটি সম্পর্কে তাদের পূর্বেই সতর্ক করে দেওয়া হবে।

স্কুলের সামনের বা চার পাশের খোলা জায়গায় যাতে ঝোপ, জঙ্গল, আগাছা জন্মাতে না পারে সে জন্য নিয়মিত পরিষ্কার করা হবে।

স্কুল পরিবেশের পরিচ্ছন্নতার সাথে ছেলেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কি না সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। স্কুলে স্বাস্থ্য সম্পর্কে যে শিক্ষা দেওয়া হয় পরিচ্ছন্নতা তার মধ্যে অন্যতম প্রধান। ছেলেরা যাতে পরিষ্কার কাপড় জামা পরে স্কুলে আসে শিক্ষকরা সে বিষয়ে একটু দৃষ্টি রাখলেই অবস্থার উন্নতি হতে পারে। ছেলেরা রোজ স্নান করে কি না, দাঁত মাজে কি না, নিয়মিত নখ কাটে কিনা, নখের গোড়ায় মাটি জমে আছে কিনা প্রভৃতি বিষয় শিক্ষক দেখবেন। ক্লাসে কয়েকদিন যদি একটু খোঁজ খবর করা যায় তাহলেই ছেলেদের অভ্যাসের পরিবর্তন হবে। শুধু উপদেশে কোন কাজ হবে না, অভ্যাসগুলি ছেলেদের আয়ত্ব করিয়ে দিতে হবে। মুখে নোংরা হাত দেওয়া, পেন্সিল মুখে দেওয়া, দাঁত দিয়ে নখ কাটা, যেখানে সেখানে থুথু ফেলা, মুখে হাত বা রুমালে চাপা না দিয়ে হাঁচি দেওয়া বা কাসতে থাকা প্রভৃতি খারাপ অভ্যাসগুলির দোষ সম্পর্কে ছেলেদের বলা

হবে। যদি পর পর কয়েকদিন শিক্ষক এ সম্পর্কে বলেন তাহলে ছেলেদের এ অভ্যাসগুলির পরিবর্তন হয়।

স্কুলে জল খাবারের ব্যবস্থা (School Tiffin)

ছেলেরা যে বয়সে স্কুলে আসে সে বয়সটা হচ্ছে তাদের বাড়বার সময়, ছেলেদের দৈহিক পুষ্টির জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্যের। উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যের অভাব হলে দেহ দুর্বল হয় ও দেহে রোগ প্রবণতা দেখা দেয়। দৈহিক পুষ্টির অভাবে মানসিক শক্তির ও সম্যক বিকাশ লাভ ঘটে না। দেহকে কর্মক্ষম রাখতে, দৈহিক পুষ্টির জন্য, দেহের ক্ষয় পূরণের জন্য দেহের তাপ রক্ষা ও রোগ প্রতিরোধের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। এঞ্জিনের যেমন জল ও কয়লার প্রয়োজন দেহের পক্ষেও কর্মশক্তি অর্জনের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের বাল্যে ও কৈশোরে যদি পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ঘটে তাহলে দেহ সুগঠিত হবে না, তারা চিররুগ্ন হবে জীবন হবে তাদের কাছে একটা বোঝা, সমাজ ও তাদের গলগ্রহ মনে করবে।

আমাদের দেশের ছেলেরা সাধারণতঃ ১০ টার মধ্যে স্কুলের দিকে রওনা হয়। স্কুলে ৪টা থেকে ৪-৩০ টায় বাড়ী ফেরে। স্কুলে তারা কিছুটা ছুটোছুটি করে, খেলা করে ফলে তাদের পরিশ্রম হয়, দেহের ক্ষয় সাধিত হয়। সকাল ১০টার মধ্যে যারা খেয়ে আসে ১টার মধ্যে তাদের খিদে পায়। দেহের পুষ্টি ও তাপ রক্ষার প্রয়োজনেই তখন তাদের জন্য কিছু খাবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। স্কুলের সময় তালিকায় এজন্য বিরতির ব্যবস্থা আছে। বিরতির ঘণ্টাকে বলা হয় টিফিন পিরিয়ড বা জল খাবারের ঘণ্টা। ধরে নেওয়া হয় ছেলেরা এ সময়ে কিছু খাবে। কোন কোন সহ-রাঞ্চলের ছেলে হয়ত বাড়ী থেকে খাবার নিয়ে আসে। গ্রামের খবর যারা রাখেন তারা জানেন বছরে একটা সময়ে বেশ কিছু ছেলে কিছু না খেয়েই স্কুলে আসে। তাদের পক্ষে টিফিন নিয়ে আসা বা কিছু কিনে খাবার জন্য পয়সা নিয়ে আসা কল্পনার বাইরে। অথচ ৪টা বা ৪৷৷০টা পর্যন্ত না খেয়ে থাকা এই অল্প বয়সের ছেলেদের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। দেহের ক্ষয় পূরণের ব্যবস্থা না হলে স্বাভাবিক ভাবেই অপুষ্টি দেখা দিবে। ইংলণ্ড ও আমেরিকার ছেলেদের জন্য Mid day meal এর ব্যবস্থা আছে। সে অসম্ভব চিন্তা করে আমাদের লাভ নেই। জাতির ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ব্যাপক স্বাস্থ্য হীনতার হাত থেকে ছাত্র সমাজকে রক্ষা করতে হলে বিদ্যালয়ে

টিফিনের সময় কিছু খাবার ব্যবস্থা করা দরকার। ছেলেরা নিজেরা কিছু কিনে খাবে এভরসা থাকলে চলবে না। ছেলেদের কর্মক্ষমতা বজায় রাখতে তাদের দেহমন পড়ার উপযোগী রাখতে, ছেলেরা স্কুলে থাকাকালীন কিছু খাবার যাতে পায় সে চিন্তা স্কুল কর্তৃপক্ষকে করতে হবে। প্রগতিশীল দেশসমূহে স্কুল কর্তৃপক্ষ ছেলেদের খাবারের ব্যবস্থা তাদের অন্যতম কর্তব্য বলে মনে করে। শিক্ষা শুধু পড়ান নয় দৈহিক স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থাও শিক্ষার একটা অঙ্গ।

ছেলেদের জলখাবারেব ব্যবস্থার সময় প্রথমেই দেখতে হবে যে খাবার ছেলেদের দেওয়া হবে তা যেন পুষ্টিকর হয়। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাবার দিলেও হয়ত দেখা যাবে ছেলেদের মধ্যে পুষ্টির অভাব জন্মাচ্ছে। খাদ্য প্রচুর হলেই হবে না—পুষ্টিকর খাদ্য বেছে নিতে হবে। স্কুলেব টিফিনে পেট ভরে খাবার ব্যবস্থা সম্ভব নয় তাই পুষ্টিকর খাবার তারা যাতে পায় সে কথা চিন্তা করে খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। খাদ্য পুষ্টিকর হলেই চলবে না সেই সাথে বৈচিত্র্যের ব্যবস্থা করতে। একই রকম খাদ্য যত পুষ্টিকরই হোক না কেন ছেলেদের রুচির সাথে সঙ্গতি রেখে পুষ্টিকর খাদ্যেব ব্যবস্থা করা সম্ভব হতে পারে।

স্কুলে টিফিনের সাথে যে প্রশ্নটি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তা হচ্ছে টিফিনের ব্যয় ভার বহন করবে কে? আমাদের দেশেব স্কুলগুলির পক্ষে এই ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব নয়। তাই অন্যত্র অর্থের সন্ধান করতে হবে। তারপর অভিভাবকদের উপর এই ব্যয়ভার চাপানো যায় কিনা সে ' ' ভাবতে হয়। আমাদের দেশেব অধিকাংশ লোক অতি কষ্টে ছেলেদের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করে। পল্লী অঞ্চলে স্কুলের মাইনে কম তবু দেখা যাবে মাসের পর মাস ছেলেরা স্কুলের মাইনে দিতে পারছে না। তার উপর যদি টিফিনের খরচ বাবদ অতিরিক্ত বোঝা তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তারা আর ছেলেদের স্কুলে পাঠাতে পারবে না। সবদিক বিবেচনা করে এই ব্যয়ভার বহন করবার দায়িত্ব সরকারের গ্রহণ করা উচিত। বর্তমান স্কুল থেকে অর্দ্ধেক ব্যয়ভার বহণ করতে রাজী হলে বাকী অর্দ্ধেক সরকার থেকে দেওয়া হয়। কিন্তু বর্তমানে এই অর্দ্ধেক খরচ দেবার মত শক্তি অধিকাংশ স্কুলের নেই। যে নীতি সরকার অনুসরণ করছে এভাবে চললে অধিকাংশ স্কুলে কোনদিনই টিফিনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে না। দীর্ঘসময় ব্যাপী কিছু না খেয়ে ছেলেরা দিনের পর দিন স্কুলে থাকলে ছেলেদের মধ্যে

যে অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহীনতা দেখা দেবে সেটা জাতীয় ক্ষতি। এই ক্ষতি রোধ করতে হলে সরকারকে নীরব দর্শকের ভূমিকা ত্যাগ করে একটা কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। আমাদের দেশের সহরাঞ্চলের অভিভাবকদের আর্থিক অবস্থা পল্লী অঞ্চলের থেকে কিছু ভাল। স্কুল টিফিনের ব্যয়ভার থেকে গ্রামের স্কুলগুলিকে সম্পূর্ণ রেহাই দেওয়া উচিত। সহরের অভিভাবকদের অর্দ্ধেক ব্যয়ভার বহন করার ব্যবস্থা করতে হবে। সহরের স্কুলেও গরীব ছাত্রদের জন্য ফ্রি টিফিন দিতে হবে।

স্কুল টিফিনে কি খাবার দেওয়া হবে এ সম্পর্কে একটা পূর্ব নির্দিষ্ট খাদ্য তালিকা করে দেওয়া সম্ভব নয়। আর্থিক সামর্থ্যে কুলালে দুধ, ডিম, ফল, মাংসের স্যাণ্ডউইচ, রুটি, মাংস প্রভৃতির একটা খাদ্য তালিকা করে দেওয়া কঠিন কাজ নয়। কিন্তু গরীব দেশের ছেলেদের অল্প খরচে যাতে পুষ্টিকর ও বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য দেওয়া যায় সে ব্যবস্থা করতে হবে। স্থানীয় অবস্থা বিচার করে ঋতু ভেদে খাদ্য তালিকা বিভিন্ন প্রকার হবে। ক্রমবর্দ্ধমান মূল্যবৃদ্ধির যুগে একটা নির্দিষ্ট খরচের মধ্যে কিছু ব্যবস্থা করা কষ্টসাধ্য। স্থানীয় বাজারে কি পাওয়া যায় ও দরসীমার মধ্যে কিনা বিচার করে স্কুল কর্তৃপক্ষ দৈনিক টিফিনের ব্যবস্থা করবেন। সাধারণভাবে কয়েকটি জিনিষ সর্বত্র অল্প খরচে ব্যবহা করা যায়। চিড়ে ভাজা ও নারকেল, আটার রুটি ও আলুর তরকারী, অঙ্কুরিত ছোলা, বা চিনে বাদামের সাথে মুড়ি, সময় উপযোগী ফল বিশেষ করে কলা ও কমলা নিয়মিত দুধ দিতে পারলে ভাল হয় তা যখন সম্ভব নয় মাঝে মাঝে দুধ ও ডিমের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

ছুটির দিন ও শনিবার বাদ দিলে আমাদের দেশের স্কুলগুলিতে ১৮০ দিনের বেশী টিফিনের ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। যদি দৈনিক প্রতি ছাত্রের জন্য কুড়ি নয়া পয়সার মধ্যে টিফিনের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে বছরে মাথা পিছু ছত্রিশ টাকার প্রয়োজন। মাসে প্রত্যেকটি ছাত্রের জন্য দেড় টাকা যদি সরকার থেকে দেয় তাহলে বাকী অর্দ্ধেক অভিভাবকদের কাছ থেকে নেওয়া যেতে পারে। শহরের শিক্ষিত অভিভাবকেরা ছেলে-দের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে এই অতিরিক্ত ব্যয় বহন করতে রাজী হবেন বলে আশা করা যায়। কিন্তু গ্রামের স্কুলের ছেলেদের জন্য টিফিনের দায়িত্ব পুরোপুরি সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষা বিভাগ ছাড়াও সমাজ কল্যাণ বিভাগেরও এ সম্পর্কে একটা দায়িত্ব রয়েছে। সমাজ কল্যাণ বিভাগ যদি আংশিক ব্যয় ভার বহন করে তাহলে সমস্যার সমাধান সহজতর হয়।

টিফিনের ব্যাপারে যথা সম্ভব বাজারের খাবার বাদ দিয়ে চলতে হবে। বর্তমান ভেজালের যুগে ছেলেদের খাঁটি পুষ্টিকর খাবার দিতে হলে স্কুলেই শিক্ষকদের তত্ত্বধানে টিফিন প্রস্তুত করা হবে। টিফিন তৈরীতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে। টিফিন তৈরীর জন্য ভিন্ন লোক থাকবে। প্রতিদিন একজন শিক্ষকের উপর ভার থাকবে তিনি তদারক করবেন। স্কুলের স্বাস্থ্য পরিদর্শক থাকলে তিনি লক্ষ্য রাখবেন যাতে স্বাস্থ্য-সম্মত খাদ্য ছেলেদের দেওয়া হয়। খাবার তৈরী হলে সেগুলি ধূলি মাছি প্রভৃতির থেকে রক্ষার জন্য আলমারীতে আটকে রাখা হবে। যাই খাবার দেওয়া হোক না কেন তা যেন বিশুদ্ধ ও টাটকা হয়।

টিফিন দেওয়া যাতে সুশৃঙ্খলভাবে হয় সেজন্য শিক্ষকেরা টিফিন দেবার সময় উপস্থিত থাকবেন। ছেলেরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে, প্রতি ক্লাসের দু'একটি বড় ছেলের সাহায্যে খাবার ভাগ করে দেওয়া হবে। পাতা কি অন্যান্য আবর্জনা যেখানে সেখানে ফেলতে দেওয়া হবে না। একটি নির্দিষ্ট জায়গায় পাতা বা খাবার ঠোঙ্গা ফেলা হবে সেখান থেকে ঝাড়ুদার সেগুলি পরিষ্কার করবে।

কয়েকটি সংক্রামক রোগ :—

স্কুলের ছেলেদের মধ্যে সংক্রামক ও অসংক্রামক দু'রকম রোগই দেখা যায়। সংক্রামক রোগের মধ্যে হাম, হুপিং কাশি, জল বসন্ত, বসন্ত, মামস, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ম্যালেরিয়া, কলেরা, যক্ষ্মা ও নানা প্রকার চর্মরোগ যেমন দাদ, খোঁস, একজিমা প্রভৃতি রোগে ছেলেরা আক্রান্ত হয়। সংক্রামক রোগ মাত্রই বীজাণু ঘটিত। উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে বীজাণু গুলি সৃষ্ট হয় এবং কোন বাহকের মাধ্যমে এরা সুস্থ শরীরে প্রবেশ করে। মানুষের দেহ রোগ বীজাণুর পক্ষে অনুকূল আশ্রয় স্থল। বীজাণুদ্বারা রোগ সংক্রমণের চারটি পথ আছে—(১) পরস্পর মেলামেশা দ্বারা (২) খাদ্য পানীয়ের মাধ্যমে। (৩) পোকামাকড়ের মধ্য দিয়ে (৪) জীবজন্তুর দ্বারা

সংক্রামক রোগের চারিটি অবস্থা :— (১) উপ্তিকাল (Incubation period) (২) রোগ লক্ষণাবলীর প্রকাশ (Symptoms) (৩) রোগের উপশম (cure) (৪) সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভের পূর্বাবস্থা (convalescene)।

রোগ বীজাণু মানুষের দেহে প্রবেশ করলে দেহ সুস্থ ও সবল থাকলে এসব বীজাণু সহজেই নষ্ট হয়ে যায় দেহে রোগ সৃষ্টি হতে পারে না। দেহ দুর্বল

হলে বীজাণু শরীরে বংশ বৃদ্ধি করে। এদের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি হলে এরা এক প্রকার বিষাক্ত রস নিঃসরণ করে তখনি দেহে রোগ লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পেতে থাকে। দেহে রোগ বীজাণু প্রবেশ করা থেকে রোগ লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত সময়কে বলা হয় রোগের উপ্তিকাল (Incubation period)। এর পরের অবস্থায় যখন রোগ লক্ষণাদি প্রকাশ পায় রোগী অসুস্থ হয়ে পড়ে তাকে বলা যায় রোগের আক্রমণ কাল। এরপর রোগীর দেহ থেকে বিষাক্ত রস বেরিয়ে গেলে রোগ ধীরে ধীরে কমে আসে এবং রোগী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

রোগের এই চারিটি অবস্থাতেই রোগের সংক্রামতা কমবেশী থাকে। তবে তৃতীয় ও চতুর্থ অবস্থায় রোগ সংক্রমণ সম্ভাবনা সর্বাধিক। এ অবস্থায় রোগী সেরে উঠতে থাকে কিন্তু সে তখন রোগ বিস্তারের প্রধান বাহক হয়ে দাঁড়ায়।

ছাত্রদের মধ্যে যে কোন রকম সক্রামক ব্যাধিব লক্ষণ দেখা দিলে তখনি তাকে অন্য ছেলেদের থেকে পৃথক করতে হবে যাতে ছোঁয়াচে এসে অন্য ছেলেদের মধ্যে সে রোগ ছড়িয়ে পড়তে না পারে। যতদিন পর্যন্ত না সে সম্পূর্ণ নীরোগ হয়েছে ততদিন পর্যন্ত তাকে স্কুলে আসতে দেওয়া হবে না। কলেরা বসন্ত প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাবেব সময় এ সব রোগের প্রতিষেধক টীকার ব্যবস্থা স্কুল থেকে কবা প্রয়োজন।

কয়েকটি রোগ :—হাম (Measles) অত্যন্ত সূক্ষ্ম বীজাণু দ্বারা এ রোগ সংক্রামিত হয়। বাতাসে ভেসে এ রোগ বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে পারে। রোগের উপ্তিকাল ১০ থেকে ১৪ দিন। রোগাক্রান্ত হলে রোগীর জ্বর হয়, মুখ চোখ ভার, সর্দি কখন কাশিও হয়। অল্প বয়সের ছেলেমেয়েদের এ রোগ অত্যন্ত বেশী হয়। হাম সাধারণতঃ শবীরের উপর দিকে বুকে পিঠে বের হয়।

রোগের আক্রমণ হলে রোগীকে তিন সপ্তাহ পৃথক রাখতে হবে। এ সময় তাকে স্কুলে বা অন্য কোথায়ও যেতে দেওয়া হবে না। যার হাম হয়েছে তার রক্তের সিরাম নিয়ে ইনজেকসান দিলে হাম নিবারিত হতে পারে।

জল বসন্ত (Chicken Pox)—জল বসন্তের সূক্ষ্ম ভাইরাস থেকে এ রোগ হয়। রোগের উপ্তিকাল ২।৩ সপ্তাহ। জ্বর হয়। জ্বরের প্রথম দিনেই ফোস্কার মত জল নিয়ে গুটি বের হয়। প্রথম দিনের পরও গুটি বের হয়। বুক, পেট, পিঠ, হাতের দিকে বেশী হয়। মুখে ও কপালে কয়েকটি গুটি

বের হয়। গুটি সেরে গেলে কোন দাগ থাকে না। জল বসন্তের খোসা পাতলা হয় ও উঠতে দেরী হয় না। বেশীর ভাগ সময়ে শিশু কিশোর ও যুবকদের হয়। অত্যন্ত সংক্রামক রোগ। বাতাসে রোগ ছড়িয়ে পড়ে। রোগীর গায়ের গুটি শুকিয়ে যে পাতলা খোস ওঠে তা থেকে ও রোগীর সংস্পর্শে এলে ও রোগ সংক্রামিত যায়।

এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেলে রোগীকে স্বতন্ত্র রাখতে হবে। তিন সপ্তাহের মধ্যে তাকে স্কুলে আসতে দেওয়া হবে না। বসন্তের টীকা জল বসন্ত রোগ নিবারণ করতে পারে না।

বসন্ত (Small Pox) : বসন্তের সূক্ষ্ম ভাইবাস থেকে এ রোগ সংক্রামিত হয়। সাধারণতঃ এ রোগের উপ্তিকাল ১২ দিন। যে কোন বয়সে এ-রোগ হতে পারে। প্রথমেই প্রবল জ্বর হয়। সারা শরীরে ব্যথা ও মাথায় যন্ত্রনা হয়। মুখ ফলা ও চোখ লাল হয়। জ্বরের চার দিনের দিন গুটি বের হতে থাকে। প্রথমে মুখে পরে হাতের বাইরের দিকে গায়ে বুকে শক্ত গুটি বের হয়। পরে পুঁজে ভরে যায়। গুটি সেরে গেলেও দাগ থাকে। চোখে বসন্ত হলে অন্ধ হয়ে যাবার ভয় থাকে।

জল বসন্তের মত বাতাসে, গুটির খোসার মাধ্যমে, মাছি রোগীর বিছানা কাপড় ইত্যাদি, নাকের ও মুখের শ্লেষ্মা থেকে বসন্ত রোগ ছড়ায়।

বসন্তের টীকা এ রোগের একমাত্র প্রতিষেধক। বাড়ীতে বসন্ত হলে হাসপাতালে পাঠন উচিত-- না হলে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করে রোগীকে ভিন্ন ঘরে রাখতে হবে। রোগীর সংস্রবে যারা আসবে তাদের [illegible] করা (quarantine) দরকার।

মামপস (Mumps) ঃ—এই রোগের বীজাণু গলার মধ্যকার প্যারটিড লালাগ্রন্থিকে আক্রমণ করে। কানের নীচের থেকে চোয়াল গলা পর্যন্ত ফুলে ওঠে। ১৪-২১ দিন এ রোগের উপ্তিকাল। এর পরের দিনথেকে পনের দিনের মধ্যে রোগের উপসম হয়। অত্যন্ত সংক্রামক রোগ। কারো সাথে রোগীর ছোঁয়াচ না লাগে সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। রোগ সেরে গেলেও অন্ততঃ পনের দিন স্কুলে আসতে দেওয়া হবে না।

ডিপথিরিয়া (Diphtheria) ঃ—ক্লীবলীফার্স ব্যাসিলাস নামক বীজাণু থেকে এ রোগ হয়। রোগের উপ্তিকাল দুই থেকে দশ দিন। জ্বর কাশি কোন কিছু গিলে খাবার অপারগতা দেখা দেয়। রোগীর টনসিল বা কণ্ঠনালীর উপর এবং কখন কখন নাসারন্ধ্রে একটি সাদাটে বা ছাই রংয়ের পর্দা পড়ে।

এর ফলে রোগীর শ্বাসরোধ হয় ও মুখ নীল হয়ে যায় শেষে শ্বাসরোধে রো. মৃত্যু হয়।

মুখের লালা থেকে এ রোগ ছড়ায়। এই রোগের অনেক রোগ বাহক থাকে তাদের মাধ্যমে রোগ ছড়ায়। ছোট ছেলেমেয়েরা চুষিকাঠি, কলম আইসক্রীম, ফলক, পেন্সিল মুখে দেয় তা আবার অন্য আরেকজন ব্যবহার করে তা থেকে রোগ ছড়ায়।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এ রোগ অত্যন্ত বেশী হয়। এ রোগ অত্যন্ত ছোঁয়াচে তাই রোগীকে পৃথক রাখতে হবে। ছোট ছেলেমেয়েদের সকলকেই ডিপথিরিয়ার সিরামের টীকা দেওয়া উচিত। স্কুলে এক গ্লাস থেকে খাওয়ার ব্যবস্থায় এ রোগের প্রসার ঘটায়। ছেলেদের একজনের মুখের জিনিষ আরেক-জনকে খেতে দেওয়া উচিত নয়।

হুপিং কাশি (Whooping Cough) :—ছোট ছেলেদের মধ্যে এ রোগটি খুব দেখা যায়। প্রথম অবস্থায় সর্দির পরবর্তী কাশির মত থাকে। এই রোগের উপ্তিকাল ৬ থেকে ১৮ দিন। প্রথম অবস্থায় ঠিক বোঝা যায় না। পরে কাশতে কাশতে প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসে। চোখ মুখ লাল হয়ে যায়। কখনও কখনও কাশতে কাশতে বমি করে ফেলে। এই রোগটি ছেলেদের পক্ষে খুবই কষ্টদায়ক। রাতে দু'তিন বার কাসির উদ্রেক হয় ফলে ঘুমের খুবই ব্যাঘাত হয়। এ রোগ সারতে বেশ সময় নেয়। ব্যাধিটি ছোঁয়াচে তাই যতদিন রোগমুক্ত না হয় ততদিন রোগীকে স্কুলে আসা বন্ধ রাখতে হবে।

যক্ষ্মা (Tuberculosis) :—ব্যাসিলাস টিউবারকিউলোসিস নামক এক প্রকার সূক্ষ্ম বীজাণু থেকে এই রোগ হয়। এ রোগের কোন নির্দিষ্ট উপ্তিকাল নেই। রোগ বীজাণু বহুদিন পর্যন্ত শরীরে গোপন থাকে। এমনও দেখা গিয়েছে রোগ বীজাণু দেহে রয়েছে কিন্তু রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায়নি।

সাধারণতঃ ক্ষয় রোগের বীজাণু ধুলির সাথে মিশে বায়ুবাহিত হয়ে সুস্থ লোকের দেহে প্রবেশ করে ফুসফুসে, অন্ত্রে কি হাড়ে বাসা বাঁধে। রোগীর সাথে কথা কইবার সময় বা হাঁচি বা কাশির মধ্য দিয়ে যক্ষ্মার জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে। রোগীর জিনিষপত্র ব্যবহার করলেও এই রোগ হতে পারে।

রোগ দেহে বাসা বাঁধলে শরীর ক্রমে দুর্বল হয়ে আসে, ওজন কমতে থাকে, বিকেলের দিকে অল্প জ্বর হয়, সহজেই ক্লান্তি বোধ হয়। রাতে ঘাম হয়। প্রথম অল্প অল্প কাশি থাকে, পরে কাশির সাথে যে গয়ের বের হয় তার সাথে রক্ত